ললিত বিভাস

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ—১লা আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রকাশক :
কালিদাস চক্রবর্তী,
সুন্দর প্রকাশন
৮-এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৮০, আচার্য জগদীশ বসু রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মূল্য :
দশ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

(সূচনা)

কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর কুড়ি বছর যেমনভাবে ঠিক সন্ধ্যাহ্নিক সারার পর সামান্য কিছু খেয়ে নিজের মশারীটা নিজে টানিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েন, এবং শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন, সেদিনও সন্ধ্যায় ঠিক তেমনিভাবেই শুয়ে পড়েছিলেন সুধাকান্ত। কিন্তু কোন এক নিদারুণ তাড়নায় ঘুমের মধ্যেই জর্জরিত হয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তাড়িত বিহ্বলের মত বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি। স্থান কাল সব কিছু যেন মুছে গিয়েছে। শুধু রয়েছে চারিপাশে অন্তহীন অন্ধকার, আর মনের মধ্যে রয়েছে এক সর্বগ্রাসী নামহীন উদ্বেগ। নিজেকেই যেন ভুলে গিয়েছেন তিনি। নিজেই যেন একতাল জমাট উদ্বেগের পিণ্ডের মত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ভেসে চলেছেন।

সেই অবস্থাতেই চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকলেন তিনি, ধীরে ধীরে অকাল বর্ষার মেঘের মত আচ্ছন্নতার সেই ভয়াতুর ভাবটা কেটে গেল, অন্ধকারের মধ্যেই আবার স্থান আর কালের মাপটা ফিরে এল। অকস্মাৎ বালিশের পাশে রাখা ঘড়িটার জলন্ত দাগগুলোর উপর নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। আপনার অজ্ঞাতেই বেরিয়ে এল। ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দুলালের সেই ঘড়ি-বাঁধা হাত আর তার হাসি-হাসি গম্ভীর শান্ত মুখখানি মনে পড়ল। আজ দু মাস আগে মারা গেছে দুলাল। হিসেব করতে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, ঠিক দু মাস হল আজ। তাঁর দুলাল, আদরের দুলাল, ছোট ছেলে, কিন্তু কখনও প্রকাশ্যে আদর তো করেননি তাকে। অকস্মাৎ সমস্ত বুকটা মথিত করে আপনিই যেন ইষ্টনাম স্মরণ করলেন—হরিবোল, হরিবোল।

ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। ঠিক দেখতে পেলেন না। বয়স হয়েছে তো। হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে দেখলেন—সাড়ে বারোটা বাজছে। ঘড়িটা আবার বালিশের পাশে যথাস্থানে রেখে চুপ করে বসে থাকলেন। চিন্তা, শুধু রাশি রাশি চিন্তা। শেষ নেই তার। দুলাল বিবাহ করেনি। সংসারে তার সন্তান সন্ততি, তার সামান্য চিহ্নও থাকল না। অন্ধকারের মধ্যেই নিজের কথাকে অস্বীকার করে ঘাড় নাড়লেন তিনি। সে আপনার চিহ্ন রেখে গেছে অন্যভাবে। সে যে তাঁর সন্তান, তাঁর আদরের দুলাল ছাড়াও যে অন্য কিছু ছিল এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সে সমস্ত দেশের উপর আপনার স্বাক্ষরের দীর্ঘস্থায়ী চিহ্ন রেখে গিয়েছে। সে তাঁকে কোন দিকে তো ভারগ্রস্ত করে যায়নি। কিন্তু কেন গেল না? তাঁর উপর কি তার কোন অভিমান ছিল? সেই থেকেই কি তার মনে হয়েছিল যে বাবার উপর কোন ভার চাপিয়ে কষ্ট দিয়ে যাব না? তার মুখ দেখে তাকে কত সুন্দর, কত দূরের মানুষ মনে হত। মনে হত আপনার অস্পষ্ট হাসির আড়ালে কোন এক কঠিন আবরণ দিয়ে সব কিছুকে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে মনে হত—যাই, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি হাসিমুখে—বল্ তোর অভাব কি, কষ্ট কি, বেদনা কি আমাকে বল্। আমি সব তোর ধুয়ে দেব। কিন্তু তা তো পারেননি। স্নেহের উপরে যে গাম্ভীর্যের আবরণ ছিল তাকে তো ভাঙতে পারেননি তিনি। কি করবেন—আজ আর তা নিয়ে ভাববারও অবকাশ নেই তাঁর। ওদিকে রয়েছে আশাহতা পুত্রবধূ আর আট বছরের পৌত্র। তাঁর বড় ছেলে কিশোরের স্ত্রী আর তার একমাত্র সন্তান।

কিশোর! তাঁর বড় ছেলে। সেও নেই, আজ আট বছর আগে মারা গেছে। দুই ছেলে, বড় আদর করে নাম রেখেছিলেন নন্দকিশোর আর নন্দদুলাল। আঃ, হায় হায় হায়। তাঁর আদরের বেড়ি ভেঙে দুজনেই চলে গেল। ঠিক একই বয়সে গেল দুজনেই। পঁয়তাল্লিশ। কিশোরের ঐ আট বছরের ছেলে নবনী—সেও হয় তো যাবে ঐ বয়সেই। কিম্বা হয় তো তার আগেই যাবে। আর তিনি অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে বসে বসে সব দেখবেন।

নারায়ণ! নারায়ণ! ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। তিনি যা করবেন তা ভাল বলেই ভাল'র জন্যেই করবেন। তিনি ভেবে কি করবেন! আর ভাববেন না তিনি।

কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁর জীবন! আজ যদি জীবনের স্মরণীয় ঘটনার তালিকা তৈরী করেন তবে কি কি দিয়ে তা তৈরী হবে? একথা তিনি ভেবেছেন অনেক—অনেকবার। শুধু একটা কি দুটো স্মরণীয় আনন্দ ছাড়া আর সব মৃত্যুর কঠিন কালো দাগে চিহ্নিত। তাঁর জীবনটা শুধু মৃত্যুর শোভাযাত্রা যেন। বিশ বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে আজ পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত আপনার সংসারে আর পরিবেশে কত কত মৃত্যু ঘটল! বাবা, মা, স্ত্রী, আমু, কিশোর; লোকনাথ, সর্বশেষ দুলাল। আরও কত কত! তাদের কথা বাদ যাক। কিন্তু ওরা, যারা জীবনের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল, ওরা যখন এক একজন করে গেছে তখন বুকের খানিকটা করে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। নিজের পাওনা নিয়ে যেতে কেউ ভুল করেনি তো! তিনিও দিয়েছেন, বুকের এক একখানা পাঁজরা নিজের অনিচ্ছা সত্বেও খুলে দিয়েছেন। শোক করতে চাননি, মনকে মানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, ভুলতে চেয়েছেন, শাস্ত্রের অনুশাসন স্মরণ করে মনকে শাসন করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেন নি। পারা কি যায়! মনকে শান্ত করে আনতে আনতে আবার নূতন আঘাত এসেছে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে যেন তাঁকে কেউ অলক্ষ্য থেকে দীর্ঘকাল ধরে হয় পরীক্ষা করছে নয় রহস্য করছে। করুন, যদি কেউ পরীক্ষক বা রসিক অন্তরালবর্তী থাকেন তবে তিনি তাঁর পরীক্ষা কি রহস্য মাথা পেতেই নেবেন যেমন বরাবর নিয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে হাসিমুখে হয়তো নেবেন না—তবে মাথা পেতে নেবেন।

আনন্দও তো তিনি কিছু দিয়েছেন তাকে। অস্বীকার করে, অকৃতজ্ঞ হয়ে লাভ কি! আনন্দও তিনি পেয়েছেন বৈ কি! আজ কিশোর আর দুলালের জন্ম মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে, সেই মুহূর্তের আনন্দময় পরিবেশের ছবি আজও চোখের উপর ভাসছে। তারপর আমুর প্রথম কল্পনাতীত সার্থকতার কথা যেদিন কানে এসেছিল সেদিনটা যে কী আনন্দের ঘোরে কাটিয়েছিলেন-তা তো এখনও মনে পড়ে। আমু—আনন্দচন্দ্র, তাঁর তো কেউ নয়, তবু সে যে তাঁর কাছে অনেকের চেয়ে আপন ছিল। তার সার্থকতার সংবাদ সেদিন যাকে সামনে পেয়েছেন তাকেই সামান্য অছিলা করে শুনিয়েছেন। নিজের শান্ত স্বল্পভাষণের স্বভাবটাই যেন উল্টে গিয়েছিল সে দিন। তারপর যেদিন আমু দেশে ফিরল সেদিনকার সুখস্মৃতিও তো

মনে আছে আজও। তারপর কিশোরের বিবাহ—সেও যেন আজ কবেকার সুখস্বপ্নের মতো। শান্ত-স্বভাব, স্বল্পভাষী, বিনয়ী ছেলের মুখে সে দিনের অস্পষ্ট লাজুক হাসি যে আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

এক এক করে হিসেব করতে গিয়ে একে একে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেক মৃত্যুর মত অনেক জীবনের স্পর্শ ও আস্বাদ তিনি পেয়েছেন। আর স্মৃতির মনিকোঠায় আজও অম্লান হয়ে সব যেন সাজানো রয়েছে থরে থরে। তাদের প্রভায় সেই অন্ধকার পুরী যে এখনও ঝলমল করছে। মনে পড়ছে উদ্ধত তেজস্বী লোকনাথকে—যেদিন জেলে যাবার সময় সংসারে আপনার শেষ সম্বল একমাত্র সন্তানকে তাঁর হাতে তুলে দিতে এসেছিল, তার স্বভাব-প্রখর দৃষ্টি কয়েক মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণতায় ভারী হয়ে কৃতজ্ঞতায় গলে তাঁরই পায়ে পড়েছিল বহুজনের দৃষ্টির সামনে, সেদিনের কথা। সে স্মৃতির বিচিত্র আস্বাদ এখনও তো মন থেকে মুছে যায়নি!

তারপর! সেই বোধহয় শেষ আনন্দ! লেখক হিসেবে দুলালের সুপ্রচুর খ্যাতি যখন কাগজে কাগজে প্রচারিত হল সেদিন! তখন পরিণত বয়সেও আবার বোধহয় আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। সেও যে মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

কিন্তু সব আনন্দেরই শেষ পরিণাম কি মৃত্যু? না তারপর আরও আছে?

কিন্তু মৃত্যুর অপরিমেয় বেদনাকে ভুলবার, জয় করবার শক্তি তো জীবনই দেয়? সেই কি অমৃত?

কিন্তু মৃত্যুর বেদনা কি জয় করা যায়? কে জানে? আজও যেন সমস্ত প্রাচীন ক্ষতগুলি সমান ব্যথার কেন্দ্র হয়ে আছে। আবার নূতন ব্যথা পেলে সব পুরানো আঘাতগুলোও যেন নূতন হয়ে ওঠে। তিনি তো তাদের জয় করা দূরের কথা, ভুলেও যাননি।

অকস্মাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই একা হারিয়ে-যাওয়া পরিত্যক্ত মানুষের মত বসেছিলেন, হঠাৎ বাইরের পৃথিবী কথা কয়ে উঠল। শেয়াল ডাকতে আরম্ভ করেছে। এক প্রহর শেষ হয়ে আর এক প্রহর আরম্ভ হল। আর না, এইবার শুয়ে পড়া ভাল। এই বৃদ্ধ দেহই এখন বিধবা পুত্রবধূ আর নাবালক শিশু পৌত্রের একমাত্র আশ্রয় আর ভরসা। তিনি ঘড়িটা দেখলেন। আড়াইটা বাজছে! আবার ইষ্টস্মরণ করে তিনি শুয়ে পরলেন।

স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের মধ্যেই আপন মনে দুবার ডাকলেন—আনু, আনু! ঘুম ভেঙে যাবার পরও আবছা আচ্ছন্নতার মধ্যেই আবার একবার হাল্কা করে ডাকলেন—আনু, ডাকছিস? তারপরই বিছানার উপর উঠে বসলেন।

ভোর হয়ে গেছে। কার্তিকের শেষ। অল্প ঠাণ্ডা লাগে। অন্যদিন আর কিছুক্ষণ পরে তিনি গাড়ু হাতে প্রাতকৃত্যে বার হন। আজ তাঁর মনে হল যেন আরও একটু ভোর আছে। তাঁকে ডাকছে আনু। সেই তরুণ বয়সে যেমন মাঝে মাঝে ডাকত আনন্দ ঠিক তেমনি করে যেন সে তাঁকে ডাকলে। শুধু কি আনু! আনুর পিছনে পিছনে কিশোর, লোকনাথ, দুলাল সব—যেন কেমন আবছা হাসিতে ভিজে ভিজে মুখ নিয়ে সারি বেঁধে দাড়িয়ে আছে।

তিনি কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এমনি করে ষাট বছর আগেও তিনি একটি ডাক শুনে যখন তখন বেরিয়ে যেতেন। আনু ডাকত। আনু যখন তখন আসত। বাড়ীর মধ্যে কিছুতে ঢুকত না। বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে শুধু একটি বার ডাকত—সুধা। ডাকত সে জোরেই। যখন যেখানেই থাকুন সব কাজ ফেলে হাসি মুখে ছুটে আসতেন তিনি। আনু চিরকালই তাঁর কাছে মহামূল্য। মনের টানেই ছুটে বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু খানিকটা চেষ্টা করে মুখে হাসি মেখে আসতে হত, মুখে আগ্রহ প্রস্ফুট করে আনতে হত। যদি কোন দিন ডাকে সে সাড়া না পেয়েছে তো সে সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছে। যদি আসতে এক মুহূর্ত দেরী হয়েছে তো পর মুহূর্তে বেরিয়ে এসে আর তার সাক্ষাৎ মেলে নি। মুখে হাসি আর আগ্রহ না দেখলে তার মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। সে ভার দূর করতে অনেক সময় লাগত আর অনেক বেগ পেতে হত সুধাকান্তকে।

সেই আনন্দ, সেই আনু আজ আবার ডাকছে, না বেরিয়ে উপায় কি! ডাকছে তাঁদের সেই পুরানো সঙ্কেত স্থানে। দুই বন্ধু বহু খুঁজে অনেক হিসেব করে যায়গাটি আবিষ্কার করেছিলেন। হরসুন্দরবাবুদের বাগানে একটি কুঞ্জের মত যায়গা। গ্রামের একেবারে খুব কাছেই, অথচ একান্ত নির্জন। প্রায় পতিত, কেউ যায় না সেখানে। সেই তাঁদের বালককালের তরুণ কালের সঙ্কেতস্থল।

সুধাকান্ত মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন। মুখ তুললে পাছে রাস্তায় আর কোন মানুষের মুখে চোখ পড়ে, পাছে মনে আর চোখে যে স্বপ্নের যে স্মৃতির ছায়া পড়েছে তা ভেঙে যায়! অপেক্ষা করে আছে, সঙ্কেত স্থানে আজ আনন্দ থেকে আরম্ভ করে দুলাল পর্যন্ত সকলে যেন সকৌতুকে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। আনন্দই তাদের সকলকে ডেকে এনেছে আজ। অথচ আনন্দ আর লোকনাথ দুজনে এই পৃথিবীতে চিরদিন লড়াই করে কাটিয়েছে, সেই দু'জনে কি করে আজ একসঙ্গে এল! সঙ্গে কিশোর আর দুলাল! কিশোর কোন দিন মুখ ফুটে কাউকে কোন কাজে ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় বলেনি, কোন দিন কারও কোন কথায় সে থাকেনি। আপনার ঘরখানিতে বই আর পুঁথি নিয়ে, সামান্য ভূসম্পত্তির তদারক ক'রে, আপনার বাপ, আর স্ত্রী, শিশুসন্তানকে নিয়ে আপনার স্বর্গ রচনা করেছিল অতি ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যে। আর দুলাল! সে ছিল সম্রাট! তাকে হুকুম ক'রে ডাকে এমন সাধ্য তো কারও ছিল না! অতি সামান্য অবাঞ্ছিত কথা তাকে বলবার সাহস কারও ছিল না। সে কোনদিন মুখে কথা বলে কলহ করেনি; কেবল মুখের অতি সামান্য বিচিত্র ভঙ্গিতে তার উত্তর অতি স্পষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করত। আজ কি সব বাদ দিয়ে তারা সব এক সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায়?

পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ স্থবির পা জোড়ায় যেন পঁচিশ বছরের শক্তি এসেছে। তিনি লম্বা লম্বা দ্রুত পা ফেলে গ্রামের ভিতরের সদর রাস্তা পার হয়ে গ্রামের দক্ষিণের ধানের জমি পার হলেন। কার্তিক মাস। সবুজ ধান-ভর্তি মাঠ, মাঝখান দিয়ে সরু আল রাস্তা শিশিরে ভিজে সপসপে। রাস্তা পার হতে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ধানের শিষের আর রাস্তার শিশিরে ভিজে হিম হয়ে গেল।

তারপর রেললাইন। পূর্ব পশ্চিমে টানা উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে রেললাইন পার হলেন। এই তো সেদিন হল লাইন। সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ। থাক, সে সব থাক।

তারপর বাগান। আম, বট, অশ্বত্থ এখানে ওখানে সারি বেঁধে। তারই নীচে নীচে রাস্তা। কতকাল আসেননি, তবু সব—সব স্পষ্ট মনে আছে। এঁকে বেঁকে ঘুরে এসে দাঁড়ালেন সেই কুঞ্জের মুখে।

বুকটা আসন্ন প্রত্যাশায় একবার ধক্ ধক্ করে উঠল। আবছা আলো অন্ধকারে ঐ তো সাদা সাদা কারা স্থির দাঁড়িয়ে। আশে পাশে বৃহৎকায় বট গাছ অনেক উপরে ডালপালা মেলে আছে। তারই মাঝখানে ক'টা আমলকী, কৃষ্ণচূড়া আর শিউলী গাছের একটি বৃত্তাকার বেড়। ঝালরের মত চিরল চিরল পাতায় ঢাকা কুঞ্জ। ছায়ার জন্যে নীচে ঘাস নাই, কেবল বালি।

ঐ তো বোধ হয় তারা দাঁড়িয়ে আছে আবছা আলো ছায়ার মধ্যে। তিনি দুরু দুরু বুকে ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ পর্যন্ত নেই। ক'টা শিশিরে ভেজা শুকনো ঝরা পাতার উপর তাঁর পায়ের শব্দ উঠল কেবল।

তিনি কুঞ্জের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন! কৈ তারা? যারা তাঁকে ডেকে আনলে তারা কৈ? তিনি চারিদিকে বার বার চাইলেন। নেই, নেই, তারা নেই তো! তারা নেই! কিন্তু তারা তো এসেছিল, নিশ্চয় এসেছিল। তারা গেল কোথায়? চারিদিকে আলো আর ছায়া! তা হ'লে তারা কি এদিক ওদিকে লুকিয়ে থেকে রহস্য করছে তাঁর সঙ্গে? তিনি দুরু দুরু বুকে চাপা গলায় অস্পষ্ট করে ডাকলেন—আনু! আনন্দ! আনু ভাই!

—কিশোর! কিশোর রে!

কোথাও কোন উত্তর নেই। আবার চারিপাশে চাইলেন, দেখলেন তারা আশপাশ থেকে তাকে দেখছে কিনা, কৌতুক করে লুকিয়ে আছে কিনা! আবার ডাকলেন, লোকনাথ! দুলাল! বাবা দুলাল!

নাঃ, নেই, তারা কেউ নেই। কেউ আসেনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তবু আবার একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—আনু, আনন্দ! যেন পরলোকবাসী বন্ধুকে লোকান্তরে ডাক পাঠালেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ। তাঁর ডাকে আশ পাশের গাছে পাখীরা ডানা ঝটপট করে উঠল মাথার উপর। শিউলী গাছ থেকে কটা কাক ঘুম ভেঙে কা কা করে উড়ে গিয়ে পাশের গাছে বসল। ডালপালায় সামান্য আলোড়ন জাগল এক মুহূর্তের জন্য। টুপ টুপ করে কতকগুলো শিউলী ফুল তাঁর গায়ের উপর দিয়ে ঝরে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু চার কোঁটা শিশির গাছের গা থেকে পড়ল তাঁর গায়ে, পাশে মাটিতে।

এতক্ষণে তিনি পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। পশ্চিম আকাশে এখনও চাঁদ রয়েছে। জীর্ণপ্রান্ত, হলুদবর্ণ চাঁদ এখনও পশ্চিম আকাশে লেগে রয়েছে। প্রায়-স্পষ্ট চাঁদের আলোয় চারিদিক এখনও বেশ পরিষ্কার। তা হ'লে এখনও রাত্রি আছে। তিনি ভুল ক'রে ভোর মনে করে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল বৈ কি! সবই ভুল, মনের ভুল। তারা কেউ আসেনি। তারা কেউ নেই, কে আসবে! তারা যারা কথা বলেছিল, আশ্বাস দিয়েছিল তাঁকে, তারা তো তাঁর মনের মানুষ, মনেই আছে। তাদের বাইরে খুঁজে লাভ কি?

তবু তিনি আশাহতের মত বসে থাকলেন চুপ ক'রে। ধীরে ধীরে চাঁদের দুধবরণ আলো ঝাপসা হয়ে এল, চাঁদ অস্ত গেল, আবছা অন্ধকার আর কুয়াশায় চারিদিক ভরে গেল, আবার ধীরে ধীরে কুয়াশার আড়াল থেকে পূর্বদিকে আকাশ রাঙা করে ধীরে ধীরে সূর্য উঠল, আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

তিনি অবষপ্নের মত উঠলেন। একবার এদিককার উঁচু প্রান্তর থেকে তাকালেন গ্রামের দিকে। গ্রামের গাছপালা আর বাড়ীর মাথায় আলো পড়েছে। সর্বপ্রথমেই দেখা যায় তিন চারখানা বাড়ী। সাদা, লাল, হলুদে, সব চেয়ে উঁচু। আনন্দচন্দ্রের বসত বাড়ী, ঠাকুরবাড়ী আর কাছারী। তারপর সব খড়ের আর টিনের চাল। লোকনাথের একতলা বাড়ীখানা আর দেখা যায় না। আনন্দের বাড়ীর আড়ালে পড়েছে। আর আগে এই বাড়ীখানাই সর্বপ্রথম নজরে পড়ত বাইরে থেকে। বাড়ীখানা আজ পরিত্যক্ত, ধ্বসে গিয়েছে। ওদের বাড়ীর আড়াল দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ীর টিনের চাল রোদে ঝকমক করছে তাঁরই মত। তাঁরই মত পাকা চুল আর গোঁফ নিয়ে রিক্ত হয়ে অর্থশূন্য হাসি হাসছে।

তিনি বাড়ীর দাওয়ার নীচে এসে শিশির ভেজা, ধুলোভরা পা ঝেড়ে ফেলে দাওয়ায় উঠলেন! দুটি ছেলে দাওয়ার উপর খেলা করছে। অশোক আর গণনাথ। লোকনাথের ছেলে গণনাথ। মরবার সময় তারই হাতে ছেলেকে তুলে দিয়ে গিয়েছে লোকনাথ। তিনি একবার ওদের দুজনকে দেখলেন। অশোক একেবারে দুলালের মত। ঐ তো লোকনাথ কিশোর দুলাল সব বেঁচে রয়েছে। নূতন মূর্তিতে। বিষণ্ণ মন এক মুহূর্তে হালকা

হয়ে গেল। ডাকলেন—এই যে সকাল বেলাতেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে তোমাদের, হ্যাঁ গো জোড়মাণিক !

(এক)

জোড়মাণিক !

আজ নাতিকে এই সকাল বেলাতেই খেলতে দেখে আর একদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিনের ছবি ভেসে উঠল স্পষ্ট হয়ে। তাঁকে আর আনুকে,—আনন্দকে একসঙ্গে দেখে তাঁদের সময়ে এক পিতামহ স্থানীয় ব্যক্তি দুজনকে সেদিন ঠিক ঐ নামেই সম্বোধন করেছিলেন। আজকের সঙ্গে তার তফাত ছিল যৎসামান্য। সেদিন এই সিমেণ্ট-বাঁধানো দাওয়ার বদলে দাওয়াটা ছিল মাটির, গোবরজল দিয়ে পরিষ্কার করা, আর টিনের বদলে চাল ছিল খড়ের। আর সব চেয়ে যেটা বড় তফাৎ সেটা হ'ল তাদের দুজনের বয়স সেদিন এই নাতিদের মত আট ন' বছর ছিল না। তাঁদের দুজনেরই বয়স তখন চোদ্দ পনের ক'রে। আজকের চোদ্দ পনের আর সেদিনের চোদ্দ পনেরোর তফাৎ অনেক। সেদিন তাঁদের দুজনেরই বিয়ের কথা হচ্ছে।

বিয়ের কথা বলতেই আনন্দ সেদিন এসেছিল। পনর বছর বয়সে সংসারে প্রবেশ করতে হ'লে যতখানি ভাবনা, চিন্তা ও আনন্দ হয় ততখানির সবটাই আপনার মুখে ফুটিয়ে আনন্দ সকাল বেলাতেই এসেছিল বন্ধুর কাছে। এসেই বাইরে থেকে ডাকলে—সুধা ! আছিস !

সুধাকান্ত বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। খানিকটা আশ্চর্যও হল। এমন সময়ে আবার আনন্দ ফিরে এল ! এই তো ঘণ্টাখানেক আগে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে এল। আবার কি দরকার হ'ল এখনি ?—কি রে ? কি হ'ল ? আবার এলি ?

খোঁচা না দিয়ে যেন কথা বলতে পারত না আনন্দ। মুখখানা গম্ভীর, সেই মুখেই একটু হাসি টেনে বললে—কেন, তোর কাছে ক'বার আসব সেটা

কি হিসেব ক'রে আসব না কি? তা হ'লে তাই বল। এবার থেকে সেই রকম আসব!

আহত হল, অপ্রস্তুত হল সুধা, অপরাধ বোধ হল তার চেয়ে বেশি। সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল সে। বললে—এমন ক'রে বলিস কেন ভাই? আমি তোকে তাই বলছি! তুই যতবার আসিস ততবারই কত ভাল লাগে তা তো তুই নিজেও জানিস। জেনে শুনেও বলিস কেন?

আঘাতের বেদনা আর অভিমানের সুরটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সুধার কথায়। আর তার আবেদনও বোধ হয় আন্নুর মনে লাগল, আপনার কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে নিলে সে। অন্য সময় সে এত সহজে ছাড়ে না। এখন সঙ্গে সঙ্গে বললে—না রে, তোকে ঠাট্টা করছিলাম। যাক শোন কেন এলাম।

আগ্রহে সুধা তার মুখের দিকে তাকালে। আন্নু তার কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বললে—এখুনি বাড়ী গিয়ে দেখি সে এক ব্যাপার। আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। আন্নুর চোখে আর ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন হাসি প্রস্ফুট হয়ে উঠল।

সুধা এক কথায় অনেক বুঝে নিলে। আন্নু আজ সত্যিই খুসী হয়েছে। আন্নুদের অবস্থা তো ভাল নয় বরং খারাপই। এতদিন পর্যন্ত ওর কোন বিয়ের প্রস্তাব আসেনি। অথচ এর মধ্যে তার সাত আট জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছে, কয়েক জায়গা থেকে তার বাবাকে চাপাচাপিও করছে খুব। অথচ প্রথম দিন যখন তার সম্বন্ধ এসেছিল সেদিন প্রাণের বন্ধু হিসেবে আন্নুকে বলেছিল সে। বলার সঙ্গে সঙ্গে আন্নুর মুখটা ভারী হয়ে উঠেছিল, কতকগুলো বাঁকা কথাও বলেছিল সে। সুধার মুখখানা আর মনখানা ছোট হয়ে গিয়েছিল; অথচ আন্নু সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করেনি। আর আজ? যাক, সে সব যাক। আন্নু খুসী হয়েছে খুব। বন্ধুর খুসীতে সুধাও খুসী হল। কৌতুহলও হল খুব। জিজ্ঞাসা করলে—তাই বল। কোথা থেকে সম্বন্ধ এসেছে রে?

এইবার আন্নুর মুখে হাসি পরিস্কার কৌতুকের রূপ নিলে। বল্লে—সেই তো! বল দেখি কোথা হতে?

কপট রাগ দেখিয়ে সুধা বললে—পৃথিবীতে তো লক্ষ লক্ষ মেয়ে আছে।

তার মধ্যে কাকে তোমার হাতে দিতে আসছে কি করে বলব? তবে তোর কথা থেকে বুঝতে পারছি মেয়ে আমাদের জানা, ঘরও জানা।

—ঠিক বলেছিস। বুদ্ধি আছে তোর। সুধার পিঠে একটা তারিফের চাপড় মারলে আনু!

—বেশ, এইবার বল ক'নে কে? আমাদের গাঁয়ের মেয়ে নিশ্চয়ই।

অত্যন্ত সংগোপনে মুখটা কানের কাছে এনে আনু বললে—কুলীন পাড়ার ব্রজ চাটুজ্জের ভাগ্নীর মেয়ে হিলু। দেখেছিস তো তাকে? ওর চোখ দুটো খুসীতে ঝকমক করছে। কি সুন্দর উজ্জ্বল চোখ ছিল আনুর।

বন্ধুর খুসীর ছায়া পড়ল ওর চোখে। সকৌতুকে সে বললে—তাই না কি রে। বিয়ে করে ফেল। মেয়েটা ভারী সুন্দর দেখতে।

আনু হাসল। বোঝা গেল সে খুব খুসী হয়েছে সুধার কথায়। সুধার মনে পড়ল মেয়েটিকে। ব্রজ-চাটুজ্জের বিধবা ভাগ্নীর কন্যা। চাটুজ্জে মশায়ের গলায় লেগেছে মেয়েটি। বয়সও হয়েছে অনেক—বছর দশেক বয়স হবে। তবে মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। বড় বড় চোখ, টানা ভুরু, সুডৌল মুখ, এক পিঠ চুল, ফর্শা রঙ। সবাই বলে—মেয়েটি খুব সুন্দরী। একেবারে পটের পরী।

মেয়েটির মূর্তি সুধার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একে সুন্দরী, তার উপর স্বাস্থ্য ভাল, কচি লাউডগার মত বাড়ন্ত গড়ন। বিবাহের কন্যা হিসাবে মেয়েটির বয়স একটু বেশীই। অনেকবারই তাকে দেখেছে, গাঁয়েরই মেয়ে তো। ব্রজ চাটুজ্জে এমনি সঙ্গতিহীন, সামাজিক প্রতিষ্ঠাহীন মানুষ। তাতে মেয়ে তার ভাগ্নীর মেয়ে। সে সবারই চোখে একান্ত অনাদৃতা। তার উপর ইদানীং বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে বলে সে খানিকটা অবহেলার পাত্রীও হয়েছে। সেই মেয়ে এক মুহূর্তে ব্রজ চাটুজ্জের ভাগ্নীর অনাদৃতা অরক্ষণীয়া কন্যা থেকে অতি লোভনীয় বিবাহযোগ্যা কন্যা হয়ে উঠল। অন্তত সুধার কাছে উঠল। তার বয়স তখন পনর, একতারার এক সুতোর সুরের মত গলার তরুণ কোমল স্বরে সদ্য সপ্তস্বরা বীণার ধ্বনির গাম্ভীর্য লাগতে সুরু হয়েছে। কচি হালকা মুখে গোঁফের কালো রেখা ধরেছে সবে। সেই মুহূর্তে আনন্দ অকস্মাৎ পাত্র হিসাবে তার কাছে হিংসার পাত্র হয়ে উঠল। অমন সুন্দরী মেয়ে বৌ হবে আনুর! সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বভাব অনুযায়ী

তার প্রকাশ হল—সত্যি একেবারে পটের পরী রে! তোকে হিংসে হচ্ছে ভাই।

প্রাণখোলা হাসি হাসল আনন্দ। এমন অকপট হাসি আনন্দ বাল্যকালেও কম হেসেছে। সে হিংসার পাত্র নয়, এটাই তো তার সব চেয়ে বড় ব্যথা। এই বোধ থেকেই তো সে অবিরত উগ্র হয়ে থাকে। আজ এক মুহূর্তে সে কেমন নরম হয়ে গিয়েছে। আনন্দ বেহিসাবী কথা সচরাচর বলে না। বলবে কি করে? ক্ষোভ আর অবিশ্বাসের তাতে ওর মনের তার সব সময় টান করে বাঁধা। কোন কিছুর আঘাত লাগলেই প্রথমে ঝন্ করে বেজে উঠবে। এই মুহূর্তে নরম হয়ে আছে মন, বললে—চল্ একবার বাজারপাড়া দিয়ে ঘুরে আসি। বলে হাসতে লাগল মিষ্টি মিষ্টি।

আনন্দকে কোন কিছু অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাহ'লে সে এক মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এখন পড়তে বসার সময়। পড়তে বসা হয় নি দেখলে বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হবেন, রাগ করবেন, বকবেনও হয়ত। বাবার সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য করে ফিরবার সময়ও হয়েছে। তবু সে আনন্দের মন রাখবার জন্যে বললে—চল।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে বন্ধুর হাতখানা ধরে দাওয়া থেকে রাস্তায় নামবার জন্যে পা বাড়ালে আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের মুখে দেখা গেল—হাতে গাড়ু মুখে দাঁতন, কানে উপবীত জড়ানো সুধার বাবা রাধামাধব ভট্টচায আসছেন। থমকে গেল দুজনেই সঙ্গের মানুষটিকে দেখে। সঙ্গে ও কে? স্বয়ং ব্রজ চাটুজ্জে!

আনন্দর মুখখানা এক মুহূর্তে কেমন যেন হয়ে গেল। আনন্দ বোধহয় ভাবলে—তার বাবা বোধহয় প্রত্যাখ্যান করেছেন চাটুজ্জেকে। এইবার চাটুজ্জে মশায় বোধহয় সুধার বাবার কাছে দ্বিতীয় পাত্রের সন্ধানে আসছেন। নিজের হাতে সুধার ধরা হাতখানা সে ছেড়ে দিলে।

সুধার মুখে তখন কৌতুকের হাসি খেলা করছে। আনন্দের যে হাত খানা তার হাতে ধরা ছিল সেই হাতখানা আপনার হাতে তুলে নিয়ে একটু ইঙ্গিতময় চাপ দিলে, সকৌতুকে ফিস ফিস করে বললে, ওরে আনু, ওই দেখ তোর দাদাশ্বশুর আসছে।

আনন্দ অকস্মাৎ রূঢ় গলায় বললে—হাত ছাড়, আমি বাড়ী যাই।

এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় মনে মনে ব্যথিত হলেও সুধা তার হাত ছাড়লে না, বরং তাকে টেনে ধরে বললে—আয় ঘরের ভেতর আয়।

আনন্দ কোন কথা না বলে কি জানি কেন সুধার পিছন ধরলে। এমন সময় পিছন থেকে ডাক উঠল—কোথায় যাও ওহে জোড়মাণিক!

ব্রজ চাটুজ্জের সস্নেহ কণ্ঠস্বর! দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

সুধার বাবা একবার দুজনের দিকে তাকালেন। রাশভারী মানুষ। চোখে শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালেই মনে হয় চোখের দৃষ্টি দিয়ে তিরস্কার করছেন। আজ কিন্তু চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত কোমল। তাতেই সুধা আজ অভয় ও প্রশ্রয় দুই-ই খুঁজে পেল। সে অন্যদিনের মত বাবাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হল না, বরং ঘরের মধ্যে আনুর হাত ধরে সস্মিত মুখে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাধামাধব বললেন—আপনি বসুন চাটুজ্জে মশায়। আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আসি। সুধাকে ডেকে বললেন—দাওয়া তো শুকিয়ে গিয়েছে। এইখানেই চাটুজ্জে মশায়কে কম্বল পেতে দে। বলে রাধামাধব ভিতরে চলে গেলেন।

কম্বলের উপর বসে চাটুজ্জে মশায় আনন্দকে আর সুধাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন বলে মনে হ'ল সুধার। তারপর সস্নেহে সকৌতুকে আনন্দকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাই, আমার নাতনী হিলুকে দেখেছ তো? তাকে কনে বলে পছন্দ হবে ত?

শান্ত-স্বভাব সুধা হঠাৎ বাকপটু হয়ে উঠল, বললে—হবে, খুব হবে।

হা হা করে হাসলেন চাটুজ্জে। বললেন—হবে বৈ কি! নাতনী যে আমার পরী হে! তা তুমি তো শুনি খুব ডানপিটে ছেলে। তা সে তোমাকে বশ করবে ঠিক। জব্দ তো করবে না, বশ করবে। ভারী শান্ত, ঠাণ্ডা আর কাজের মেয়ে।

তারপর সুধার দিকে ফিরে বললেন—তোমার বন্ধুর তো ব্যবস্থা হল। এবার তোমার ব্যবস্থা করবার জন্যে বলি তোমার বাবাকে? জোড় মাণিক তোমরা। এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল হবে ভাই? হাসতে লাগলেন তিনি।

এমন সময় কাপড় ছেড়ে মাটির দোয়াত, খাগের কলম, আর বালি

কাগজ হাতে এলেন রাধামাধব। আনন্দ আর সুধা দু জনেই বুঝল—বিয়ের ফর্দ হবে। তারা উঠে পড়ল দু জনেই।

আনন্দ হঠাৎ সুধার হাত খানা ধরে বললে—আয় আমার সঙ্গে।

সুধা বললে—তোর হাতখানা কি ঘেমে উঠেছে রে আনু!

দাওয়া থেকে নেমে রাস্তা ধরে কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে চাটুজ্জে মশায়ের কটা কথা কানে এল। চাটুজ্জে মশায় গলা নামিয়ে কথা বললেও তারা শুনতে পেলে। কারণ পনের বছরের হাল্কা পায়ে জোর কদমে চলার শক্তি থাকলেও সদ্য-রঙ-লাগা মন তখন ওঁদের পিছনে চোরের মত ঘুরছে! সুধা শুনতে পেলে চাটুজ্জে মশায় বলছেন—সবই তো বুঝতে পারছ রাধামাধব। মেয়ে গলায় লেগেছে, পার করতে হবে। পাঁচ কুড়ি টাকা পণ আর চার ভরি সোনা—এ দিয়ে আর কোথায় পাত্র পাব। আর এই যে খরচা হবে এওতো আমারই খরচা। এতেই দু বিঘে জমি বিক্রী করতে হবে আমাকে। ঐ গরীবের ঘর ছাড়া আর কি পাব বলতে পার! তবে ছেলেটা ডানপিটে, এই ভরসা। তাই ফর্দটা যত সংক্ষেপে পার সেরে দাও।

কথাগুলো কানে না এলেই ভাল হত। কথাগুলো শোনার জন্যে লজ্জা করতে লাগল সুধার। সে যখন শুনেছে তখন আনন্দও শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়। আনন্দ যে শুনেছে সেটা তখনই বুঝা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল আনন্দ। আনন্দর মুখের চেহারাটা কেমন বিবর্ণ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। মুখটা যেন ঝুলে পড়ছে মাটির দিকে, যেন সে মাথা তুলতে পারছে না। সুধাকেও দাঁড়াতে হল। আনুর মুখটা দেখে তার শুধু লজ্জা নয়, ভয় করতে লাগল। যে কথাটা দু'জনেরই মনে গোপন ছিল, সেই কথাটাই চাটুজ্জে যে সোচ্চারে ঘোষণা করলেন। অবস্থাটাকে সহজ করার জন্যে সে আনন্দর হাতটা ধরে টানলে, মুখে কথা বলবার সাহস হল না।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে আপনার হাতখানা সুধার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে আনন্দ, বেশ হিসেব করেই ছাড়িয়ে নিলে। চাপা গলায় কর্কশভাবে বললে—কোন ভূমিকা করলে না, কথাটা এড়িয়ে গেল না—বললে—আমি চললাম। আমার কাজ আছে।

সুধা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে, জানে কোন ফল হবে না, তবু করুণ মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকলে—আনু, যাস না, শোন।

আরও কর্কশ উত্তর এল—নাঃ, আমার কাজ আছে।

সহানুভূতি আর মমতায় তার কিশোর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল, প্রায় আর্তকণ্ঠে সুধা শেষবার ডাকলে—দাঁড়া, আমি যাই তোর সঙ্গে।

আনন্দ যেতে যেতে একবার ফিরে দাঁড়াল, কিছু বললে না, পরক্ষণেই আবার ঘাড় ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করলে।

সুধা স্তম্ভিতের মত সেইখানেই তার অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আঘাতে আর অভিমানে তার দুই চোখ ভরে অকস্মাৎ জল এল। আনন্দ গরীব, লোকে তাদের দরিদ্র বলেই জানে, এ অপরাধ কি সুধার! অথচ আনন্দ কথাটা মনে মনে খুব বোঝে, কিছুই করার নেই তার। কিন্তু এ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আর অসহ্য হলেই সমস্ত আঘাতটা সে দেয় সুধাকে। তার ক্ষুব্ধ ক্ষতবিক্ষত মন বিশ্বসংসারকে আঘাত করবার জন্যে হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্বসংসার তার নাগালের বাইরে। তাই বিশ্বসংসারের একমাত্র প্রতিনিধি, যে তার দিকে প্রসন্ন প্রীতির পাত্র হাসিমুখে বাড়িয়ে ধরে আছে, তাকেই প্রতিঘাত করে।

সুধা চোখের জল মুছলে। অতি গভীর অভিমানে তার মন টন টন করছে। তবু সে আনন্দর ব্যথিত পাংশু মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সুধা বাড়ীর দাওয়ায় এসে উঠল। তখনও সেই একই কথা বলছেন চাটুজ্জে মশায়। মেয়েটাকে, এমন সুন্দর, শান্ত মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধেই জলে ফেলে দিচ্ছেন বলে আক্ষেপ করছেন চাটুজ্জে। কিন্তু সান্ত্বনার কথা বলছেন নিজেই—গরীবের গরীব ছাড়া উপায় কি!

গরীব। আনন্দ সহ্য না করতে পারলে কি হবে একথা গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ইতর, ভদ্র সকলেই বলে। বৃহৎ গ্রাম। অবস্থাপন্ন লোকের বাস, নানান শ্রেণীর, নানান বর্ণের মানুষ, নানান অবস্থার মানুষ গ্রামে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনে, সেঁকরা, শুড়ি এদেরই মধ্যে অনেক স্বচ্ছল অবস্থার লোক আছে গ্রামে। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ

হরসুন্দরবাবু, গ্রামের সিকি অংশ জমিদারীর মালিক ; তাঁরা অবশ্য থাকেন না এখানে। একজন কর্মচারী, একজন পেয়াদা আছে আদায়ের জন্য। আর জন দুয়েক চাকর আছে বাড়ী দেখাশুনা করবার জন্যে। তাঁদের কর্মচারীটিও এখানে প্রায় রাজসম্মানের অধিকারী। তারপর আছেন নরনাথবাবু। গ্রামেই থাকেন তিনি, গ্রামেরই মানুষ। পাকা একতলা বাড়ী তিনিই প্রথম করেছেন। তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠা করা দুর্গোৎসব আছে, নারায়ণশিলা আছেন, পাঁচটি শিব মন্দির করেছেন। তাঁর বাবাকে যখন সবাই পাকা ইমারৎ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তখন তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ না করে নারায়ণের আর পাঁচটি শিবের জন্য পাকা মন্দির তৈরী করেছিলেন। বলেছিলেন আমার দেবতার পাকা মন্দির হল, এইবার আমার হবে। তবে সে আর আমি পারলাম না। নরনাথ পিতার সে ইচ্ছা পুরণ করেছেন। তাঁরা গ্রামের তিন আনা রকমের জমিদার, তাঁদের প্রতিপত্তিই এখন র্বাধিক।

গ্রামে আর জমিদার নেই। তারপরই গণনায় পড়েন রাধামাধব ভট্টাচার্য, সুধাকান্তের পিতা। পণ্ডিতের বংশ। বহুকাল ধরে তাঁদের বংশের বিদ্যার গৌরবে এ অঞ্চল উজ্জ্বল ছিল। বিদ্যার সঙ্গে বিনয়, আচার, দেবভক্তি, ব্রাহ্মণ ও শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা ক'রে তাঁরা এ অঞ্চলের সবচেয়ে পূজনীয় ও মান্য ব্যক্তি ছিলেন। আজ বিদ্যার গৌরব, এমন কি বিদ্যার অহঙ্কারও নাই। তবে বাকী বংশগত গুণগুলি সবই আছে। তারই জন্যে তাঁরাও এ অঞ্চলে আজও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তবে আজ যেমন বিদ্যার গৌরব গিয়েছে তেমনি নূতন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁরা। জ্ঞানী, সন্ন্যাসী মানুষের বংশধররা আজ সংসারী। রাধামাধব সংসারে উন্নতিলাভ করেছেন। প্রায় দেড়শো বিঘে উৎকৃষ্ট জমি, অনেক বাগান, পুকুর করেছেন। নগদ টাকাও তিনি করেছেন যথেষ্ট।

তারপর আর গণনার দরকার নেই। অন্তত আরও সাত আটটি স্বচ্ছল অবস্থার লোক আছে গ্রামে। তারপর আছে মাঝামাঝি অবস্থার মানুষ। তাদেরই সংখ্যা বেশী।

তাদের নীচে আনন্দর বাবা রামগোপাল মুখুজ্জের কথা। রাম গোপাল মুখুজ্জে এ গ্রামের বংশানুক্রমিক বাসিন্দা নন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল এখান

থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। নরনাথ বাবুরাই সেখানকার জমিদার। আনন্দর পিতামহ গ্রামে পূজক পুরোহিত ছিলেন। সেখানে তিনি যা উপার্জন করতেন তাতেই বেশ চলে যেত। তখন দিনকাল ভাল ছিল, লোকের অর্থে না হোক সামগ্রীতে স্বচ্ছল সংসার ছিল, অল্পে তুষ্টি ছিল, তাই তার পিতামহের কোন ক্লেশ হয়নি কোনদিন। বরং মানুষটি আনন্দেই ছিলেন। সৎ, অল্পে তুষ্ট মানুষটি নিজের স্ত্রী আর একটি ছেলে নিয়ে আনন্দে এবং শান্তিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি একটু ভুল করেছিলেন। ছেলেকে মোটামুটি সংস্কৃত না শিখিয়ে পাঠশালায় দিয়েছিলেন। তারপর পাঠশালার পড়া শেষ হলে মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলে মাইনর পাশ করলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পৌরোহিত্যও বর্জন করলে। বাপের অনুরোধ সত্ত্বেও আর দেবমন্দির কি দেবকর্মের ধার দিয়ে হাঁটল না। কি কাজ করবে এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। এমন সময় সমস্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়ে পুরোহিত পিতা মারা গেলেন। রামগোপাল মুখুজ্জের বয়স তখন বছর আঠারো। তিনি অথৈ জলে পড়লেন।

রামগোপাল মুখুজ্জে মানুষটি এমনি খুব ঠাণ্ডা মিষ্টভাষী। কিন্তু আশ্চর্য এই ওঁর সমস্ত বিনয় ও মিষ্টতার অন্তরালে একটি সুকঠিন গোঁ আছে যার কিছুতে পরিবর্তন হয় না; সহস্র শিষ্টাচার, প্রলোভন বা ভয় প্রয়োগ করলেও তার পরিবর্তন হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং তাঁর বাবার যজমানরা বার বার অশেষ স্বচ্ছলতার প্রলোভন দেখালেন, পিতার কর্মগ্রহণ না করলে তিনি সপরিবারে কি অসুবিধার মধ্যে পড়বেন, কি ভীষণ দারিদ্র্যের সামনাসামনি হতে হবে সে ভয়ও দেখালেন। কিন্তু মুখুজ্জের সংকল্প অটুট থাকল। পৌরোহিত্য বর্জন করে প্রায় অনাহারে দিন কাটিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগলেন—কোন কর্ম করবেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কর্ম একটা জুটল নিজের ব্রাহ্মণত্ব গৌরবেই। মুখুজ্জের সেকালের মাপে একটা বৃহৎ গৌরব ছিল। আজ আনন্দর বিয়ের সম্বন্ধের সময়ও চাটুজ্জে সে গৌরব ভুলে যায়নি। মুখুজ্জেরা কুলীনের সেরা কুলীন বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান। সেই অনুপার্জিত কৌলিন্য গৌরব হঠাৎ কাজে লেগে গেল। নরনাথবাবুর বাবা মহালে গিয়েছিলেন। সেখানে কথায় কথায় এই বংশানুক্রমিক ও পৈত্রিক বৃত্তিত্যাগী গোঁয়ার তরুণটির কথা শুনতে পান।

শুনে খানিকটা রাগে, কিছুটা কৌতুহলের বশবর্তী হয়েই রাম মুখুজ্জেকে ডেকে পাঠান।

কিন্তু রাম মুখুজ্জে এসে যখন অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয় সহকারে তাঁকে প্রণাম করলেন তিনি খানিকটা অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। অত্যন্ত বিনীতস্বভাব মিষ্টভাষী ভদ্র মানুষটির মধ্যে কোন দুর্বিনীত গোঁয়ারকে তিনি দেখতে পেলেন না, আলাপের মধ্যে অনেক সন্ধান করেও খুঁজে পেলেন না। তিনি তাঁকে পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করে আবার পৈত্রিক বৃত্তি গ্রহণ করতে বলেছিলেন, তাতে সবিনয়ে রাম মুখুজ্জে এমন কিছু বলেছিলেন যাতে জমিদার মোটামুটি সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। তিনিই তাঁকে নিজের বাড়ীতে এনে গোমস্তার কাজ দিয়েছিলেন। সেই থেকে সেই কাজই করছেন মুখুজ্জে। প্রথম প্রথম তিনি জমিদার বাড়ীতে আর তাঁর মা ও স্ত্রী গ্রামে থাকতেন। তাতে অসুবিধা ঘটতে লাগল। সেই সব বুঝেই নরনাথবাবু—তাঁর বাবা তখন মারা গিয়েছেন—এই গ্রামেই তাঁদের সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। মাসে সাত টাকা মাইনে, চারখানা কাপড়, শীতের সময় চাদর আর দু বেলা খাওয়া—এই পুরোপুরি রাম মুখুজ্জের উপার্জন। এতেই অবশ্য সহজেই সংসারযাত্রা চলে। এই আয়ে আনন্দর পরিবার গরীব ছাড়া কি!

দুই অসম সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার সন্তান হওয়া সত্তেও আনন্দর সঙ্গে সুধার বন্ধুত্ব হতে বাধে নাই। শৈশবে অথবা কৈশোরে, যেদিন পরস্পরের কাছে একমাত্র মানবচিত্তের মূল্য ছাড়া আর কিছুর বিচার থাকে না, যখন পরস্পরের ব্যক্তিগত প্রীতিই একমাত্র ইপ্সিত বস্তু থাকে সেই সময় ওদের পরিচয় হয়েছে। সে পরিচয়ের দিনটির কথা পরিণত বয়সেও ওদের দুজনের কেউই ভোলেনি।

একই গ্রামের ছেলে, হাঁটতে শিখলেই অলিখিত আইনে আলাপ হয়েই যায়। কিন্তু ওদের আলাপটি ঠিক সেভাবে হয়নি। ঠিক স্মরণ করা যায় না এমন সময় থেকে অবশ্যই তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখেছে, কথাও কয়েছে। কিন্তু সে তো পরস্পরকে চেনা নয়। না চেনার কারণও অবশ্য ছিল। গ্রামের দক্ষিণ পাড়া অর্থাৎ প্রান্তের পাড়ায় সুধার

বাড়ী। নরনাথ বাবুদের বাড়ীও এ পাড়ায়। আনন্দ'র বাবাকে সুধা অবশ্য অনেকবার দেখেছে। তিনি কাজকর্মে সারাদিন এ পাড়াতেই থাকেন। কিন্তু তাঁর বাড়ী বাবুপাড়ায়। এ পাড়াতেই পুরানো জমিদার হরসুন্দর বাবুর বাড়ী। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার ছোট ছেলেদের অভিজ্ঞতা আর আবিস্কারের গণ্ডী আপনার পাড়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, আর সেই কারণেই শিশুকালের সঙ্গী খুঁজতে পাড়ার বাইরেও যেতে হয় না! কাজেই এ পাড়ার ছেলে ও পাড়ায় যায় না, অথবা ওপাড়ার ছেলে এ পাড়াতেও আসার কথা নয়।

সেই কারণেই পরস্পরকে দেখলেও চিনত না। আর এক চেনার সুযোগ ছিল বিদ্যামণ্ডপে। কিন্তু তাও ঘটে নাই। পাড়ায় পাড়ায় তখনকার দিনে একটা অদ্ভুত রেশারেশি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকত; একটা পাড়ার মানুষ নিজেদেরকে পৃথকভাবে এক একটা বিশেষ গোষ্ঠিভুক্ত মানুষ মনে করত। সেই কারণে অতি যৎসামান্য খরচার বিনিময়ে পাড়ায় পাড়ায় পৃথক পৃথক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ ও অহঙ্কার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেনি দুই পাড়ার মানুষগুলি! কাজেই শিশুকালে পাঠশালাতেও পরিচয় হয়নি দু জনের।

চেনা পরিচয় হ'ল মাইনর স্কুলে। হরসুন্দরবাবুর এবং নরনাথবাবুদের যুক্ত চেষ্টায় ও সাহায্যে অনেকদিন আগে থেকেই মাইনর স্কুল হয়েছে গ্রামে। পাছে কোন এক বিশেষ পাড়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে অন্য পাড়ার মনোবেদনার কারণ ঘটে সেই কারণেই প্রতিষ্ঠাতারা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রামের বাইরে, এক প্রকাণ্ড এজমালী ও সরিকানি দিঘীর পাড়ে।

সেবার পাড়ার পাঠশালায় শেষ শ্রেণী দ্বিতীয়মানের পড়া শেষ করলে সুধাকান্ত প্রথম হয়ে। আর বাবুপাড়ার পাঠশালায় তার চেয়ে এক ক্লাশ নীচে পড়ত আনন্দ। শুধু আপনার শ্রেণীতে প্রথমই হল না, পাঠশালার পণ্ডিত তাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে একেবারে মাইনর স্কুলে ভর্তি হবার পরোয়ানা দিলেন।

দুজনে একই সময়ে মাইনর স্কুলে এসে ভর্তি হল একই ক্লাসে। এবার আর শ্রেণী নয়, ক্লাস; একেবারে ফার্স্ট, সেকেণ্ড হওয়া। এবার তালপাতা আর খেজুরের চাটাই থেকে প্রমোশন হল বেঞ্চিতে।

তখনও স্কুলের পড়া আরম্ভ হয়নি। খেলাধুলার দিন চলেছে। সুধাকান্ত আর আনন্দ দুজনেই ভাল ছেলে। এসেই আপনার আপনার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান নিয়েছে। দু জনেই শুনেছে দু জনের কথা। আনন্দ শুনেছে দক্ষিণ পাড়ার পাঠশালার প্রথম-হওয়া ছেলে সুধা এসে ভর্তি হয়েছে এই স্কুলে। দু জনেই মনে মনে কল্পনা করেছে অনেক পড়াশুনো করে অপরকে ঘায়েল করার। আনন্দ দেখতে পায় খেলাধুলোর মধ্যে একটা ফর্সা ধবধবে ছেলে তার দিকে সব সময় তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করছে। চোখের চাউনিটা ওর কেমন যেন মেয়েলি মেয়েলি। সকৌতুক স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধা প্রায় দেখতে পায় আপন মনে খেলাধুলার আড়ালে মাঝে মাঝে কালো কালো শক্ত কাঠামোর ছেলেটা হঠাৎ আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে; ওর চোখে চোখ পড়তেই ধরা পড়ে যাওয়ার মত চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখাতে চাচ্ছে যেন সে তাকে দেখতেই পায়নি, কিম্বা সে যে না তাকালেও সর্বদা ওর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আছে এ কথাটা সে কিছুতেই বুঝতে দেবেনা। একজন সকৌতুক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপরের দিকে সদা-সচেতন হয়ে; আর একজন অবিরাম মুখ ফিরিয়ে আপনার সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে।

সুধা অনেক চেষ্টা করেও আলাপ করতে পারলে না কিছুতেই। দু একবার সলজ্জভাবে কথা বলবার চেষ্টা করেছে সে আনন্দে'র সঙ্গে, আনন্দ অবহেলা দেখিয়ে সরে গেছে। তারপর কি আশ্চর্য, আনন্দই একদিন যেচে আলাপ করলে তার সঙ্গে।

তখন পড়াশুনো আরম্ভ হয়েছে সমারোহে। নূতন স্কুলে ভর্তি হওয়ার গৌরব তখনও মনে টাটকা আছে ছাত্রদের। স্কুলের হেড মাষ্টার নরেনবাবু তাদের ক্লাশে বাংলা পড়াতে এসেছেন প্রথম দিন। একে হেড মাষ্টার, তায় আবার তাঁর প্রথম ক্লাশ। ছাত্ররা আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। দু সারি বেঞ্চ, মাঝখানে যাবার রাস্তা। প্রথম সারির একখানা বেঞ্চের একেবারে এক প্রান্তে সুধা বসে আছে, ওদিকে অন্য বেঞ্চখানার বিপরীত প্রান্তে আছে আনন্দ। পরস্পর মাঝে মাঝে বিনা বাক্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ কিন্তু সবারই চোখ হেড্ মাষ্টারের মুখের দিকে।

হেড্মাষ্টারের হাতে একখানা বই। তিনি কিন্তু বইখানা খুললেন না এসে কিছুক্ষণ ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর পিছনের বেঞ্চ থেকে আরম্ভ করলেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। প্রথম আরম্ভ করলেন সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন দিয়ে। বাংলা দেশ কি, বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি, তার সীমানা কতখানি, বাংলাদেশে কতগুলি বিভাগ, কতগুলি জেলা, তাঁরা যে জেলায় বাস করেন তার নাম, সীমা, প্রধান প্রধান সহরের পরিচয়। সন্থ কিছু দিন আগে হাওড়া থেকে নূতন রেল লাইন চলে গেছে পশ্চিমে গ্রামের সাত আট মাইল দূর দিয়ে, ট্রেন গেলে আওয়াজ পাওয়া যায়। তার উৎপত্তি ও সমাপ্তি ও পথ সম্বন্ধেও ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন। অধিকাংশ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার ক্ষমতা নেই কোন ছেলের। তারা প্রশ্নের ধরনধারণে খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছে। সুধাও পারলে না অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব দিতে। বরং দু চারটে জবাব দিলে আনন্দ ওপাশ থেকে। সুধা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে—আনন্দর ঝকঝকে চোখ দুটো অহঙ্কারে জলজল করছে, সে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে।

হেডমাষ্টার এবার প্রশ্নের ধারা পাল্টালেন, আরম্ভ করলেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে প্রশ্ন। অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন—সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী তোমারা জান কেউ? কোন উত্তর নেই। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে—কেউ উঠল কি না দেখবার জন্যে। অনেক্ষণ নীরবতার পর সুধা উঠে দাঁড়াল।

তাকে উঠতে দেখেই হেডমাষ্টার প্রশ্ন করলেন—তুমি কাহিনীটা জান?

ব্যাকুল ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে সে শুধু ঘাড় নাড়লে। প্রশ্নকর্তা তাকে উৎসাহিত করলেন—আচ্ছা বল। আস্তে আস্তে বল, কোন ভয় নেই তোমার। আস্তে আস্তে বল।

সুধা বলতে আরম্ভ করলে! ঢোঁক গিলে, এদিক ওদিক সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে, থমকে থমকে সে বলতে আরম্ভ করলে। জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল, কথার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল, তবে সে বেশ গুছিয়ে আরম্ভ করলে বলতে। সে পণ্ডিত বংশের ছেলে, রক্তধারায় যে বংশানুক্রমিক শিক্ষা ও আবেগ, কল্পনা ও ধারণা ওতপ্রোত হয়ে আছে তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলে। সে ভুলে গেল কোথায় কাকে গল্প শোনাচ্ছে।

কেবল এক অতি প্রাচীন, বিস্ময়কর, বিশাল, অবিশ্বাস্য ঘটনা, যাতে সে বিশ্বাস করে, তা চমৎকার বর্ণনা করে গেল। শিক্ষক ও ছাত্রদল চুপ করে শুনে গেল তার কাহিনী। শেষ হবামাত্র হেডমাষ্টার সোচ্ছ্বাসে প্রশংসা করলেন—বাঃ, বাঃ, চমৎকার। সকলেই তখন সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সুধার তখন প্রশংসার ভারে মাথা আর চোখের দৃষ্টি দুই-ই নুয়ে পড়েছে। শুধু একবার সামান্য মুখ তুলে আড়চোখে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকাল সে। সে দেখতে পেলে আনন্দের উজ্জ্বল চোখদুটো স্ফটিক পিণ্ডের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, তার মনে হল ঈর্ষায় যেন তার মনে আগুন ধরে গেছে।

হেডমাষ্টার প্রশ্ন করলেন সাগ্রহে—কোথায় শিখলে তুমি এ গল্প?

মাথা নামিয়ে সে জবাব দিলে—বাবা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় গল্প বলেন আমাকে।

বুঝবার ভঙ্গীতে হেডমাষ্টার ঘাড় নাড়লেন। বললেন—তুমি রামায়ণ, মহাভারত সব জান?

—অনেক জানি। বাবা আমাকে গল্প বলেন। তাই থেকে জানি।

হেডমাষ্টার খুব খুসী হলেন। তাকে আর একবার সাধুবাদ দিলেন। সকলকে রামায়ণ মহাভারত পড়তে গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিলেন। তারপর ছুটি।

কোলাহল করতে করতে সব ছেলে তখন বেরিয়ে পড়েছে। সুধা সেদিন আর কারো দিকে তাকালে না। কেবল মাত্র প্রশংসার আত্মপ্রসাদে নয়, আন্তরিক বিশ্বাসের একটি কাহিনী বলতে গিয়ে ওর চোখে তখন স্বপ্নের ঘোর নেমেছে। কোন অতীতকালে কোন অন্তহীন নীল ফেনোজ্জ্বল মন্থিত জলরাশির শব্দ ও দৃশ্যের স্বপ্ন নেমেছে তখন ওর চোখে। তারই ছায়ায় মন আর দৃষ্টি দুইই মেদুর।

সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। আশপাশ থেকে সব চলে গেছে। হঠাৎ কে গম্ভীর গলায় ডাকল—শোন।

চমকে উঠল সে। ফিরে তাকালে। স্বপ্নের মায়া ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সুখ স্বপ্নের চেয়েও সুদুর্লভ তার সামনে দাঁড়িয়ে। আনন্দ ডাকছে তাকে। সে সাগ্রহে সস্মিতমুখে বললে—ডাকছ আমাকে?

শুকনো গলায় আনন্দ উত্তর দিলে—হ্যাঁ। তার চোখগুলো তখনও ঝকমক করছে।

আবার মিষ্টি গলায় ওর মুখের দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে সে বললে—বল ?

কোন ভূমিকা নেই। আনন্দ একেবারে আরম্ভ করলে—তুমি ওই গল্পগুলো আমাকে বলবে ? আমি শিখব। খুব ভাল গল্প।

সুধার বিস্ময়ের অবধি রইলনা। আনন্দ গল্প শিখবে তার কাছে। সাগ্রহে সে বললে—নিশ্চয় বলব। কিন্তু কি ক'রে অত গল্প বলব ?

প্রশ্ন হল—কত গল্প ?

—অনেক, অনেক। এক বছর দু বছর প্রতিদিন বললেও শেষ হবে না।

এবার অবাক হল আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হজম করে নিলে। সে সহজ গলায় বললে—তা এক বছর দু বছরই শুনব প্রতিদিন। তা হ'লে তো শেষ হবে ?

তা হবে।

তা হ'লে কাল থেকে বিকেলে বাড়ী গিয়ে তোমাকে ডাকব। তারপর মাঠে গিয়ে তুমি গল্প বলবে। প্রতিদিন, এ্যাঁ ?

সুধা শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। সেদিন তার অবাক লাগেনি। পরে বড় হয়ে সে যখন এই নিয়ে ভেবেছে তখন আশ্চর্য লেগেছে। আশ্চর্য, শুধু বিক্রেতার কাছে ক্রেতার মত এসে সেদিন কথা বলেছিল সে। আরও আশ্চর্য, ক্রেতার মূল্যের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না, মূল্য না দেবারই ভঙ্গী যেন। সে যেন মূল্য না দিয়ে তার কাছ থেকে গ্রহণ করেই তাকে কৃতার্থ করবে।

কিন্তু সুধা পরে আরও ভেবেছিল। তার ধারণা, সে যে আনুকে ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে সেকথা আনন্দ বোধ হয় তার সঙ্গে আলাপ না করেও বুঝতে পেরেছিল। তাই সেদিন সে চাইতে পেরেছিল অমন অকুণ্ঠভাবে।

তারপর আরম্ভ হল প্রতিদিন গল্প শোনা। প্রতিদিন বিকেল বেলা স্কুলের ছুটির পর যে যার বাড়ী চলে যেত। জল খেয়ে সুধা অপেক্ষা করতো একটি ডাকের। আনন্দ এসে বাইরে থেকে ডাকত—সুধা! সুধার আর সাড়া দেবার দরকার হত না, পরমুহূর্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াত, বলত—চল।

কেবল এক অতি প্রাচীন, বিস্ময়কর, বিশাল, অবিশ্বাস্য ঘটনা, যাতে সে বিশ্বাস করে, তা চমৎকার বর্ণনা করে গেল। শিক্ষক ও ছাত্রদল চুপ করে শুনে গেল তার কাহিনী। শেষ হবামাত্র হেডমাষ্টার সোচ্ছ্বাসে প্রশংসা করলেন—বাঃ, বাঃ, চমৎকার। সকলেই তখন সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সুধার তখন প্রশংসার ভারে মাথা আর চোখের দৃষ্টি দুই-ই নুয়ে পড়েছে। শুধু একবার সামান্য মুখ তুলে আড়চোখে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকাল সে। সে দেখতে পেলে আনন্দের উজ্জ্বল চোখদুটো স্ফটিক পিণ্ডের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, তার মনে হল ঈর্ষায় যেন তার মনে আগুন ধরে গেছে।

হেডমাষ্টার প্রশ্ন করলেন সাগ্রহে—কোথায় শিখলে তুমি এ গল্প?

মাথা নামিয়ে সে জবাব দিলে—বাবা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় গল্প বলেন আমাকে।

বুঝবার ভঙ্গীতে হেডমাষ্টার ঘাড় নাড়লেন। বললেন—তুমি রামায়ণ, মহাভারত সব জান?

—অনেক জানি। বাবা আমাকে গল্প বলেন। তাই থেকে জানি।

হেডমাষ্টার খুব খুসী হলেন। তাকে আর একবার সাধুবাদ দিলেন। সকলকে রামায়ণ মহাভারত পড়তে গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিলেন। তারপর ছুটি।

কোলাহল করতে করতে সব ছেলে তখন বেরিয়ে পড়েছে। সুধা সেদিন আর কারো দিকে তাকালে না। কেবল মাত্র প্রশংসার আত্মপ্রসাদে নয়, আন্তরিক বিশ্বাসের একটি কাহিনী বলতে গিয়ে ওর চোখে তখন স্বপ্নের ঘোর নেমেছে। কোন অতীতকালে কোন অন্তহীন নীল ফেনোজ্জ্বল মন্থিত জলরাশির শব্দ ও দৃশ্যের স্বপ্ন নেমেছে তখন ওর চোখে। তারই ছায়ায় মন আর দৃষ্টি দুইই মেদুর।

সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। আশপাশ থেকে সব চলে গেছে। হঠাৎ কে গম্ভীর গলায় ডাকল—শোন।

চমকে উঠল সে। ফিরে তাকালে। স্বপ্নের মায়া ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সুখ স্বপ্নের চেয়েও সুদুর্লভ তার সামনে দাঁড়িয়ে। আনন্দ ডাকছে তাকে। সে সাগ্রহে সস্মিতমুখে বললে—ডাকছ আমাকে?

শুকনো গলায় আনন্দ উত্তর দিলে—হ্যাঁ। তার চোখগুলো তখনও ঝকমক করছে।

আবার মিষ্টি গলায় ওর মুখের দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে সে বললে—বল?

কোন ভূমিকা নেই। আনন্দ একেবারে আরম্ভ করলে—তুমি ওই গল্পগুলো আমাকে বলবে? আমি শিখব। খুব ভাল গল্প।

সুধার বিস্ময়ের অবধি রইলনা। আনন্দ গল্প শিখবে তার কাছে! সাগ্রহে সে বললে—নিশ্চয় বলব। কিন্তু কি ক'রে অত গল্প বলব?

প্রশ্ন হল—কত গল্প?

—অনেক, অনেক। এক বছর দু বছর প্রতিদিন বললেও শেষ হবে না।

এবার অবাক হল আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হজম করে নিলে। সে সহজ গলায় বললে—তা এক বছর দু বছরই শুনব প্রতিদিন। তা হ'লে তো শেষ হবে?

তা হবে।

তা হ'লে কাল থেকে বিকেলে বাড়ী গিয়ে তোমাকে ডাকব। তারপর মাঠে গিয়ে তুমি গল্প বলবে। প্রতিদিন, এঁ্যা?

সুধা শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। সেদিন তার অবাক লাগেনি। পরে বড় হয়ে সে যখন এই নিয়ে ভেবেছে তখন আশ্চর্য লেগেছে। আশ্চর্য, শুধু বিক্রেতার কাছে ক্রেতার মত এসে সেদিন কথা বলেছিল সে। আরও আশ্চর্য, ক্রেতার মূল্যের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না, মূল্য না দেবারই ভঙ্গী যেন। সে যেন মূল্য না দিয়ে তার কাছ থেকে গ্রহণ করেই তাকে কৃতার্থ করবে।

কিন্তু সুধা পরে আরও ভেবেছিল। তার ধারণা, সে যে আনুকে ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে সেকথা আনন্দ বোধ হয় তার সঙ্গে আলাপ না করেও বুঝতে পেরেছিল। তাই সেদিন সে চাইতে পেরেছিল অমন অকুণ্ঠভাবে।

তারপর আরম্ভ হল প্রতিদিন গল্প শোনা। প্রতিদিন বিকেল বেলা স্কুলের ছুটির পর যে যার বাড়ী চলে যেত। জল খেয়ে সুধা অপেক্ষা করতো একটি ডাকের। আনন্দ এসে বাইরে থেকে ডাকত—সুধা! সুধার আর সাড়া দেবার দরকার হত না, পরমুহূর্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াত, বলত—চল।

হাত ধরাধরি করে এ কথা ও কথা বলতে বলতে গ্রামের বাইরে গিয়ে হাজির হ'ত তারা। তখনও এখনকার রেললাইনটা হয়নি। চারিদিকে খালি ধানের জমি অথবা পতিত মাঠ। এখন যেখান দিয়ে রেল লাইন চলে গিয়েছে, কাঁচা পায়ে-চলা রাস্তার পাশে সেখানে একটা কচি বটগাছ ছিল। তারই নীচে বসত তারা নিয়মিত ভাবে। তখনও পরবর্তী কালের হরসুন্দর বাবুর বাগানের কুঞ্জবন পর্যন্ত যাবার সাহস ছিলনা তাদের।

আনন্দের স্বভাবে ঐ বয়সেই এক একটা আশ্চর্য গুণ ছিল। সুধার অদ্ভুত মনে হত। অমন নিয়মানুবর্তিতা, অমন অনন্যমনে কোন কিছুতে লেগে থাকার ক্ষমতা, অমন একাগ্রতা, সুধাকান্ত তার দীর্ঘ জীবনেও আর দেখেনি। গাছতলায় পেঁছুলেই সব বাজে কাজ বন্ধ হয়ে যেত। আনন্দ যেন সব ঝেড়ে ফেলে দিত—বলত—বল্, গল্প আরম্ভ কর।

আরম্ভ হত গল্প। দিনের উজ্জ্বল আলোয় লাল রঙ ধরত, মাথার উপর আকাশে, পশ্চিম দিগন্ত থেকে অতি দীর্ঘ, নীল, আবছা অন্ধকারের স্থূল কোমল রেখা পড়ত, সূর্য অস্ত যেত। পাখীরা শব্দ করতে করতে উড়ে যেত মাথার উপর দিয়ে, গরুর পাল নিয়ে রাখালেরা ফিরত মন্থর পায়ে। ওদের কাছে তখন আবছা স্বপ্নের মত এসে দাঁড়াত পুরানো কালের বড় বড় মানুষরা, কেউ কিরীট কবচ-কুণ্ডলধারী, শস্ত্রপাণি। কেউ চিরবাস পরা আনন্দিত উদাসীন তপস্বী। কেউ বিচিত্রবেশা রাজকন্যা, কেউ বা মোহিনী অপ্সরী, কত বিচিত্র ভয়ঙ্কর হিংস্র অতিকায় রাক্ষস, কত অপরূপ সুন্দর দেবতা। শুনতে শুনতে এক একদিন অন্ধকার হয়ে আসত, সন্ধ্যাতারা চন্দনের টিপের মত ফুটে উঠত অন্ধকার মসৃণ আকাশে, কোন কোন দিন তারই সঙ্গে উঠত চাঁদ। কোন দিন ম্লান আবছা আলোয় আকাশ-পৃথিবী এক হয়ে যেত; কোন দিন বা দুধবরণ আলোয় আকাশ থেকে পৃথিবী সব ধুয়ে যেত।

এমনি চলল দিনের পর দিন। দু বছরের মধ্যে তারা বিকেলে ক'দিন একসঙ্গে ঐ গাছতলায় বসেনি তা বোধ হয় দুটো হাতের আঙুল গুনে বলে দিতে পারত সুধা। কিন্তু আশ্চর্য, সুধাকান্ত সেটা অনেক পরে বুঝেছে,—সে নিজে ঐ কাহিনীর মাঝখান দিয়ে গড়ে উঠেছে, তার মন আর ঐ কাহিনীর ভাবনা দুটো মিশিয়ে যেন তার চরিত্র তৈরী; কিন্তু আনন্দর গায়ে ঐ

কাহিনীর রঙটা কেবল লেগেছে বাইরে বাইরে। জানার পরিমাণ দুজনেরই এক। কিন্তু ফল দুজনের ক্ষেত্রে দু রকম হয়েছে। সেই পুরানো কালের কাহিনীর গন্ধ যেন আজও সুধাকান্তের মনে পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দর মনে যে রঙ লেগেছিল তা পর জীবনের বর্ষার জলেই ধুয়ে গিয়েছিল কবে।

কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটেছিল দু জনেরই অজ্ঞাতে। দু'জনে দু'জনের মনের কাছে—বড় কাছে এসে পড়েছিল। সেটা কেউ বোঝেনি সে দিন। দিনের পর দিন দু'জনে পাশাপাশি বসে একজন বলেছে, অন্যজন শুনেছে, এরই মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কাছে অভ্যাসের গুণে অপরিহার্য হয়ে গেছে। সেটা বোধ হয় বোঝেনি তারা, বুঝবার বয়সও হয়নি তখন।

তবে কিছুদিনের মধ্যেই সেটা বুঝল তারা।

দুজনের মধ্যে হঠাৎ একবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল অতি তুচ্ছ কারণে।

ওদের দুজনেরই বয়স তখন এগারো বারো। ওদের বন্ধুত্ব তখন বছর দুয়েকের পুরানো হয়েছে। টিফিনের সময়। ছেলেরা স্কুল থেকে বেরিয়ে দিঘীর পাড়ের উপর খেলাধূলো করছে। সুধা আর আনন্দ দু জনেই তখন মাইনর স্কুলের দু ক্লাস পার হয়ে গিয়েছে। নীচের ক্লাসের ছেলেরা ছুটোছুটি করে, আর ওরা অপেক্ষাকৃত উঁচু ক্লাসের ছাত্র, ওরা নিরিবিলি বসে গল্প করে খেলাধুলোয় নামে ক্কচিৎ কদাচিৎ। সেদিনও টিফিনের সময় নীচের ক্লাসের ছেলেরা খেলাধুলো করছে, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ খেলা থেমে গেল, কথা কাটাকাটি আরম্ভ হ'ল ওদের মধ্যে। কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে মারামারি। এদিক ওদিক থেকে বড় ছেলেরাও এসে জমে গেল।

তুচ্ছ কারণ, অথচ অসামান্য হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ পাড়ার অর্থাৎ সুধাদের পাড়ার ছেলে, নাম হরেন্দ্র, বছর আষ্টেক বয়েস, পাতলা ফুটফুটে চেহারা। খেলতে খেলতে ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে। লেগেছেও খানিকটা। উঠে দাঁড়িয়ে সে গা-হাত-পা ঝাড়ছে, বেদনাটা ভুলবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ওদিক থেকে আর একটি ছেলে বলে উঠল—দক্ষিণ পাড়ার ছেলেরা অমনিই হাঁদা। দু পা ছুটতে গিয়েই দড়াম ক'রে পড়ে আছাড় খায়।

একে আছাড় খেয়ে পড়ে হাত পায়ে লেগেছে এবং খানিকটা অপ্রস্তুতও হয়েছে, তার উপর এই ব্যঙ্গ। রাগে আগুন হয়ে ছোট্ট ছেলেটি ছুটল তাকে মারতে। যে বলেছিল সে বাবুপাড়ার ছেলে। ছেলেটি বয়সে অপেক্ষাকৃত বড়, তার উপর বলিষ্ঠ। সে অনায়াসে দুর্বল আক্রমণকারীর হাত দুটো ধরে মুচড়ে দিয়ে ছেড়ে দিলে, মুখ বাঁকিয়ে বললে—এ্যাঁঃ, দক্ষিণ পাড়ার পূজারী বামুনের ছেলে, বাবুপাড়ার ছেলের সঙ্গে মারামারি করতে এসেছে। কেমন হয়েছে তো?

এবার ছেলেটি দেহের আর মনের যাতনায়, অপমানে পাগল হয়ে গেল, সে উন্মাদের মত লাফিয়ে পড়ল বিদ্রূপকারীর উপর। কান্না-মেশানো বিকৃত ক্রুদ্ধ গলায় বললে—বাবুপাড়া না ভিখিরী পাড়া। তোরা ভিখিরী।

এই সময়ে এসে দাঁড়াল আনন্দ বাবুপাড়ার অধিবাসী হয়ে। শেষের কথাটা সে শুনতে পেয়েছে, বাবুপাড়ার অপমানটা তার গায়ে লেগেছে। সে এসেই ছোট ছেলেটার কান দুটি ধরে মাথায় আর পিঠে আঘাত করলে। একবার মেরেও সে আবার মারবার জন্য হাত তুলেছে এমন সময় উত্তেজিত কঠিন কণ্ঠে চীৎকার উঠল—মেরো না ওকে, থাম।

সুধা বসে বসে সমস্তটাই লক্ষ করেছে। অপমানে, আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দুর্বল ছেলেটি তখন হার মেনে কাঁদতে সুরু করেছে। তার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখন আনন্দর হাত আবার উঠেছে তাকে নূতন আঘাত করার জন্যে। সুধা আনন্দকে জানে, ওর স্বভাবই ওই। আনন্দ ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, যেটা তার কাছে অসম্মানকর তার সে বিরুদ্ধে। ওই ছোট ছেলেটির দু গাল বেয়ে জল পড়ছে, ওর দেহে মনে আঘাত লেগেছে সে দিকে ও ভ্রূক্ষেপ করবে না। অথচ ছেলেটির অবস্থা দেখে অকস্মাৎ সুধার ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, দু চোখ জ্বালা ক'রে জলে ভরে উঠল। সে চীৎকার ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল ছেলেটিকে। রাগে ক্ষোভে সে তখন জ্বলছে। সে দেবে না, কিছুতে ওর গায়ে আঘাত লাগতে দেবে না।

আনন্দ আশ্চর্য হয়ে গেছে, খানিকটা বিহ্বলও হয়ে গেছে। সুধা, সেই সুধা, তার সমস্ত কথার সমর্থনকারী, মিষ্টভাষী, মিষ্টচরিত্র সুধা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে বিবাদ করবার জন্যে! বিস্ময়ে, রাগে, বেদনায় আহত

অহঙ্কারে তার সমস্ত মুখখানা আকুঞ্চিত হয়ে উঠল, চাপা কঠিন গলায় বললে—মারব না, মারব না, না ?

সুধার চোখের জল তখন রাগের আগুনে শুকিয়ে গেছে। সে কঠিন কণ্ঠে বললে—না, মারবে না। ওকে কি বলে অপমান করলে, কি করে মারলে তা দেখলে তুমি ?

—না, দেখিনি। দেখব না। পুজারী বামুনের ছেলেকে পুজারী বামুন বলেছে তো কি হয়েছে ? সত্যি কথাই তো বলেছে।

—সত্যি কথা বলেছে ? তার মুখের প্রান্তে আনন্দর সম্বন্ধে ক'টা সত্যি কথা এসে গেল। তার বলতে ইচ্ছা হল—তুমি তো বাবুপাড়ার লোক নও, উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। আর তুমিও তো গোমস্তার ছেলে। কথাগুলো বিষের তীরের মত তার মুখের প্রান্তে এসে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। না, আনন্দকে সে আঘাত করতে পারবে না। আর আঘাত করলে আনন্দ এই দুর্বল ছেলেটির মত ভেঙে পড়বে না, উন্মাদের মত রাগে আঘাত করবে। সে আর কিছু না বলে ছেলেটিকে হাতে করে আগলে সরিয়ে নিয়ে গেল। উদ্যত হাত দুটোও আর আঘাত করতে পারলে না। তারও মনে হল, সে সুধাকে আঘাত করবে কি ক'রে ?

আনন্দ অবাক হয়ে ওদের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল। কিন্তু চোখগুলো রোদ লাগা অতসী কাচের মত ঝকঝক করতে লাগল।

সেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

তারপর আবার সেই আগের মত দুজনে পৃথক হয়ে দু জায়গায় বসতে লাগল। আবার সেই আগের মত আলাদা হয়ে দুজনের দুই কোণে বসা, আবার মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে চাওয়া, ধরা পড়ে লজ্জিত হওয়া। এবার কিন্তু সুধার চেয়ে আগ্রহটা আনন্দের বেশী। সুধার মনে প্রথম থেকেই আনন্দের উপরে অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। সমস্ত ঘটনার মধ্যে আনন্দ'র যে অবিবেচনা, আত্মপরতা আর নিষ্ঠুরতা দেখেছে তারই ছাপ পড়ে মনটা যেন তার বিষিয়ে আছে। ঐ অতটুকু দুর্বল ছেলেটাকে অকারণে নির্যাতন করার ছবিটা তাই মনে হলেই মন এখনও টন টন করে ওঠে, আনন্দর প্রতি ভালবাসা এক মুহূর্তে বিষিয়ে যায়, আর ওর দিকে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছা হয় না। তার প্রতি একটা ক্ষুব্ধ ঘৃণা থেকে

সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা একটি কঠিন অবহেলায় ভরে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে এমন দাঁড়াল যে আর যেন আলাপ না হলেও চলে। কিন্তু এক সঙ্গে দুজনের চোখে চোখ পড়লেই মন দুলে উঠত! সুধার মনে হত—যাই, ছুটে যাই ওর কাছে, গিয়ে ওর হাতটা ধরে বলি—যা হয়েছে হয়েছে, সব ভুলে যা ভাই। কিন্তু পরক্ষণেই মন আবার কঠিন হয়ে উঠেছে।

হয়তো এমনিই চলত। মনে মনে সংগোপনে আবার কাছাকাছি আসবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো আর কাছাকাছি আসা হত না। কিন্তু সেই ঘটনা ঘটল তাদের অজ্ঞাতে।

সেই সময় গ্রামে একটি ভারী মজার মানুষ এসেছিলেন। সরকারী কর্মচারী, সাবরেজিষ্ট্রার। গান বাজনার খুব সখ। সন্ধ্যা বেলায় থানার দারোগা, মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টার, নরনাথবাবু সকলে গিয়ে বসতেন তাঁর বাড়ীতে। অবিবাহিত মানুষ, ধর্মপ্রাণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ সজল হয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে বসে ভগবানের নাম করেন গান গেয়ে। নাম বোধ হয় রাধারমণ ঘোষ। এই ভদ্রলোকই এখানে থাকতে থাকতে একখানা ধর্মমূলক নাটক লিখে ফেললেন। স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত নাটক। নাম 'প্রেমের ডোর'। এখানে প্রেম অবশ্য ভাগবত প্রেম। নাটক লিখে বন্ধুদের শোনাতেই হেড মাষ্টারই তাঁর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে অভিনয় করাবার পরামর্শ দিলেন। একটি ছেলে—ঈশ্বরের প্রেমে পাগল, তাঁকে পাবার জন্যে তপস্যা ক'রে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেলে তো বটেই উপরন্তু তিনি ভক্তের আজীবন নানান কজকর্ম করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে কোলে তুলে নিলেন। এই গল্প। মূল ভূমিকায় ভক্ত ধনা আর শ্রীকৃষ্ণ।

অনেক বাছাবাছি ক'রে হেডমাস্টার আর রাধারমণবাবু নিলেন তাদেরই দুজনকে। সুধা করবে মূল ভূমিকা ভক্ত ধনার অংশ, আর আনন্দ করবে শ্রীকৃষ্ণের অংশ। নরনাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন—তা আপনাদের ভূমিকার জন্যে উপযুক্ত মানুষ দুটিই বের করেছেন দেখছি। সুধার চেহারাটি মিষ্টি, স্বভাবটি মিষ্টি, আর শুদ্ধ পণ্ডিত বংশের ছেলে। আর আমাদের রামবাবুর ঐ তো একমাত্র ছেলে আনু। একেবারে আদরের দুলাল। আর রঙটিও ঠিক ঠিক মিলেছে।

সকলেই অল্প হেসে উঠল। যাদের সম্বন্ধে বলা হ'ল তাদের একজনের

প্রশংসায় মাথা নীচু হয়ে গেল, অপর জন চাপা রাগে মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে প্রকাশের উপায় নাই। কেবল ভিতরের অসন্তোষ ক্ষোভ আর রাগ ওর ঝকঝকে চোখের ভিতর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছুরিত হয়ে আবার ম্লান হয়ে গেল।

অভিনয়ের মহড়া আরম্ভ হল। ভক্তের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন না তখন অভিমানাহত ভক্ত অদৃশ্য দেবতাকে লক্ষ্য করে বললে—বেশ তুমি দেখা দিলে না তো! তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি এলে না! আর আসতে হবে না তোমাকে। তোমাকে যে নৈবদ্য সাজিয়ে দিয়েছি তাও নেবে না তুমি! তোমার আর নিয়ে কাজ নাই। আমি চললাম, ডুবে মরব আমি।

ভক্ত ধীরে ধীরে নামল দিঘীর কালো জলে। দেবতার আসন টলল, মুকুট নড়ল, অকস্মাৎ ভক্তবৎসল আবির্ভূত হলেন, পিছন থেকে ডাকলেন—ধনা, ফিরে আয়, আমি খাচ্ছি।

ভক্ত ফিরে এল মৃত্যুর দ্বার থেকে, ভক্ত-ভগবানে মিলন হল।

শুধু ভক্ত আর ভগবানের মিলন নয়, এই অভিনয়কে সূত্র করে আবার মিলিত হল সুধা আর আনন্দ। প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিনের মহড়া শেষ করে দুই বন্ধু পরস্পরের হাত ধরে নয়, গলা ধরে বাড়ী গেল। সে বন্ধন আর ভাঙেনি। সেই থেকে ধীরে ধীরে গ্রামের লোক ওদের ভাব আর ভালবাসা দেখে নাম দিলে জোড়মাণিক।

তারপর আরও কতদিন গেল। মাইনর স্কুলের পড়াও প্রায় শেষ হল। বালক বয়সও পার হয়ে গেল, জীবনে নূতন রঙ ধরল, তরুণ গাছের মত লম্বা ঢ্যাঙা হ'য়ে উঠল দুজনেই, মুখে হালকা গোঁফের রেখা দেখা দিলে। গলার তারের মত সরু একহারা আওয়াজে মিঠেকড়া সাত স্বরের আভাস লাগল। খুঁটিনাটি ঝগড়া হয়, মনকষাকষি হয়, আনন্দ রাগ করে, সুধা রাগ ভাঙায়। কখনও কখনও সে দু চারটে কঠিন তীব্র কথা বলে আনন্দকে। আনন্দ আর সেদিন কথা বলতে পারে না। মুখ নীচু ক'রে থাকে। তারপর আর দু' দিন আসে না হয়তো। তিন দিনের দিন আবার নিজেই এসে ডাকে তাকে। সেদিনও সকালে রাগ ক'রে চলে যাবার পর বিকেলবেলা আবার নিয়ম মত এসে ডাকলে—সুধা।

তার ডাকের জন্যই অপেক্ষা করছিল সুধা। বেরিয়ে এল সে। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে সকাল বেলার সেই ক্ষোভের আর বেদনার যে ছায়া দেখে নিয়ে সে গিয়েছিল তা কোথায় কোন খুসীর হাওয়ায় যেন উড়ে গেছে। তবু সে মনে মনে ঠিক করলে—আজ কিছু কঠিন কথা বলবে আনন্দকে।

মুখে রাগ ফুটিয়ে সে বললে—হ্যাঁরে, তুই সকালে অমন রাগ করে চলে গেলি কেন? তুই কি পাগল না কি?

তার কথা এড়িয়ে দিয়ে আনন্দ বললে—ছেড়ে দে সে কথা! বিয়ের দিন শুদ্ধ ঠিক হয়ে গেল। অঘ্রাণের পাঁচ তারিখ। মানে আর দশদিন বাকী। বুঝলি?

এবার একটু ঠাট্টা করলে সুধা—কি রে, হিলুকে পছন্দ হবে তো?

আনন্দর কেবল একটু হাসি। তার মুখে কেমন বেমানান যেন ঐ কোমল নরম হাসিটুকু।

বিয়ে হল সেই অঘ্রাণের পাঁচ তারিখেই। আবার যখন বিয়ের পর দিন তার সঙ্গে সুধার নিরিবিলি দেখা হ'ল সে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। আনন্দ এমনই কেমন পরুষ কঠোর, কঠিন। পোষাক, চেহারা থেকে আরম্ভ করে ওর ভিতর থেকে অহরহ যে মানুষটি আত্মপ্রকাশ করে তার সবটাই কড়া ছাঁচে ঢালা। কিন্তু আজ যেন তার নূতন জন্মলাভ হয়েছে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি লাগছে তাকে।

সুধা জিজ্ঞাসা করলে—কি রে, বৌ পছন্দ হয়েছে? ভাব হয়েছে বৌয়ের সঙ্গে?

আনন্দ জবাব দিলে না, শুধু হাসলে। চোখের দৃষ্টি, মুখের পেশী থেকে আরম্ভ করে ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত কেমন হয়ে যেন হাসিতে গলে পড়ছে। সুধার মনে হল আনন্দর মুখে আর মনে যেন তার মুখের ছায়া পড়েছে।

দুই

আনন্দর কথা যখনই মনে হয় তখনই মনটা নরম হয়ে যায় সুধার কিন্তু আনন্দর স্বভাবের সম্বন্ধে চিন্তা করলেই প্রগাঢ় বন্ধু-প্রীতির জন্যই বরাবর ভয় পেয়েছে সুধা। ওর স্বভাবের মধ্যে এমন আশ্চর্য আত্মপরতা আছে, সর্বোপরি এমন অসহিষ্ণুতা আছে যে ওর খুব কাছে এলেই আহত হতে হবে মানুষকে। যদি সে অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান হ'ত লোকে তার চরিত্রের দাহ সহ্য করত ভয়ে ভয়ে। কিন্তু সংসারে তার নিজের সহায় নেই, সম্বল নেই। তার অসহিষ্ণুতা কে সহ্য করবে!

আনন্দকে বার বার সুধার মনে হয়েছে একপাত্র অত্যুজ্জ্বল আগুনের মত। সব সময় অবিরাম জ্বলছে আপনার দাহে। কাছে এলেই পুড়তে হবে মানুষকে। সুধা তার কাছে কাছেই আছে, অবিরাম তার দাহ তাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। আর সে ক্রমাগত আপনার চরিত্রের শান্ত শীতলতা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছে।

তবে একটা জিনিষ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে—আনন্দকে উপেক্ষা করা, একেবারে অবহেলা করা খুব কঠিন।

তবে সুধার মনে হল—বিয়ের পর একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে আনন্দের। সে যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

চার বছর মাইনর স্কুলে এক সঙ্গে পড়লে তারা। দু'জনেই দুই পাঠশালা থেকে 'প্রথম' হয়ে এসেছিল। কিন্তু মাইনর স্কুলে এসে পরস্পর যখন প্রতিদ্বন্দ্বী হল তখন প্রতিবারই সুধাকে হারতে হয়েছে আনন্দর কাছে। একটা আধটা বিষয়ে বরাবরই যেমন সুধা বেশী নম্বর পেয়েছে, তেমনি আনন্দ বছরের তিনটে পরীক্ষার প্রত্যেকটাতেই জিতেছে, ফার্স্ট হয়েছে।

শেষ পরীক্ষা তখন কেবল বাকী। মাইনর স্কুল থেকে সেবার ওরা দুজন বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। হেডমাষ্টারমশাই আশা করেন যে আনন্দ তো বৃত্তি পাবেই, সুধাও হয়তো পেয়ে যেতে পারে। ওদের দুজনের উপরেই তাঁর বিপুল ভরসা। ওরা দুজনেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রেখেছে ওরা দুজনেই জেলা স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবে। চার টাকা বৃত্তি তো পাবেই, উপরন্তু বিনা মাইনেতে পড়ার ব্যবস্থাও হবে। তা হলেই আর অসুবিধা হবে না আনন্দর।

পরীক্ষার কিছুদিন আগে আনন্দের বিয়ে হল। আনন্দের চেহারাই যেন পাল্টে গিয়েছে। সুধার ওকে দেখে মনে হয় আনন্দ যেন একটা সুখের নদীতে হাত-পা ছেড়ে ভেসে চলেছে, পড়াশুনার কথা বোধ হয় একেবারে ভুলেই গিয়েছে। একদিন ওকে সে মনে পড়িয়ে দিল কথাটা।—হ্যাঁ রে আনু, সামনেই যে বৃত্তি পরীক্ষা সেটা মনে আছে ত ?

অন্য সময় হলে মুখে কিছু সে বলত না, কেবল চোখ দুটো জ্বলে উঠত। আজ সে একটু হাসল, বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। তোর কি ধারণা আমি নতুন বৌ পেয়ে বইপত্তর সরিয়ে রেখেছি ? না রে পড়ি, রাত্রে পড়ি।

—মনে রাখিস তোকে ফার্স্ট হতে হবে, বৃত্তি পেতে হবে। না হলে ইস্কুলের ভীষণ অপমান হবে। ওকে কথাটা মনে করিয়ে দিলে সুধা। বৃত্তি না পেলে যে ওর আর পড়া হবে না এ-কথাটা বলতে সঙ্কোচ হল। সে তো জানে আনন্দকে। এখনি হয়তো মুখ ভার করে সমস্ত আনন্দের পরিবেশটিকে দলে মুছে দিয়ে উঠে যাবে, ভ্রূক্ষেপ করবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, আসল কথাটা মনে করিয়ে দিলে আনন্দই, বললে—বুঝলে সুধাবাবু, বৃত্তি না পেলে আর পড়া হবে না আমার। কথা শেষ করে হাসল আনন্দ।

আশ্চর্য হল সুধা। সে এমন সহজ হ'ল কি ক'রে ?

সামান্য কিছুদিন পরেই বৃত্তি পরীক্ষা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে ওদের বাড়ীতে সদ্যবিবাহিত গ্রামবাসী বলেও বটে আবার সুধার বন্ধু বলেও বটে, একদিন আনন্দর সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ হল। লাল পাড় ফরাসডাঙার ধুতি পরে এল আনন্দ, আর ডুরে সাড়ী-পরা, আঁচলে চাবির

রিঙ বাঁধা দশ এগার বছরের হিলু এল বৌ সেজে মাথায় মস্ত ঘোমটা টেনে। আনন্দর মা এলেন বৌকে নিমন্ত্রণ খাইয়ে নিয়ে যেতে।

আনন্দের সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে সুধা দেখলে দশ বছরের মেয়েটি, যে এই সেদিন পাড়ায় এক টুকরো গামছা পরে ছুটে বেড়াত সে আজ ডুরে সাড়ী আর লম্বা ঘোমটার আড়ালে খাসা দিব্যি বৌটি সেজে শান্ত হয়ে বসে আছে।

সুধা বললে—আরে এ যে একেবারে দিব্যি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আনন্দ গম্ভীর গলায় বললে—না রে মেয়েটি ভারী লক্ষ্মী। ভারী ভাল মেয়ে।

তার মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনে সুধা মুখ টিপে হেসে বললে—তোমার বৌ, তুমি তো বলবেই।

আনন্দের গলা আরও গভীর হল, বললে—আমি সত্যি বলছি। কিছু বললে এমন চুপ করে বড় বড় চোখ মেলে তাকায় যে মায়া হয়। কোন উত্তর করে না, কাঁদে না, সব সহ্য করে। আর মিষ্টি কথা বললে খালি হাসে!

খাওয়া দাওয়ার পর প্রণাম করিয়ে ফিরবার সময় আনন্দের মা বলছেন—ওরা শুনতে পেলে—সুধার মাকেই বলছেন—আপনারা পুণ্যবতী। ওকে আশীর্বাদ করুন যেন আমার ছেলের জীবনে শান্তি দেয়, যেন সুখ দেয় তবে বড় ভাল মেয়ে, শান্ত মেয়ে। ওর মা ওকে নিয়ে যাবেন বলেছেন, কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে থাকব কি ক'রে তাই ভাবছি।

যাবার সময় মা আনন্দ আর ওর বৌ দুজনকেই কাপড় দিলেন। সুধা বুঝলে এই সম্মানে আনন্দ অত্যধিক খুশী হয়েছে।

পরীক্ষার ফল বের হল।

ফলটা আশ্চর্য হয়েছে। সুধা জেলার মধ্যে সেকেণ্ড হয়ে বৃত্তি পেয়েছে, আর আনন্দ বৃত্তিই পায় নেই। খবরটা শুনে সুধার বাবা যে অমন গম্ভীর মানুষ তিনি পর্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—একদিন আমার বন্ধুবান্ধব সবাইকে খাইয়ে দিতে হবে। তারপরই তিনি পঞ্জিকা নিয়ে সুধার জেলার সদর সহরে স্কুলে ভর্তি হবার দিন দেখতে বসেছিলেন। সেদিন সুধা

আর বাড়ী থেকে বের হয়নি। আশ্চর্য, সেদিন এত আনন্দের মাঝখানে আনন্দের নাম একবারও মনে হয়নি। এমনকি আনন্দ বৃত্তি না পাওয়াতে বোধহয় তাদের পরিবারে আনন্দটা আরও বেশী হয়েছিল।

বিকেল বেলা যথানিয়মে বাইরে থেকে ডাক এল—সুধা।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। আনন্দ এসেছে। মন থেকে না হোক, একটা বিরক্তি আর অপ্রস্তুত বোধে ওর সারা মুখ ভরে গেল। আজ তো আনন্দ না এলেও পারত! সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর জন্যে দুঃখ হল, মায়া হল। সে ম্লান মুখে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, কিন্তু আনন্দের মুখে তার কোন ছায়া পড়ে নেই। অভিমানী দুর্যোধনের মত মানুষ। অথচ তার মুখে সমান হাসি রয়েছে, কেবল হাসিটা একটু ম্লান বলে মনে হল সুধার।

সুধা খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে রাস্তায় নেমে এল। আজ আনন্দ এসে ওর হাত ধরলে। অল্প হেসে বললে—চল, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

সদ্য-আবিস্কৃত সেই সঙ্কেত স্থান। বালির উপর বসল দুজনে। সুধা চুপ করেই আছে, কি বলবে সে! আজ তার কিছুই বলার নেই!

আনন্দই তাকে বললে—কি রে, কথা বলছিস না যে! কি ব্যাপার! কথা বল। কোথায় তুই আমাকে সান্ত্বনা দিবি না তুই মুখ গুঁজে বসে আছিস! বলেই বললে—তোর অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি রে!

সুধার কথা বলার রাস্তা আনন্দই করে দিলে। সুধা বললে—ভারী দুঃখ হচ্ছে আনন্দ। আমি বৃত্তি পেলাম আর তুই পেলি না এটা একটা আজগুবী কথা বলে মনে হচ্ছে। শুধু দুঃখ নয়, এর জন্যে যেন কেমন লজ্জা লাগছে। আরও কি জানিস—সব চেয়ে দুঃখ এই যে আর বোধহয় আমাদের একসঙ্গে পড়া হবে না।

এইবার আনন্দ বেশ একটু জোরে হেসে উঠল, বললে—বোধহয় বলছিস কেন, নিশ্চয়ই। বৃত্তি পেলাম না, স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে পাব না। তা'হলে পড়া হবে কি ক'রে? কথাটা বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল আনন্দ মাটির দিকে চেয়ে, তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—জানিস, আজ যখন শুনলাম প্রথম খবরটা তখন সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রথমটা তো বিশ্বাসই করি নি। তারপর বাবা যখন কাছারী থেকে দুপুরবেলা বাড়ী এল দেখলাম আমার যে বাবা কখনও আমার উপর রাগ

পর্যন্ত করে না তারও মুখ ভার। কী ব্যাপার! না, হেডমাস্টার নরনাথবাবুদের ওখানে এসেছিলেন, তিনি বাবাকে বলেছেন তাঁর ছেলে বৃত্তি পায় নি। পেয়েছে এক মাত্র সুধা। বাবা আমার ভবিষ্যত ভেবে আকুল হয়েছেন দেখলাম। রাগ হল, তোর ওপর রাগ হল। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম চুপচাপ। হঠাৎ শুনলাম মা বারান্দায় বলছেন বাবাকে—তখনই বললাম তোমাকে, এখন বিয়ে দিয়ো না, পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তা তুমি মানলে না। আর তেমনি অপয়া বৌ! কথাটা শুনে জানিস, ভারী কষ্ট হ'ল। চারদিকে তাকালাম। দেখলাম ঘরের ভেতর দেওয়ালের সঙ্গে লেগে হিলু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দশ বছর বয়স হলে কি হয়, ওর বুদ্ধি খুব। দেখলাম কথাটা ওর মনে বড় বেজেছে। মাথার ঘোমটা খসে গিয়েছে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গিয়ে তার থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমার কান্না আসে না, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার চোখ দিয়ে জল এল। কাঁদলাম কিছুক্ষণ। সেটা আর হিলু দেখতে পেলে না। সে চোখের জল মুছে তখন বেরিয়ে গিয়েছে। কেঁদে মনটা বেশ হাল্কা হল। ভাবলাম—তোর কাছে আসি। এমন সময় দেখলাম—হিলুই আবার ঢুকল ঘরে। বললে—কোথায় যাচ্ছ? বললাম—এই একবার সুধার কাছ থেকে আসি।

—না, এখন যেও না। বিকেলে যাবে যেমন যাও প্রতিদিন।

—আচ্ছা। কিন্তু তোমার মন খারাপ হয়নি আমি বৃত্তি না পাওয়ায়? রাগ হচ্ছে না আমার উপর?

হিলু একটু হাসলে, হেসে মাথা নাড়লে, পাছে আমি না বুঝি তাই মুখেও বললে—না, একেবারে না।

দুঃখ ওর খুব হয়েছে। কিন্তু পাছে আমি কষ্ট পাই সেই ভেবে মিথ্যে কথাটা বললে। তাই একটু খোঁচা দিলাম, বললাম—কেন? দুঃখ লাগছে না কেন?

ও কোন জবাব দিলে না, কেবল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আমার হাসি লাগল ওর হাসি দেখে। কিন্তু ওর হাসির মানেটা বুঝলাম না। হাসতে হাসতেই বললাম—জবাব দিচ্ছ না যে।

—ও কি জবাব দিলে জানিস? বললে—কি জবাব দোব? তুমি কিছুই বুঝতে পার না, তুমি বোকা।

—আমি বোকা ?

—বোকা নয়ত কি ? বৃত্তি পেলে তো তোমাকে ক'দিন পরেই পড়তে চলে যেতে হত। আমার কাছে ত আর থাকতে না! এখন আমার কাছেই থাকবে। কথাটা বলে ওর বোধ হয় লজ্জা লাগল, জানিস! কথাটা শেষ করেই একেবারে ছুটে পালাল ঘর থেকে।

কথাটা শেষ ক'রে আনন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল মাটির দিকে চেয়ে। তারপর বললে—এ ভালই হয়েছে জানিস। তা না হ'লে আমাকে তো ওকে ছেড়ে চলে যেতে হত।

কথাটা শুনে সুধার মনে এক সঙ্গে নানান বোধ আর চিন্তা এক সঙ্গে ভীড় করে এল। সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে আনন্দর কথা শুনে। সেই আত্মাভিমানী, উচ্চাকাঙ্খী, অহঙ্কারী আনন্দ! তার অভিমান কোথায় গেল? তার অসম্ভব-প্রত্যাশা ও তৃষ্ণা কি ক'রে মিটল! সে এমন নরম হ'ল কি ক'রে?

আশ্চর্য হয়ে সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্যে হাসলে কিছুক্ষণ। হাসতে হাসতে বললে—বলিস কি আনু! এত ভাব হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে? তোর ভাগ্যি খুব ভাল ভাই!

আনন্দ কিন্তু হাসল না। এক সুগভীর পূর্ণতায় সে যেন টলমল করছে। সে গভীরভাবে বললে—তুই ঠিক কথা বলেছিস। আমার ভাগ্য খুব ভাল। বৃত্তি পাইনি, এ ভালই হয়েছে। তার জন্যে কোন দুঃখ নেই আর।

সুধা বুঝলে, কথাটা সত্যি। আর বানানো সান্ত্বনার কথাও নয়, কিম্বা আত্মপ্রবঞ্চনার কথাও নয়, এটা একেবারে আনন্দর মনের কথা। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন ওর মনে এল, সে প্রশ্ন করলে—এর পর তুই কি করবি ভাই? আর পড়বি না যখন তখন একটা কিছু তো করতে হবে!

আনন্দর কণ্ঠের গভীরতা তখনও সমানই আছে, সে বললে—বন্ধু না হ'লে এ কথা বলে কে! ঠিক কথা জিজ্ঞাসা করেছিস। কাল থেকে বাবাও এই কথা ভাবছে! আমিও ভেবেছি, এখনও ভাবছি। এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। তা এতে আর ভাবনার কি আছে? একটা কিছু করলেই হবে। টাকা রোজগার নিয়ে তো কথা। ও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

এবার সুধা একটু অবাক হ'ল। আনন্দ বলে কি? বিশ্ব সংসারের মানুষ যার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও কোন কিছুর কূল কিনারা করতে পারে না তারই কথায় আনু অবহেলা করে বলছে—করা যাবে একটা কিছু! তবে এ আনন্দেরই উপযুক্ত কথা! সব কিছু অত্যন্ত সহজে সে করতে পারে বলে তার বিশ্বাস।

এ ধরণের কথা শুনতে কার ভাল লাগে! বিশ্ব সংসারের যে কোন কাজ না কি সে অত্যন্ত সহজে করতে পারে। একটু খোঁচা দেবার জন্য সে নিরীহভাবে বললে—কিছু ঠিক করেছিস, কি করবি?

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বললে—বাবা তো অনেক কষ্টে সংসার চালায়। কষ্ট করাই স্বভাব হয়ে গিয়েছে। উপর দিকে তাকাবার ক্ষমতা বাবার নাই। আমার পরীক্ষা খারাপের খবর শুনেই বাবা তো বুঝে নিয়েছে আমার আর পড়া হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে মঙ্গল দত্ত'র দোকানে দত্তকে বলে আমার খাতা লেখার চাকরীর ব্যবস্থাও করে এসেছে। কথাটা এখনও আমাকে বলে নি। বাবা মাকে বলছিল, আমি শুনলাম। আমি এখনও কিছু বলি নি। আমাকে নিজে মুখে বললেই আমি জবাব দেব। ওসব আমি করব না, পরের তাঁবেদারী করা আমার পোষাবে না।

মনে মনে বিরক্তি বাড়ছে সুধার। সে এবার একটু কণ্টকিত প্রশ্ন করলে—চাকরি যদি না করবি তো কি করবি?

সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে আনন্দ জবাব দিলে—যাই হোক একটা কিছু করব। তবে চাকরী করব না, পরের তাঁবেদারী করব না এটা ঠিক। আর—তার গলায় আশ্চর্য প্রত্যয়ের সুর এল—তুই দেখিস সুধা, তোকে বলে রাখলাম টাকা আমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে।

আশ্চর্য দম্ভ! আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়! তার ভাগ্যে যা হবে, তারই হবে। সুধার বিরক্তি লাগছে। তবু বিরক্তি চেপে সে বললে—চল, ওঠ, সন্ধ্যে হয়ে এল।

সহজ, হাল্কা, নিরুদ্বেগ কণ্ঠে আনন্দ বললে—চল। সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে গেল। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। অথচ হিলুকে বলে এসেছিলাম সন্ধ্যের আগেই ফিরব। জানিস ওর খুব ভয় হয়েছে আমার পরীক্ষার খবর শুনে। আমার মা কি খুব মন খারাপ হয়েছে। কে জানে যদি আমি গলায়

দড়ি-টড়ি দিই। তাই বলেছে সকাল সকাল ফিরতে। বলতে বলতে সে হা করে হাসতে লাগল। সহজ, উচ্চ, অকুণ্ঠ হাসি। সন্ধ্যার অন্ধকার সেই সহজ সবল অকুণ্ঠ হাসিতে শিউরে উঠল বার বার।

তারপর হাসি থামিয়ে বন্ধুকে বললে—জানিস, হিলু এখনও আমাকে ঠিক বুঝতে পারে না!

আরও কিছুদিন গেল।

বাবা পঞ্জিকা দেখলেন, দশবার দশরকম উপদেশ দিলেন গম্ভীর কণ্ঠে। গভীর আশ্বাস নিয়ে ওর ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে আশীর্বাদ করলেন, চোখের জল ফেললেন খানিকটা দুঃখে, খানিকটা সুখে। জেলার বড় স্কুলে ভর্তি হবার দিন এসে পড়েছে।

যাবার দিন সকালে একবার আনন্দর বাড়ী' গেল সুধা ওর সঙ্গে দেখা করতে। আনন্দও নেই, আনন্দের বাবাও নেই বাড়ীতে। আনন্দর মা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলে—আনু কৈ?

—আনু তো কাজ করতে গিয়েছে বাবা! মঙ্গল দত্তর দোকানে কাল থেকে খাতা লেখার কাজে লেগেছে।

—ওঃ। অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল সে। তারপর তাঁকে প্রণাম করে বললে—আমি আজ ভর্তি হতে চললাম সহরে।

উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করলেন আনন্দর মা—বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘায়ু হও, অনেক লেখাপড়া হোক, সোনার দোয়াত-কলম হোক। তোমার লেখাপড়া হবে না তো কার হবে বাবা! ভাল বংশের ছেলে, পুণ্যবান বাপ-মায়ের ছেলে তুমি। আর এই দেখ বাবা, আমাদের কপাল। আস্তকুড়ের পাতা কি স্বর্গে যায়! শেষের কথায় ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর হতাশাও ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

অকারণে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সুধা। সে বললে—আমি যাই তা'হলে। আনুকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

—নিশ্চয় বলব বাবা। এস। অনেক উন্নতি হোক।

বেরিয়ে এসে হঠাৎ অকারণে পিছন ফিরতেই নজর পড়ল জানলায় দাঁড়িয়ে আছে হিলু। মাথায় ঘোমটা নেই, অপুরন্ত সুডৌল মুখখানির মধ্যে

দুটি আয়ত বড় বড় চোখে গভীর দৃষ্টি, তারই দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে চোখ পড়তেই বড় বড় চোখের দৃষ্টি আরও বিস্ফারিত হ'ল মুহূর্তের জন্য, তার পরই সরে গেল।

গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে সুধার মনে হ'ল আনুর কথা। আনুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, অথচ গ্রাম পার হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা গেল আনুকে। রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়েছিল তারই অপেক্ষায়। বাবাকে বলে গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর পিছনে হাঁটতে লাগল আনুর সঙ্গে।

আনু বললে—চললি। ভাল করে পড়াশুনো করবি। মান রাখতে হবে, লেখাপড়া শিখে দেশবিদেশে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। আমার দ্বারা তো আর হ'ল না, তুই-ই করবি। শেষের কথাগুলো বলে একটু হাসল সে। তারপর খানিকটা কৈফিয়তের সুরেই বললে—জানিস মঙ্গল দত্তর দোকানেই চাকরী নিলাম। ছিলু বললে বার বার করে। যতদিন কিছু না করতে পারছি ততদিন মন্দ কি! আচ্ছা ওঠ গাড়ীতে। দেরী হয়ে যাবে।

আবার একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসল আনন্দ।

আবার আনন্দের সঙ্গে দেখা হ'ল বেশ কিছুদিন পর। গরমের ছুটিতে বাড়ী এসে।

সুধা ভালই জানে সে নিজে গিয়ে দেখা না করলে আনন্দর সঙ্গে দেখা হবে না। সে আসবে না আগে। বিকেল বেলা আনন্দর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—আনন্দ, আনু, আছিস?

ভিতর থেকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাড়া এল—আয়রে আয়। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। আয়, চলে আয়।

বাড়ীতে ঢুকবার আগেই তার জন্য আসন পেতে দেওয়া হয়েছে। কে পেতেছে সেটা বুঝতে বাকী থাকল না সুধার। আনন্দ হাত মুখ ধুচ্ছিল। বললে—এই এখুনি এলাম ভাই তাঁবেদারী করে। বস ভাই একটু, আমি কিছু খানিকটা খেয়ে নিই।

—তোর মা কোথায় আনু?

—মা? মা বোধ হয় ঘাটের দিকে গিয়েছে। কি জানি?

সুধা মনে মনে একটু বিরক্ত হল। বৌ নিয়েই গেল আনন্দ। ঐ তো হিলু-বৌ মাথায় মস্ত ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে আসছে। বোধ হয় আনন্দর খাবার যোগাড় করে বেড়াচ্ছে। আনন্দর সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু দেখতে পেলে সুধা তাতে বুঝতে পারলে এই ক'মাসের মধ্যেই ওর শরীর সেরেছে বেশ। যেন ছোট ছিল, হঠাৎ বড় হয়ে গিয়েছে।

এরই ভেতর আনন্দর কাছে ও খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। অতি সামন্য আয়োজন, কিন্তু কি পরিপাটি আর যত্ন! প্রতিটি কাজের মধ্যে উচ্ছ্বসিত আদর মাখানো রয়েছে। তেল মেখে মুড়ি দিয়েছে একেবারে নৈবেদ্যের মত চুড় করে, একটি পিতলের রেকাবীতে একদিকে ভিজে ছোলা, একদিকে একটু আদার কুচি, একটি কাঁচা লঙ্কা, এক জায়গায় একটু নুন, একপাশে একটু গুড়ের পাটালি। কত সামান্য কিন্তু কত পরিচ্ছন্ন সুন্দর আয়োজন! মনে মনে হিংসা হতে লাগল সুধার। সে বুঝতে পারলে আনন্দ কোন্ বাঁধনে—পাকে পাকে বাঁধা পড়েছে। অহঙ্কারী আনন্দ প্রতি মুহূর্তে দেবতার মত মনোযোগ আর সম্মান পেয়ে গলে যাচ্ছে।

সে আনন্দর খাবার আয়োজন দেখছিল মুগ্ধ বিস্ময়ে। ওরই মধ্যে সে হিলু-বৌএর মনখানি দেখতে পাচ্ছিল যেন। অকস্মাৎ একখানি শাঁখা আর সামান্য একগাছি রুলি-পরা নিটোল একখানি হাত ওর সামনে একখানি রেকাবী আর একগ্লাস জল নামিয়ে দিলে। রেকাবীতে দুটি মণ্ডা।

আনন্দ খেতে খেতে একটু হাসি টেনে বললে—খা।

কোন কথা না বলে সুধা খেতে আরম্ভ করলে।

বেড়াতে বেরিয়ে কথায় কথায় সুধা বুঝতে পারলে আনন্দ যেন কেমন একটু মনমরা হয়ে আছে। সে দীর্ঘদিন দেখছে আনন্দকে। সে বুঝতে পারলে। তার নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, সহরের সংস্কৃতির যে পরিচ্ছন্নতার ছাপ তার পরিচ্ছদে আর চেহারায় লেগেছে সেটার জন্যেই হয়তো ব্যথা লাগছে আনন্দের মনে। হয়তো খতিয়ে দেখছে ও, কতখানি বেড়ে উঠেছে সে। পরীক্ষায় বৃত্তি পেলে সেও তো এমনি হতে পারত। সুধা সাবধান হয়ে গেল। বাইরের পোষাক আর চেহারাটার পরিবর্তন পর্যন্তই আনন্দ দেখুক। তার বেশী নয়। নূতন শিক্ষার যে রঙ তার মনে ধরছে তা আর

ওকে দেখিয়ে কাজ নেই। তাতে ওর বেদনা বাড়বে বই কমবে না। ওর কথা জিজ্ঞাসা করেই ওকে ব্যাপৃত রাখতে হবে।

সে জিজ্ঞাস্য করলে—কেমন আছিস রে বলত ?

একটু হাসল আনন্দ, বললে—কেমন আর থাকব ! বেশ আছি।

এবার গম্ভীরভাবে সুধা বলবে—তুই তো তাই কখনও বেশ থাকিস না। হয় ভাল থাকিস নয় খারাপ থাকিস, মাঝামাঝি তো তোর পোষায় না।

এবার খানিকটা হা হা করে হাসল আনন্দ, তারপর বললে—তা যা বলেছিস। মাঝামাঝি থাকতে আমার ভাল লাগে না। জানিস, জিজ্ঞাসা করলি যখন তখন বলি। একদিক দিয়ে খুব ভাল আছি ; আর একদিক দিয়ে খারাপ আছি !

—মানে ?

—বলি দাঁড়া। মানেটা তোকে বলব বই কি। সব দিক দিয়েই খারাপ আছি। আর ভাল লাগছে না, সহ্য করতে পারছি না এমনি ভাবে বেঁচে থাকা। সকাল থেকে দুপুর, আবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত মঙ্গল দত্তর দোকানে খাতা লেখা, আর তার মন জুগিয়ে চলা এ আর সহ্য হচ্ছে না। মাসে পনর টাকা মাইনে। আজ সাত মাস কাজ করছি, টাকাটা ঠিক সময় মত পেয়েছি। একশো টাকার ওপর পেয়েছি। বাবা ভেবেছিল মাস গেলে ঐ পনরটা টাকা আয় বাড়বে। সংসারের দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। বাবাকে দিই নি। সংসারের অভাব দেখেও দিই নি। টাকা না দেওয়াতে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছে। তবে আমাকে মুখ ফুটে কিছু বলে নি। বাবা-মায়ের বোধ হয় ধারণা হয়েছে আমি নিজে টাকা জমিয়ে হিলু-বৌকে গয়না গড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। ওরা মনে কষ্ট পাচ্ছে চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করব ! জানিস, আমি নিজে ওর থেকে একটা পয়সা খরচ করা দূরের কথা হিলুকে পর্যন্ত একটা পয়সা দিই নি। আর মাস ছয়েক কাজ করলেই আরও শত খানেক টাকা জমবে। তখন ঐ শ দুয়েক টাকা নিয়ে ব্যবসা করব।

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে চুপ ক'রে গেল আনন্দ। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললে, জানিস এত কষ্টের মধ্যেও আমার একমাত্র সান্ত্বনা আর আনন্দ কি ? হিলুকে সব বলি, একমাত্র সেই বোঝে। না বললেও

মনের কথা ও ঠিক বুঝতে পারে। আমি যখন কথা বলি তখন বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমার কথাগুলো গেলে যেন তখন। তারপর আমার কথা দিয়েই আমাকেই আবার সহজ করে বুঝিয়ে দেয়। আমার সমস্ত কষ্ট সহ্য হয় কেবল ওর জন্যে। নইলে কবে সব ফেলে পালিয়ে যেতাম। ওর মুখ চেয়েই সব সহ্য করি, আর ও আছে বলেই সব সহ্য করতে পারি। বলে সে থেমে গেল। চুপ করে থাকল।

সুধা বুঝলে—ও আপনার মনের মধ্যে দুঃসহ এক ক্লেশের রাজ্যে ওর একমাত্র সম্বনা আর সঙ্গী হিলু-বৌয়ের হাত ধরে তার চোখের সহানুভূতি আর মুখের হাসিকে সম্বল করে পথ চলেছে। আনন্দর মনের বল তো কমেই নি; জীবনের গভীরে আরও কঠিন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। জীবনে কষ্টের উত্তাপে শুকিয়ে যাবার ছেলে সে নয়।

দুজনেই বাড়ী ফিরল, পথে কেউ আর কারো সঙ্গে কথা বললে না।

আবার পরের দিন। অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। তখন বোধ হয় বেলা দশটা। আনন্দ ওকে ডাকছে বাইরে থেকে—সুধা আছিস। সুধা।

ছুটে বেরিয়ে এল সুধা। কি ব্যাপার! আনন্দ তো কখনও একটার বেশী ডাকে না কোনদিন। আজ একেবারে ডাকের পর ডাক।—কি রে আনন্দ?

আনন্দর মুখে উত্তেজনা! সে বললে—আয়, নেমে আয়। কথা আছে।

রাস্তায় নেমে এল সুধা। ওর হাতখানা ধরে একটা চাপ দিয়ে বললে—আজ কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম মঙ্গল দত্তর দোকানে।

কেমন চমক লাগল সুধার। বৃত্তি পেয়ে সহরের স্কুলে পড়তে যাওয়ার চেয়ে এ যেন অনেক অনেক কঠিন কাজ বলে মনে হল তার। নিজের দৈনন্দির জীবনের বৃত্তকে ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে যাওয়া তো সোজা কাজ নয়, এ কথা সে বাবার কাছেই শুনেছে। সে অবাক হয়ে বললে—চাকরী ছেড়ে দিলি? এখনই তবে যে আমাকে কাল বললি আরও মাস কয়েক কাজ করবি।

—আরও মাস কয়েক কাজ করলে আরও কিছু টাকা জমত ঠিক কথা। কিন্তু আর পারলাম না। ঝগড়া হয়ে গেল। আর আমার

হাতে যা আছে ওতেই দিব্যি কাজ আরম্ভ করা যাবে। সে সব আমি আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি। আয়, এখন আমার সঙ্গে আয় দিকি।

—ঝগড়া হল কেন?

আনন্দ উত্তেজিত হয়েছে, তার সঙ্গে কেমন উৎসাহিতও হয়েছে যেন। সুধার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতেই বললে—মনে আছে সুধা, তোকে আমি কতদিন বলেছি আগে যে, আমার কারও তাঁবেদারী ভাল লাগে না, তাতে আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরেও যদি যাই তাতেও না। এই যে মঙ্গল দত্ত'র দোকানে ছ' সাত মাস কাজ করেছি এতে একদিনও আমার মনে সুখ ছিল না। আজ ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি।

—তা হঠাৎ আজকেই ছাড়তে গেলি কেন? সুধা ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—আরে মুস্কিল, যেদিনই ছাঁড়ব সেইদিনই তো হঠাৎ হবে রে বাপু। একটু যেন চটে গেল আনন্দ। আনন্দ'র চটে যাওয়া থেকেই মনে হ'ল যে আজকেই কাজ ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে গতকাল ওর নিজের সহর থেকে ফিরে আসার যেন কোন একটা যোগাযোগ আছে। কিন্তু সে কথা যাক। আনন্দ তখন আবার বলতে আরম্ভ করেছে—মন আমার প্রতিদিন হাঁপিয়ে উঠেছিল, আর পারছিলাম না। আজ ছুতোনাতা করে চাকরীটা ছেড়ে এলাম। বিজয়ীর ভঙ্গিতে খানিকটা হাসল সে।

—কিন্তু জানিস, দত্ত বেটা কতকগুলো খারাপ খারাপ কথা শুনিয়ে দিলে। একটু আফশোষের সুর ওর গলায়।

—তা ঝগড়া করতে গেলে, বিশেষ করে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে গেলে তো ভাই শুনতেই হবে দুটো খারাপ কথা। সান্ত্বনার সুরে বললে সুধা।

আনন্দ চটে উঠল—গায়ে পড়ে? মানে? দত্ত আমাকে কি বললে জানিস? ব্যাপারটা শোন না।—হল কি জানিস? এক পাইকিরী খদ্দের এসেছে দোকানে। সে আসবামাত্র তাকে তো প্রচণ্ড আদর-আপ্যায়ন —আসুন, আসুন, ঘোষ মশাই। বহুদিন পর এলেন। শুনে তো আমার হাসি আসছিল। কথার মানে তো বুঝলি? 'অনেকদিন আপনি আমার দোকানে আসিয়া জিনিষপত্র যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করিয়া আমাকে লাভ করিবার অর্থাৎ আপনার গাঁট কাটিবার অধিকার দেন নাই। আজ আপনি

আসিয়া আপনার পকেট কাটিবার নিমিত্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন সেজন্ত আপনাকে ধন্তবাদ। আজ আমার সুপ্রভাত। আজ আবার আপনার পকেট কাটিতে পাইব।' আনন্দ হাসতে লাগল পরমানন্দে। তার ব্যাখ্যা শুনে সুধাও হাসতে লাগল।

হাসতে হাসতেই আনন্দ বলতে লাগল—আমি অবশ্য তখন হাসি নি। যাই হোক আদর করে আপনার পাশেই চাদরের খানিকটা জায়গা দু হাত দিয়ে ঝেড়ে দত্ত বললে—বসুন। যাক বাড়ীর সব কুশল ?

ঘোষ মশায়ের হাত জোড় হল, এতক্ষণে তিনি কথা বলার সুযোগ পেলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন—আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে সব ভাল।

—বেশ। এর পরই দত্ত মশায়ের হঠাৎ খেয়াল হ'ল তামাক দেওয়ার কথা। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—কোথা গেলি রে! ঘোষ মশাই এসেছে। তামাক দিয়ে যা। ভাল করে তামাক সাজিস রে! এর পরই আসল কথা পাড়লে দত্ত—ব্যবসার অবস্থা কেমন !

—ভাল, ভাল, আপনার আশীর্বাদে চলছে ভাল।

আমার তখন হাসি চেপে রাখা দায়। দেখছি দুটো ভণ্ড মানুষ কেমন পরস্পরের সঙ্গে বিনয়ের পাল্লা দিচ্ছে। হঠাৎ আবার দত্তর তামাকের কথা খেয়াল হয়েছে। বললে—আরে চাকরটা গেল কোথায়? ওজনদার হাজারই বা কোথা গেল? ঘোষ মশাইকে তামাক দিতে বললাম! চারিদিকে কাউকে না পেয়ে আমাকে বললে, অবিশ্যি কাজটা আমার নয়, আমাকে বলাটা অন্যায় এই বুঝেই বললে—বাবা লক্ষ্মীটি, ও আনন্দ, ঘোষ মশাইকে এক কলকে তামাক সেবা করাও। যাও বাবা।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, জবাব দিলাম না। ওদিকে দত্তও চটেছে তখন, বললে—ওহে ও ছোকরা, বললাম না এক কলকে তামাক সেজে আনতে !

কলমটা আস্তে আস্তে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম, ঠাণ্ডা গলায় বললাম—আপনার চাকর-বাকর কাউকে বলুন। আমি আপনার চাকর নই।

দত্ত আমার কথা শুনে অবাক হয়ে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। রাগে তার তখন বাক্যরোধ হয়েছে। খানিকটা সামলে নিয়ে ধমকে উঠল হঠাৎ—আরে ম'ল। উত্তর করে দেখ। তুই চাকর নস তো আবার কি?

যা তামাক সেজে নিয়ে আয়। আরে দেমাক দেখ দিকি। খেতে পাচ্ছিলি না। তোর বাপ এসে হাতে পায়ে ধরে বললে, আমাকে বাঁচান। ছেলেটার তো আর লেখাপড়া হল না। বিয়ে করেই উচ্ছন্নে গেল। এখন না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, আপনি একটা চাকরী-বাকরী দেন। চাকরী দিলাম দয়া করে। এখন খেতে পেয়ে তেল বেঁধেছে দেখছি। ভাল রে ভাল।

কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আরও। বললাম—দেখ টেঁকো বুড়ো, তুমি চেঁচিও না বেশী। এই হুঁকো তুলে তোমার টাকের উপর মেরে টাক ফাটিয়ে দোব। তোমার কাজ থাকল, আমি চললাম। বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হাসতে লাগল আনন্দ। কিন্তু মনে মনে খুব খারাপ লাগল সুধার। গ্রামের বয়স্ক, প্রবীণ, সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মঙ্গল দত্ত। তাকে এইভাবে কুৎসিত অপমান করা কোন মতেই উচিত হয় নি আনন্দর। কিন্তু সে কথা বললে এখনি বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে যাবে!

আনন্দর বর্ণনা তখনও শেষ হয় নি। সে বলতে লাগল—জানিস দত্ত রাগে পাগল হয়ে গেল, বললে—বেরো, বেরো দোকান থেকে।

আমি বলে এলাম—চললাম। কিন্তু মনে থাকে যেন। আমি এর একদিন শোধ নোব।

দত্ত রাগে একেবারে পাগল হয়ে গেল বুঝলি। আমাকে সে ভ্যাঙাতে লাগল পিছন থেকে। বুঝলি আমি প্রায় পালিয়ে এলাম। আমার ভয় হল পাছে আমাকে মারধোর করে।

সুধাও কেমন ক্লিষ্ট বোধ করছিল তার কথা শুনে। একজন প্রবীন গম্ভীর-প্রকৃতি মানুষ কতখানি অপমানিত হলে এই রকমভাবে নিজের পারি-পার্শ্বিককে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এমনি বর্বর উন্মাদের মত ব্যবহার করতে পারে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুধা। কিছু বললে না। আনন্দ তখনও বিজয়ীর মত হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—কিন্তু দত্ত আমাকে যে অপমান করলে তা আমি ভুলব না, এ তুই জেনে রাখিস সুধা। দিন আমারও একদিন আসবেই। সেদিন আমি ওকে দেখব।

সুধা ওকে বর্তমান মুহূর্ত সম্বন্ধে সচেতন করে দিলে, বললে—এখন আমাকে নিয়ে চললি কোথায়?

—কোথায় আবার, বেড়াতে। আজ আমার ছুটি। এখনও হিলুকে বলা হয়নি সব। কাল থেকে আবার নতুন করে সব আরম্ভ করতে হবে।

—কি আরম্ভ করবি?

—ব্যবসা। কাপড় আর গামছার ব্যবসা। মাথার ভেতর সব ঠিক করে রেখেছি। জিনিষ কাল কিনে আনব। পরশু থেকে দোকান আরম্ভ করব। ঘর সুদ্ধ ভাড়া করে রেখেছি কাল রাত্রে।

আশ্চর্য হয়ে গেল সুধা।—বলিস কি? কিন্তু পরশু ভাল দিন? একটা ভাল দিন দেখে আরম্ভ করবি তো?

—দিন টিন আমি মানি না। চল চল বেড়িয়ে আসি। ওসব তো আছেই। পরে হবে।

দুজনে আবার পথ ধরল। সুধার মন আনন্দর চরিত্রের এই কঠিন ও বিচিত্র প্রকাশে কেমন হয়ে গিয়েছে যেন। ওর কিছু ভাল লাগছে না। আর আনন্দ পরমানন্দে লঘুমনে ওরই পাশে চলতে চলতে নূতন কর্মারম্ভের কল্পনায় মশগুল হয়ে আছে।

কিন্তু আকস্মিকভাবে রাস্তাতেই তারা নূতন বিপদের সামনে পড়ে গেল।

নরনাথবাবুদের বৈঠকখানার সামনে দিয়েই যেতে হয়। সদর রাস্তার ধারেই পড়ে। বৈঠকখানার একপাশে দুখানা ঘরে জমিদারী সেরেস্তার কাছারী। সেখানে বেশ নিরিবিলি বসে কাজ করেন আনন্দর বাবা রাম মুখুজ্জে। বৈঠকখানার সামনে ভারী ভারী গড়নের ক'খানা চেয়ার আর বেঞ্চি পড়ে থাকে। কর্তাদের আড্ডা জমাবার সময় অসময় কিছু নেই। অনন্ত অবসর। আজ চেয়ারে কেবল একা বসে তামাক খাচ্ছেন নরনাথবাবু। বোধ হয় কথা বলার লোকের অভাব হয়েছে, তাই ওরা সামনে দিয়ে যেতেই তিনি ডাকলেন—কিহে সুধাকান্তবাবু, শোন, শোন।

আকস্মিক ভাবে সচকিত হয়ে সুধা সপ্রতিভ হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সর্ব প্রথম প্রণাম করলে তারপর মুখে হাসি টেনে শ্রদ্ধার ভাব যথাসম্ভব ফুটিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তবু কিছু খানিকটা খোঁচা দিলেন নরনাথ বাবু, বললেন—তুমি আমাদের ভট্‌চাজ মশায়ের ছেলে, কত বড় বংশে জন্ম তোমার, তুমি কোথায় নিজে থেকে এসে সম্ভাষণ

করবে, তা না—তুমি আমাকে দেখেও চলে যাচ্ছিলে বাবা। বংশের বিনয় শ্রদ্ধা এগুলো ভুলো না বাবা।

সুধা অপ্রস্তুত হয়ে বললে—আজ্ঞে আমি ভেবেছিলাম আপনি ব্যস্ত আছেন।

হা হা করে হেসে উঠলেন নরনাথ বাবু, সহজ রহস্যের সুরে বললেন—ওরে চালাক, আমি ব্যস্ত ছিলাম কোথায়। একা বসে বসে তামাক টানছি। এর চেয়ে আলসে হয়ে কি থাকতে পারে কেউ?

সমস্ত আবহাওয়াটা সরস হয়ে উঠেছে। নরনাথ বাবু সহরের গল্প জুড়ে দিলেন। সহরে তাঁর যতজন পরিচিত আছেন তাঁদের কথা বলতে আরম্ভ করলেন ওদের। হাসির শব্দে রাম মুখুজ্জে কাজ ফেলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনিও গল্পে যোগ দিলেন।

আনন্দই কেবল চুপ করে আছে। সে কি বলবে! সে তো আর সহরে পড়তে যাবার সৌভাগ্য করে নি।

অকস্মাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে সেখানে এসে আবির্ভূত হল মঙ্গল দত্ত। সে যেন ছুটে এল কোথা হতে। আনন্দর মুখখানা একবার ছাইএর মত সাদা হয়ে গিয়ে কঠিন শক্ত হয়ে গেল। তার চোখ দুটো তীব্র উজ্জ্বল হয়ে উঠে ঝক ঝক করতে লাগল। চীৎকার করে উঠল দত্ত—এই যে, খুব ভাল হয়েছে। যাদের দরকার তারা সবাই আছে।

তারপর রাম মুখুজ্জের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—তোমার কাছেই এলাম মুখুজ্জে। তোমার কাছে জানতে এসেছি তুমি যেদিন তোমার ছেলের জন্যে আমার হাতে পায়ে ধরেছিলে সেদিন তোমার কি মতলব ছিল? তুমি কি অপমান করবার জন্যে তোমার ছেলেকে আমার কাছে দিয়েছিলে?

কেউ কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। নরনাথ বাবু হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বললেন—ওহে দত্ত, আমি সামনে বসে আছি। তুমি কি দেখতেও পেলে না? না দেখেও দেখলে না? কি ব্যাপার কি?

এবার কান্নায় প্রায় দত্তর গলার স্বর ভেঙে পড়ল—মাপ করবেন হুজুর। দেখেও আপনাকে দেখি নি। আজ দেখবার মত অবস্থা ছিল না মনের। হুজুর এই আপনার পায়ে ধরে বলছি, আপনিই বিচার করুন এর।

—কি ব্যাপারটা বল। শুনি। তোমার রাগটাই তো দেখছি খালি। নরনাথবাবু বেশ গুছিয়ে নিয়ে বসলেন। রাম মুখুজ্জে কিছুই বুঝতে পারেন নি। তিনি প্রায় হতভম্ব হয়ে দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মঙ্গল দত্ত তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে শেষকালে বললে—এখন ঐ তো ওর ছেলে, ষোল সতের বছর বয়স হয়েছে ওর, ঐ দাঁড়িয়ে আছে। করুন, বিচার করুন।

সুধার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে শুধু দর্শক মাত্র। তবু এই কুৎসিত ঘটনার সাক্ষী থাকতেও যেন কেমন অপরাধ বোধ হচ্ছে তার। দত্ত আপনার মত করে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বলে শক্ত হয়ে বসল। নরনাথ বাবু সব শুনে বিচারের জন্য বেশ গুছিয়ে বসলেন যেন। রাম মুখুজ্জের অতিরিক্ত পুত্রস্নেহ আর পুত্রের এই কৃতঘ্নতা তাঁর মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে তুলেছে তারই ক্ষুব্ধ ছবিটা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে।

কেবল আনন্দর মুখখানা আরও কঠিন শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি অস্বাভাবিকরকম প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে একবার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত মানসিক চাপটাকে ঝেড়ে ফেললে, তারপর অতি সংযত গলায় দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—নালিশ করতে এসেছেন, কিন্তু সব সত্যি কথাটা বলবার সাহস নেই আপনার?

আবার ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠল দত্ত—কি, আমি মিথ্যে—

শান্তকণ্ঠে হাত তুলে আনন্দ তাকে বললে—থামুন। চেঁচাবেন না। আপনি বিচার চাইতে এসেছেন। আমি আসি নি। আমি আবার বলছি আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। এখানে সব কথা বলেন নি আপনি। আপনি কোন্ কথা বলেন নি তা আপনিই ভাল জানেন। সে আর আমি বলব না, কারণ আমি তো বিচার চাইতে আসি নি। আপনি কেবল আমার একটা কথার জবাব দিন। আপনি আমাকে কি হিসেবে চাকরী দিয়েছিলেন?

দত্ত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সে আনন্দর ঔদ্ধত্য থেকে অবাক হয়ে গিয়েছে। সে বললে—আরে এ তো ভগবানের অবাক সৃষ্টি দেখি। নিজে দোষ করলে, করে আবার আমার কাছে কৈফিয়ৎ চায়। আরে!

—হ্যাঁ চাইছি। বলুন আপনি।

অসহায়ের মত চারিদিকে তাকিয়ে দত্ত বললে—কেন, তোমাকে খাতা লিখবার জন্যে বহাল করেছিলাম।

—তবে? আমাকে চাকরের কাজ করতে বললে আমি কেন করব? আমার আত্মসম্মান নেই।

এবার অবাক হবার কথা দত্তের, সে বললে—এক কলকে তামাক সেজে দিলে চাকর হয়ে যাবে?

—সেটা তো আপনিই সেজে নিতে পারতেন!

শুধু দত্ত নয়, বয়স্ক মানুষ দুজনেই আনন্দর এই যুক্তি শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। এক কলকে তামাক সেজে দিলে যে চাকর হয় না এ কথাটা যে বুঝবে না, তাকে কি করে বোঝানো যাবে! কিন্তু ওর যুক্তি, বিশেষ করে যুক্তির পিছনে যে কঠিন শক্ত শীতল মন এই কথাগুলি প্রকাশ করছে তাকে বুঝতেই পারছেন না তাঁরা। বিশেষ করে একজন সম্ভ্রান্ত, প্রবীন ব্যক্তিকে অপমান করে মনে সামান্য অনুশোচনাও নেই একজন তরুণের, এইটেই তাঁদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে।

বিচারটা আর নরনাথবাবুকে করতে হল না। রাম মুখুজ্জেই বললেন—আনন্দ, তুমি দত্ত মশায়ের কাছে মাপ চাও।

আনন্দ অবাক হয়ে একটু হাসল, বললে—মাপ? মাপ চাইব কেন?

—যাই হোক। আমি বলছি তুমি মাপ চাও।

অত্যন্ত সহজ হাসি হেসে সে বললে—কেন?

—আমি বলছি। অতি শান্ত রাম মুখুজ্জের মধ্যে তখন সেই সনাতন গোঁয়ার ও জেদী জাগ্রত হয়ে উঠেছে।—আমি বলছি তুমি মাপ চাও। তা না হ'লে কাল তুমি বৌমাকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে।

এক মুহূর্তে যেন ভোজবাজী হয়ে গেল। তার মুখের অতি সহজ সকৌতুক হাসির রোদ এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল; পরমুহূর্তে মুখখানা আসন্ন বর্ষার মেঘের মত থমথমে হয়ে উঠল। সে দত্তর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে বললে, আমার দোষ হয়েছিল দত্ত মশায়, আমাকে মাপ করবেন।

ঘটনার নাটকীয়তায় সকলে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মঙ্গল দত্ত বিগলিত হয়ে গেল। মঙ্গল দত্ত বিগলিত হয়ে বললে—হয়েছে বাবা হয়েছে। আর বলতে হবে না। ছোট ছেলে হাজার হোক। কাল থেকে আবার

কাজে এস। যেমন কাজ করছিলে কর। মাইনে বরং বাড়িয়ে দোব আমি।

—নাঃ। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছি। আপনাকে ভাবতে হবে না তার জন্যে! আয়রে সুধা। সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলে না। সুধার হাত ধরে টেনে রাস্তায় নেমে পড়ল।

পরদিনই সে বাজারে ছোট কাপড়ের দোকান খুলে বসল। কারও কথায় সে ভ্রূক্ষেপ করলে না।

তারপর তিনটে বছর।

সুধা আর আনন্দ দুজনেই জীবনের দুই বিচিত্র রসের আস্বাদন করে পরমানন্দে দুই ভিন্ন সাগরে সাঁতার কাটতে লাগল। সুধা ডুবে গেল লেখাপড়ার মধ্যে। লেখাপড়ার মধ্যেও শিক্ষকদের শাসন, তিরস্কার, পরীক্ষা, নম্বর, একে পুরোপুরি মেনেও যে আনন্দ পাওয়া যায় তার আস্বাদন পেতে আরম্ভ করলে সে। জীবনের স্বাদ ও চোখের দৃষ্টি দুইই যেন ধীরে ধীরে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করতে লাগল তার কাছে। সমস্ত জীবনে যেন কোন্ স্বর্গলোকের এক বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে গিয়েছে। যত দেখে ততই ভাল লাগে।

ছুটিতে বাড়ী আসে। নূতন নূতন মানস-সঙ্গীরা পরমাদরে টিনের তোরঙ্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আসে, তার অবসরের মুহূর্তগুলিতে আনন্দের, বিষাদের, বেদনার, মহৎ শোকের রঙ নিয়ে তার জীবনে ছোপের পর ছোপ লাগায়, বুঝিয়ে দেয় জীবন কত বৃহৎ, কত ভয়ঙ্কর, কত মহৎ।

তবু বাইরের বন্ধুকে সে ভুলে যায় নি। তার নিজের ব্যক্তিগত প্রীতি, ভদ্রতা আর আনন্দের প্রতি তার শ্রদ্ধা, সর্বোপরি এক অদ্ভুত সমীহ তাকে আনন্দকে ভুলতে দেয় নি। শুধু তাই নয়, প্রধানতঃ আনন্দই তাকে ভুলতে দেয় নি। ছুটিতে বাড়ী এলে প্রথমেই সে একবার আনন্দের বাড়ীতে গিয়ে তার বাবা-মাকে প্রণাম করতে যায়। আনন্দ'র মা সস্মিত স্নেহে তাকে আশীর্বাদ জানান, ঘোমটার আড়াল থেকে হিলু-বৌয়ের কৌতুকে তাকে দেখাটা সে দুরু দুরু বুকে উপভোগ করে। তার শুধুমাত্র শাঁখা আর সোনার রুলি-পরা সুগৌর সুকুমার দুখানি হাত তার কাছে যৎসামান্য

কিছু নামিয়ে দিয়ে যায় জলযোগের জন্যে। সে আনন্দের সঙ্গে গল্প করতে করতে তার সদ্ব্যবহার করে।

তার পর দিন থেকে আনন্দ বরাবরের মত তাকে ঠিক বিকেল বেলা এসে ডাকে—সুধা! একটি মাত্র ডাক। সুধা বেরিয়ে আসে।

একটা জিনিষ আশ্চর্য লাগে সুধার। দাম্ভিক আনন্দ আর নিজের কথা বলে না। যেদিন বলে সেদিন বলে কেবল হিলু-বৌয়ের কথা। সথাসম্ভব সচেতন ও সংযত হয়ে বলতে বলতে কোথায় সংযমের বেড়া সে ডিঙিয়ে যায় আপনার অজ্ঞাতে। হিলু-বৌয়ের কথা বলতে বলতে চোখে তার জল আসে, গলা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সেটা বুঝতে পারলেই একটু সামান্য সচেতনতার হাসি হেসে আপনার গদ্‌গদ অবস্থাটা উপভোগ করে, তারপর থেমে যায়।

নিজের ব্যবসার অথবা জীবিকার সম্বন্ধে একটা কথাও কোন দিন বলে না সুধাকে। আজকাল গল্প করে সুধাই। নিজের কথা নয়, নিজের কথা বলা তার কোন দিনের স্বভাব নয়, আর তার নিজের কোন্ কথাই বা আছে! সে আগে যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছে আনন্দকে, তেমনি ধারা গল্প বলে আনন্দকে।

কথাটা তাকে বলেছিল আনন্দই—সুধা, অনেক দিন আগে রামায়ণের আর মহাভারতের গল্প বলা মনে পড়ে? তেমনি ক'রে আবার আরম্ভ কর দেখি। ছুটিতে ছুটিতে যখন আসবি দেশ বিদেশের নানান গল্প বলবি আমাকে। কিছু তো আর জানাও হল না, শেখাও হল না। তোর কাছ থেকে যতটুকু পারি জেনে নিই।

কথাটা শুনে সুধা হেসেছিল, বলেছিল—জানা আর শেখা নাইবা হল, তোমার তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? লোকে জানে আর শেখে কেন? পাবার জন্যে; আর পায় কি মানুষ, আর হয়ই বা কি? মানুষ, হতে চায় ভালমানুষ, আর পেতে চায় ভালবাসা, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাও বলতে পার। তা তুমি কতখানি ভালমানুষ আর কতখানি ভালবাসা পেয়েছ তা আমি জানি। আমার জানা যদি তোমার পছন্দ না হয় হিলু-বৌকে জিজ্ঞাসা ক'র, সে ঠিক জবাব দেবে।

কথাটা শুনে স্থির সকৌতুক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে

ছিল আনন্দ। ওর কৌতুকের আড়ালে যেন একটা গভীরতার ইঙ্গিত আছে। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে একটু মন্থর হাসি হাসল। বললে, তুই তো বেশ চমৎকার সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছিস সুধা! এই কথাই তো আমি অনেকদিন ভেবেছি। কিন্তু তুই কেমন গুছিয়ে বললি। কিন্তু আচ্ছা, তুই কি ভাল বেসেছিস?

খিল খিল করে হেসে উঠল সুধা, বললে—ভাল বাসিনি? বারে—বাবা মা তুই-এদের ভালবাসি তো বটেই। আর তোদের কাছ থেকে আলাদা থেকে তোদের কতটা ভালবাসি সেটা যে অহরহ বুঝতে পারি। ওর বলার আগ্রহ আর আন্তরিকতায় আনন্দর মুখ থেকে যেন একটা ছায়া সরে গেল। সেও লঘু হাসি হাসতে লাগল। কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে—বল, গল্প বল।

একদিন সুধা ওর ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—হ্যাঁরে আনু, সবাই বলছে কি আজকাল জানিস? আনন্দ না কি খুব জোর ব্যবসা চালিয়েছে। দিন দিন বেড়ে উঠছে। হু হু করে বেড়ে উঠছে ওর ব্যবসা। আর দু এক বছরের মধ্যে ও না কি এখানকার সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার হয়ে উঠবে যদি এই ভাবে চলতে পারে সে।

আনন্দ একটু হাসলে, বললে—তা ব্যবসা ভালই চলছে।

সুধা বললে—হ্যাঁ, লোকে আজকাল তোকে খুব হিংসে করে! বলে—দেখ বাপু, কপাল দেখ!

অকস্মাৎ চটে উঠল আনন্দ—কপাল? হিংসুটে নিষ্কর্মা লোকে কি জানবে? জানিস সুধা, এই তুই যখন ছুটিতে বাড়ী আসিস তখন এই বিকেলটা আমার ছুটি। একটা লোক রেখেছি, এই সময় দোকানের কেনা বেচা দেখবে বলেই রেখেছি। শুধুমাত্র এই জন্যে। তা ছাড়া আমার এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আমাকে এত পরিশ্রম আর এত চিন্তা করতে হয় যে হিলু-বৌয়ের সঙ্গে রাত্রে ভাল করে দুটো কথা বলারও শক্তি থাকে না। কথা বলতে বলতে ঘুমে এলিয়ে পড়ি। আমার দোকানের জন্যে আমায় হিলু-বৌকে প্রায় অবহেলা করতে হয়! এতেও লোকে বলবে—কপাল থেকে হয়েছে?

ওর রাগটা কমিয়ে দিলে সুধা—ঐ দেখ আবার কথায় কথায় হিলু-বৌয়ের কথায় এসে গিয়েছিস।

হা হা করে হাসতে লাগল আনন্দ। সুধা ওকে বললে—হাসিস না, হাসিস না, শোন আনন্দ, আমার শেষ কথাটা শোন। তোর কেমন হয়েছে জানিস? তোর শরীর আর মনের একটা ভাগ ছুটে বেড়াচ্ছে, কাজ করছে, ভাবছে, ব্যবসা করছে। কিন্তু তোর ভিতরের মনটি কি করছে জানিস? হাতে একগাছা মালা নিয়ে চোখ বন্ধ করে শুধু জপ করছে, হিলু-বৌ, হিলু-বৌ! আর মনে মনে শুধু ভাবছে হিলু-বৌয়ের মুখখানি।

আনন্দ কোন জবাব দিলে না। চুপ করে থাকল। মনে হল কথাটা ওর মনে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে বললে—বেশ বললি, তবে বড় বাড়িয়ে বললি।

সুধা তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছে। তার পরের বছর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে।

ফাল্গুন মাসের সকাল বেলা। সে পড়তে বসেছে বোর্ডিংয়ে নিজের ঘরে। আজে বাজে বই পড়া আজকাল একেবারে বন্ধ করে দিয়ে পাঠ্য পুস্তকে মন দিতে হয়েছে। পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হবে। স্কলারশিপ পেতে হবে। কলেজে পড়বে। অকস্মাৎ বাবা এসে হাজির। ছেলে মন দিয়ে পড়াশুনো করছে এটা স্বচক্ষে দেখে যেন খুশীই হলেন তিনি। সে কিন্তু তাঁর এই রকম আকস্মিক আসায় চমকে গেল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ভাল করে। তাঁর মুখে কৈ কোথাও কোন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কি দুঃখের কোন চিহ্ন নেই। বরং স্বভাব-গম্ভীর ভারী মুখখানি একটু প্রসন্নই। তবু সে জিজ্ঞাসা করলে উদ্বিগ্নভাবে—আপনি হঠাৎ এ সময়ে এলেন? কোন খবর না দিয়ে? বাড়ীর সব খবর ভাল?

—ভাল। সব ভাল আছে। কিন্তু তোমাকে আজই বাড়ী যেতে হবে।

বাড়ী যেতে হবে? সে অবাক হয়ে গেল। চিন্তিত হল তার চেয়ে বেশী!

বাবা অবশ্য পরমুহূর্তেই চিন্তা দূর করলেন, গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বললেন—তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। আজ দশ তারিখ। চৌদ্দই তোমার বিয়ে। কথাটা শুনবামাত্র সে মাথা নামিয়ে নিলে লজ্জায়।

সে বাবার মুখের দিকে না চেয়েও অনুভব করলে বাবার গম্ভীর মুখ

কোমল হয়ে সেখানে আবছা হাসি ফুটেছে, কণ্ঠস্বরে অতি সূক্ষ্ম স্নেহের কোমলতার খাদ মিশেছে। মনে হল এক পরম সুন্দর রাজ্য তার বাবা জয় ক'রে তার হাতে তুলে দিয়ে যেন সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। আর নিজে খুশী হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন সে কতখানি খুশী হয়েছে। তার নিজের মনে হচ্ছে যে মনের কোণে কল্পনার আলমারীর থাকে থাকে যে লাল আর সোনালী রঙের শিশিগুলি সেগুলি কে যেন এক সঙ্গে উল্টে দিয়ে বিশ্বসংসারের উপর ঢেলে দিয়ে তার সংসারকে লাল আর সোনালীর সোনার রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। বাবা অকস্মাৎ তার মনের উপর লাগাম টানলেন।—তা হ'লে তৈরী হয়ে নাও, জিনিষপত্র তোমার গুছিয়ে নাও। বই পত্তর সব থাকুক। বিছানাও থাকুক। না, বিছানাটা নাও, দরকার হবে। কাপড়-জামা সব ভাল ক'রে দেখে নাও।

বাবা সচরাচর এত কথা বলেন না একসঙ্গে, অন্ততঃ তার সঙ্গে কোন দিন বলেন নি। আজ বাবা কাজের কথা, বাজে কথা, নানান কথা বলছেন। বাবার আজ কথা বলতে ভাল লাগছে। বিশেষ করে তারই, তারই সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। বাবা আবার জিনিষপত্র গোছাবার তাগাদা দিলেন, বললেন—নাও, নাও, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও। চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছি, একেবারে ষ্টেশন থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছি কতগুলো জিনিষপত্র কিনতে। সে স্টেশনে টিকিট করে আমাদের অপেক্ষা করবে। এই এগারোটার ট্রেণেই ফিরব।

হঠাৎ তাঁর কি একটা কথা মনে পড়ল, বললেন—হুঁ। তোমার হেডমাস্টার মশাইকে একবার বলতে হবে। ভাল, তুমি সকাল থেকে কিছু খেয়েছ? খাওনি? খুব অন্যায় কথা! নিয়মিত সময়ে খাওয়া দরকার, তা না হ'লে শরীর থাকবে কেন? আচ্ছা ডাক তোমার চাকরকে, ডেকে খাবার আনতে দাও।

সুধা আজ হঠাৎ বাবার অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যে এসেছে। সে যে বড় হয়েছে এই কথাটা বাবা যেন আজ বিশেষ আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। সে সসঙ্কোচে বড় হওয়ার প্রথম দাবী প্রতিষ্ঠা করলে, বললে—আনতে দিই। আপনি খাবেন না?

বাবা হাসলেন। গম্ভীর প্রশান্তচিত্ত মানুষের মুখে কনিষ্ঠরা ভুল করলে

যে সস্নেহ সমাদরের হাসি ফুটে ওঠে তেমনি হাসিতে মুখখানি ভরে গেল, বললেন—আমি? না, আমি খাব না। আমি একেবারে বাড়ী ফিরে খাব।

আবার অন্য কথা মনে পড়ল তাঁর, জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিদিন গায়ত্রী-সন্ধ্যা কর ত? প্রশ্নটা করেই প্রশ্নের উত্তরটা তিনি আপনার মন থেকেই সংগ্রহ করে নিলেন। সে জবাব দেবার আগেই তিনি বললেন—হ্যাঁ, নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করতে যেন কখনও ভুল না হয়। তোমরা তো ভগবানকে প্রণাম করবার অন্য অবকাশ পাও না।

বাবার মন—সুধা স্পষ্ট বুঝতে পারছে—আজ ছোট ছেলের মত চঞ্চল হয়ে আছে, অধীর হয়ে আছে, অধীর হয়ে আছে লঘু আনন্দে। আজ আর তাঁর মন দাঁড়াবার অবকাশ পাচ্ছে না, এ কথা থেকে সে কথায় অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাবা আবার অন্য কথা, বাজে কথায় চলে গেলেন, বললেন—জান, তোমার বন্ধুর আজ কাল খুব চলতি।

বাবার মুখে তার বন্ধুর উল্লেখ সে ঠিক ধরতে পারলে না। শুধু জিজ্ঞাসু হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাবা সেটা বুঝে জবাব দিলেন—তোমার বন্ধু, আনন্দ গো! আনন্দ।

—কি হ'ল আনন্দর? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে সুধা।

—সে ইতিমধ্যেই মস্ত ব্যবসাদার হয়ে পড়েছে। কাপড়ের একখানা বড় দোকান তো তার রয়েইছে। এবার কাটা কাপড়, মুদীখানা আর সৌখীন জিনিষপত্র এই সব নিয়ে আবার একখানা মস্ত দোকান খুলছে। আমার কাছে এসেছিল দিন দেখাতে, কবে নূতন দোকান পত্তন করবে! নূতন ভাল বাড়ী কিনেছে দোকানের জন্যে। সেদিন এসে সব বলে গেল। লেখাপড়া না করতে পারার জন্যে খুব দুঃখ করছিল। তোমার কথা দশবার বলে বললে—সুধা শিখুক, তা হলেই আমার শেখা হবে। আমি ওর মুখ থেকে কিছু কিছু পাব। ঐ আমার সান্ত্বনা। বলে আবার বললে—সব জিনিষ তো সবারই নয়। আমি গরীবের ছেলে, আমি হয়তো মনে মনে টাকারই তপস্যা করতাম; আর সরস্বতীর আশীর্বাদে হয়তো আমার উপকার হত না, আমার মন ভরত না। এ ভালই হয়েছে।

সুধা অবাক হয়ে গেল। আনন্দর কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। আনন্দ প্রায়ই বলত—তুই দেখিস সুধা টাকার অভাব আমার হবে না, টাকা

আমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে। আনন্দ বললে সে কথাটা সে বিশ্বাস করত সহজেই। তারও মনে হত টাকা ইচ্ছা করলে আনন্দ অনেক অনেক উপার্জন করতে পারে। আনন্দ না কি করছেই তাও। তাতে সুধা অবাক হয় নি। অবাক হল বাবার মুখ থেকে আনন্দর বিনীত ভদ্র কথাবার্তা শুনে। আনন্দর কর্কশ ভাষা আর প্রতি কথায় আকাশস্পর্শী স্পর্ধা তা হ'লে লোপ পেয়েছে? লক্ষ্মীর কল্যাণ-স্পর্শের কল্যাণে তা হ'লে শুধু আনন্দের বাইরেই শ্রী আসে নি, ভিতরে শ্রী আর সৌন্দর্য ফুটে উঠছে! না অনেক টাকা হয়ে আনন্দ নির্ভে গেল! সেই অতি শুষ্ক দাহ্য বারুদের মত ব্যক্তিত্ব টাকার জলস্পর্শে ভিজে জমে গেল!

বাবার কথায় ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। বাবা আবার কথা বলতে লাগলেন আনন্দ সম্বন্ধেই—জান, আমার ধারণা ছিল ছোকরা অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির। কিন্তু সে দিন অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেল। আমি ওর চালচলন দূর থেকে লক্ষ্য করেছি, তারপর মঙ্গল দত্তর সঙ্গে ওর ঝগড়ার কথাও শুনেছি। শুনে খানিকটা বিরাগ ছিল ওর সম্পর্ক। তা কথাবার্তা বলে দেখলাম—খাসা ছেলে। ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি ও কাজকর্মে প্রয়োগ করে যেমন সার্থক হয়েছে লেখাপড়া করলেও ঠিক তেমনি সার্থক হত। তার উপর বেশ বাকপটু, বেশ মিষ্টি করে গুছিয়ে কথাবার্তা বলে। বিনয়ী, নম্র। তবে একটা দোষ আছে। খুব জেদী। তা ওর জেদটা বরং ওর দোষ না হয়ে গুণই হয়েছে। তবে মনে হল— বলতে বলতে বাবা একবার থমকে গেলেন, যেন এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন, তারপর বল্লেন— মনে হল একটু স্ত্রৈণ। স্ত্রীর কথা বলতে বলতে মাত্রা হারিয়ে ফেলে। তবে বুদ্ধিমান ছেলে তো, সামলে নিতে জানে, পারে। ওর স্ত্রী মেয়েটি অত্যন্ত ভাল মেয়ে। পাড়া-ঘরে প্রায় ওর প্রশংসা শুনি।

সুধার মনে হল—বাবা যেন আনন্দর সঙ্গে কথা বলে বিশেষ প্রীত হয়েছেন। সেই কথাটা তাকে জানাবেন এটা যেন আগে থেকে ভেবেই রেখেছিলেন। সুধা খুশী হল, অবাক হল তার চেয়ে বেশী। আনন্দ, সেই আনন্দ, যে লোককে আঘাত না করে কথা বলতে পারত না সে এরই মধ্যে কথাবার্তায় এত পাল্টে গিয়েছে? তার ভিতরটাও কি পালটে ফেলতে পেরেছে আনন্দ? বোধ হয় পেরেছে। ভিতরটা পালটে ফেলতে না পারলে কি বাইরেটা পালটানো যায়? ভিতরটা পালটানো কি এত সোজা? কে জানে!

বাবার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বললেন,—নাও তাড়াতাড়ি কর। দেরী ক'র না অবিশ্যি। বাজার যা কিছু করবার তা তোমার বন্ধুই নিয়ে গিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম কাটোয়া থেকেই বাজার করব। তা ও নিজেই উপযাচক হয়ে বললে—আমি তো জিনিষপত্র, মানে আমার নূতন দোকানের জিনিষপত্র কিনতে কলকাতা যাব। আমাকেই টাকা আর ফর্দ দেন! তা ওকেই দিলাম, ও-ও বোধ হয় আজ ফিরবে।

আনন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জংসন স্টেশনে। ও আগের আপ ট্রেণে আধঘণ্টা আগে নেমেছে। সুধারা নামল পরের ডাউন ট্রেণ থেকে। আনন্দ ওদের দেখেই হৈ হৈ করে উঠল। অবাক হয়ে গেল সুধা। আশ্চর্য, এ তো আনন্দর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ! তা হ'লে কি ওর মনের কঠিন বেড়গুলো একের পর এক ভেঙে যাচ্ছে!

আনন্দ তার সঙ্গে দু পাঁচটা কথা বলে তাকে বললে—ছোকরা, তুমি চুপ করে বসে থাক। এইখানে বসে বসে আমার জিনিষগুলো পাহারা দাও, আর নতুন বৌয়ের মুখ ভাব'। আমার তো আর তোমার মত লিখিপড়ি করে চলবে না, আমার অন্য কাজ আছে। তারপর সহজ করে বললে—বস, তোর বাবার সঙ্গে কতকগুলো কাজের কথা সেরে আসি।

কাজের কথা? তাও আবার তার বাবার সঙ্গে কাজের কথা! অবাক হ'ল সুধা। কিন্তু আরও অবাক হ'ল এই দেখে যে কিছুদূরে গিয়ে আনন্দ বেশ সহজে তার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

সুধার মন তখন স্বভাবতই একটু হাল্কা হয়ে আছে, নিজের মধ্যেই ডুবে আছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যেন অকস্মাৎ একটা কথা অনুভব করলে। আনন্দ শুধু মাত্র তার কাছে নয়, তাদের সমগ্র পরিবারের একেবারে একান্ত কাছে এসে পড়েছে। আরও একটা কথা তার মনে হল। এই যে আনন্দর কাছে আসা—এ আকস্মিক নয়, এ আনন্দের পরিপূর্ণ পরিকল্পিত না হলেও, আনন্দেরই চেষ্টায় এটা ঘটল।

সেই কথাটাই আবার এবং বারে বারে সুধা অনুভব করলে বাড়ী এসে। বিবাহের আয়োজনের মধ্যে হাজার বার নানানভাবে আনন্দর উপস্থিতি সে দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ একগোছা ফর্দ হাতে পড়ল, তুলে নিয়ে দেখলে সেগুলো সব আনন্দের হাতের লেখা। ওদিকে কোন্ একটা কাজের জন্যে

উচ্চকণ্ঠে আলোচনা চলেছে তার মধ্যে উচ্চতম কণ্ঠ যা কানে আসছে তা আনন্দের কণ্ঠস্বর। আনন্দ যে এইখানেই কাজের প্রয়োজনে ঘোরাফেরা করছে তা সে জানত না। ভাল লাগল তার, খুব ভাল লাগল। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল সে। আলোচনা হচ্ছিল রন্নার যায়গা করার স্থান নির্বাচন নিয়ে। সে গিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। কথা শেষ হয়ে এসেছে। সুধা বুঝলে আনন্দ যে কথাটা বলছিল সেইটাই গৃহীত হয়েছে।

ধীরে ধীরে সকলে চলে গেল আপন আপন কাজে। আনন্দ দাঁড়িয়ে মজুরদের হুকুম দিতে লাগল কেমনভাবে জায়গাটা কতখানি পরিস্কার করতে হবে, কোনখানে উনুন হবে, কোন্ কোন্ জায়গায় ক'টা বাঁশ পুঁতে সামিয়ানা কেমনভাবে খাটাতে হবে। সুধা গিয়ে ধীরে ধীরে ওর কাঁধে হাত দিলে। আনন্দ ওকে দেখতেই পায় নি এতক্ষণ। সে ওর দিকে না ফিরেই বোধহয় ওর উপস্থিতি বুঝতে পারলে। ওর একখানা হাত সহজভাবে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ধরেই রাখলে। ওর দিকে ফিরল না, কথাও বললে না।

সুধা বুঝতে পারছে—আনন্দ যেন এক ধাপ উপরে উঠে গেছে অকস্মাৎ। সে সুধার বন্ধু থেকে ওদের পরিবারের বন্ধু হয়ে উঠেছে, অকাজের মানুষ বলে অনেক কাজের সম্পূর্ণ ভার পড়েছে তার উপর। সুধা বললে—কি রে, খুব যে কাজের মানুষ হ'লি? তা কাজের হ'লে বুঝি আর বাজে মানুষের সঙ্গে কথাই বলা চলে না? তার নিজের সস্নেহ কপট অভিযোগের সুরটা তার নিজের কানেই খুব মিষ্টি লাগল।

আনন্দ হেসে ওর দিকে মুখ ফেরালে। তার হাসিটা দেখে মনে হল যে সে যা চেয়েছিল সব পেয়ে গিয়েছে। মানুষকে অভিযোগ করলে সে অভিযোগের উত্তরে যেমন সস্নেহ হাসি হাসে তেমনি হাসি। সে অভিযোগের সে কোন জবাব দিলে না। বললে—জানিস না বিয়েতে বিয়ের বরই সব চেয়ে অবহেলার পাত্র। তোকে এখন কে কেয়ার করছে! তুই তো উপলক্ষ্য মাত্র। এখন কতবড় সামাজিক কাজ, কত আয়োজন, কত নিমন্ত্রণ, কত খরচ—এই সব বড় কথা নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে। তোর মত সামান্য একটা ইস্কুলে-পড়া বাচ্চা ছেলেকে কে খোঁজ করবে!

সুধা হাসল, বললে—বুঝলাম। কিন্তু তোর দোকান? নূতন দোকান

আরম্ভ হ'ল আর তুই এদিকে সব ছেড়ে এইখানে পড়ে আছিস। কাজের ক্ষতি হবে না?

—না, আমার কাজের ক্ষতি হয় না। তেমন কাজ আমি করি না। লোক রেখেছি, তারা সন্ধ্যে বেলায় হিসেব দেবে। গোলমাল হলে গালাগাল করব না, কিছু বলব না, যতটা দরকার মাইনে থেকে কেটে নেব। বাদ দে ও কথা। আমার ব্যবসা তো আর ভাগ্যের আশীর্বাদ নয়, আমার চেষ্টার ফল।

—বাদ দিলাম। চল তোদের বাড়ী যাব, তোর মা-বাবাকে প্রণাম করতে।

—তুই যা। আমার দেরী আছে। আচ্ছা যা জামা-কাপড় ছেড়ে আয়, এক সঙ্গেই যাব।

সুধা ফিরে এসে দেখলে আনন্দ নেই। তার বাবাই বললেন—আনন্দকে কে ডাকতে এসেছিল তাই আগেই চলে গেল। আবার এখনি আসবে।

ওদের বাড়ীর দরজায় পৌঁছেই সুধাকে থমকে দাঁড়াতে হল। অনুচ্চ অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাদানুবাদ হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে? সুধা কান পেতে শুনলে আনন্দ আর ওর বাবা। আনন্দ বলছে—তোমার কথার মানে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোমার আপত্তি কোনখানে?

—আপত্তি আছে। সে তোমাকে আমি বলতে পারব না। তবে এ তোমাকে আমি পরিস্কার বলে রাখছি যে তোমার দোকানে বসে খবরদারি করতে আমি পারব না। আর আমি যে কাজ করছি সেটা ছাড়তেও আমি পারব না।—আনন্দর বাবার গলা।

—কেন পারবে না সেটা বলবে আমাকে? তোমার ঐ পেট-ভাতা আর দশ টাকা মাইনেতে আর তোমার দরকার কি? এখন তো যথেষ্ট আয়ের পথ হয়েছে। আমার ব্যবসা দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। তোমার আর চাকরীতে দরকার কি? তাও যদি ভাল চাকরী হ'ত কথা ছিল।

কর্কশ কণ্ঠে জবাব এল—থাম। ঐ সামান্য চাকরী করেই তোমাকে মানুষ করেছি। মানুষ করেছি বলা ভুল হচ্ছে—অমানুষ করেছি, তোমাদের পেট ভরিয়েছি। আমি ও দোকানীর কাজ করতে পারব না।

এবার আনন্দ অতি কটু কণ্ঠে বললে—দোকানীর কাজ বড় অসম্মানের, নয়? কিন্তু পেটভাতা আর দশ টাকা মইনের কাজে তার চেয়ে বেশী সম্মান আছে, নয়?

এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওর বাবা, চীৎকার করে বললে—খবরদার, চুপ কর বলছি। এ সংসার আমার। আমি যেমন পারি উপার্জন ক'রে আনব। সেই উপার্জনে সকলকে খেতে পরতে হবে। তোমার টাকা তোমার থাকুক, তোমার ব্যবসা দিন দিন বাড়ুক, তাতে আমার প্রয়োজন নেই। এ তোমাকে আমি বলে দিলাম। এই আমার শেষ কথা।

আনন্দ হাল ছেড়ে দিলে, বললে—তুমি পাগল ছাড়া কি বলব। আর তোমার মত জেদী, অনবুঝ মানুষ আর আমি দেখি নি।

সুধা বুঝলে ওদের কথা শেষ হয়েছে। সে ডাকলে—আনু! আনন্দ!

আনন্দ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। এতবড় ঘটনাটার কোন ছাপই নেই ওর মুখে।

বিয়ে হয়ে গেল। বৌভাতও শেষ হ'ল। আনন্দর মত খুশী এবং ভাব-বিহ্বল হয়তো সে হয় নি তবু খুশী হয়েছে বৈ কি। হিলু-বৌয়ের মত না হোক, কমলা সুন্দরী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল বংশের কন্যা। ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, তবে ছোট্ট খাট্ট মানুষটি। সবাই বললে—সুধা যেমন পাতলা, ছিপছিপে, তেমনি ছোট্ট সুন্দর বৌ হয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে।

বিয়ে যে কোন দিক দিয়ে হৈ হৈ করে পার হয়ে গেল তা বুঝতে পারলে না সে। আনন্দ অনেক হয়েছে, কিন্তু কোলাহল হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কেবল সামাজিক অনুশাসন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পঞ্চগ্রামী, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমাদর ও ভোজন, বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান! এরই আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে বর-বধূ। অকারণ উদ্বেগ, অপরিমেয় শ্রম, অযথা খরচ সব মিলে আনন্দকে এক কটক কুরুসৈন্যকে ঘটোৎকচের চাপা দেওয়ার মত ব্যাপার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সবাই বধূর প্রশংসা করে গেল কিন্তু সুধা এখনও বধুর মুখ পর্যন্ত দেখে নি ভাল করে।

সে সুযোগ এল ফুল-শয্যার রাত্রিতে। হিলু-বৌ কমলাকে হাতে ধরে নিয়ে এল। এ ক'দিন শুধু মাত্র আনন্দই নয়, হিলু-বৌও অসাধারণ পরিশ্রম করেছে। সারাদিন দেব-কর্মে, অভ্যাগত মহিলাদের সমাদরে, রান্না-শালায় যত্রতত্র হিলু-বৌ ঘুরেছে, কাজ করেছে। গোলমাল আর ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে সুধা লক্ষ করেছে হিলু-বৌকে। লম্বা দীঘল হিলু-বৌয়ের দু খানি সুগৌর সুডোল রুলি আর শাঁখা-পরা হাত নানান কাজে বারবার অহরহ এগিয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, মাথার ঘোমটা ঠিক সমানই আছে, এতটুকু কমে নি সে লজ্জাশীলতার পরিমাণ। সারাদিন পরিশ্রম করে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বা না দিয়ে সে বাড়ী চলে যেত আবার ভোরে সকলে উঠবার আগে এ বাড়ীতে এসে কাজে লেগে যেত। আর আনন্দ তো কাজকর্ম শেষ করে এইখানেই কোন একটা জায়গায় যা হোক একটা কিছু টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাদিন খাওয়া-দাওয়া ও বৌভাতের পর গোটা বাড়ী ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে। আর উৎসব করবার মত মনের বা শরীরের অবস্থা নেই কারও। সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে সুধারও ক্লান্তি এসেছে, চোখ ঘুমে ঢুলে পড়ছে। এমন সময় কমলার হাত ধরে হিলু বৌ ঘরে ঢুকল।

সুধা ঘুম ঝেড়ে খাটের উপর বসল সচেতন হয়ে। সুসজ্জিতা কমলা গয়নায় আর কাপড়ে ঢাকা, মাথায় মস্ত ঘোমটা। আর একি! হিলু বৌ মাথার ঘোমটা তুলে ফেলেছে। তার সিঁথির প্রান্তে সিন্দুরের রেখা জ্বল জ্বল করছে, তার নীচে তারও দুটি চোখ হাসিতে কৌতুকে ঝলমল করছে, পাতলা রাঙা ঠোঁটের উপর স্বল্প হাসি টলমল করছে।

ভারী ভাল লাগল সুধার। সে বুঝলে যখন সমস্ত বাড়ী ক্লান্তিতে টলে পড়েছে মূর্চ্ছাহতের মত সেই মুহূর্তে হিলু-বৌ এসেছে নতুন বধূর হাত ধরে তার হাতে তুলে দিতে। মঙ্গল-অনুষ্ঠান আর মাধুর্য্যের যেন কোন ঘাটতি না ঘটে সেই দিকে এই দীর্ঘদিনের বান্ধবীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নেই। কৃতজ্ঞতায় সুধার মন ভরে উঠল। বুঝলে সেই জন্যেই আজ হিলু-বৌকে ঘোমটা খুলতে হয়েছে।

হাসি মুখে সে খাট থেকে নামল, বললে—আর বুঝি কেউ জেগে নেই বৌঠাকুরুণ? আপনাকে একা আসতে হ'ল? আর সেই জন্যেই বুঝি ঘোমটা খুললেন?

জলতরঙ্গের মত হাসিতে ফুলের গন্ধ মাতাল ঘর শিউরে শিউরে উঠল। হাসি থামিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে—না ভাই, অনেকদিন থেকে এই দিনটার কথা মনে রেখেছিলাম। তোমার বৌয়ের মুখের ঘোমটা খুলে তোমার হাতে তুলে দেবার আগে আমার নিজের মুখের ঘোমটা খুলে তোমার সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ পাতিয়ে যাব।

—আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তো হয়েই আছে বৌদি!

—না বৌদি নয়। তুমি আমার দাদা, আর আমি তোমার দিদি।

কথার সুরে যে মমতা মাখান ছিল তার ছোঁওয়ায় তার চোখে জল এল। সে বললে—তাই হবে। দিদিই হলেন আপনি। আবার হেসে উঠল হিলু-বৌ। ধীরে ধীরে কমলার ঘোমটাখানি দুহাতে তুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বধুর কনে-চন্দনমাখা মুখখানি নেমে গিয়ে চোখ দুটি মুদে গেল। চোখের কোন দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে।

সস্নেহে হেসে হিলু-বৌ বললে—দাও ভাই। বৌয়ের চোখের জল মুছিয়ে দাও।

তারপর আঁচলের তলা থেকে কি বের করে কমলার গলায় সে পরিয়ে দিলে। সুধা অবাক হল, জিজ্ঞাসা করলে—কি পরিয়ে দিলেন? হার? সোনার হার?

পল্লীগ্রামে এ রেওয়াজ তো নেই। অবাক হবারই কথা, কিন্তু সহজভাবে হেসে হিলু-বৌ বললে—ভাই, তোমার বন্ধুর হুকুম। ভাগ্যে তোমার বিয়ে হয়েছিল তাই এই দেখ আমিও সোনার হার পেলাম। কমলাকে আর আমাকে একই জিনিষ একই দিনে দিয়েছে।

হিলু-বৌয়ের কথায় তার গলার দিকে নজর পড়ল সুধার। তার গলায় সোনার মটর মালা চিক চিক করছে। এতক্ষণে আনন্দর কথা মনে পড়ল সুধার। জিজ্ঞাসা করলে—আনু কোথায়?

হেসে উঠল হিলু-বৌ। হাসতে হাসতেই বললে—তোমাদের জন্যে আমাদের আর আজ ফুলশয্যা হ'ল না ভাই। ঐ দেখ বারান্দায় খালি চৌকির ওপর চাদর চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমাদের পাহারা দিচ্ছে।

কমলার হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে হিলু-বৌ বেরিয়ে গেল। যাবার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে বলে গেল—দরজায় খিল দাও ভাই।

তিন

সুখস্বপ্নের মত কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে গেল, কতদিন কেটে গেল তার খেয়াল সুধার ছিল না। এর মধ্যে সে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এসেছে। তারপর তার বাবা আর মায়ের ইচ্ছায় আবার কমলা তারই সঙ্গে ফিরে এসেছে। পনর বিশ দিন এখানে থেকে আবার ফিরে যাবে। সে পনর দিনও প্রায় কেটে গেল। শ্বশুর মশায়ও বাবাকে পত্র লিখে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"পরম মাননীয় বৈবাহিক মহাশয়, আশা করি ৺ভগবৎ কৃপায় ও বাটীর সকল কুশল। পরে লিখি আপনার আদেশ মত কমলা মাকে এ বাটী লইয়া আসিবার নিমিত্ত আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান গোবিন্দকে বৈশাখের ৩রা তারিখ পাঠাইব। এবং দয়া করিয়া আপনি ৪ঠা তারিখ যে দিন নির্ধারণ করিয়াছেন সেই দিনে শ্রীমান গোবিন্দের সঙ্গে কমলা মাতাকে পাঠাইয়া দিলে সবিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গোপনে চিঠিখানা পড়ে সুধার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল, মনে বিরক্তি এসে গেল। কমলাকে সংগোপনে ডেকে সে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল—কি! বাবার তাগাদা পত্র এসে গিয়েছে। আর কি, এবার গোছগাছ করে রওনা হও।

কমলার সঙ্গে ইতিমধ্যেই ওর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। কমলা ওর বিরক্তি দেখে হাসতে লাগল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। তাতে সুধার বিরক্তি বেড়ে গেল, বললে—কি হাসছ তুমি? বাপের বাড়ী যাবে, আনন্দ হয়েছে বুঝতে পারছি কিন্তু তার জন্যে অত হাসির দরকার কি?

কমলার হাসির পরিমাণ বেড়ে গেল। মুখের চাপা কাপড় এবার হাসি রোধ করবার জন্য মুখের ভিতর গুঁজে দিতে হল। সুধা অবাক হয়ে কমলার হাসির কারণটা খুঁজতে লাগল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। তার

বিরক্তি প্রকাশটা যে তার ভালবাসারই প্রকাশ, আর সেই কারণেই যে কমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সেটা বুঝবার চোখ সুধার তখনও হয় নি।

সে এবার সত্যিই বিরক্তি হল, বললে—কি অত হাসছ? ও কি স্বভাব, অমন ক'রে হাসি!

সত্যিই কমলার ঐ এক স্বভাব, উচ্ছ্বসিত হাসি। নইলে চরিত্রের মিষ্টতায় ও আর হিলু-বৌ একই ধরণের মেয়ে। শুধু তাই নয়। দু'জনের স্বভাবের গভীর প্রদেশে কোথায় যেন একটা সুগভীর মিল আছে। অন্ততঃ তাই মনে হয় সুধার। কেবল হিলু-বৌ স্বভাবতই একটু গম্ভীর আর কমলা একটু চপল। অকারণে যখন তখন হাসে। আর ওর স্বভাবে আত্মীয়তা করবার একটা সহজ শক্তি আছে। সেই কারণেই ও ইতিমধ্যেই শ্বশুরবাড়ীতে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই ওর স্বভাবটা ও এত সহজে প্রকাশ করতে পেরেছে এখানে। কিন্তু স্বভাবের কথা বলাতেই ওর হাসি এক মুহূর্তে থমকে গেল। একবার মার-খাওয়া মানুষের মত চোখ বড় বড় ক'রে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে। কিন্তু তার চোখে সে কি দেখলে সেই জানে আবার বিপুল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বাবার গলার আওয়াজ কানে এল। আসতেই সুধা চুপ করে গেল, কমলাও হাসি থামিয়ে ফেললে। বাবা বাইরের দিকের ঘরে বসে কার সঙ্গে কথা বলছেন। বিরক্তির ভান করেই সে হাত জোড় করে কমলাকে বললে—হাত জোড় করছি, একটু হাসিটা থামাও। বাবা শুনতে পাবেন।

বাবার ক'টা কথা কানেও এল—তা তোমার বাড়ী যাবে এ কি বলবার কথা! যখন খুশী তোমার নিয়ে যাও সুধাকে বৌমাকে। আপত্তি কি! ওরা তো তোমার আর বৌমারই সর্বপ্রথম।

সুধা বুঝলে বাবা আনন্দ'র সঙ্গে কথা বলছেন। আনন্দ বোধ হয় ওদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলে বাবা হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন—আবার আমাকে কেন বাবা! আমাকে বাদ দাও।

কিন্তু আনন্দ'র যে ষোল আনার উপর দরকার আঁঠারো আনা। আনন্দ'র টাকা হয়েছে। এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠা চাই বই কি!

আনন্দ'র কথা শুনতে পায়নি সুধা কিন্তু বাবার কথা শুনে মনে হল বাবাকে নিমন্ত্রণ করেছে সে। বাবার তাতেই আপত্তি। এবার আনন্দ'র

গল। শোনা গেল—আজ্ঞে না। এ আমার বহুদিনের বাসনা। আপনাকে আর মাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। এই একটা উপলক্ষ্য হয়েছে, এখনই চলুন।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন—বেশ তাই হবে। তোমাকে কি না বলতে পারি বাবা? তবে এর দরকার ছিল না কিছু!

সুধা হাসল এ-ঘরে। দরকার ছিল না? বাবার দরকার নেই হয়তো, কিন্তু আনন্দ'র যে ষোল আনার উপর দরকার আঠারো আনা। আনন্দ'র টাকা হয়েছে। এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠা চাই বই কি!

সুধা জানলা থেকে দেখতে পেলে আনন্দ চলে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে। ওর চলার ভঙ্গী থেকেই ওর মনের হাল্কা খুশীখুশী ভাবটা অনুমান করে নিতে পারলে সে। সুধা আজকাল লক্ষ্য করেছে আনন্দ ওর সঙ্গে যতখানি মেশে ঠিক ততখানি মেলামেশা আর কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে বাবার সঙ্গে। বাবাও পরমানন্দে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এটাও সে লক্ষ্য করেছে।

কমলাও পিছন থেকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিলে—কি দেখছ? ওপাড়ার ভাসুর (আনন্দকে কমলা ঐ নামে সম্বোধন করে) গেলেন তাই দেখছ বুঝি? আহা, তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন? আহা, তোমার দুঃখ হচ্ছে না? যাও, দেখা করে এস। ডাক বরং এইখান থেকে।

কমলাও কছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা উনি কার বন্ধু? তোমার না বাবার?

সুধার এটাকে রসিকতা বলে মেনে নিতে ভাল লাগল না, বললে—আমার বন্ধু, বাবারও বন্ধু, আবার তোমারও বন্ধু।

কমলা অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

·

বৈশাখের সূর্য তখন মাথার একেবারে উপরে। চলমান মানুষের ছায়া তখন তার পায়ের তলায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাটি তেতে আগুন হয়ে উঠেছে—এমন সময় সপরিবারে রাধামাধব ভট্টচায মশায় রাম মুখুজ্জের বাড়ীতে পৌঁছুলেন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। যাবার সময় ছেলেকে একটা এবং বৌমাকে একটা ছাতা দিলেন, নিজে ভিজে

গামছাটা চাপিয়ে নিলেন আপনার মাথায়, স্ত্রীকেও বার বার অনুরোধ করলেন—একখানা ভিজে গামছা মাথায় দাও বুঝলে।

স্ত্রী প্রথম বার কয়েক কথা বললেন না, তারপর একটু হেসে বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার মাথা গরম হয়েছে, তুমি ভিজে গামছা দাও মাথায়। আমার দরকার নেই।

কথা শুনে ভট্‌চায মশায় একটু চটে গেলেন। আর কিছু না বলাতেই সেটা বোঝা গেল। কথাটা শুনে সুধা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। আগে বাবার সামনে সে দাঁড়াতে পারত না। এখন বাবা তাকে বড় বলে অনেকখানি স্বীকার করে নিয়েছেন।

তিনি স্ত্রীকে আর কিছু না বলে রাস্তায় পা দিলেন।

বাড়ীর দরজায় আনন্দ অপেক্ষা করছিল। তাঁকে রাস্তায় দেখে অনেকখানি ছুটে এল আনন্দ। খুশীতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খুশী গলায় বললে—আমি এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে ভাবছিলাম আবার একবার যাই, দেখি কি হল, আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

ভট্‌চায মশায় হাসলেন, যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই হাসলেন, বললেন—বাবা, মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করছে। মধ্যাহ্ন না হ'লে আসি কি করে? আর তারপর পুজো-আহ্নিক, সংসারের কাজকর্ম শেষ করতে আমাদের দু জনেরই দেরী হয়ে যায়। তারপর মুখুজ্জে মশায় আছেন ত?

আনন্দ'র বাবাকে 'মুখুজ্জে মশায়' বলে সম্বোধন এক কমলা ছাড়া আর কারো কান এড়াল না। গ্রামের এক জমিদারের বাড়ীতে দশটাকা মাইনের গোমস্তা, দুঃস্থ রাম মুখুজ্জেকে সকলেই, সামনে না হোক, আড়ালে রাম মুখুজ্জে বলেই সম্বোধন করে। আজ গ্রামের এক বিশেষরূপে গণনীয় এবং একদিকে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার বাবাকে তাঁর নিজের সমকক্ষ বলে সম্বোধন এবং সম্মান করায় আনন্দ বোধ হয় বিগলিত হয়ে গেল।

আনন্দর মুখের প্রতিটি রেখার স্বাভাবিক ঋজু কাঠিন্য এক মুহূর্তে কোমল হয়ে এল, প্রায় আবোরুদ্ধ গলায় বললে—আজ্ঞে হাঁ, বাবা আপনাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আনন্দর এই সূক্ষ্ম আবেগ একমাত্র সুধার অভ্যস্ত চোখ আর কানেই ধরা পড়ল। সুধার কেমন বিচিত্র লাগছে। একটা বিচিত্র অবস্থান্তরের অনুভূতি

ধীরে ধীরে ওর মনে বাসা বাঁধছে। তার মনে হচ্ছে কোন্ অদৃশ্য টানে আনন্দ তাদের সমস্ত পরিবারকে টেনে নিয়ে চলেছে। যেন সে তার নিজের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের পরিবারকে নিয়ে গিয়ে আপনার পরিবারের সঙ্গে প্রীতির গাঁটছাড়া বেঁধে দিতে চেষ্টা করছে। এবং তার জন্যে আনন্দের দৃষ্টি অহরহ জাগ্রত, তার চেষ্টা বিরামহীন।

ওঁরা বাড়ীর বাইরের দরজাটা পার হলেন। পার হবার আগে আনন্দ সকলকে সচেতন করে একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললে—দেখবেন একটু মাথা হেঁট করে ঢুকবেন। দরজাটা বড় নীচু।

বাড়ীতে ঢুকেই ভট্‌চাজ মশায় তাকে বললেন—হ্যাঁ হে আনন্দ, এ বাড়ী তো নরনাথদের? তা তোমরা কি এমনিই থাক না ভাড়া দিতে হয়? যদি ভাড়াই দিতে হয় তবে অন্য বাড়ী দেখ না কেন? আর তুমি তো একখানা বাড়ী করলেই পার হে এখন?

দ্বিধাগ্রস্থ নিম্নকণ্ঠে আনন্দ জবাব দিলে—দেখি। ইচ্ছা তো আছে। তারপর একটু থেমে গেল। তারপর আবার বললে—আমি তো ইদানীং বাবাকে বলছি একখানা পুরনো বাড়ী কিনি, তারপর মেরামত করিয়ে নতুন করিয়ে নেব। না হয় এই পাড়াতেই কোথাও জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ী করি। তা বাবার ঘোর অনিচ্ছা। উনি বার বার আপত্তি করেন। বলেন, এই বেশ আছি। আবার অনর্থক বাড়ী করে কি হবে? কতকগুলো পয়সা খরচ করে লাভ কি? আমি জোর করলে উনিও জোর করেন, বলেন—তোমার পয়সা তুমি করতে পার। সে বাড়ীতে তুমি গিয়ে বাস কর। আমি যাব না। আমি এইখানেই বেশ আছি।

তার কথা শুনতে শুনতেই বাড়ীর চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন ভট্‌চাজ মশায়। ছোট বাড়ী। কিন্তু তার শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর। সমস্ত উঠোনটি গোবরমাটি দিয়ে সযত্নে লেপন করা। গোবরমাটিতে লেপা, গিরিমাটির আলপনা দেওয়া তুলসী মঞ্চের উপর তুলসী গাছটি লকলক করছে, সতেজ সবুজ। বৈশাখ মাস পড়েছে। মাথার বাকারী থেকে সুতো-বাঁধা ফুটো ভাঁড় বেয়ে ঝারার জল কোঁটায় কোঁটায় পড়ছে এখনও। অর্থাৎ এই মধ্যাহ্নেও জলদাত্রীর দৃষ্টি আছে বৃক্ষরূপী দেবতার উপর। নিচে কতকগুলি গাঁদাগাছে এখনও ফুল ফুটছে। ফুলের পরিমাণ

কম, আকৃতিও ছোট। কিন্তু অসময়ে যখন কোথাও গাঁদা ফুল নেই তখনও ফুটছে। গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ দুপুর বেলাতেও গাছের তলার মাটি এখনও ভিজে। ও পাশে শাকের ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে।

ভারী ভাল লাগল সকলেরই। ভট্‌চাজ মশায়ের চোখের দৃষ্টি কোমল স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। অল্প হাসি হেসে বললেন—এসব বুঝি বৌমার হাতের?

সলজ্জ হাসল আনন্দ, বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ নিয়েই তো আছে।

আনন্দ'র বাবা রাম মুখুজ্জে বেরিয়ে এলেন হুঁকো হাতে। হাত জোড় করে সম্বর্দ্ধনা জানালেন—আসুন, আসুন, আমার মহা ভাগ্য আপনারা এসেছেন।

ভট্‌চাজ মশায় দরাজ গলায় বললেন—বলছেন কি মুখুজ্জে মশায়? আপনার কাছে আমার ঋণের পরিমাণ তো বেড়েই যাচ্ছে। আনন্দ আমার পুত্রের অধিক।

ভট্‌চাজ মশায়ের কণ্ঠের উত্তাপ কিন্তু তিনি মুখুজ্জের কাছে খুঁজে পেলেন না। তাঁর কথার উত্তরে মুখুজ্জে মুখে সম্মান দেখিয়ে বলেন—আসুন। এই যে জল আছে, পা'টা ধুয়ে ফেলুন।

ভট্‌চাজ মশায়ের মনের মধ্যে যে প্রীতি ও আবেগ-উত্তপ্ত মানুষটি তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের কঠিন আবরণের অন্তরাল থেকে উঁকি দিচ্ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মগোপন করলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বভাব-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—থাক থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আনন্দ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এক মুহূর্তের অনুমানে সে সব একসঙ্গে বুঝে নিলে। কথা বলতে গিয়ে কি বলে কথা আরম্ভ করবে সে খুঁজে পাচ্ছেনা। ভট্‌চাজ মশায় বললেন—বাবা আনন্দ, আমার আর সুধার মায়ের খাবার ব্যবস্থা করে দাও, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কিছু কাজ আছে বাড়ীতে।

রাম মুখুজ্জে বললেন—তার জন্মে আর কি। তাড়াতাড়িই করতে বলি। আপনি হাত পা ধুয়ে ফেলুন। এই যে গামছা, জল। কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই গাড়ু আর গামছা হাতে করে তুললেন।

আনন্দ বাবার বিচিত্র ব্যবহার দেখতে লাগল। আন্তরিক সম্মান দেখাবার ইচ্ছায় বাবা এক হাতে গাড়ু অন্য হাতে গামছা নিয়ে সেবা করতে এগিয়ে

যাচ্ছেন কিন্তু কণ্ঠস্বরের শুষ্কতায় আন্তরিকতার অভাব যে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ হয়ে পড়ছে এটা তিনি বুঝতে পারছেন না।

ঠিক এই মুহূর্তে হিলু-বৌ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে বোধহয় এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। এসেই শ্বশুরের হাত থেকে গামছা আর গাড়ু নিয়ে গেল সপ্রতিভ ভাবে, গাড়ুর জল ভট্‌চাজ মশায়ের পায়ে ঢেলে দিয়ে নিজের হাতে পা ধুইয়ে দিলে। ভট্‌চাজ মশায় একবার 'না না' করেও তা গ্রহণ করলেন। মুখুজ্জে কোন কথাও বললেন না, চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনি সমস্ত দৃশ্যটার একজন নিরাসক্ত দ্রষ্টা মাত্র।

ঘোমটার আড়াল থেকে হিলু-বৌ জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আর মা তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যাবেন এখনি? এই দুপুরবেলা, কি রোদ? একটু পরে গেলে হয় না?

—না মা। কাজ আছে বাড়ীতে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি। মিথ্যা একবার বলেছেন, তাকে রক্ষা না করে উপায় কি? কিন্তু তার জন্যে মনে দুঃখ হল। মিথ্যা 'না' বললে হয়তো থাকতে পারতেন, তাতে আর কিছু না হোক এই কল্যাণী মেয়েটি খুশী হত।

একটু দুঃখিত হল হিলু-বৌ। বললে—তা হ'লে আমি খাবারের জায়গা করি বাবা? তার ম্লান কণ্ঠস্বর থেকে ভটচাজ বুঝতে পারলেন মেয়েটি সত্যিই দুঃখ পেয়েছে। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি! আমি তো তোমারই। ডাকলে আসব, না ডাকলেও আসব।

হিলু-বৌ চলে গেল। কমলাকে আর সুধার মাকে আন্নুর মা নিয়ে গেছেন একটু আগেই। সুধাকে নিয়ে আনন্দ তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। সুধা দেখতে পেলে আনন্দের চোখে তার সেই পুরানো দৃষ্টি ফিরে এসেছে। চোখগুলো দুপুরের আলো-লাগা মাজা রূপোর বাসনের মত ঝক্‌ঝক্ করছে।

ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল সুধা। সেটা বুঝতে পেরেই আনন্দ'র যেন সম্বিত হল। বললে—আয় বসবি। ভট্‌চাজ মশায়কেও সসম্মানে ডাকলে। কমলা আর সুধার মা রান্নাঘরে। আনন্দ ওদের নিয়ে বসালে নিজের ঘরে। বাবাকে একবার আসতেও অনুরোধ করলে না, অথবা মুখুজ্জে অতিথিদের অনুগমনও করলেন না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে লাগলেন তিনি নির্বিকারভাবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরেই পান মুখে দিয়ে সস্ত্রীক ভটচাজ মশায় চলে গেলেন। হিলু-বৌ সুধাকে বললে—কি ভাই, খিদে পেয়েছে খুব? বস, লক্ষী ভাই। আমার শ্বশুরকে খেতে দিয়ে আসছি।

সুপ্রচুর আয়োজন। পাশাপাশি দুখানা আসন। হিলু-বৌ হাসতে হাসতে বললে—দেখ ভাই, এখনও সময় আছে বল। আমার কর্তাকে না দিয়ে তোমার গিন্নীকে পাশে বসিয়ে দিই। দেখ, আমার কর্তাতো খিদেতে প্রায় কাঁদ কাঁদ। উনিতো বসবার জন্যে ঐ দাঁড়িয়ে। এখনও যদি বল ব্যবস্থা করতে পারি। হাসতে লাগল হিলু-বৌ।

আনন্দ রেগে উঠল, বললে—খিদেয় পেট জ্বালা করছে, এই সময় তোমার হাসি রসিকতা আরম্ভ হল?

আরও জোরে হেসে উঠল হিলু-বৌ। বললে—তোমার ভেতরে তো হাসি-রসিকতা বলে কোন পদার্থ নেই। থাকলে তো বাঁচতাম। তা হলে তো নিমন্ত্রণ করে দুপুর-বেলা লোক ডাকতে হত না রসিকতা করবার জন্যে। আবার হাসি। হাসতে হাসতেই বললে, এবার বললে সে সুধাকে—দেখছ তো ভাই, কেমন খিদে পেয়েছে মানুষটার! এখনও বল।

সুধাও হাসল, বললে—তাতে আপত্তি কি? আপনারও তো তাতে আপত্তির কিছু থাকবে না। ভালই হবে। আমরা কর্তা-গিন্নী খেয়ে উঠে গেলে আপনারা দুজনে বেশ গল্প করতে করতে নিরিবিলি খেতে পারবেন। চাই কি ইচ্ছে হলে এক থালাতেই খেতে পারবেন।

হিলু-বৌ হাসছিল। হাসির পরিমাণ আরও বেড়ে গেল তার। বললে তা হলেই হয়েছে। খাবার সময় গল্পের আশায় আমি ওঁর চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে থাকব আর উনি খাবারের থালায় তাকিয়ে থাকবেন। অল্পক্ষণেই থালা খালি। আমাকে না খেয়েই উঠে যেতে হবে।

এবার আনন্দকেও হাসতে হল। বললে—যাও, আর দেরী কর না। বস ভাই সুধা।

খাবার সময় আনন্দের মা এসে দাঁড়ালেন। ফর্সা, রোগা, লম্বা, পাকানো চেহারা। লাবণ্যের কোন অবশেষ নেই। এক সময়, হয়তো প্রথম জীবনে স্বাস্থ্য ছিল; লাবণ্যও কিছু ছিল। কিন্তু সংসার, দারিদ্র্য, বহুতর ক্লেশ সব শেষ করে দিয়েছে! তিনি এসে চুপ করে দাঁড়ালেন।

কথা বললেন না। হিলু-বৌ পাখা হাতে বসেছিল। সে মাথার ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিলে।

ঘরে কোন কথা নেই। প্রয়োজন না হলে আনন্দ কারও সঙ্গে সচরাচর কথা বলে না। সুধা কি বলবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে আনন্দের মতই খেয়ে চলল, কথা বলছিল কেবল মাত্র হিলু-বৌ। শাশুড়ী আসতেই সে চুপ করে গেছে। ওদিকে একমাথা ঘোমটা দিয়ে কমলা চৌকির উপর চুপ করে বসে আছে। কাজেই এই অশোভন নীরবতাকে ভঙ্গ করতে হল আনন্দের মাকেই। তিনি একেবারে সামাজিক কথা পাড়লেন, পোষাকী কণ্ঠস্বরে বললেন—খুব খাসা বউ হয়েছে। খাসা দেখতে। ভাল বংশের মেয়ে। দিয়েছে থুয়েছেও ভালই।

তাঁকে থামতে হল। আর বলার কথা নেই। আবার নীরবতা। আবার কথা আরম্ভ করলেন তিনি—তা সুখে থাক তোমরা, আনন্দে থাক। বছর ঘুরতেই রাঙা খোকা হোক বৌমার কোল জুড়ে। আবার থামলেন তিনি। আবার আরম্ভ করলেন—আমার কপাল দেখ বাবা। আজ চার বছর আমুর বিয়ে হয়েছে। এখনও নাতির মুখ দেখলাম না। আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে আর হয়তো দেখতেও পাব না।

মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়াটা যেন অন্য রকম হয়ে গেল। সুধার মাথাটা ভাতের থালার উপর নীচু হয়ে পড়ল। আনন্দ চুপ করেই খেয়ে যাচ্ছিল। সে মায়ের কথা শুনে একবার মায়ের মুখের দিকে একবার হিলুর মুখের দিকে চেয়ে খাবার গ্রাস হাতেই থমকে গেল। হিলু বাতাস করছিল। তার চোখে আনন্দর চোখ পড়তেই তার হাতের পাখা বন্ধ হয়ে গেল, সে পাখাটা নামিয়ে রেখে অস্ফুটকণ্ঠে কি বললে, বোধ হয় বললে—অম্বলটা নিয়ে আসি। বলেই সে উঠে চলে গেল। কমলা ঘোমটার ভিতর থেকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আনন্দ'র মুখের দিকে চেয়ে থাকল, বোধ হয় মনে মনে এক বৎসরের মধ্যে রাঙা খোকা পাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল। কেবল যিনি বললেন তিনি নির্বিকার মুখে ও শান্ত চিত্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনিই অতি মিষ্ট স্বরে আবার খাবার কথা মনে করিয়ে দিলেন, বললেন—খাও বাবা, রান্না কি ভাল হয়নি নাকি?

তাঁর কথায় আবার দুজনেই খেতে আরম্ভ করলে। হিলু-বৌ অম্বলের বাটি হাতে ঘরে এসে ঢুকল হাসি মুখেই।

খেতে খেতে সুধার মনে হল কি আশ্চর্য ক্ষোভ আনন্দের বাবা আর মায়ের মনে ? সে কোন্ ক্ষোভ, কোন্ ব্যথা তা সে জানে না। তবে কোন এক দুরন্ত ক্ষোভ আর আত্মপরতায় এই দম্পতি যেন অহরহ পীড়িত। আর সেই পীড়ায় বারবার তারা এই দুটি মানুষকে আঘাত করছে! অথচ আনন্দ আর হিলু-বৌ দুজনেই কত চেষ্টাই না করছে এই পীড়াকে মুছে দিতে!

আনন্দর বয়স হল কুড়ি। হিলু-বৌয়ের বয়স হল সতের। হিলুর বিয়ের সময় তার মায়ের মামা ব্রজ চাটুজ্জে জানিয়েছিলেন হিলুর বয়স দশ, দশ পার হয়ে এগারোয় পড়ছে সে। কিন্তু আসলে ওর বয়স তখন তেরো। বরাবর এই গ্রামে থাকলে, অথবা এই গ্রামে জন্ম হলে বিয়ের সময় হিলুর দু বছর বয়স লুকানো অসম্ভব হত যে কোন লোকের পক্ষে। কিন্তু ব্রজ চাটুজ্জে ভাগনীর বিয়ে দিয়েছিলেন ভিন্ন স্থানে। সেখান থেকে হিলুর মা বিধবা হয়ে কোলে আটবছরের মেয়েকে নিয়ে এসে পড়ল মামার ঘাড়ে। তখন থেকেই মামার ইঙ্গিতমত হিলুর বয়স দু'বছর কমে গিয়েছিল। বিয়ের সময় আনন্দ'র বাবা বোধ হয় হিলুর বয়সে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তার উত্তরে চাটুজ্জে বলেছিলেন—ওকে দেখে বয়স একটু বেশী লাগে। স্বাস্থ্যটা ওর একটু মানে বেশ ভাল কিনা। হিলু আমাদের বেশ বাড়ন্ত গড়নের।

কথাটা আনন্দ পরে হিলু-বৌকে জানিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল সঠিক বয়স। হিলু প্রথমে জবাব দেয় নি, কেবল হেসেছিল, বলেছিল—তুমি বলনা কেন আমার বয়স কত ? তুমি তো দেখছ আমাকে অনেকদিন থেকে!

—কত আর, বিয়ের সময় এগার বারই ছিল। আর কি ?

—বোকা কোথাকার! তখন আমার বয়স তের। যদি ডাগরই না থাকতাম তখন তবে তোমার মত শক্ত খুদে ডাকাতের নাকে কি আর সঙ্গে সঙ্গে দড়ি পরাতে পারতাম! তোমার মা ঠিক ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—তা বেশ ভালই হয়েছে। বেশী বয়সই তো ভাল। ডাগর মেয়েই দরকার ছিল আমার।

এ কথা আনন্দই বলেছিল একদিন সুধাকে। বাপ-মা ছেলেদের কত ভালবাসেন, তাদের সুখ-সুবিধে-আনন্দের দিকে কতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁদের থাকে সেই আলোচনার মুখেই একদিন আনন্দ কথাগুলি বলেছিল—তাই

ভাবি জানিস সুধা, বয়সের এই গোলমালেই বিয়ে ভেঙে যেতে পারত। কিম্বা বিয়ের পরেও যখন মা জেনেছিলেন যে বিয়ের সময় ওর বয়স লুকিয়েছে তখনই চাটুজ্জে মশায় আর আমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়া হয়ে যেতে পারত। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হয়েও আমার মা সব মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু এ কি রূপ, এ কি ক্ষোভ, এ কি আক্ষেপ আমুর মায়ের! সেই মানুষ আর আজকের এই মানুষ দু'জনেই কি এক? না তো। তবে কেন মানুষ এমন পাল্টে যায়? অথচ হিলু-বৌয়ের কি স্বভাব, কত সেবা-যত্ন করে চলেছে সে সমস্ত সংসারের, মুখের হাসি, সম্ভ্রম আর বিনয় একসঙ্গে এই তিন দিয়ে অবিরাম সে তো ঐ তিনটি মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। তবু সে পরিপূর্ণ প্রসন্নতা আর ক্ষমা পায় না কেন?

সুধা সচেতন হয়ে উঠল। কি দরকার পরের কথা ভেবে? নিজের কথা মনে পড়ল অকস্মাৎ। তার বাবা মা তো এমন নন। কমলাকে গ্রহণ করার ভঙ্গিই সম্পূর্ণ আলাদা তাঁদের। তার তো মনে হয় কমলাকে তাঁরা অন্তরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন।

খুট করে দরজায় শব্দ উঠল। সে পিছন ফিরে তাকাল। দরজার আড়াল থেকে কমলা দরজার খিলটায় হাত দিয়েছে তারই শব্দ। সে মুখ ফিরে তাকাতেই দেখলে কমলা দরজার আড়ালে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে হতেই মুখে অস্ফুট হাসি ফুটে উঠল। কমলা ইঙ্গিতে ডাকছে তাকে? সে ছুটে উঠে গেল।

কাল চলে যাবে কমলা।

যে স্বপ্ন কখনও সে দেখেনি, সেই স্বপ্ন, সেই সোনার স্বপ্ন দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল এ স্বপ্ন যেন কোনদিন ভাঙবে না। কিন্তু সুধার সে স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল। কমলা চলে গেল আজ। মনটা তার ভাল নেই, উদাস হয়ে গিয়েছে। সে বসে ছিল চুপ করেই। তার মন-মরা ভাবটা এত স্পষ্ট যে সেটা মা এমন কি বাবারও নজর এড়ায় নি। বাবা আর মা এই নিয়ে ফিস ফিস করে পাশের ঘরে কথা বলছিলেন, সে কান পেতে শুনেছে।

বাবা ফিসফিসানির চেয়ে একটু উচ্চ কণ্ঠেই মাকে বলছিলেন—আজ-

কালকার ছেলেদের রকম সকমই আলাদা। সুধা কেমন মন-মরা হয়েছে! আজকেই বউমা গিয়েছেন, আজকেই আমার ছেলের মন কেমন করছে।

বাবা যে বিরক্ত হয়ে শ্লেষ ক'রে কথাগুলো বলেন নি সে কথা পাশের ঘরে বসে বাবার মুখ না দেখেও সুধা বুঝতে পেরেছে। বাবার অনুচ্চ হাসির শব্দও তার কানে এসেছে। ঐ হাসি থেকেই তাঁর সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছে সে।

পর মুহূর্তেই মায়ের তর্জন কানে এসেছিল—আঃ, কি জোরে জোরে বলছ। ছেলে তোমার পাশের ঘরেই আছে, শুনতে পাবে। বড় হয়েছে ছেলে।

—তা বটে। মাঝে মাঝে ভুলে যাই কিনা যে সুধা আমার বড় হয়েছে।

—বড় হয়েছে বলে কি তোমাকে ওকে বেশী মান খাতির করতে বলছি? ছেলে মুখ চুন করে বেড়াচ্ছে মন খারাপ ক'রে, আমরা তাই নিয়ে কথা বলছি জানতে পারলে লজ্জা পাবে।

—লজ্জা কিসের? ভালবাসবে বলেই তো বিয়ে দিলাম। আচ্ছা, দেখি, তোমার ছেলের দুঃখ দূর করার কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আকারে ইঙ্গিতে বেয়াইকে লিখে তোমার ছেলেকে যেতে লেখাব। কিছুদিন পর ঘুরে আসবে একবার। বৌমাকে এখন দ্বিরাগমনের আগেই পাঠিয়ে দাও—এ তো আর বলতে পারব না।

সুধা আর শুনতে পায় নি, চায়ও নি। বাবা-মায়ের সহানুভূতি আর মমতার স্পর্শ পেয়ে, আবার অদূরে কিছুদিন পরে কমলার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনার কথা জেনে সে লঘু পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়াল।

বৈশাখের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে রৌদ্রের প্রখরতায় আর উত্তাপে কাছের আর দূরের গাছপালার পাতাগুলি সব এলিয়ে নুইয়ে পড়েছে। বাতাস দূরে কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে চলেছে। তার ওপারে দিগন্তের গাছপালা সব কাঁপছে মনে হয়। সুধা উদাস দৃষ্টিতে অন্যমনে সেইদিকেই চেয়ে রইল। মনে বিষণ্ণতা আর আনন্দ দুইই যেন এক সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে।

এপাশে হঠাৎ কে ডাকলে—সুধা।

আনন্দ ডাকছে। সে চমকে উঠে বললে—কি রে আনন্দ, এত বেলায়?

—এই এলাম একবার। আনন্দ হাসলে। ওর হাসি দেখে সুধার মনে হল যেন রৌদ্রে এসে বড় ক্লান্ত হয়েছে আনন্দ। বললে—কোথা থেকে আসছিস? তোকে দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস রোদে এসে। আয় ঘরে আয়।

সুধার পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরের চৌকির উপর বসল আনন্দ। আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলে। সেই ক্লান্ত হাসি। বললে—কিরে, বৌয়ের জন্যে মন কেমন করছে?

সুধাও একটু হাসলে।

আনন্দ বললে—তোর বৌ যাবার সময় আমি আর আসতে পারলাম না। ভেবেছিলাম আমি আর হিলু-বৌ দুজনেই আসব। তা বাড়ীতে আটকে গেলাম গোলমালে।

সুধা কথাটা পালটে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে—এখন এলি কোথা থেকে? রোদে বুঝি খুব ঘুরেছিস? ক্লান্ত হয়েছিস খুব।

আনন্দ আবার হাসলে আগের হাসি, বললে—না ঘুরি নি তো বেশী। তবে রোদ লেগেছে খুব। মানুষের মনের তাত্ লেগেছে রে।

অবাক হয়ে সুধা বললে—মানে?

—মানে কিছু নয়। একটা বাড়ী কিনছি। তোর বাবা সেদিন নতুন বাড়ী করতে বলছিলেন। তাই কিনব ঠিক করছি। সোনা দত্তদের পুরনো বাড়ীটা।

—হঠাৎ বাড়ী কিনবি? তোর বাবার তো মত নেই? তবে?

—সেই জন্যেই তো কিনব। আলাদা হয়ে যাব। আর পারছি না।

স্তম্ভিতের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুধা তার কথা শুনে। এ কি বলছে আনন্দ!

—এ তুই কি বলছিস রে? কি হল কি?

—হ'ল কি? কি না হ'ল? চুপ করে গেল আনন্দ। তারপর বললে—জানিস মানুষের মনের তাত আর সহ্য করতে পারছি না। মানুষ কে—না আমার বাবা আর মা। এক এক সময় কি মনে হয় জানিস? মনে হয় দু'চার পয়সা আমার যা হয়েছে তা না হলেই যেন ভাল হ'ত। আমার সামান্য ক'টা টাকা আমার সঙ্গে আমার বাবা-মাকে আলাদা করে দিলে। মাঝে মাঝে মনে হয় মঙ্গল দত্তর দোকানে চাকরী করেই যেন বেশী সুখে ছিলাম।

আবার চুপ করে গেল আনন্দ। যেন আপনার মনের বিষকে পরিপাক করতে চেষ্টা করছে সে। সুধা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু হল কি বল দেখি?

—জানিস সুধা কি হয়েছে? হিলুকে মা আর বাবা দু'জনেই সহ্য করতে পারছে না।

অবাক হয়ে গেল সুধা, প্রশ্ন করলে যেন আপনা আপনিই—কেন? হল কি?

—সেইটা তো আমিও বুঝতে পারছি না রে। অথচ হিলু— ! হিলুর মত মেয়ে! যে সব সময় মুখে হাসি নিয়ে সদা-সর্বদা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে! বাবা আর মা দু'জনেই যে ওকে সহ্য করতে পারছে না এটা দিন দিন বুঝতে পারছি। আর সেই অসহ্য ভাবটা দিন দিন বাড়ছে! আজকে মা আমাকে কি বললে জানিস?

আবার থামল সে। যে কঠিন কথাটা তাকে বলতে হবে তার শক্তি-সঞ্চয় ক'রে নিচ্ছে সে যেন। সে বলতে লাগল—আজ সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দোকানে যাব, হিলুবৌ বাসন নিয়ে ঘাটে গিয়েছে। বাসন মেজে কাপড় কেচে একেবারে ফিরবে। সেই সময় মা এসে খেতে দিলে, দিয়ে সামনে দাঁড়াল। মায়ের দাঁড়ানো থেকেই মনে হল মা যেন কিছু বলবে। খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করলাম--মা, কিছু বলবে নাকি? যেমন করে দাঁড়ালে—

মা বললে—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলবার জন্যই দাঁড়িয়েছি।

—বল।

—মা একটু ভণিতা করলে, বললে, একটা কথা বলব, কিছু মনে ক'র না বাবা।

এবার ভয় লাগল। মনে ভয় হতে লাগল—এমন কি কথা বলবে মা! আর ভয়ই বা কি! মা আমাকে এমন কি বলতে পারে যাতে আমার কষ্ট হবে, আমাকে ভয় পেতে হবে। হেসেই বললাম—বল কি বলবে? তুমি কথা বলবে তাতে আবার মনেই বা কি করব, আর অত ভণিতাই বা কিসের! বল।

—তোমার বিয়ে তো কম দিন হল না বাবা, আর বৌমার বয়সও কম হল না। তোমার বিয়ের সময় বৌমার বয়স ওঁরা বলেছিলেন দশ-

এগার বছর। কিন্তু বয়স আসলে তখন আরও ঢের বেশী। বার পার হয়ে প্রায় তের পূর্ণ হয় হয় হয় তখন। আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে। বৌমার বয়স সতের পার হতে চলল। কিন্তু এখনও ছেলে-পিলে তো কিছু হল না।

—জানিস সুধা আমার খাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেল। মা এবার কি বলবে বুঝতে পারলাম। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

...মা বললে—ঠাকুর-দেবতা, তাবিজ-কবচ করাও তো কম করলাম না বাবা! সে তো তুমিও দেখেছ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না সেও তো বাবা নিজের চোখেই দেখছ। তা আমি বলছিলাম কি, তুমি আবার বিয়ে কর। আমি অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কি বলব! অনেকক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম—তুমি বলছ কি মা? তুমি পাগল হলে নাকি?

...ওদিকে বারান্দায় বাবা কাপড়-চোপড় পরে বেরুবার আগে তামাক খাচ্ছিল। মায়ের আর আমার সমস্ত কথাই শুনেছে। ওদিক থেকে বাবা বললে—পাগলের মত কথা বলেনি তোমার মা। ঠিকই বলেছে। অন্যায় কিছু বলে নি বাবা। তুমি ভেবে দেখ।

মা আরও কঠিন কথা বললে। কি বললে জানিস? পাগল আমরা হইনি বাবা, পাগল হয়েছ তুমি। না হ'লে পাড়া ঘরের লোকে কি বলছে তা তোমার কানে ঢুকত।

...জানিস সুধা, আমার মনে হল মা যেন আমার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারলে। মুখের ভেতরটা আমার শুকিয়ে গেল, বুকটা ধক ধক করতে লাগল। আমি বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছে পাড়া ঘরের লোকে? বোধ হয় আমার এই রকম ভাব দেখে মা যেন ক্ষেপে গেল, বললে—পাড়া-ঘরের লোকে বলছে বৌ নিয়ে তো ঢলাঢলির শেষ নাই, তবুও যদি বউ বাঁজা না হ'ত। ও বউয়ের যা কাঠ কাঠ শক্ত শক্ত গড়ন দাঁড়িয়েছে তাতে ওর আর ছেলে হবে না এ জন্মে।... জানিস, আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেল। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম, মাকে বললাম—বলত মা, পাড়া-ঘরের কে কে এ কথা বলেছে? তাদের নাম কর। আমি তাদের দাঁতগুলো কিল মেরে ভেঙ্গে দিয়ে আসব, জিভটা টেনে ছিঁড়ে আনব। মা আবার খোঁচা মারলে আমাকে, বললে

—তা তোমার বাবা এখন অনেক পয়সা কড়ি হয়েছে, তুমি তা পারবে। এবার বাবা মুখ খুললে বুঝলি। এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বাবা থামিয়ে দিলে মাকে—আঃ, কি অযথা কথা কাটাকাটি করছ তোমরা। এ তো রাগারাগির কথা নয়। এ ভেবে দেখার, বিশেষ ভাবে চিন্তা করবার কথা। ...বুঝলাম অনেক। বাবা যেন ষড়যন্ত্র ক'রে আজ আরম্ভ করেছে ঝগড়া করতে। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না। বাবা বললে—দেখ আনন্দ, তুমি বড় হয়েছ। তুমি বৌমাকে যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দাও, বাইরের লোকের সঙ্গে সে কথা বলে, এটাতে আমি বা তোমার মা কিছু মনে না করলেও পাড়া-ঘরের লোকে কথা বলতে ছাড়বে কেন? কিন্তু সে কথা যাক। সে কথা আজ ধরছিই না। আজ যদি মঙ্গল দত্তর সেই পনর টাকা মাইনের চাকুরী করতে তা হ'লে তোমাকে এ কথা বলতাম না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতাম। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান। তোমার পয়সা হয়েছে, আরও পয়সা হবে তোমার। এ অবস্থায় তোমার সন্তান হোক, আমাদের একমাত্র পুত্রের সন্তান হোক, আমাদের বংশধর আসুক এ বাসনা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে তো তাকে অন্যায় বলতে পারব না বাবা! আর আজ চার বছর হয়ে গেল বিয়ের। এই অবস্থায় যদি তোমাকে তোমার মা আবার বিয়ে করতে বলে থাকেন তা হ'লে অন্যায় করেছেন এ কথা তো বলতে পারব না।...জানিস, সব বুঝতে পারলাম, কি আশ্চর্য শান্ত আক্রমণের কায়দা! আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। গেলাসের জলে হাতটা ধুয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। দেখলাম খিড়কির দরজার সামনে মাজা বাসন হাতে নিয়ে ভিজে কাপড়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে হিলু-বৌ। তাকে দেখে আমি যেন আশ্রয় পেলাম। মা-বাবাকে আর কিছু বললাম না। হিলুকে বললাম—তুমি আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা আলাদা হয়ে যাব। আমি সব ব্যবস্থা করছি। তার ভিজে কাপড় থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে, মাথায় ঘোমটা নেই, হাতের বাসন তখনও নামানো হয়নি। সেই অবস্থাতেই সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। সব কথা বাদ দিয়ে বললে—তুমি খাওয়া ফেলে চল্লে কোথায়? খেয়ে যাও।

—নাঃ। যা বললাম তাই কর। বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

কথা শেষ করে আনন্দ চুপ করে গেল। সুধা ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি বলবে সে? বলার কি আছে? যে বিষাক্ত কথাগুলো এই মাত্র সে শুনলে তার বিষ এখনও ঘরের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর আনন্দ বললে—চল্ একবার আমার সঙ্গে। বাড়ীটা দেখে দাম দর করে আসি। আর একা একা ঘরে বসে থেকে কি করবি? মন খারাপ হবে। আয় আমার সঙ্গে।

সুধা বুঝলে, এই ঘরে বসে ওকে বোঝানো দূরের কথা ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলা যাবে না। সেও বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে। বললে—বাজার পাড়ায় যাবার আগে চল একবার বাগান দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকালে—কেন?

—চল্ না। আমি বলছি। আমার কথা শুনলে তো কিছু দোষ হবে না।

—চল।

বাগানে সেই কুঞ্জের মধ্যে বসল দু জনে। চারিদিকে গাছপালা ঘেরা জায়গাটি বড় ঠাণ্ডা! আনন্দ একেবারে বালির উপর লম্বা শুয়ে পড়ল। কেউ কোন কথা বললে না।

সুধা অনেকক্ষণ পর ডাকলে—আনু!

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল আনন্দ। চোখ না খুলেই সে উত্তর দিলে—উঁ!

—একটা কথা বলব, শুনবি?

—বল। সেইভাবেই সে উত্তর দিলে।

—আমি বলছিলাম কি এই বাড়ী কেনা দু'দিন বন্ধ রাখ না কেন?

এবার আনন্দ চোখ খুলে উঠে বসল। পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে—কেন?

—এখন তুই খুব উত্তেজিত হয়ে আছিস। উত্তেজনাটা কমুক। তারপর হিলু-বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করবি।

হিলু-বৌয়ের নামে আশ্চর্য কাজ হল, যেমন হয় প্রতিবারই। আনন্দ বললে—বুঝলাম। তা আমি এখন কি করব?

—কিছুই করবি না। তুই কেবল একটা কাজ কর। তুই একবার কলকাতা নিয়ে যা হিলু-বৌকে। কোন বড় ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আয়। তারপর যা হয় করবি।

অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল আনন্দ। তারপর বললে—ঠিক বলেছিস। আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল আনন্দ। তারপর বললে—আচ্ছা যদি কলকাতায় বড় ডাক্তার বলে যে ওর ছেলে হবে না কোন দিন ?

সুধা এক মুহূর্ত ভাবল, সহজভাবে বললে—তখন যা হয় করবি।

এবার আনন্দ হাসল, বললে—যা করব তা আমি জানি। ওর যদি ছেলে না-ই হয় কি করব ! তা বলে ওকে তো আর ছাড়তে পারব না।

—ঠিক বলেছিস। আমিও সেই কথা ভাবছি। কিন্তু তোকে বলব কি করে ? অমন মেয়ে হয় না রে আনন্দ !

এবার সুধাকে অবাক করে দিয়ে অকস্মাৎ হা হা করে হেসে উঠল আনন্দ, বললে—এ কথাটা বলব হিলুকে। আজকেই বলব।

—তা হ'লে এবার ওঠ। বাড়ী চল। আজকের মত তো সব প্রশ্নের মীমাংসা হল।

—তা হ'ল। চল বাড়ীই যাই। আর কি ! কিন্তু জানিস সুধা, হিলুর মত মেয়ে সত্যিই হয় না। আমি সংসারের সব ছেড়ে দিতে পারি ওর বদলে। ও কাছে থাকলে আমি আর কিছু চাই না।

দু তিন দিন আর দেখাই হল না সুধার আনন্দের সঙ্গে। একটু মনে মনে আশ্চর্যই হল সুধা। দু দিন দেখা না পেয়ে তিন দিনের দিন বিকেল বেলা নিজেই গেল আনন্দ'র বাড়ী ওর খোঁজ নিতে। বাবা-মায়ের সঙ্গে মন কষাকষির সংবাদ শুনে ওর আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু খানিকটা কর্তব্যবোধ, খানিকটা মমতা আর খানিকটা কৌতূহল টেনে নিয়ে গেল তাকে। যেতে যেতে বার বার মনে হচ্ছিল হিলুবৌয়ের ম্লান বিষণ্ণ মুখ। হয়তো সেই অপরূপ লাবণ্যময় মুখখানি নানান ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে তাকে দেখলে সে অবশ্যই আনন্দ পাবে মনে মনে, তার মুখে শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের আলোর মত একটু ক্লিষ্ট হাসি হয়তো ফুটে উঠবে। বাড়ীর বাইরে থেকেই সে ডাকলে—আনু !

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকলে—আনু। বাইরের বন্ধ দরজায় একটু ধাক্কাও দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিলেন আনন্দ'র মা।

দরজার বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে—আনু কোথায়? আজ দু তিন দিন দেখি নি ওকে।

ওর মা দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, পাছে ওকে ভিতরে যেতে বলতে হয় এই জন্যেই যেন তিনি দরজার কাছে দরজা আগলেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন—কি ক'রে জানব বাবা, সে কোথায় কখন যায় কখন কোথা থেকে আসে—আমাকে তো কিছু বলেও যায় না। দেখি যদি বৌমা জানে।

তিনি দরজা থেকেই ডাকলেন—বৌমা! ও বৌমা!

ঘর থেকে বেরিয়ে এল হিলু-বৌ। শ্বাশুড়ীর আড়ালে রাস্তার উপর তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখখানি এক মুহূর্ত ঝলমল করে উঠল হাসিতে আর খুশীতে। সবটা দেখে সে যেন এক মুহূর্তে সব অনুমান করে নিলে। মাথায় সামান্য একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সে একেবারে উঠানে নেমে এল শ্বাশুড়ীর কাছে। একগাল হেসে সে তাকে বললে—একি, ঘরের মানুষ বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ভাই? এস, ঘরে এস। যা দেখছি এর পর তো আর আসবেই না কোন দিন।

সে শ্বাশুড়ীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই যেন তাকে নিয়ে এসে আসন পেতে দাওয়ার উপর বসতে দিলে। সুধা বসল, বসে বললে—বসে কি করব? আনু কোথায়? জানেন?

একবার সুধার মুখের দিকে তাকাল হিলু-বৌ। কোন এক বিচিত্র ইঙ্গিতময় দৃষ্টি তার মুখের উপর এক মুহূর্ত রাখলে হিলু-বৌ। তারপর বললে—ঠিক তো জানিনা। তা আমার চেয়ে তো তার খবর তুমিই বেশী জান ভাই।

হিলু-বৌ-এর শ্বাশুড়ী এক মুহূর্ত তাদের দু জনের উপর দৃষ্টিপাত করে উঠোন থেকে দাওয়া পার হয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন। সে দৃষ্টি দেখে সুধার কেমন অদ্ভুত অস্বস্তি লাগতে লাগল। আর বসে থাকতে পারলে না সে, বললে—বসে আর কি করব? দেখি ও কোথায়? আমারও তো গরমের ছুটি ফুরিয়ে এল। দু এক দিনের মধ্যেই যাব। বাবার তো আবার দিন দেখা আছে।

—উঠবে? আচ্ছা ওঠ! ধরে তো আর রাখতে পারছি না ভাই। তার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হল যেন সে আরও কিছুক্ষণ বসলেই হিলু-বৌ খুব খুশী হত।

সে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় আনন্দ এসে ঢুকল। তাকে দেখেই বললে—এই যে, তুই এখানে? অথচ তোকে খুঁজতেই আমি গিয়েছিলাম তোর বাড়ী। কতক্ষণ এসেছিস?

হঠাৎ ঘরের ভিতর ঠিক দরজার কাছে একটা শব্দ হল। কি সামান্য কিছু পড়ল যেন। আনন্দ সেটা ভ্রূক্ষেপই করলে না। হিলু-বৌ বোধ হয় শব্দটা শুনতে পেলে কিন্তু তার বাহ্য ব্যবহারে কোন কিছু প্রকাশ পেল না। কেবল সুধা চমকে উঠল। মনে হল যেন একটা বিশেষ ইঙ্গিত করেই হিলু-বৌয়ের শ্বাশুড়ী দরজার কাছে একটা বিশিষ্ট মুহূর্তে একটা কিছু ফেলে দিলেন। হিলু-বৌয়ের চোখে সে চমক এড়াল না। সে হাসল একটু। আনন্দ বললে—আয়, আমার ঘরে আয় সুধা। কথা আছে।

ঘরে ঢুকে আনন্দ বললে হিলু-বৌকে উদ্দেশ করে—এক কাজ কর দিকি। তাড়াতাড়ি কর।

হিলু-বৌ চলে গেল। আনন্দ বললে—আর তো ঝগড়া করতে পারছি না লোকের সঙ্গে। হিলুর ছেলে হল না তাতে লোকের কি বল দেখি? আসল কথা কি জানিস সুধা? আমি যে সামান্য গরীবের ছেলে, আমার চেয়েও এক গরীবের ঘরের একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে আমি সুখী হয়েছি তার রূপে গুণে; আর সে মেয়েটিও সুখী হয়েছে আমাকে পেয়ে, তার উপর খানিকটা ভাগ্য পরিবর্ত্তনে—এইটা যে যে লক্ষ্য করেছে সে-ই খুশী হওয়া তো দূরের কথা, কষ্ট পেয়েছে। ভাবটা এই যে, অতি গরীব ছিল যে তার টাকা হবে কেন? যারা গরীব, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তারা সুখী হবে কেন? যদি সুখীই হল তবে সে সুখটা প্রকাশ করবে কেন?

সুধা চুপ করে ওর কথা শুনলে। বললে—একটা কথা বাদ দিয়ে গেলি আনু। সেইটাই আসল কথা।

তোকে বলি শোন। আমাদের সংসারে আর সমাজে স্ত্রীকে ভালবাসে সবাই, কিন্তু 'ভালবাসি' এই কথাটা প্রকাশ পাওয়া বড় লজ্জারই শুধু নয়, বড় অপরাধের। তুই তো হিলু-বৌকে শুধু যে ভালবাসিস তাই নয়, তুই ভালবাসিস খুব বেশী পরিমাণে। আর তার পরিমাণটা খুব বেশী বলেই

লোকের কাছে সেটা অপ্রকাশ থাকে না, ঐক মুহূর্তে সেটা ধরা পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোর ভালবাসায় আর যাদের অধিকার আছে তারা ভাবে আমাদের অংশের ন্যায্য প্রাপ্য যেটা ওর কাছ থেকে, সেটা ও আমাকে না দিয়ে দিচ্ছে ওর স্ত্রীকে। কেন সে তা দেবে? তাই তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া।

আনন্দ হাসল। বললে—বুঝলাম বাপু হে তোমার কথা। হয় তো যারা এমন করে ভাবছে, হয় তো যাদের ন্যায্য অংশ অন্যায় করে তাদের না দিয়ে হিলুকে দিচ্ছি তারা সঙ্গত ভাবেই আমার উপর ক্ষুব্ধ হচ্ছে। হোক। তাদের ক্ষোভের মাত্রা যদি বেশী হয় তবে শেষ পর্যন্ত যতটুকু দিচ্ছি তাও দেব না। সবটা, আমার জীবনের যা কিছু আছে সব আমি ঐ এক জায়গাতেই দেব, ঢেলে দেব। তাতে যা হয় হোক।

আনন্দ আবার একটু হাসল, হেসে বললে—তাই তো চেয়েছিলাম ভাই। তুই তো হতে দিলি না। আলাদা বাড়ী কিনে হিলুকে নিয়ে আলাদাই তো হতে চেয়েছিলাম। তা তুই তো সে সময় জল ঢেলে দিলি। যাক যে কথা বলছি এখন শোন। কলকাতা তো তাই যাওয়া হবে না হিলুকে নিয়ে।

—কেন? কি হল? অসুবিধাটা কি হ'ল।

—সেখানে আমার চেনা-পরিচিত কেউ নেই। কাকে কোথায় দেখাতে হবে কিছুই জানি না।

—বাঃ, কথাটি একেবারে পাঁড়াগায়ে আনন্দচন্দ্রের মতই হয়েছে। তুই তো কলকাতা মাঝে মাঝে যাস বাজার করতে। তখন তোকে কে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়? ব্যবসাদার আনন্দচন্দ্র আর স্বামী আনন্দচন্দ্রতে এতে প্রভেদ কেন?

সুধার কথা শুনে হাসতে লাগল আনন্দ। হাসি থামিয়ে বললে—মেয়ে মানুষ নিয়ে যাব সঙ্গে। তাকে নিয়ে তো আর যেখানে সেখানে যেতে পারব না। আগে থেকে ঠিক না করে নিয়ে কি করে যাই বল?

—কেন সেদিন যে বললি নরনাথবাবুর কলকাতায় জানা শোনা আছে? তাঁর কাছে যাস নি?

আনন্দের মুখখানা এক মুহূর্তে থমথমে হয়ে উঠল। বললে—সেই কথাই তো বলছি। শোন না কি হ'ল। গাঁয়ের বড় রাস্তার পাশেই বৈঠকখানা। কর্তা তো সামনেই বসে থাকেন চেয়ারে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বড় রাস্তা,

সদর রাস্তা। অনবরত মানুষজন যাচ্ছে আসছে। কর্তা বসে বসে সব দেখছেন। কেন বসে থাকেন জানিস? এই পৃথিবীতে এসে ওঁর যার কাছে যতটুকু পাওনা আছে তার সবটুকু সুদসুদ্ধ আদায় করবার জন্যে। বসে থাকেন আর গড়গড়া টানেন, আর রাস্তার দিকে যেন কত অন্যমনস্ক হয়ে মিটি মিটি তাকিয়ে থাকেন। রাস্তা দিয়ে লোক যায় আসে, কত রকমের লোক। সবাই জানে এইখানে গ্রামের তিন আনা অংশের জমিদার শ্রীযুক্ত নরনাথবাবু বসে বসে বিশ্রাম করেন, তামাক খান। কাজেই লোকজন যাবার আসবার পথে তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান ও যথাবিহিত প্রণাম নমস্কার দিয়ে যায়। তিনি তীর্থের পাণ্ডার মত রাস্তাটি আগলে বসে থাকেন। চেয়ারে বসে তামাক টানতে টানতে লোকের কাছে পাওনা সম্মানটুকু সুদসুদ্ধ আদায় করেন, জমিদারীর খাজনা বাকী থাকলে তাগাদা করেন, ঐখানে এক চেয়ারে বসে গ্রামের সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে নাসিকাগ্র প্রবেশ করান, আপনার মতামত বা হুকুম দেন। প্রয়োজনমত কাউকে তিরস্কার করেন, কখনও কাউকে মিষ্টি কথায় পুরস্কৃতও করেন। তবে সে কদাচিৎ। মিষ্টি কথা বা প্রশংসা মুখ দিয়ে বড় একটা বের হয় না। জানিস সুধা, গেলাম ওঁর কাছে। ওঁর বৈঠকখানার বারান্দায় উঠবার আগেই ডাকতে আরম্ভ করলেন—আরে আনন্দ যে, কোথায় চলেছ? এস এস। বসে যাও একবার। যাবে কোথায়?

—বসে তামাক খাচ্ছেন আর ওঁর চার পাঁচ বছরের ছেলেকে আর একটি লোক কোলে করে আদর করছে। আমার দেখে কি মনে হল জানিস সুধা? ঠিক মনে হল যেন বাঘের ধাড়ী মা তার বাচ্চাকে শেখাচ্ছে কেমন করে জানোয়ার মারতে হয়, তারপর খেতে হয় কেমন করে। মানুষটা আমাদের গ্রামেরই লোক, পচা বাউতি, চিনিস তো তাকে? সে বেচারা ছেলেটাকে কোলে নেবার জন্যে দু হাত বাড়িয়ে কাকুতি মিনতি করছে—এস খোকাবাবু এস। এস এস, একবার কোলে করি। এস তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ী। একটা সাদা, একেবারে দুধের মত সাদা ছাগলের বাচ্চা দোব। এস।…তবে বুঝলি ছেলেটা কোলে নেবার মত ছেলে বটে। দেখতে বড় ভাল ছেলেটা। ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, এই বয়সেই কী চমৎকার টিকালো নাক। মোটাসোটা তুলতুলে গড়ন, অথচ মোটা নয়।

বুঝলি আমারও দেখে খুব ভাল লাগল। লোকটা কেমন সাধ্য সাধনা করছে। আর কর্তা তো নির্বিকার তামাক টানছেন। মাঝে মাঝে ছেলের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছেন। আমি বললাম শেষকালে—যাওনা খোকন, যাও। অত করে ডাকছে তোমাকে।...অত সাধ্যসাধনাতে না আমার কথাতে জানি না, ছেলেটি ওর কোলে উঠে বসল। বসে যেন তাকে কৃতার্থ করে দিলে। পচা ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে লাগল।

আমাকে আপ্যায়ন করে নরনাথবাবু বললেন—বস, আনন্দবাবু বস।

বসলাম। বসতেই জিজ্ঞাসা করলেন—এ দিকে কোথায় চলেছিলে? মাঠের দিকে নাকি?

সবিনয়ে বললাম—আজ্ঞে না। একবারআপনার এখানেই এসেছিলাম।

কর্তা বেশ উৎসাহিত হয়ে বললেন—তাই নাকি? বেশ বেশ। বস। বাবার কাছে দরকার আছে নাকি? ডাকাব?

—আজ্ঞে না। আপনার কাছেই দরকার একটু।

—আচ্ছা! বস।

আমার কথা বলবার আগেই একেবারে লম্বা ছন্দে গল্প ফাঁদলেন তিনি—তারপর, তোমার ভাবনা কি হে! তুমি তো একজন লক্ষ্মী-আশ্রিত পুরুষ। তুমি যখন বৃত্তি পেলে না তখন তোমার বাবার সে কি আক্ষেপ! আমার কাছে দুঃখ ক'রে বললে—বাবু, আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা স্বর্গে যায় না, আস্তাকুঁড়েই পড়ে থাকে তা মানতে হল এবার। ছেলেটাকে আমারই মত কোন জমিদারী সেরেস্তায় কিম্বা কোন ব্যবসার গদীতে খাতা লিখতে হবে। তা আমি তখন বলেছিলাম—কিছু ভেব না রাম, ছেলে তোমার বাহাদুর ছেলে। ও একটা কিছু করবেই। তা তুমি যখন মঙ্গল দত্ত'র দোকানের কাজ ছাড় তখনও তোমার বাবা বলেছিল—এই হ'ল, আমার গোঁয়ার ছেলের জন্যে এবার শুকিয়ে মরতে হবে। শুধু ছেলে নয়, আবার ছেলের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছি, বিয়ে দিয়েছি ছেলের। তা তখনও আমি বলেছিলাম—কিছু ভেবো না মুখুজ্জে, তোমার ছেলে চুপ করে বসে থাকবে না। ও একটা কিছু করবেই।

বুঝলি সুধা, যেদিন মঙ্গল দত্ত ওঁর কাছারীতে ছুটে এসেছিল সেদিন তুইওতো ছিলি—সেদিনের কথা মনে করে আমার হাসি এল। অনেক কষ্টেই

হাসি থামালাম। তা ওরা তো বড় মানুষ। ওঁদের এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কথা বলেই চললেন, বলেই চললেন—তা আমার কথা সত্যি হয়েছে। চোখের উপর এই তিন চার বছরে তো দেখলাম তুমি একেবারে সামান্য অবস্থা থেকে কি ক'রে ফেললে! তা এখন তো বাজারে তোমার খানচারেক দোকান, না কি হে?

জানিস সুধা, ইচ্ছে হল একবার বলি—তোমার যা জমিদারীর আয় তার চেয়ে আমার দোকানের আয় কম নয় মশায়। মুখে বললাম—আজ্ঞে জংশন সহরেও একখানা কাপড়ের আর একখানা মুদিখানার দোকান আরম্ভ করেছি এই কিছু দিন হ'ল। সেটা এখনও কেউ জানে না।

বুঝলি বলে আমার ভারী ভাল লাগল, আরামও পেলাম। দেখলাম বাবুর মুখখানা একেবারে কেমন সাদা হয়ে গেল। মুখে বললেন—আহা বেশ, বেশ। এ কতো আনন্দের কথা। আমি তো তাই তোমার বাবাকে বলি—মুখুজ্জে, আর কি পনর টাকা মাইনের চাকরী কর হে? তোমার ছেলের এমন ব্যবসা—ব্যবসা দেখ। তা মুখুজ্জে বলে—আমার আপনার দরবারের শাকভাতই ভাল হুজুর। আমার ছেলের টাকার পোলাও কালিয়া আমার রুচবে না। তা আমি হেসে বলি—বেশ তাই কর। আমার জমিদার-বাড়ীর অন্নই খাও। এ অন্ন রাজ-অন্ন, পৃথক একটা দাম এর আছে বৈকি!...তা বেশ। খুব ভাল। তবে একটা কথা। এত সব করলে যে, এত সব যে করছ—কার জন্য করছ? কে খাবে এসব তোমার? এঁা? বয়স তো তোমার কম হ'ল না? কত হল—বাইশ? তেইশ? কুড়ি একুশ? তা তুমি তো বিয়ে করেছ আমাদের ব্রজ চাটুজ্জের ভাগ্নীর মেয়েকে। তা তোমার স্ত্রীরও তো বছর আঠার বয়স হবে! তারও তো সন্তান হল না। আর যখন এতদিন হল না আর তখন কি আর হবে?

আমি বললাম—আজ্ঞে সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

চমকে উঠলেন নরনাথ বাবু। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, গলা আপনি খাদে নেমে গেল। বললেন—বল। আমিও তো তাই তোমার বাবাকে কিছুদিন থেকেই বলছি—মুখুজ্জে, ছেলের আবার বিয়ে দাও। তোমার ও পুত্রবধু বন্ধ্যা! ওর ছেলেপিলে হবে না। আবার বিয়ে দাও। অনেক ঠাকুর-দেবতা, তাবিজ-কবজ তো করেছ। কিছুতেই তো কিছুই

হ'ল না। আবার বিয়ে দাও ছেলের। খুব ভাল সৎবংশের সুন্দরী কন্যারও অভাব নাই। এইতো হাতের কাছে আমার ভাগনী—

নরনাথবাবুর কথাকে মাঝখানে আমাকে কেটে দিতে হ'ল। কিছুক্ষণ থেকেই কথাবার্তার মধ্যে একটা চাপা' 'আঃ' 'আঃ' শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে। ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম—পাচ বাউতির লম্বা লম্বা গোঁফ ধরে টানছে পাঁচ বছরের জমিদার নন্দন। সে বেচারা ব্যথায় কাতর হয়ে উঠেছে। তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে যন্ত্রণায়। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম—এই খোকন ছাড়। নরনাথবাবু তাকালেন। পচা—অতবড় মানুষটা এক মুহূর্তে লজ্জিত হয়ে ছোট হয়ে গেল যেন সে। নরনাথবাবুর দিকে তাকাতেই সে বললে—না, না, আমার লাগে নি হুজুর। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—সে অন্য ব্যাপার বাবু। এই খোকাবাবুর মত এমনিই দেখতে, এমনি বয়েস, আমার একটি ছেলে ছিল হুজুর। সে আজ বছর খানেক মারা গিয়েছে হুজুর। তাই—

তাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে নরনাথবাবু ডাকলেন—লুকু, এইখানে আয়। তারপর পচাকে বললেন ওরে পচা, এবার থেকে যখন আমার কাছারীতে আসবি গোঁফটা কামিয়ে আসিস। বুঝলি।

পচা পালিয়ে বাঁচল। আমি ওকে বললাম—আমি এসেছিলাম একটু অন্য কারণে। আপনার কলকাতায় তো জানাশোনা আছে। আমি আমার স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোন বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে আনতে চাই। আপনি যদি সে বিষয় আমাকে কিছু পরামর্শ দেন।

...জানিস সুধা, ভদ্রলোক আমার কথা শুনে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখের চেহারাটা পাল্টে গেল। কেমন এক ধরণের হাসি হাসতে হাসতে বললেন—ওঃ, তাই বল। ভেবেছিলাম—। যাক। আমার ভুল হয়েছিল। এখন কি বলছ বল।

...জানিস ভদ্রলোকের হাসি দেখে হঠাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ওঁর কোলের কাছে ওঁর ছেলে বসেছিল আমার দিকে চেয়ে, তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—এস খোকন এস, কোলে করি।

জমিদারের ছেলে, ও কি সহজে ভোলে? আমাকে কি বললে জানিস? বললে—তুমি আমাকে তখন বকলে কেন?

—বকলাম? না তো? আচ্ছা, আমার দোষ হয়েছে। এবার এস।

ছেলেটি আমার কোলে এসে গেল। ব্যপারটা আমার কাছে বেস সহজ হয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম তোমার?

—কেন জান না? সবাই তো জানে আমার নাম। আমার নাম শ্রীলোকনাথ বন্দোপাধ্যায়।

এবার তাগাদা দিলেন নরনাথবাবু—কই হে, তোমার কথা শেষ করে নাও। আমার অন্য কাজ আছে।

ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে ওঁকে বললাম—আপনার তো কোলকাতায় পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আছে। তাঁদের কাউকে যদি লিখে দেন আমাকে একটু সাহায্য করতে এই ব্যাপারে। আমি তো ওসবের কিছুই জানিনা।

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—তা হ'লে কলকাতায় সাহেব-ডাক্তার দেখানো চাই তোমার স্ত্রীকে। তা আমার তো এমন বন্ধু কেউ নেই সেখানে যে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

—কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম আপনার এক আত্মীয় ডাক্তার আছেন ওখানে। আমি বললাম।

—তা তুমি শুনতে পার অনেক রকম। ভুলও তো শুনতে পার। আমিও তোমার সম্পর্কে শুনেছিলাম তুমি আবার বিয়ে করছ। আমারও তো ভুল হয়েছিল।

কি আশ্চর্য অপমান করার কৌশল। আমি তবু বললাম—আজ্ঞে তা হ'লে—

—তা হলে এস। আর আমার আত্মীয় ডাক্তার থাকলেই তাকে তোমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করব এমন নাও হতে পারে।

খোকনকে বললাম—খোকন নাম। আমি বাড়ী যাই।

বড়লোকের ছেলে কি খেয়াল হল, বললে—না। তুই আমায় কোলে নিয়ে থাক, যেতে পাবি না।

আমার রাগ হ'ল। ওকে কোল থেকে ঝাঁকি দিয়ে নামিয়ে দিতে গেলাম যদিও বললাম—নাম, নাম, খোকন। কাজ আছে।

খোকন কিন্তু তখন আমার মাথার চুল এক হাতে আর এক হাতে জামার

পকেট টেনে ধরেছে। আমি আর টেনে ছাড়াতে পারি না। ওকে টেনে নামালাম যখন তখন আমার মাথার দু চার গাছা চুল ছিড়ে রয়ে গেল ছেলে-টার হাতে, জামার পকেটটাও খানিকটা ছিড়ে গেল। এই দেখ না পকেটটা দেখ।

আমার কি মনে হল জানিস? মনে হল বাপ-বেটা দু জনে মিলে আমাকে সব দিক দিয়ে অপমান করে মেরে তাড়ালে।

রাস্তায় নামতে নামতে ভদ্রলোককে বললাম—আপনার ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ। তবে আপনি যা ভেবেছেন মনে মনে তা কোন দিন হবে না এটা জেনে রাখবেন। আর ছেলেকে একটু শিক্ষা দেবেন।

আশ্চর্য! ভদ্রলোক রাগ করলেন না। বললেন—শুনলাম সব। তবে আবার যখন আসবে তখন খালি গায়ে, আর মাথাটা ন্যাড়া করে এসো হে বুঝলে। তা হ'লে মাথার চুলেও টান পড়বে না, জামার পকেটও ছিঁড়বে না।

কথা শেষ করে চুপ করে গেল আনন্দ।

এমন সময় হিলু-বৌ মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকালে। এক মুহূর্তের জন্যে তার বড় বড় চোখের স্থির দৃষ্টি থমকে রইল আনন্দের মুখের দিকে। তারপর আবার চোখ হেঁট করে খাবারের পাত্র সরিয়ে দিতে লাগল।

তারপর দাঁড়িয়ে বললে—দেখ তো ভাই আলুভাজায় নুন ঠিক হয়েছে কিনা! একটু হাসল—ওঁর মাথায় ভাবনা-চিন্তা থাকলে উনি তরকারীতে মাছে নুন দিলাম কি না, বেশী দিলাম কি না, কিছুই বুঝতে পারেন না। যা দি খেয়ে চলে যান।

—নুন ঠিক আছে। সুধা বললে।

—আচ্ছা জল নিয়ে আসি আমি। হিলু-বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধা বললে—আনন্দ, তোকে ভাবতে হবে না। আমি আজ বাবাকে বলে চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার বড় মামাশ্বশুরকে। তাঁকে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসব। তিনি কলকাতাতেই চাকরী করেন জানিস তো?

অসহায় আনন্দ যেন অকস্মাৎ একটা কূল পেল। সে কোন কথা না বলে কেবল সুধার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার মুড়ির বাটিতে মন দিলে।

একটা বাটিতে করে মিষ্টি আর জল নিয়ে ফিরে ঘরে ঢুকল হিলু-বৌ।—খাও ভাই। নুন-মুখ মিষ্টি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

—আনুকে দিলেন না?

—ওর লাগে না। আমার হাতের নুনই ওর মিষ্টি। কি বল, কথা বলছ না যে।

আনন্দ মুখ তুলে তাকালে হিলু-বৌ আর সুধার দিকে, পরক্ষণেই আবার মুখ নামিয়ে নিলে। ওর দুই চোখ জলে টলমল করছে।

শেষ পর্যন্ত সুধার সঙ্গেই কলকাতা গেল আনন্দ আর হিলু-বৌ। সুধার মামাশ্বশুরকে সুধার বাবা লিখে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। দিন তিনিই দেখে দিলেন। ঠিক হ'ল সুধা কলকাতায় ওকে দেখিয়ে ওদেরই সঙ্গে ফিরে একেবারে স্কুলে যাবে; ওরা বাড়ী ফিরে আসবে।

গোটা গ্রামেই এই নিয়ে নানান জায়গায় নানান বিরূপ আলোচনার সূত্রপাত ও সমাপ্তি হয়েছে। এর পূর্বে এ গ্রাম থেকে অনেকেই অনেকবার কঠিন অসুখে দেখাবার জন্যে কলকাতা গিয়েছে, ডাক্তার দেখিয়েছে। কিন্তু ঠিক এই রকম প্রয়োজনে কেউ এর আগে কোনদিন যায় নি। সন্তান হয় নি, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করা হয়েছে, ধর্না দেওয়া হয়েছে। তাবিজ-কবচে বধূর হাত গলা ভরে উঠেছে। উপবাসে শরীর ক্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোথাও ফল হয়েছে, সেখানে দেবতার মহিমা প্রচার করা হয়েছে, দেবতার দয়া স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। যেখানে সন্তান হয় নি, সেখানে আক্ষেপ করা হয়েছে, শেষকালে ঘোষণা করা হয়েছে বধূ বন্ধ্যা। স্বামী আবার কোথাও সানন্দে, কোথাও বাধ্য হয়ে বিবাহ করেছে। কিন্তু ডাক্তার বদ্যির হাতে চিকিৎসার কথা ওঠে নি।

নানান কুটিল আলোচনা। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার কোনটাই মাথা তুলতে পারে নি রাধামাধব ভট্চাজ মশায়ের সম্মতিতে। ওরা চলে গেল। যাবার পূর্বে শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করতে গিয়ে কোন আশীর্বাদ পেলে না হিলু-বৌ। কেবল ভট্টচাজ মশায়কে প্রণাম করতে তিনি আশীর্বাদ করলেন—পুত্রবতী হও মা। মনোবাসনা পূর্ণ করুন নারায়ণ। চোখের জলে ভট্চাজ মশায়ের পা ভাসিয়ে দিয়ে হিলু-বৌ গাড়ীতে উঠল।

যাবার সময় শান্ত স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু ফিরবার সময়

সারা রাস্তা কোলাহল করতে করতে ফিরল তারা। বিশেষ করে আনন্দ। ডাক্তার দেখেছেন। বলেছেন, বিশেষ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—ভয়ের বা নিরাশার কোন কারণ নেই। হিলু-বৌ হাসি মুখে সারা রাস্তা ওদের দিকে চেয়ে থেকেছে, ওদের কোলাহলকে দুই চোখ ভরে দেখতে দেখতে এসেছে সমর্থনের দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে মৃদু তিরস্কার করেছে ওদের—কি ছেলেমানুষী করছ তোমরা। চুপ করে বস। কখনও আনন্দকে বলেছে—কি, তুমি পাগল হলে না কি?

তিরস্কার করেছে। তবু মুখের হাসি মিলায় নি তার।

সুধা সারা রাস্তা তাই দেখতে দেখতে এসেছে। আজ বহুকালের পারিবারিক গণ্ডী, বহুদিন ধরে তিল তিল সঞ্চিত ক্লেশ—সব কিছু থেকে মুক্তি পেয়েছে ওরা দুজনে। আজ পরিবেশ-বন্ধনহীন মন আনন্দে ভর্তি, আজ যদি ওরা একটু খুশী হয়ে চপলতা প্রকাশই করে ক্ষতি কি!

আনন্দ হঠাৎ বললে—সুধা জানিস, এই গেঁয়ো মেয়েটা কখনও ট্রেনে চড়ে নি এর আগে।

হিলু-বৌ বললে—তাতে আর আমার লজ্জা নেই মশাই। এমন গেঁয়ো মানুষ যে স্ত্রীকে কখনও ট্রেনে চড়ায়নি।

তারপর একসঙ্গে হাসি।

সুধার অবস্থা বিচিত্র। সে যে ধাতের মানুষ তাতে তার আনন্দ দুঃখ সব কিছুরই প্রকাশ সংযত, শান্ত; আনন্দের আত্ম-প্রকাশের তুলনায় কিছু পরিমাণে হয়তো স্তিমিতও। তার উপর তার যে বংশে জন্ম সেখানে অতিরিক্ত আনন্দিত হওয়া ও তা প্রকাশ করা প্রায় রীতি ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই সে মাঝে মাঝে ওদের আনন্দ-উদ্বেলিত পরিবেশ থেকে আপনিই সরে এসেছে। ওদের আনন্দ প্রকাশকে মাঝে মাঝে সমালোচকের মত দেখছে; দেখতে দেখতে মনে হয়েছে—এতটা উচ্ছ্বসিত প্রকাশ না হলেই যেন ভাল হ'ত, শোভন হ'ত। আবার ধীরে ধীরে ওদের অদৃশ্য আহ্বানে কখনও সেই খুশীর স্রোতে গিয়ে অবগাহন করে ওদেরই সঙ্গী হচ্ছে।

কামরায় ওরা ছাড়া আর একজন মাত্র যাত্রী। কাজেই হৈ-চৈ করতে বাধা কোথায়?

প্রত্যেক স্টেশন আসছে, আর আনন্দ খাবার জিনিষ কিছু না কিছু কিনছে,

নিষেধ করলেও শোনে না। কিনছে, নিজেই খাচ্ছে প্রথম, তারপর ডাকছে ওদের দুজনকে অংশ গ্রহণ করতে। না নিলে জোর ক'রে খাওয়াচ্ছে।

বর্ধমান পার হয়ে গেল। এক গাদা খাবার কিনলে আনন্দ। সুধা এবার একটু বিরক্ত হল। বললে—তুই খেপলি না কি আনন্দ?

হিলু-বৌ একটু হাসল। একবার গাড়ীর চারিদিক দেখে নিলে। একমাত্র অপর যাত্রীটিও তখন নেমে গিয়েছে। হিলু-বৌএর চোখ থেকে পর্যন্ত কৌতুকের হাসি উপচে পড়ছে যেন। সে বললে— ভাই, এই সাদা ব্যাপারটা এতদিনে তোমার নজরে পড়ল? ওর পাগলামির কি আজ সুরু? আর কেউ না জানুক তোমার তো জানবার কথা—যেদিন থেকে ও এই সুন্দরী বউটি পেয়েছে ও খেপেছে সেই দিন থেকে।

সুধা অবাক হয়ে গেল। হিলু-বৌয়ের চরিত্রের সবচেয়ে বড় মাধুর্য ওর পরিমিতি-বোধ। ও কখনও অসংযত, অপরিমিত কথা বলে না, রসিকতা করে না। সেই হিলু-বৌ আজ এ-কথা বললে! তা হ'লে ও কতখানি খুশী হয়েছে!

তবু ওর কথাটা সুধার ভাল লাগল। আনন্দ'র দিকে তাকাতেই মনে হল সেও যেন শুনেছে কথাটা। ওর চোখে চোখ পড়তেই আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে নিলে। আনন্দ লজ্জা পেয়েছে। এটা নূতন। হিলু-বৌ কথাটা বলে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ গাড়ীর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল আনন্দ। তারপর আবার নিজের লজ্জাটা সামলে নিয়ে এসে বসল ওদের পাশে। খাবার পাত্র এগিয়ে বললে—সুধা খা, খাও হে।

কপট ক্রোধে হিলু-বৌ বললে—তুমি না এঁটো করেছ এগুলো? আমরা খাব কেন?

আনন্দ'র জবাব যেন তৈরী ছিল, সে বললে—কেন রায় মহাশয়ের কীর্তন শোন নাই? সুধা তোর তো মনে আছে রে? সেই যে মা যশোদাকে রাখালরা বললে—মা, তোমার গোপালের খাবার জন্যে ভেব না। আমরা বনের ফল খুঁজে এনে খানিকটা খেয়ে তারপর তোমার গোপালকে দি! মা যশোদা বললেন—বাবা, তোমরা আমার গোপালকে এঁটো ফল দাও? রাখালরা বললে, হ্যাঁ মা, তাই দিই। —কেন দাও বাবা? আমার

গোপালকে তোমরা উচ্ছিষ্ট ফল দাও? —হ্যাঁ মা। যদি সে ফল বিষফল হয় তা হ'লে গোপালের মরণ না হয়ে তার আগে আমরাই মরব। আমাদের গোপালকে রেখে আমরাই যাব।···তোরা দুজন আমার সেই গোপালরে!

সুধা অবাক হয়ে গেল। সেই ছাত্র অবস্থার আনন্দ, আর আজকের এই আনন্দ, কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে? কি ক'রে এল সে এখানে? কে আনলে ওকে? হিলু-বৌ? সঙ্গে সেও কি? হবে হয়তো।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল সে। বললে—ওরে এবার তোদের নামতে হবে। স্টেশন প্রায় এসে গিয়েছে।

ট্রেণ থামল। ওরা নেমে গেল। সুধা বসে রইল। সে যাবে সদরে ইস্কুলে। সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। আনন্দ আর হিলু-বৌকেই দেখছে। আনন্দ এগিয়ে এল—হেসে বললে—যা, আবার আসবি কখন?

—পূজোর সময়।

হিলু-বৌ একেবারে আনন্দ'র কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আপনার একখানা হাত দিয়ে সুধার হাত চেপে ধরল। মুখে কিছুই কেউ বললে না। কেবল হিলু-বৌয়ের দুচোখ জলে একেবারে ভর্তি হয়ে এল। সুধা দেখলে, আনন্দ দেখলে। আনন্দ ধরা গলায় বললে—সরে এস, ট্রেণ ছাড়ছে।

গাড়ী চলতে লাগল। যতক্ষণ গাড়ী থেকে দেখা যায় ততক্ষণ মুখ বাড়িয়ে থাকল সে। দেখলে হিলু-বৌ চোখ মুছতে মুছতে ওরই দিকে চেয়ে আছে। স্ত্রীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আনন্দও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সুধার চোখও অকস্মাৎ জলে ভরে এল। এক সুন্দরী অনাত্মীয় তরুণীর এই নির্ভরতা আর বিশ্বাসের মহিমা কি অপরূপ, তার আস্বাদ কি বিচিত্র যেন কোন্ এক আশ্চর্য মহিমায় তার এই মুহূর্তটি মহিমান্বিত হইয়ে উঠেছে।

তিন

নিত্য-নিয়মিত স্কুলে পড়া দেবার জন্যে পড়াশুনা করা, আর আসন্ন পরীক্ষার ভয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাওয়া আর প্রাণপাত পরিশ্রম করা এ যেন ছাত্রজীবনে মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন খানিকটা খানিকটা করে অগ্রসর হওয়া। মরুভূমি পার হতেই হবে। সামনে কোন আশ্বাস নেই, আছে কেবল আগামী কালের যাত্রার যন্ত্রনা। সেই যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন পথ চলতে হচ্ছে সুধাকে। বাইরের পড়াশুনো একেবারে বন্ধ। বাইরের বইয়ে ডুবলে এ দিকে পাঠ্য পুস্তকে আর মন বসবে না। তার উপর পরীক্ষা। পরীক্ষায় যেমন করে হোক ভাল ফল করতেই হবে। আর সামনেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। আর ক'মাসই বা দেরী। অথচ বিয়েতে বেশ কিছু দিন নষ্ট হয়ে গেল। সুধা চেষ্টা করে করে পড়াশুনার মধ্যে ডুবে গেল।

মাঝে মাঝে কমলার কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আর হিলু-বৌয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়লেই হিংসা হয় খানিকটা। কেমন পরমানন্দে আছে ওরা দু জনে। সেই বিয়ের পর থেকেই ওরা দু জন এক সঙ্গেই আছে, ছাড়াছাড়ি হয়নি ওদের। আর তার যদি বিয়ে হল তো থাক আলাদা হয়ে এক বছর। তারপর দ্বিরাগমন হবে। তারপর কমলা থাকবে শ্বশুর বাড়ীতে, আর সে পাশ করে বর্ধমান কি কলকাতায় পড়তে যাবে।

তবু উপায় কি? এই করতেই হবে। নিয়ম। এর সান্ত্বনা কোথায়? ভুলে থাকবারও কিছু নেই। অথচ এদিকে নিজের জীবন আছে, বৃহৎ জীবনের কামনা আছে, কল্পনা আছে। কাজেই পড়াশুনার ভিতরেই ডুবতে হল তাকে। পড়তে পড়তে পড়াশুনোও ভাল লাগল।

এই সময় যুগপৎ বাবার আর শ্বশুর মহাশয়ের চিঠি। বাবার নির্দেশ— "তোমার শ্বশুর মহাশয় বার বার তোমাকে ও বাটী যাইবার জন্য লিখিতেছেন। অতএব তুমি একবার স্কুল ও তোমার বোর্ডিংএর কর্তৃপক্ষের আদেশ লইয়া সেখানে যাইবে। এক সপ্তাহ সেখানে থাকিবে। তদতিরিক্ত

এক দিন থাকিবে না। তোমার পরীক্ষার বৎসর। আশাকরি সে কথা মনে রাখিয়া পড়াশুনা কর্তব্যমত করিয়া যাইতেছ। এবং সেই জন্যই সেখানে অধিক দিন থাকা উচিৎ হইবে না। আগামী বারই শ্রাবণ ভাল দিন। সেই দিন মধ্যাহ্নে একটার পর যাত্রা করিবে।" বাবা প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

শ্বশুর মহাশয়ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—"বাবাজীবন, আমার ও তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ও তোমার ও বাটীস্থ অন্যান্য গুরুজনের শুভাশীর্বাদ অত্র পত্রে জানিবা। আমি এবং বিশেষভাবে তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তোমাকে অধিক কাল না দেখার কারণ তোমাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তোমার পরীক্ষার জন্য পড়াশুনার কারণ শরীরও ভাল যাইতেছে না জানিয়াছি। এ বিষয়ে আমি বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি অনুমতি দিয়াছেন এবং আগামী বারই শ্রাবণ ভাল দিন বিধায় তোমাকে যাত্রা করিতে বলিয়াছেন। অতএব বাবাজীবন, পত্রে লিখি—তুমি ঐ তারিখ আসিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিয়া আনন্দ বর্ধন করিবা।"

আবার শ্বশুর বাড়ী। কত সমারোহ, আনন্দ, কোলাহলের অন্তে আবার কমলার সঙ্গে দেখা।

দিনের বেলা বাড়ীর ভিড়ের ভিতরে ঘোমটা-টানা কমলাকে মাঝে মাঝে দেখেছে সে। সে তো অবস্থিতির চিহ্ন খালি। দেখা হল শোবার সময় সেজের নরম আলোতে। মাথায় তখনও ঘোমটা টানা। দ্বিধাজড়িত পদে ঘরে আসতেই সুধা সপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার সঙ্কোচ হল। কমলার সঙ্গে পিছন পিছন এসে কে যেন তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সে-উঠে দাঁড়াতেই যেন ঘরের চারিপাশ থেকে চাপা খিলখিল হাসি বেজে উঠল গয়নার রিনঝিন শব্দ, চাপা গলায় কথার শব্দ। দরজা বন্ধ করেও অনেকক্ষণ আড়ষ্ট পুলকিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল দু জনে। তারপর ধীরে ধীরে সে কমলার ঘোমটাখানি তুলে দিলে। সুন্দর লাবণ্যময় মুখখানিতে চোখের পাতা দুটি মুদে আছে। দুই ভ্রূর মাঝখানে মসৃন ছোট্ট কপালটির নীচে কাঁচপোকার টিপ অল্প আলোতেও মাঝে মাঝে চক চক করে

উঠছে। কমলা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমার মত। সে আস্তে আস্তে তার চিবুকখানি তুলে ধরলে। পাতলা ঠোঁট দুটি পানের রঙে লাল, রসে ভিজে। কেবল টিকালো ছোট নাকটির দুটি কোমল প্রান্ত গাঢ় নিশ্বাসের টানে মাঝে ফুলে কেঁপে উঠছে। সুধা ধীরে ধীরে ওর হাতখানি ধরলে। কোথায় কৌতুকময়ী, লীলাচঞ্চলা, হাস্যমুখরা কমলা! সে হাত ধরে তাকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

তারপর আদি অন্তহীন কোমল অন্ধকার।

সুধা অনুভব করলে যেন বিশ্ব সংসারের বিপুল সস্নেহ দৃষ্টি এই মুহূর্তে ওরই দিকে নিবদ্ধ। বিশ্ব সংসারের আনন্দ আর কৌতুকের কেন্দ্রস্থল হিসেবে সংসার যেন সকৌতুক দৃষ্টি নিয়ে ওরই দিকে চেয়ে আছে। আর অন্ধকারের আবরণ দিয়ে সে-ই যেন ওদের ঘিরে দিয়ে সে কৌতুকের পরিমাণকে বাড়িয়ে তুলেছে। এক বিচিত্র অহঙ্কার আর পুলকে সে বিহ্বল হয়ে গেল। সে আনন্দ আর হিলু বৌয়ের জীবনযাত্রা তাদের জীবনের দরজায় দাঁড়িয়ে দর্শকের মত লক্ষ করেছে। অপরিমেয় আনন্দ আর রসের আভাস মাত্র পেয়েছে সেখানে। দেখে ভাল লেগেছে। আর আজ তার নিজের জীবনে সেই আনন্দ মূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। অশেষ কৃতজ্ঞতায় আর মমতায় সে অন্ধকারের মধ্যেও কমলার দিকে চাইলে। তার মাথায় হাত রাখলে। তার হাতের উপর দ্বিগুণ মমতার মত আর একখানি কোমল হাত এসে পড়ল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘুম ভেঙে গেল। পাশে কমলা গাঢ় ঘুমে অচেতন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে খাটের উপর, কমলার ঘুমন্ত দেহের উপর, মুখের উপর। সে সস্নেহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কপালের টিপটি উঠে গেছে, রাতের সযত্ন খোঁপা খুলে গিয়ে এলোমেলো চুল মুখের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ওকে দেখে ওর বয়সের চেয়ে ছোট মনে লাগল। সে ধীরে ধীরে ওর মুখের উপর থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিতে লাগল। ঘুমন্ত কমলার ঠোঁট দুটি যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে হাসিতে বিস্ফারিত হতে লাগল, তারপর যেন স্বপ্নের ঘোরেই সে চোখ খুললে। মুখ দিয়ে স্বপ্নাতুরের মত কথা বেরিয়ে এল—কি দেখছিলে?

—তোমাকে?

—আমাকে? আচ্ছা বলত, আমি সুন্দর না হিলুদি সুন্দর। ঠিক বলবে কিন্তু।

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল সুধা, তারপর বললে—হিলু বৌ সুন্দর। তুমি তার চেয়েও অনেক সুন্দর আমার কাছে।

—ঠিক বলছ? মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে মুখে আটকে যাচ্ছিল বলে ভাল করে ভেবে নিলে বুঝি? নিয়ে বললে?

—না সত্যি কথাই বলেছি। আমার কাছে কি তোমার রূপের তুলনা আছে? তুমি তো আমার কাছে সব তুলনার বাইরে!

—সত্যি নাকি? মুখ বাঁকিয়ে কৌতুকের সুরে বললে কমলা। কথাটা তাকে আনন্দে বিহ্বল করেছে। কিন্তু আনন্দকে হজম ক'রে কৌতুক করার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কথা বলছে সে।

এবার সুধাও কৌতুক করলে। বললে, আমার যদি আর একটা বিয়ে থাকত তুলনা করে দেখতাম না হয়।

—আবার একটা বিয়ে করবে? বল না কনে ঠিক করে দি।

—করছিই তো। রোজই তো তোমাকে নূতন করে পাই মনে মনে। আবার আর একটা কনের দরকার কি?

এবার কমলা গলে গেল, বললে—আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে? আমার আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না।

আনন্দ আর হিলু-বৌয়ের কথা মনে পড়ল। তারা যা পেয়েছে তার চেয়ে তো সে কম পায় নি! সে যা পেয়েছে, যা পাবার প্রত্যাশা রয়েছে তা ক'জন পায়? সে উত্তর না দিয়ে শুধু কমলার দিকে চেয়ে থাকল।

পুজোর ছুটিতে বাড়ী এসে সুধার মনে হতে লাগল কমলার কথা। এত বড় বৃহৎ আনন্দের মধ্যে কমলা নেই। তার তো উৎসবের আধখানাই নষ্ট হয়ে গেল। তবু পড়াশুনোর কথা মনে করে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে। পড়াশুনো আজকাল তার বেশী করে ভাল লাগছে। নিজের সুবৃহৎ ভবিষ্যৎ কল্পনা করে পড়াশুনোকেই সে প্রতিদিন আঁকড়ে ধরছে। যেখানে তার মন অহরহ আজকাল ঘুরে বেড়ায় সেখানে বৃহৎ, দীর্ঘাকার, কীর্তিমান মানুষের সমাবেশ; সেখানে সাধারণ মানুষ আনন্দ, সুন্দরী হিলুবৌ কারো

জায়গা নেই। এমন কি মাঝে মাঝে মনে হয়—কমলাও সেখানে না থাকলেই বা এমন কি ক্ষতি! মনে হতেই মনটা মমতায় টনটন করে ওঠে। মনে হয় কমলাকে পরিত্যাগ করে সে কোন দীর্ঘ শোভাযাত্রার পুরোভাগে যাত্রা করেছে। কমলাকে সঙ্গে নেয়নি। কমলা পথের পাশেই পড়ে থাকল। হঠাৎ যেতে যেতে একবার কৌতূহলে পিছন ফিরে তাকাতেই নজরে পড়ল কমলা তারই যাত্রা-পথের দিকে চেয়ে অভিমানভরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে জল নেই, যেন সে ধীরে ধীরে পাথর হয়ে যাচ্ছে। আর কি যাওয়া হয়! শোভাযাত্রাকে হুকুম দিতে হয়—যাও, তোমরা যাও, আমার আর যাওয়া হল না। আমার কমলাই ভাল। পথের ধারেই থাকব আমরা দুজনে। তোমরা যাবে, আমরা এখানে বসে বসে খালি দেখব। তবু মন মানে না! মাঝে মাঝে কমলাকে ফেলে আবার যাত্রা করে মন, ছুটে চলে সেই অগ্রগামী দলকে ধরতে।

বাড়ী এসেও আনন্দ আর হিলুর কথা মনে ছিল না। মনে পড়ালে আনন্দ। এসে ডাকলে—সুধা।

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো দিন, পুরানো কথা, পুরানো মন সব জেগে উঠল এক মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে মনে অপরাধবোধ এল, মনে পড়ল—আনন্দর বাড়ী যাওয়া হয় নি।

সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই আনন্দ এসে দাঁড়াল উঠোনে। যেন তাকে তাড়না করছে এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলে—কি রে, আজকাল বুঝি লেখাপড়া করে সহরে থেকে মস্ত লোক হয়ে গিয়েছিস। ভেবেছিস কি? কাল দুপুরে এসেছিস, এখনও দেখা করতে যাস নি! তোর ব্যাপার কি?

ওর কথার ভঙ্গিতে সুধার মা হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বসবার আসন দিয়ে বললেন, বস বাবা বস। যাবে বৈকি, এখনই যাবে। তারপর সুধার দিকে ফিরে বললেন—তুমি থাক না বাবা এখানে, কিন্তু তোমার অভাব বুঝতে দেয় না আনন্দ। দুদিন একদিন অন্তর এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়, তোমার বাবার টুকিটাকি কাজকর্ম থাকলে করে দিয়ে যায়।

আনন্দ সে কথায় কান দিলে না, বললে—আর বসব না মা। সহরে লেখাপড়া জানা বাবুলোক তো আর এমনি যাবে না আমার বাড়ী। তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছি। রাত্রে সুধা আমার ওখানে খাবে। তারপর সুধার

দিকে ফিরে হাত জোড় করে বললে, আজ রাত্রে আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে আর আমার বাড়ীর অন্ন গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

সুধার মা হাসতে লাগলেন আনন্দর কথা শুনে। বললেন—বাবা, সুধা তোমার বাড়ীতে খাবে তার কি নেমন্তন্ন লাগে? কিন্তু বাবাকে আজ আমার খুশী খুশী লাগছে বড়।

আনন্দ যেন ধরা পড়ে গেল! একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললে—মা, মন তো এমনিতেই ভাল থাকার উপায় নাই। এমন কোন কারণ তো দেখতে পাই না মা যাতে মন খুশী হবে। তবে মনের উপরে যে ভারটা অহরহ চেপে থাকে বোঝার মত, মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন সেটা না বলতেই নামিয়ে দিয়েছে। কথা বলতে বলতে সে সুধার মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

আনন্দ যেন পালাতে পারলে বাঁচে। সে চলতে চলতে বললে—আমি তা হলে চললাম রে সুধা। তুই যেন যাস রে। দেরী করিস না।

সুধা উঠে দাঁড়াল, বললে—আরে তুই চলে যাচ্ছিস যে। আমিও যে যাব তোর সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে যাবি? আচ্ছা আয়! তুই কিন্তু আমার দেরী করিয়ে দিস না।

কথা বলতে বলতে দুজনে বেরিয়ে গেল। আনন্দ বললে—আমি বাপু এখন বেড়াতে যেতে পারব না। আমার অনেক কাজ আছে।

সুধা হেসে বললে—চল না। তোর পিছন পিছন ঘুরব। তাতে তো আর তোর কাজের ক্ষতি হবে না? আনন্দর ব্যবহারে ওর আশ্চর্য লাগছে! আনন্দ আজ কি অবান্তর কথা বলছে! ওর আজকের কথাবার্তা শুনে কেউ কি বলবে যে একটা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কথা বলছে! তবু মনে হয় যেন সে আনন্দর এত কাছাকাছি খুব কম এসেছে!

রাত্রে খাবার বিপুল আয়োজন করেছে হিনু-বৌ। দেখা হতেই সে সকৌতুকে ওর দিকে তাকিয়ে বললে—কি গো আজকাল নেমন্তন্ন না করলে যে আসা হয় না! এই গরীব দিদিকে কি এমনি করেই ভুলে যেতে হয়!

—দিদির ভাইকে মনে আছে কি না পরীক্ষা করছিলাম।

—বাঃ, খাসা কথা বলতে শিখেছ তো? তা পাশ করেছি তো?

—নাঃ, ডাঁহা ফেল! সেইজন্যে তো এই নেমন্তন্নের ঘুষ।

হিলু-বৌ আর কথা বাড়ালে না, বললে—চল ভাই, রান্না বান্না আমার সব জুড়িয়ে গেল। এই আকস্মিক কথার ধারা পরিবর্তন তো হিলু-বৌয়ের পক্ষে স্বাভাবিক নয়! সে তার সঙ্গে কৌতুক আর হাসির কথা পেলে সহজে থামতে চায় না! তা হ'লে? সে অল্প আলোতে দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে সে হিলু-বৌকে দেখতে লাগল। কিছু বুঝতে পারলে না। কিন্তু বার বার মনে হতে লাগল কোথায় যেন একটা বৃহৎ অথচ সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে ওর মধ্যে।

খাবার প্রচুর অয়োজন সেই আগের মতই। আজ কেবল আনন্দের মা আসেননি। হিলু-বৌ আগে থেকে সমস্ত সাজিয়ে রেখে দিয়ে ওদের খাবার কাছে বসে আছে। ওদের খাওয়া দেখছে আর মাঝে মাঝে এটা ওটা খাবার জন্যে, ফেলে না রাখার জন্যে, অনুরোধ করছে।

কিন্তু আগের আগের বারে যেমন এই আয়োজনের মধ্যে সুধা এক উত্তাপ আর উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেছিল এবার যেন সেটার অভাব, একান্ত অভাব আছে বলে তার মনে হতে লাগল। আরও মনে হচ্ছে যেন হিলু-বৌয়ের তরফের উত্তাপটা কমে গেছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল কি পরিবর্তন হয়েছে হিলু-বৌয়ের।

ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন বিশেষ ক্লান্ত, শরীর আর মন দুয়েই যেন বিশেষ ক্লান্ত হয়ে আছে হিলু-বৌ! কিন্তু তাই যদি হবে তবে তো ওর শরীর খারাপ হ'ত। শরীর তো ওর ভালই হয়েছে বলে লাগল সুধার চোখে। আগে ওর ছিপছিপে পাতলা দেহে গঠনের আর রূপের যে কঠিন তীক্ষ্ণতা ছিল তা তো নেই। শরীর যেন ওর অনেকখানি ভারী হয়েছে, উজ্জ্বল হয়েছে। যে ললিত ক্ষিপ্রতা ছিল ওর দেহে সেটা অনেক কোমল আর উজ্জ্বল হয়েছে। আগে কথায় কথায় হিলু-বৌ হাসিতে ভেঙে পড়ত। আবার অকস্মাৎ চুপ করে যেত। চোখের মধ্যে তখন হাসি বিদ্যুৎ-চমকের মত ক্ষণে ক্ষণে খেলা করে মিলিয়ে যেত। কিন্তু এখন চোখে হাসি যেন অহরহ খেলা করছে শান্ত হয়ে সকাল বেলার আলোর মত। ওর ঘোর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে কে জানে! হয়তো সন্তান না হওয়ার দুঃখটা এতকাল মনে মনে চেপে রেখেছিল, বাইরে ব্যবহারে প্রকাশ পেতে

দেয় নি। এখন হয়তো আর চেপে রাখতে পারছে না। একটা নিস্পৃহ হতাশা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে ওর চরিত্রে।

চুপ করেই খেয়ে যাচ্ছিল সে। আনন্দও খাচ্ছিল চুপ করে। হঠাৎ আনন্দ বললে—কি রে তোকে কি করতে হবে? বল।

সুধা এইবার মুখ তুললে, বললে—খেতে খেতে কথা কি বলব? যিনি খেতে দিয়েছেন, খাবার সময় কথা বলার দায়িত্ব তাঁর। তিনি যদি কথা না বলেন কি করতে পারি? তিনিই নিজে চুপ করে আছেন তো আমি কথা বলি কি করে?

আনন্দ সহজ সরল কণ্ঠে হেসে উঠল, বললে—শুনলে তো ওর কথা? সহর থেকে সুধা এবার কথায় পাশ করে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। তবে কথাটা ও বলেছে ঠিক। কথা তো তুমিই বলবে।

হিলু-বৌয়ের চোখের স্থির হাসি হঠাৎ নেমে এল ওর ঠোঁটে; শান্ত স্নিগ্ধ হাসিটি সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল যেন। বললে—আমি আর কথা বলতে পারছি না, তোমরা খাও। আমি শুলাম এইখানে।

সুধার মনের একটা সন্দেহ একমুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। না তো, হিলু-বৌয়ের মনের সেই সস্নেহ উত্তাপ তো কমেনি। বরং বেড়েছে। তার সঙ্গে সেই পোষাকী উচ্ছ্বসিত সম্পর্কটা কেটে গিয়ে যেন একান্ত আত্মীয়তার ঘনিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই সে তার সামনে অমনি ভাবে শুয়ে পড়'তে পারলে! কিন্তু ও অমন করে শুয়ে পড়ল কেন? ওর কি শরীর খারাপ? হিলু-বৌকেই সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'ল অমন করে শুয়ে পড়লেন কেন? শরীর খারাপ নয়তো?

একটু সলজ্জ হাসি হেসে হিলু-বৌ বললে—এই পুজো আসছে। তারই খাটুনিতে শরীরটা একটু ক্লান্ত লাগছে।

খাওয়া হয়ে গল। হাত ধুয়ে পান হাতে নিয়ে সুধা বললে—যাই আজ। আবার আসব।

—আচ্ছা। হিলু-বৌয়ের মুখে একটি সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল।

আনন্দ বললে—চল তোকে আলো দেখিয়ে দাঁড়িয়ে দিয়ে আসি। অন্ধকার রাস্তা।

রাস্তায় চলতে চলতে আনন্দ বললে—আচ্ছা সুধা, আজ আমার ওখানে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলি না?

—কি পরিবর্তন ? তোর বাবা আগে শুয়ে পড়েছেন এই তো ?

—দুর গাধা কোথাকার ! হিলু-বৌকে দেখে ?

—না। তবে মনে হল কেমন যেন পাল্টে গেছে। স্বভাবেও বটে শরীরেও বটে।

শুনে একটু হাসল আনন্দ। তারপর সেই জনহীন অন্ধকার পথের মধ্যেও গলাটা নামিয়ে সুধাকে ফিস ফিস করে কি বললে।

সুধা বিস্মিত আনন্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বললে—সত্যি ? ক' মাস ?

—মাস তিনেক হবে। এখনও কাউকে বলি নি। খালি তোকেই বললাম এই প্রথম।

—উল্লুক কোথাকার ! আমাকে আগে বলতে হয় ! সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—চল।

এবার আনন্দর অবাক হবার পালা। সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় ?

—তোর বাড়ী হনুমান। হিলু-বৌয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হিলু-বৌ তখন খেয়ে হাত ধুয়ে হাত মুছছিল। সুধা এসেই ওর সেই ভিজে হাতখানা চেপে ধরলে। বললে—আমাকে আগে জানায় নি আনন্দ। আজ ভারী খুশী হয়েছি ! যান শুয়ে পড়ুন। শরীরের যত্ন করবেন এখন হ'তে।

হিলু-বৌ অন্ধকারের মধ্যেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই পরম সম্মানে তার দুই চোখ দিয়ে এখন জল গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারে তা আর দেখা গেল না।

ফাল্গুনের শেষে পরীক্ষা হয়ে গেল সুধার। গ্রামের মধ্যে সেই প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলে। পরীক্ষার আগে কিছুকাল সারা পৃথিবীটাই যেন চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র ছোট চৌকিখানির উপরে ছিল সে আর পাঠ্য বইগুলো। আনন্দ, হিলু-বৌ সব মন থেকে মুছে গিয়েছিল, এমন কি কমলা পর্যন্ত। ইদানীং দু পয়সার খামে যেদিন কমলার চিঠি আসত সে দিন চিঠি পড়ে কিছুক্ষণের জন্য সে উন্মনা হয়ে যেত। উচ্চাশা ছিল না, মনে কোন বিশেষ কামনা ছিল না। সে ক'মাস শুধু পড়ে ছিল নিজের পাঠ্যপুস্তকগুলো নিয়ে। মনে শুধুমাত্র কর্তব্য করার একটি আনন্দ ছিল, আপনার কাজটুকু প্রতি দিন সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে পালন

করার জন্য আশ্চর্য আত্মপ্রসাদ ছিল। পরীক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল।

সে ভেবেছিল পরীক্ষা দেবার পরই তার পৃথিবী, যে পৃথিবী একান্ত সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে তার চৌকিটুকুর চারিপাশে আশ্রয় নিয়েছিল, সে আবার স্বাভাবিকভাবেই তার পরিধি বিস্তার করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পরীক্ষা দেওয়ার পরই সে দেখলে—যেন এতদিন একটা কাজ ছিল বলে সেই অতি মাত্রায় সঙ্কুচিত পৃথিবীর মধ্যেও তার সমস্ত সময়টা ভরাট ছিল। আজ কাজও নেই, আর সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা বৃহৎ অবকাশের কর্মহীন শূন্য ধূ ধূ মরুভূমি হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার সময় কখনও কখনও পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ভেবেছিল—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে এখানে যাব, ওখানে বেড়াব। কিন্তু পরীক্ষার পর তার মনে হল যেন সংসারে মানুষও নেই, কাজও নেই।

সে পরীক্ষা দিয়ে ভেবেছিল সহরের আশপাশে যে সমস্ত পুরানো মন্দির আর তীর্থস্থল আছে সেগুলো দেখে তারপর বাড়ী ফিরবে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে এসে বিছানায় শুতেই সব কেমন অর্থহীন ও প্রয়োজনহীন বলে মনে হতে লাগল। সে পরের দিনই বিছানা বাক্স আর আপনার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী রওনা হ'ল।

বাড়ীতে তার আর আপ্যায়নের সীমা নেই। বাবা শুদ্ধ কথা বলার সময় সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে না হেসে কথা বলেন না।

কিন্তু তার নিজের যে কি অসুবিধা হয়েছে সে কথা সে বলবে কাকে? তার কিছুই ভাল লাগছে না। মনটা যেন কাটা ঘুড়ির মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে এলোমেলো সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে।

এই অবস্থাতেই সে আসার পরের দিন গেল আনন্দের বাড়ী। আনন্দ বাড়ীতে নেই। সে জংশনে গিয়েছে গতকাল। আনন্দের মা বললেন—সে তো আমাকে বলে কিছু যায় না বাবা যে কোথায় চলল, কেন চলল। বৌমার কাছেই শুনলাম সে জংশনের দোকান দেখতে গিয়েছে।

—বৌ-ঠাকরুণ কোথায়?

—বৌমা? তা তো জানি না বাবা। সে আপনার খেয়াল খুশীতে থাকে। অ বৌমা! বৌমা! কোথায় গেলে?

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল—যাই। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল হিলু-বৌ। সঙ্কুচিত, সলজ্জ মন্থর পদক্ষেপ! বোধ হয় ওর সামনে আসতে ইচ্ছা ছিল না। বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। মুখের কাঁচা-সোনার মত রঙ পাণ্ডুর হয়ে মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। সমস্ত শরীর ভারী আর শিথিল হয়েছে।

তার নিজেরও সঙ্কোচ লাগতে লাগল। তবু একটু হাসি টেনে বললে—ভাল আছেন বৌ-ঠাকরুণ?

অত্যন্ত মিষ্টি করে হেসে শুধু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে হিলু বৌ।

—আনন্দ কবে আসবে?

—আজকেই বিকেলে ফিরবে। চারিপাশ চেয়ে বললে গলা নামিয়ে—কিছু ওষুধ কিনতে গিয়েছে।

—এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। আমি এখন যাই।

হিলু-বৌ ঘাড় নাড়লে—আচ্ছা। তাকে বসতেও বললে না। খুব সম্ভব লজ্জায়। সুধা তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে। হিলু-বৌ ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুধাও বেরিয়ে গেল। যেতেই শুনলে, আনন্দের মা আপন মনেই বলছেন—মাগো, লজ্জার ঘটা দেখে আর বাঁচি না। এ যেন আর কখনও কারো হয় নি, ওরই একা এই প্রথম হয়েছে।

বাড়ী ফিরতেই বাবা বললেন—ওহে, বৌমার দ্বিরাগমনের দিন করে চিঠি দিলাম। ফাল্গুনের সাতাশে দিন ভাল। তুমি যাও, গিয়ে নিয়ে এস। কাল দিন ভাল আছে, কাল যাও। তুমি যাবে বলে আমি বেয়াই মশায়কে চিঠিও দিয়েছি।

সমস্ত শূন্যতা, অর্থহীনতা একমুহূর্তে পরিপূর্ণ আর অর্থবান হয়ে উঠল। তার সপ্তপদী-করা বধূ এল তার সংসারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বহুপদীর সম্ভাবনা নিয়ে। তারপর আনন্দ! অবিচ্ছিন্ন, গাঢ় আনন্দ!

অমনি গাঢ় আনন্দের রাত্রি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। প্রথম রাত্রিতে সে কি গরম! বাতাস পর্যন্ত নেই এক ফোঁটা। গরমে ছটফট করছে তারা। অকস্মাৎ বাতাস উঠল, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, কৃষ্ণ পক্ষের আকাশে মধ্য তিথির পাণ্ডুর চাঁদ আর তারা ঢাকা পড়ে গেল। তারপর আরম্ভ হল

বর্ষণ, প্রবল বর্ষণ। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তারা দুজনেই ঘুমে এলিয়ে পড়ল।

হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ডাকছে তাকে। বৃষ্টি কমে এসেছে। তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে কে যেন বার বার তার নাম ধরে ডাকছে—সুধা! সুধা!

সুধা আর কমলা দু'জনেই বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসল। ওদিকে বাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলে সুধা। বাবাও উঠছেন তা হ'লে।

আবার ডাকের পর ডাক। তার নাম ধরে। সে দরজা খুলতে খুলতেই ডেকে উঠল—আনন্দ! আনু!

বাবা ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন। হাতে লণ্ঠন। রাস্তায় খালি মাথায় ভূতের মত দাঁড়িয়ে আনন্দ।

—কি হ'ল আনন্দ?

—একবার আসুন শীগ্রি। মাঝ রাত থেকেই ব্যথা উঠেছিল। এই কিছুক্ষণ আগে মরা ছেলে হয়েছে। আনন্দ থমকে গেল। তারপর বললে—হিলুও বোধ হয় বাঁচবে না। সে অকস্মাৎ কেঁদে উঠল হা হা করে। কাঁদতে কাঁদতে বললে—কেমন যেন এলিয়ে পড়েছে।

সপরিবারে রাধামাধব ওর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলেন। সুধার মা স্বামীকে এড়িয়ে একেবারে আতুঁড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আনন্দের মা দাইয়ের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন দর্শকের মত।

সুধার মা এক মুহূর্ত সব দেখে নিয়ে তিরস্কারের সুরে আনন্দর মাকে বললেন—দেখছেন কি, মুখে দুধ গঙ্গাজল দিন। তিনি ততক্ষণে হিলু-বৌয়ের মাথাটি কোলে নিয়ে বসেছেন। সেখান থেকে ডাকলেন—আনন্দ! এস! ছুটে এস।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হিলুর মাথার কাছে এসে বসল আনন্দ। হিলুর বড় বড় বিস্ফারিত চোখের তারা এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আনন্দের মুখের উপর স্থির হয়ে নিবদ্ধ হয়ে রইল। দুটি চোখের পাশ দিয়ে অশ্রুর দুটি দীর্ঘ ধারা ঝরে পড়ল। তারপরই চোখের দৃষ্টি আনন্দের মুখের দিকে চেয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সুধার মা ধীরে ধীরে চোখের পাতা মুড়ে চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন।

চার

সর্ব প্রথম উচ্চকণ্ঠে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন আনন্দের মা—ওরে মা আমার রে, এমন সাজানো সোনার সংসার ফেলে কোথায় গেলিরে! ওরে আমার সোনার প্রতিমা মা আমার রে!

সুধার মনে হল আনন্দর মা যেন এই মুহূর্তটির প্রত্যাশায় এইখানে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক নাটকীয় মুহূর্তটিতে আপনার অস্তিত্ব তারস্বরে ঘোষণা করলেন। সেও ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলার পাশ থেকে সরে আনন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়াল তার কাঁধের উপর হাত রেখে।

আনন্দ যেন তা' অনুভবই করতে পারলে না। সে কেমন বিহ্বল, স্থাণু হয়ে গিয়েছে। বাহ্য পৃথিবীর সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য হয়ে স্থির দৃষ্টিতে সে হিনুবৌয়ের স্থির পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। সুধার মা কাঁদছেন, কমলা ঘোমটার ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। সুধাও এক সময় হা হা করে কেঁদে উঠল। ঘরের দরজার কাছে সুধার বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চোখ দিয়েও নিঃশব্দ ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। সুধা কেঁদে উঠতেই তিনি সুধাকে ডাকলেন—সুধা, শুনে যাও।

সুধাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় দরজার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আনন্দের বাবা রাম মুখুজ্জে। তাঁর এই পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে সুধার সন্দেহ হল। মনে হল তাঁর স্ত্রীর মতই তিনিও মিথ্যা শোকের আড়ম্বর করছেন।

রাধামাধব ডাকলেন—মুখুজ্জে মশায়!

রাম মুখুজ্জে উঠে বসলেন দুটো লম্বা শিহরিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। চৌকো লণ্ঠনের ম্লান আলোয় সুধা দেখতে পেলে—চোখের জলে ভদ্রলোকের সমস্ত মুখটা ভিজে উঠেছে। তবু তার সন্দেহ হল। তার মনে হল যেন কোথাও থেকে জল নিয়ে ছলনা করে ভদ্রলোক মুখে মেখেছেন।

রাধামাধব বললেন—ভোর হয়ে এসেছে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এবার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

মুখুজ্জে বললেন—করুন। আমাকে এর কি জিজ্ঞাসা করছেন?

এমন সময় ঘরের ভিতর উচ্চকণ্ঠে আনন্দের মা আবার কেঁদে উঠলেন—ওরে মা আমার অভিমান করে চলে গেলিরে! তোকে কত সময়ে কত অনাদর করেছিরে! মা আমার ফিরে আয়রে!

ঘরের ভিতর কান্না শুনে বারান্দায় রাম মুখুজ্জেও হা হা করে কেঁদে উঠলেন—আহা, মা আমার অভিমান করে চলে গেল গো! কত সময়ে কত অনাদর করেছি!

ভোর হয়ে এসেছে। বাড়ীর উঠানটা এতক্ষণে লোকে লোকে ভর্তি হয়ে উঠেছে। বুড়ো যদু চাটুজ্জের সঙ্গে আনন্দের শ্বাশুড়ী এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আছড়ে পড়লেন মেয়ের বুকের উপর, কেঁদে উঠলেন—ওরে হতভাগীরে! তোর কপালের এত সুখ সইতে পারলি না রে!

গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকে সমর্থ পুরুষরা এসেছে। নরনাথ বাবু এসেছেন, হরসুন্দর বাবুরা এখানে থাকেন না, তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের নায়েব এসেছেন। বুড়ো মঙ্গল দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন রাধামাধবকে—কি হয়েছিল বৌমার ভট্‌চাজ মশায়? কৈ অসুখ বিসুখের কথাও তো কিছু শুনি নি আমরা?

—অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপার। রাত্রি দশটা এগারটার সময়, যখন বৃষ্টি আরম্ভ হল তখন থেকেই, তার কিছু আগে থেকেই প্রসব যন্ত্রনা উঠেছিল। দাই আসতেই প্রসব হয়ে গল, মরা ছেলে। তারপর ধীরে ধীরে বৌমাও নেতিয়ে পড়লেন।

সামাজিক শিষ্টাচারের জন্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা আর কি বলবেন! বধূটি এই গ্রামেরই কন্যা। তাঁরা তার রূপ আর গুণ দুয়েরই আলোচনা করতে লাগলেন। নরনাথ বাবু রাধামধবকে বলিলেন—ভট্‌চাজ মশায়, আর তা হ'লে দেরী করছেন কেন? শশ্মানে যাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হয়।

ভট্‌চাজ মহাশয় বললেন—ছেলেদের মধ্যে জন দশ বারোকে বলে দেন। একজন যাক বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাপড় গামছা নিয়ে আসুক। বাঁশ আনবার জন্য আমি লোক পাঠিয়েছি।

নরনাথবাবু বললেন—কাঠের ব্যবস্থা হয়েছে? আমার ওখানে ঠাকুর বাড়ীর নীচে প্রচুর কাঠ আছে। সন্থ কাটিয়েছি। ওখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আমি করছি।

মঙ্গল দত্ত বললে—আজ তো আর আমাদের আনন্দর দোকান আর খোলা যাবে না! ঘি লাগবে তো। ভাল ঘি আমার দোকান থেকেই নিয়ে আম্মুন। কত লাগবে? সের পাঁচেক হলেই হবে তো?

শশ্মানে চিতা সাজানো হল, আনন্দই মুখাগ্নি করলে। আনন্দ একফোঁটা কাঁদেনি। মুখাগ্নি করিয়ে শবযাত্রীরা ওকে সরিয়ে এনে চিতার থেকে অনেকখানি দূরে বসালে। আনন্দ কোন বাধা দিলেনা। সে সুধার কাছে বসল। অকস্মাৎ সুধার কোলে মুখ গুঁজে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল! সমস্ত দেহ তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সে অনেকক্ষণ থাকল অমনি করে। সুধা ধীরে ধীরে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেক্ককণ পর সে উঠে বসল। ক্লান্ত শান্ত কণ্ঠে সে বলল—সুধা, আর কি করে বাঁচব ভাই!

কি বলবে সুধা! সামনে বৃহৎ জীবন, বৃহৎ ক্ষেত্র, কত নূতন সম্ভাবনা পড়ে আছে এ কথা বলার মুহূর্ত তো এ নয়! এই মুহূর্তে আনন্দের যা মনে হচ্ছে তা সুধা বেশ বুঝতে পারছে। এ মুহূর্তে হিলুর সঙ্গে ওর সমস্ত বাসনা কামনা নিয়ে ওর জীবনই শেষ হয়ে গেলে ও বোধ হয় সব চেয়ে শান্তি পায়। কিন্তু সে কথা কেউ বলে? সুধা চুপ করেই থাকল। কেবল ওর মাথায় আর গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

শেষকৃত্য শেষ ক'রে স্নান ক'রে একবার সকলে হরিধ্বনি দিয়ে নিঃশব্দে নদী থেকে তীরে উঠে এল। গত রাত্রির বর্ষণে আকাশ ও মাটির সব ধুয়ে শিশুর মুখের হাসির মত নির্মল রৌদ্রময় প্রভাত পরিস্ফুট হয়েছে নির্জন নিঃশব্দ নদীতীরে। মাঠে কোথাও কোথাও দু একটি মানুষ। দু একখানা লাঙল চলছে ক্ষেতে। পাখীর ডাকের প্রত্যেকটি শব্দ পরিস্কার কানে এসে লাগছে। সমস্ত পরিবেশ মানুষের শোক দুঃখ আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগহীন। আপনার আনন্দে সে আনন্দমগ্ন, ধ্যানরত।

শান্ত শূন্য মন নিয়ে আনন্দ বাড়ী ফিরল। মুখে কথা নাই, চোখ শুকনো। সুধা ওর হাতখানা ধরে আসছে।

আনন্দ একবার নীচু গলায় বললে—ছেড়ে দে, আমি এমনই যেতে পারব।

সুধা হাত ছেড়ে না দিয়েই বলল—না, চল না। ক্ষতি কি?

বাড়ীর দরজাতে এসে সকলে থমকে একবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে হরিধ্বনি দিলে। বাড়ীর ভিতর থেকে বিলাপের একটা তীব্র আর্তস্বর জ্যামুক্ত তীরের মত আকাশের দিকে ছুটে গেল। তারপর আবার সব নিঃস্তব্ধ।

মা একখানা কম্বল পেতে রেখেছিলেন। আনন্দর হাতে ধরে সেখানে বসিয়ে দিলেন। আনন্দ কিছুক্ষণ স্থাণুর মত চুপ করে বসে থাকল। তারপর শুয়ে পড়ল। তারপরই ক্লান্ত দেহমন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পল্লীগ্রাম যত বিচিত্র স্থান তার চেয়েও অনেক বিচিত্র তার মানুষগুলি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একজন আর একজনের জীবনে পদক্ষেপ করে না; আপনার জীবনযাত্রাকে এক বৃত্তের গণ্ডীতে বেষ্টন ক'রে অপরকে বাদ দিয়েই চলে। যেখানে অপরের পদক্ষেপ প্রয়োজন হয় সেখানে একবার আপনার জীবনের বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকতে দেয়, তারপর ছটফট করে কতক্ষণে আবার তাকে আপনার জীবন-ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেবে। সেই পূর্ব মুহূর্তের বাঞ্ছিত মানুষ পর মুহূর্তে অবাঞ্ছিত হয়; জীবন থেকে সে আবার সরে গেলে তবে শান্তি ফিরে আসে। তাই প্রধানতঃ একজনের অন্যের জীবনের উপর দৃষ্টি নিরুৎসুক অবহেলার। তবু যদি বা কারও অপরের জীবনের প্রতি কোন কৌতূহল জাগে সে কৌতূহল প্রধানতঃ ঈর্ষ্যার, ব্যঙ্গের, শ্লেষের। ব্যঙ্গে, কৌতুকে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে অপরের বদ্ধ বৃত্ত-বেষ্টিত জীবনের সামান্য খোলা জানালার অবকাশে তখন মানুষ উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করে। অপরের জীবনের গ্লানিকর কি মর্যাদাহানিকর কোন কিছুর সন্ধান পাবামাত্র, বা তার আভাস মাত্র তার জিহ্বা তীক্ষ্ণধার বিষাক্ত অস্ত্রের মত মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই শোকের প্লাবনে মানুষের জীবনের অপটু হাতের তৈরী বৃত্তরেখা যখন ভেঙে যায়, অমনি প্রতিবেশী মানুষ অকপট বেদনায় হায় হায় করে ওঠে, তার জীবনের সব দরজা জানালা খুলে সে ছুটে আসে সেই অশ্রু-প্লাবিত মানুষকে সেই বেদনার লবণাক্ত সমুদ্র থেকে তুলে ধরবার জন্যে।

আনন্দের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। সামাজিক ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠায় প্রায় অধিকাংশ মানুষই প্রতিষ্ঠাবান। তারা কোনদিন কৌতুহলের সঙ্গে ওদের

জীবনের দিকে তাকায় নি। ইদানীং আনন্দের আর্থিক অবস্থার গত তিন চার বছরের মধ্যে আকস্মিকভাবে উন্নতি হাওয়াতে সকলেই তার কথা প্রায় আলোচনা করে। কোন গোপন মন্ত্র, কোন সংগুপ্ত কৌশলে ওর দরিদ্র অবস্থা অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে এমন স্বচ্ছল হয়ে উঠল সেইটাই ওখানে প্রধান আলোচনার বস্তু। এই ভোজবাজীর মত উন্নতি যে একান্তই ওর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফল এ কথা আলোচনার প্রথম পর্যায়েই বাতিল হয়ে যায়। কেউ বলে নরনাথ বাবুরা ওকে যে বাড়ীতে থাকতে দিয়েছেন সেইখানেই কোথাও মাটির নীচে লুকনো গোপন অর্থসম্পদ সে পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। কেউ বলে মঙ্গল দত্তর কারবারের মূলধন হস্তগত করে কৌশলে সরানো এর মূলে। কেউবা বলে পূর্ব থেকেই রাম মুখুজ্জের পৈত্রিক বৃহৎ সঞ্চয় ছিল গোপনে, এতদিনে একমাত্র ছেলে সেটাকে ব্যবসার মারফৎ প্রকাশ করেছে। নানা মুখরোচক কথা।

যার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই, সেই মুহূর্তে অর্থ হয়েছে বলেই কি সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবে? গ্রামের মানুষ অত সহজে তা দেবে না। তবু আজ যখন শোকের আঘাতে সে ধরাশায়ী তখন মানুষ এক মুহূর্তে অতি সহজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ওর প্রতি ঈর্ষ্যা—সব ভুলে গিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

গ্রামের মানুষ প্রতিদিন একে একে, দুইয়ে দুইয়ে একবার করে এসে খবর নিয়ে যায়। নরনাথবাবুও প্রতিদিন আসেন। কিছুক্ষণ বসে কখনও পরমার্থিক কথা বলে জীবনের অনিত্যতা প্রমাণ করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন, কোনদিন বা নানান দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে শোকের গুরুভারকে কিছুক্ষণের জন্য লঘু করে দেন। প্রথম দিন সকালে তিনি আসতেই রাম মুখুজ্জে তাঁকে বসবার জন্যে বার বার অভ্যর্থনা করতেই তিনি বললেন—ওহে মুখুজ্জে, আমি তো এখানে তোমার মনিব হয়ে আসি নি। এসেছি গ্রামের একজন মানুষ হিসেবে আমার সামাজিক কর্তব্য পালন করতে! অত অভ্যর্থনার কোন দরকার নেই।

রাম মুখুজ্জে একটু শুকনো হাসি হাসল। হুঁকোটা এগিয়ে দিলে ওঁর হাতে। তিনি তামাক খেতে লাগলেন। তখনও জনসমাগম হয় নি। ঘরের এক পাশে কম্বলের উপর আনন্দ মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে। সুধা মাঝে

মাঝে আনন্দের সঙ্গে এক আধটা কথা বলে ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। রাম মুখুজ্জে একবার ছেলের দিকে চাইলেন, তারপর নরনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একটা কথা বলছিলাম আপনাকে।

—বল। সাগ্রহে বললেন নরনাথবাবু।

—আমি এখন দশ পনর দিন আর কাজে যেতে পারব না বাবু। ছেলেটার মনে ঘা-টা বড় বেশী বেজেছে। এখন ক'দিন ওর কাছে কাছেই থাকি ওকে আগলে। কথা শেষ করে আবার মুখুজ্জে ছেলের দিকে চাইলেন। আনন্দ সেই মাথা হেঁট করেই বসে আছে। সে বাপের কথাটা শুনলে কি না কে জানে!

নরনাথবাবু যেন কথাটা ওর মুখ থেকে কেড়ে নিলেন, বললেন—ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। আমিও তোমাকে এই কথা বলব বলে ভাবছিলাম। এখন কিছুদিন ওর কাছে কাছে তোমার থাকা সত্যিই বিশেষ প্রয়োজন। ওর মন এখন বড় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে। তা এখন আর তোমাকে কাছারী যেতে হবে না। মাসখানেক তুমি বরং বাড়ীতেই থাক, ছেলেকে দেখাশোনা কর।

দুখানা মাত্র শোবার ঘর। একখানায় আনন্দ থাকত, আর একখানায় থাকে ওর বাবা। এখন দু খানা ঘর সদর আর অন্দর মহলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। আনন্দের ঘরে কম্বল বিছিয়ে সারাদিন আনন্দ বসে থাকে। ওর বাবা বসে থাকে হুঁকো হাতে। একবার সকালে একপ্রহর বেলা থেকে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত মানুষ-জন আসে, বসে, শোকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, নিম্নকণ্ঠে এটা ওটা ছোটখাটো আলোচনা করে, তামাক খায়, আবার চলে যায়। অন্দর মহলে আনন্দের মায়ের কাছে আসেন গ্রামের মেয়েরা। তাঁদের আসার সময় মধ্যাহ্ন পার হয়ে যখন অপরাহ্নের দিকে গড়িয়ে যায় তখন। সারাদিনের কাজ শেষ করে সংসারের পুরুষদের খাইয়ে নিজেরা খেয়ে তাঁরা আসেন, বসেন, হিলু-বৌকে যিনি যতটুকু দেখেছেন ততটুকুর মধ্যে তার যতখানি প্রশংসার সেটুকু অন্তরের সঙ্গে সাড়ম্বরে ব্যক্ত করেন তারপর আবার যখন রৌদ্রের তেজ কমে আসে ছায়া নামার সময় হয় তখন সকলে একে একে উঠে যান।

এরই মধ্যে যখন ও-ঘরে ভীড় থাকে তখন একবার আনন্দর মা একপ্রহর

পার হলে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। একবার ডাকেন ছেলের নাম ধরে। আনন্দ নিঃশব্দে উঠে আসে। উঠে এসে সামান্য জল খেয়ে যায়। আবার মধ্যাহ্ন পার হয়ে যাবার সময় আবার ডাকেন, সে উঠে এসে আর একবার খেয়ে যায়।

প্রথম দু' দিন সুধার মা-ই রান্না করে দিয়েছিলেন। শোকার্ত পরিবারে কেউ রান্না করতে পারবে না মনে করেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। তিনদিনের দিন সবিনয়ে আনন্দের মা ওকে বলেছিলেন—আপনি আর কেন কষ্ট করবেন দিদি? আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন তাতে চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকলাম। আজ থেকে আমিই যাই হোক চারটি করে ফুটিয়ে নেব। আপনি আর কষ্ট করবেন না।

সুধার মা তাতে স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রথম দিন রাত্রে সুধার মা-ই আনন্দকে নিজে বসে খাইয়ে গেলেন। তিনি উঠে যাবার পর সুধা তাঁর সঙ্গে উঠে যাবার উদ্যোগ করছে, আনন্দ তার হাতে চাপ দিলে, বললে—আমার কাছে থাক রাত্রিতে।

তার হাতের স্পর্শে সুধা অনেকখানি বুঝলে যেন। তার মনে হল এই মুহূর্তে সমস্ত সংসারটা আনন্দের কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আত্মীয়হীন হয়ে গিয়েছে সে। আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র আছে সে, হিলু-বৌয়ের সঙ্গে যার অন্তরের সুগভীর সখ্যের গ্রন্থি ছিল। তাই আজ তাকেই সে একমাত্র আত্মীয় বোধ করছে। সে রয়ে গেল। দ্বিতীয় রাত্রে সে শোবার উদ্যোগ করছে এমন সময় খাবার পাত্র হাতে ঘরে ঢুকলেন আনন্দর মা। ছেলেকে খাওয়াতে বসে বললেন—বাবা সুধা, তুমি আর কেন কষ্ট করবে? আজ থেকে আমিই শোব আনুর কাছে।

আনন্দ একবার মায়ের মুখের দিকে, একবার সুধার মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে—সত্যিই, তুই আর কেন কষ্ট করবি? তুই যা। আজ থেকে মা-ই শোবে আমার কাছে।

সুধা ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা।

বাড়ী ফিরতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে তুই চলে এলি?

সুধা বললে—আনন্দর মা বললেন উনিই শোবেন ওর কাছে। আনন্দও বললে—তুই যা। আমি আর থেকে কি করব? চলে এলাম।

মা কিছু বললেন না, কেবল যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, একবার পিছন ফিরে সুধার দিকে চাইলেন। তাঁর মুখে সামান্য অস্ফুট আকস্মিক গূঢ় হাসির রেখা সুধার চোখ এড়াল না। মা তার কথা শুনে হাসলেন কেন কে জানে? সুধা মায়ের হাসির কারণ অনেক ভেবেও খুঁজে বের করতে পারলে না।

রাত্রে কথাটা সে বললে কমলার কাছে। সব বলে বললে—আচ্ছা মা যেন কেমন একটু হাসলেন বলত? তুমিও তো দাঁড়িয়ে ছিলে সে-সময়! কমলা ঠিক মায়ের মত হাসলে, মুখে বললে,—আমি কি করে জানব?

—বাঃ। অথচ হাসবার সময় তো ঠিক মুখ টিপে টিপে হাসছ? মনে হচ্ছে যেন সব বুঝেছ, কিন্তু মুখে কিছু বলছ না।

কমলা এবার হাসতে হাসতেই বললে, তুমি কি বোকা তাই ভাবছি। এত সাদা কথাটা বুঝতে পারলে না? আনন্দ বড়ঠাকুরের মা এখন ছেলেকে আগলে আগলে রাখছেন, ছেলের মন নিচ্ছেন। অন্ততঃ মন নেবার চেষ্টা করছেন—এই টুকু বুঝতে পারলে না?

সুধা আশ্চর্য হয়ে গেল। কথাটা সে বার বার ভাবলে। ঠিক, কমলার কথাই ঠিক। আনন্দের মা ছেলেকে সত্যিই আগলে আগলে রাখবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র সন্তান তাঁর আনন্দ। তার ছেলেবেলা থেকেই অপরিমিত স্নেহে, যত্নে, পাখীর মা যেমন করে পাখার আড়ালে আপনার শাবককে ঢেকে রাখে তেমনি করে ঢেকে রেখেছিলেন। তারপর একদা ঘটনাচক্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আনুর বিয়ে হল ; দেহে অপরূপ রূপ আর লাবণ্য, মনে অপরিমেয় মমতা, অনুকম্পা আর সহ্যশক্তি, মুখে শেষরাত্রির চন্দ্রকলার মত হাসি নিয়ে নব নায়িকার মত রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল হিলুবৌ ; আপনার প্রেমের অমোঘ সুকঠিন আঘাতে কবে সকলের অজ্ঞাতে শাশুড়ীর মমতার পক্ষচ্ছেদ করেছে ; আনন্দকে সে পক্ষচ্ছায়া থেকে মুক্ত করে আপনার কুক্ষিগত করেছিল। সকলের চেতনার আড়ালে এই ঘটনা ঘটেছে। রাম মুখুজ্জে জানতে পারে নি, আনন্দর মা জানতে পারে নি; এমন কি আনন্দ আর হিলু-বৌও জানতে পারে নি। যখন ঘটে গেল, ঘটনা যখন পরিণতিতে পৌঁছে গেল তখন এক আনন্দ ছাড়া আর সকলেই অসহায়ের মতই সেই পরিণতিকে লক্ষ্য করলে। মেনে নিতে মন চাইল না, তবু মেনে নিতে

হল। যার হাতে-বাঁধা বন্ধন ছিঁড়ল সেও ক্ষোভে, নিষ্ফল গোপন বেদনায়, মর্মপীড়ায় পীড়িত হল ; যে বাঁধলে সেও অসহায়ের মত সে বাঁধনের দিকে চেয়ে থাকল। বাঁধতে হয়তো সে চেয়েছিল, কিন্তু এমন ক'রে অপরের বন্ধন ছিন্ন ক'রে সে অতি কঠিন বন্ধনে বাঁধতে চায় নি। কেবল যে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ল তার মধ্যে কোন আক্ষেপ তো দেখাই গেল না, উপরন্তু সে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠল ; আপনার বাক্যে ব্যবহারে সেই অকপট উল্লাস ব্যক্ত করতে সে কোন দিন কুণ্ঠিত হয় নি। এর ফলে যার যার বাঁধা বাঁধন খুলেছে তার ক্ষোভ, নিঃশব্দ বেদনা দ্বিগুণ হয়েছে, যার বাঁধনে নূতন বাঁধা পড়েছে তার অসহায় বেদনাও তাতে বেড়েছে বই কমে নি। আজ হিলু-বৌ নেই ; আর আশ্চর্য, তার বাঁধা বাঁধন আজ মুহূর্তে মুহূর্তে এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে। আনন্দকে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তার কোমল মনে প্রতিদিন আপনার প্রেমের যে স্বাক্ষর হিলু-বৌ ওর মনের পরতে পরতে দিন দিন এঁকে দিয়ে গিয়েছে তা হয়তো কোন দিন মুছে যাবে না, আমৃত্যু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আনন্দ তা বহন করবে। কিন্তু আজ হিলু-বৌয়ের বাঁধা পার্থিব বন্ধনগুলি সব একে একে এলিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। যেটুকু বাকী আছে সেটুকুর উপরে আজ খড়্গাঘাত করবার জন্যে তৈরী হয়ে আনন্দের মা আজ সজ্ঞানে নূতন ক'রে সেবার আর মমতা-প্রকাশের খড়্গ তুলে ধরেছেন।

এই ভাবনা মনে নিয়েই সে আনন্দের কাছে নিত্য-নিয়মিতের মত গেল পরদিন সকাল বেলায়। তখনও বাইরের লোকজন আসতে আরম্ভ করে নি। আনন্দও ঘরে নেই। বাইরের দাওয়ায় বসে মুখুজ্জে মশায় তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখেই সম্ভাষণ করলেন—এস বাবা এস, বস।

—আনন্দ কই ?

—আন্নুকে ওর মা নিয়ে গেলেন মুখ ধোয়াতে।

—আচ্ছা আমি একবার আন্নুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

—এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

অবাক হল সুধা। তাঁর সঙ্গে আবার কি কথা মুখুজ্জে মশায়ের! সে বাড়ীর ভিতরের দাওয়ায় চলে গেল। আনন্দ মুখ ধুচ্ছে, ওর মা ধীরে ধীরে গাড়ু থেকে একটু একটু ক'রে জল ঢেলে দিচ্ছেন ওর হাতে ওর প্রয়োজনমত।

পাশেই খানিকটা নুন আর সরিসার তৈল, খানিকটা ছাই ব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। আনন্দ দাঁত মেজে মুখ ধুচ্ছে। দেখে ও অবাক হল। এ সেবা এ যত্ন যেন হিলু-বৌকেও ছাড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গত রাত্রিক নিজের ভাবনার কথাগুলি। এ যেন সেবা ও মমতা-প্রকাশের সমারোহ আরম্ভ করেছেন ওর মা। মায়ের এই সেবা যে অকপট, স্বতোৎসারিত এতে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের এই সেবাকে কে সন্দেহ করবে? আর অনেক অনেকদিন মা ছেলের কাছে আসতে পারেন নি, তার সেবা-যত্ন করবার সুযোগ পান নি। সদাজাগ্রত দৃষ্টির সেবা আর যত্ন দিয়ে হিলু-বৌ আনন্দকে এতকাল ঘিরে রেখেছিল। সে নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর ভিতর ওর মা প্রবেশ করবার সুযোগ পান নি এই দীর্ঘদিনের মধ্যে। তাঁর বুভুক্ষিত মাতৃস্নেহ আজ আবার গাঢ় ছায়ায় তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মহা-সমারোহে; অজস্র অবিশ্রান্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্ষণে আনন্দকে সে তো আজ সিক্ত করে তুলবেই। সুধার মনে হল এই নূতন সেবা আর যত্নের আষাঢ়-মেঘের অন্তরালে কোথায় কোন অলক্ষ্য বজ্র-বিদ্যুতের লীলা চলেছে অগোচরে; পুরাতন স্মৃতিকে আর প্রেমকে সে যেন এই অগোচর বজ্রের আঘাতে আর এই গোচর সেবার বর্ষণে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

সুধাকে দেখে আনন্দ একটু হাসল। এ ক'দিনের মধ্যে আনন্দ হাসল বোধ হয় এই প্রথম। আনন্দ অনেকখানি সুস্থ এবং সহজ হয়েছে তা হ'লে। আনন্দ বললে—এসেছিস? আমার আজ উঠতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। উঠেছিলাম; তা মা বললে—এত সকালে উঠে কি করবি? এখন আর খানিকটা ঘুমো। তা শুতেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চল, বস গিয়ে, আমি মুখ ধুয়েই যাই।

আনন্দের মা সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন—মুখ ধুয়েই যাওয়া হবে না। মুখ ধোও, কিছু একটু মুখে দাও, তারপর বাইরে গিয়ে বস। আমি টাটকা ছানা তৈরী করে রেখেছি। খাও, খেয়ে যাও। এখুনি মানুষজন আসতে সুরু হবে, আর খাওয়া হবে না। ডাকতে ডাকতে আমার প্রাণ যাবে, আর এদিকে তোমার পিত্তি পড়বে।

সুধা সব শুনে বেশ উপভোগ করলে। আনন্দ আবার স্নেহ-সঞ্জীবিত

হয়ে উঠেছে।' আনন্দ সুস্থ হয়েছে, বেশ সুস্থ হয়েছে। একসঙ্গে সহজ মানুষের মত অনেক কথা বলে গেল। ওর মাও বার বার সাড়ম্বরে স্নেহের প্রকাশ করছেন। এ যেন তাঁর অনুপস্থিত পুত্রবধূর বিগত স্নেহ আর সেবার সঙ্গে তাঁর নিজের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। সে হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত, তার মায়ের সেবা দেখতো কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আনন্দের বাবা তাকে ডাকছেন। সে বাইরে এসে তাঁর কাছে বসল।

রাম মুখুজ্জে হাতের হুঁকো নামিয়ে বললেন—তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে বাবা।

মনে মনে অবাক হয়েও মুখে তার কিছু প্রকাশ না করে সহজ স্বরে সে বললে—বলুন।

—বলছিলাম কি! বলছিলাম—আনু তো এখন শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে আছে, কাজকর্ম কিছুই দেখতে পারছে না। অথচ মুখে যতই অস্বীকার করি একথা স্বীকার করতেই হবে যে নিজের চেষ্টায় সে এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে। এখানে তিনখানা দোকান, জংসনে দুখানা দোকান। এই পাঁচ খানা দোকানের সব কিছু একা ও নিজেই দেখাশোনা করে। আর এ এমন কাজ যে নিজে না দেখতে পারলেই লোকে চুরি করবে, কারবারের তলা ফাঁসিয়ে দেবে। তা তুমি তো এখন ছুটিতে বসে আছ, লম্বা ছুটি এখন। তুমিই কিছু দিন দেখা শুনো কর না বাবা!

এবার সত্যিই একান্ত অবাক হল সুধা। অবাক হয়ে বললে—আমি ব্যবসা দেখব? আমি ব্যবসার যে কিছুই জানি না।

আনন্দ যদি নিজে এ কথা বলত তা হলে সে কি জবাব দিত বলা যায় না। আনন্দ তার কাছে এ প্রস্তাব করেনি, বোধ হয় অসম্ভব বলেই করেনি। কিন্তু মুখুজ্জে মশাই এ প্রস্তাব করলেন কি ক'রে! আনন্দ কি বলেছে তাঁকে কিছু? নিশ্চয়ই না। যদি কিছু বলার হোত তা হলে আনন্দই তাকে বলত। সে কথা মনে হতেই অকস্মাৎ একটা কথা তার মনে হল। সে ভাল ক'রে বিবেচনা করলে না, তার পূর্বেই বলে দিলে। তার মনে হচ্ছে আনন্দের পরিবারের সঙ্গে তাদের পরিবারের যে ঘনিষ্ঠতা তার মূল কারণ হিলু-বৌ। সেই হিসাবে হিলু-বৌয়ের সঙ্গে, তারই সগোত্র

বলে আনন্দের বাবা আর মা দুজনেই বোধহয় তাদের পরিবারকে, আনন্দের প্রতি তাদের সমস্ত সহানুভূতিকে খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে দেখেন। আজ হিলু-বৌ নেই। আর হিলু-বৌয়ের সঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা তাদের পরিবারকেও যেন খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে, অন্ততঃ একটা অস্ফুট ইচ্ছা রয়েছে আনন্দের মার মনে। আজ হিলু-বৌ নেই, অনন্দের পরিবার থেকে তাই স্বাভাবিক ভাবেই তারা খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে, আনন্দের সঙ্গে আজ আর নূতন করে জড়ানো ঠিক হবে না। এই কথা মনে হতেই সুধা বললে—আপনি এক কাজ করুন না! আপনি নিজে তো এখন ছুটি নিয়েছেন। আপনি নিজেই একটু একটু ক'রে দেখাশুনো করুন না।

কথাটা বলে ফেলেই মনে হল—কথাটা তার বলা উচিত হল না। তার মনে পড়ল এই দোকান দেখা নিয়েই এর আগে আনন্দের সঙ্গে মুখুজ্জে মশায়ের অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে। তখন হিলু-বৌ বেঁচে ছিল। আনন্দের বার বার আন্তরিক অনুরোধ তিনি সেদিন উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করেছিলেন। ছেলের কথায় যিনি রাজী হন নি, জেনে শুনে অনাত্মীয় হয়ে সেই কথা তাঁকে বলবার প্রয়োজন আর যারই থাকুক তার ছিল না। তাই কথাটা বলেই তার মনে হল হয়তো মুখুজ্জে মশায় অত্যন্ত বিরক্ত হবেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা মুখুজ্জে আদৌ বিরক্ত হলেন না। কথাটা শুনে দুবার তাড়াতাড়ি তামাক টানলেন, তারপর বললেন—কথাটা তুমি বাবা, বলেছ ভাল। কিন্তু আমার সময় কই? এই সব গ্রামস্থ ভদ্রলোক অনবরত এখন তখন আসছেন, এঁদের আদর আপ্যায়ন এতো আমাকেই করতে হবে। এ কর্তব্যও তো আমারই। আনু এখন শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। আর তা ছাড়া এ কাজও ওর নয়, গৃহস্বামী হিসাবে আমারই। কিন্তু দোকানগুলো না দেখা—সেটাও খুব অন্যায় হচ্ছে। আর ক'দিনই বা দেখব। আমারও তো আবার কাজ আছে।

সুধা আর কোন কথা বললে না। তার ইচ্ছা হল বলে—আর একজনের বাড়ীতে চাকরী ক'রে যে যৎসামান্য উপার্জন করেন আপনি, সেটা পরিত্যাগ করতে বাধা কিসের? এ নিজের ব্যবসায়ে—ছেলের কাজও তো নিজের কাজই—নিজে কর্তৃত্ব করাও হবে, আর ব্যক্তিগত উপার্জনের পরিমাণও বেড়ে যাবে। কিন্তু কি দরকার সে কথা বলার?

কিন্তু বলার আর প্রয়োজনও হল না। দেখা গেল নরনাথবাবু আর তার বাবা রাধামাধববাবু দু জনে এক সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন সেই মুহূর্তে। সতরঞ্চি পাতাই ছিল। দু জনেই প্রসারিত সতরঞ্চির উপর বসলেন। ওদিকে আনন্দও হাত মুখ ধুয়ে কম্বলের উপর এসে বসল। ওঁরা দু জন রাস্তা থেকেই একটা কিছু আলোচনা করতে করতেই আসছিলেন। নরনাথবাবু বললেন—মুখুজ্জে, এখানে আসছি, পথে ভট্টচাজ মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভট্টচাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম—শ্রাদ্ধ কি রকম কি হবে, তার কোন ফর্দ করা হয়েছে না কি? তা এখনও তো কোন ফর্দ হয় নি শুনলাম। আর দিনও তো নেই। তা ফর্দ তো করা দরকার। কি রকম কি কাজ কর্ম হবে?

প্রশ্ন করেই উত্তরের প্রত্যাশা না করেই তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করলেন, বললেন—আমি বলি কি কোন রকম খরচ-খরচার ভিতর যাবার দরকার কি? তিল-কাঞ্চন কাজ করে বারোটি ব্রাহ্মণ আর শ্মশান-বন্ধুদের খাইয়ে দিলেই সব চেয়ে ভাল হবে। কোন হাঙ্গামাও হবে না, খরচপত্রও বেশী হবে না।

এতক্ষণ রাধামাধব চুপ করে ছিলেন, এবার স্বাভাবিক গম্ভীরভাবে বললেন—এ বিষয়ে আমাদের মতামতের পূর্বে মুখুজ্জে মশায়ের, আনন্দের গর্ভধারিণীর, বিশেষ করে আনন্দের মতামত জানাটা প্রয়োজন।

তাঁর কথার প্রায় মধ্যপথেই বাধা দেবার জন্যে মুখুজ্জে মুখ খুলে উত্তর দেবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতেই বললেন—না, না, সে কি কথা! আপনারা উপস্থিত আছেন, আপনারা যেমন বলবেন তেমনি কাজ হবে। এ ক্ষেত্রে যেমন করা উচিত বিবেচনা করবেন তেমনি ফর্দ করে দিন, তেমনিই হবে। শ্রীভগবানের দয়ায়, আপনাদের আশীর্বাদে আমার তো আর বর্তমানে অর্থের অভাব নেই।

কথাটা বোধহয় ভট্‌চাজ মশায় এবং নরনাথবাবু কারোই ভাল লাগল না। ঘরের মধ্যে আনন্দ অন্য দিন হেঁটমুখ করে বসে থাকে, বাইরে দাওয়ায়, ঘরের ভিতরে, তার চারিপাশে নানান আলোচনা হয়, সে মুখও খোলে না, মুখ তোলেও না, অধিকাংশ সময় মাথা হেঁট করেই বসে থাকে। আজ সে একবার বাপের কথায় মুখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামিয়ে নিলে। ভট্‌চাজ

মশায় একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বসলেন। নরনাথবাবু একবার হাসলেন একটু তারপর বললেন—ওহে মুখুজ্জে, তোমার ছেলেকে যে লক্ষ্মী কৃপা করেছেন সেটা এই গ্রামের কাক-কোকিলেও জানে। কিন্তু লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা হে! আন্তরিক বিনয় আর শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর সেবা করলে তবে তাঁর আসন স্থায়ী হয়।

সামান্য সাধারণ মানুষ রাম মুখুজ্জে। অকস্মাৎ তাঁর মধ্য থেকে এক স্পর্ধিত মানুষের আত্মপ্রকাশে উপস্থিত সমস্ত মানুষগুলি যেন চমকে গিয়েছিলেন। আপনার স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যেকের মধ্যে তার স্বতন্ত্র প্রকাশ হল। ভট্‌চাজ মশায় সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দিলেন। সাধারণভাবে বললেন—আপনার অর্থ-সঙ্গতির কথা জানি বলেই এ প্রশ্নটা উঠেছে। নইলে উঠত না। তা না হ'লে, এ যে রকম ক্ষেত্র তাতে বলতাম তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধই হোক। কারণ এই যে বৌমা গিয়েছেন এ যাওয়ায় তো সুখের কিছু নেই; এ যাওয়া একান্ত দুঃখের। এমনিতর অকাল মৃত্যু, তার উপর অস্বচ্ছল আর্থিক অবস্থায় অন্য কোন রকম শ্রাদ্ধের পরামর্শই তো দিতাম না। সেই জন্যেই তো প্রশ্ন। বাবা আনন্দ, তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় কি বলত?

নরনাথবাবুর কথায় যে তীক্ষ্ণমুখ কাঁটার মত আঘাতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল তাকে যেন নরম সেজে দিলেন ভট্‌চাজ মশায়। সকলের সঙ্গে সুধাও সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে। সুধার মনটা ভরে উঠল একমুহূর্তে, এই জন্যেই তো সে এত ভালবাসে বাবাকে। বাবার কথার কি ফলাফল হল আনন্দের উপর দেখবার জন্যে সে আনন্দের মুখের দিকে চাইলে। আনন্দের মুখে কিছু দেখা গেল না। সে গলা পরিষ্কার করে নিলে, যেন একটা আবেগ তার গলার কাছে আটকে গিয়েছিল, সেটা সে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন বললে—আপনি নিজে আমার হয়ে যেমন ভাল বোঝেন তেমনি ব্যবস্থা করে দেন। কেবল যাতে তার মুক্তির কোন বাধা না হয় সেই বুঝে যেমন ভাল হয় তেমনি করুন। আপনার চেয়ে আমার ভাল আর কে বেশী বুঝবে!

আনন্দের পক্ষপাত তার চিরদিনের স্বভাব অনুযায়ী স্পষ্ট। আনন্দের কথা শুনে সুধার লজ্জা লাগতে লাগল। তার মনে হতে লাগল যেন তার কথায় আনন্দের বাবা আর নরনাথবাবু দুজনের মনেই খোঁচা লেগেছে। রাম

মুখুজ্জে কোন কথা না বলে দ্রুত তামাক টানতে লাগলেন ; নরনাথবাবুর মুখে অতি অস্পষ্ট শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল।

ভট্‌চাজ মশায় সে সব কিছুই গ্রাহ্য করলেন না, বললেন—তা বেশ, একটা ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধই হোক তা হ'লে। কি বলেন নরনাথবাবু ? মুখুজ্জে মশায় কি বলেন ?

—তাই হোক। আপনি যেমন বলছেন।

—কি বলেন নরনাথবাবু ?

—সেই ভাল। একটু যেন অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন নরনাথবাবু। সুধার মনে হল যেন একবার উঠে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল নরনাথবাবুর। কিন্তু সেটা খুব খারাপ দেখাবে এই ভেবেই যেন তিনি সংযত হয়ে চুপ করে গেলেন ; আর সেই কারণেই অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন নরনাথবাবু।

ফর্দ করতে আরম্ভ করলেন ভট্‌চাজ মশায়। ফর্দের দিকে চেষ্টাকৃত সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়ে বসে থাকলেন নরনাথবাবু। ফর্দ হয়ে গেলে ফর্দটা মুখুজ্জে মশায়ের হাতে দিয়ে দু জনেই উঠলেন।

—একটা নিবেদন ছিল বাবু। মুখুজ্জে মশায় সম্বোধন করলেন নরনাথবাবুকে।

—বল। যেতে উদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন নরনাথবাবু।

—আমার ছুটিটা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে হবে বাবু।

—কেন হে ?

—আনন্দ তো আর এখন দোকানে বসতে পারছে না, এখন কিছুদিন বোধ হয় বসতেও পারবে না। তাই আমি ভাবছিলাম যে আমিই এখন কিছুদিন—ও যতদিন বেশ সুস্থ না হচ্ছে ততদিন—ওর কারবারটা একটু দেখা শুনো করব।

সাগ্রহে সম্মতি দিলেন নরনাথবাবু, বললেন—এতো খুব ভাল কথা হে। তা আনন্দের দোকানে বসবার মত মন মেজাজ হোক। ততদিন তুমি অনায়াসে বস দোকানে। আমার হয়তো একটু অসুবিধা হবে। তা হোক, আমি সে চালিয়ে নেব কোনরকম করে। আর এতো তোমার কর্তব্যই হে ! এতো খুব ভাল কথা !

নরনাথবাবু আর ভট্চাজ মশায় দু জনেই চলে গেলেন। সুধার মনে হয়েছিল আনন্দ ওর বাবার কথা শুনে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার এই যে আনন্দ মোটেই অবাক হল না, একটু অভিযোগ মিশিয়ে বাবাকে বললে—তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম বাবা, ওই জমিদারী সেরেস্তার চাকরী ছেড়ে দিয়ে কারবার দেখাশুনো কর। তা তখন তোমার রাগ হল। আমি আর কি বলব বল?

মুখুজ্জে মশায় বার কয়েক জোরে তামাক টানলেন, তারপর হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর মাথাটা দু হাতে চুলকোতে লাগলেন, বললেন—উঃ, মাথাটা কেমন সুড়সুড় করছে। তেল পড়ে নাই ক' দিন। তা তুই যা বলেছিলি ঠিকই বলেছিলি। তোর কথাই ঠিক।

আনন্দ জোর দিয়ে বললে—ঠিক কথাই বলেছিলাম আমি। তখন তোমার পছন্দ হল না। এখনও বরং এক কাজ কর তুমি। চাকরী ছেড়ে দাও। তুমি বরং নরনাথবাবুকে গিয়ে আমার নাম করে বল—আমার ছেলে ছাড়ছে না। সে বার বার আমাকে বলছে চাকরী ছেড়ে তার ব্যবসা দেখবার জন্যে। সে কিছুতেই ছাড়ছে না আমাকে।

এমন সময় এসে দাঁড়ালেন আনন্দের মা। তিনি বাইরের সব লোক চলে যাওয়া বোধ হয় ভিতর থেকে লক্ষ্য রেখেছেন। বাইরের লোকের মধ্যে এক মাত্র সুধা। সুধা তো প্রায় ঘরের লোক। আনন্দের মা বললেন স্বামীকে—আনু যা বলছে তাই কর। ও ভাল কথাই বলছে। ওর কথায় আর তুমি না ক'র না।

এবার একটু চটে উঠলেন মুখুজ্জে মশায়, রাগতস্বরে বলে উঠলেন—আমি কি তোমাকে বলেছি যে আমি করব না। যাব, আজই বিকেলে যাব নরনাথবাবুর কাছে। তাঁকে সব বলে কাজে জবাব দিয়ে আসব।

আনন্দের মা অদূর ভবিষ্যতের নূতন ছবি আঁকলেন সঙ্গে সঙ্গে, তুলে ধরলেন স্বামীপুত্রের চোখের সামনে, বললেন—বাপ-বেটাতে তোমরা কারবারে নাম, লক্ষ্মী উথলে উঠবে। লক্ষ্মী আমার সংসারে আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, তাঁকে হাত জোড় করে ডাকলেই তিনি ঘরের ভেতর সিংহাসনে এসে বসবেন। মা লক্ষ্মীর পিছন পিছন আমার ঘরের লক্ষ্মী আসবেন আবার। আমার সংসার আবার নূতন করে ভরে উঠবে।

তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আর জল খাবে কখন? বেলা যে এক পহর পার হয়ে গেল। এস খাবে এস।

তিনি চলে গেলেন। জল খাবার জন্যে স্বামীও তাঁর পিছনে পিছনে উঠে গেলেন।

বাবা-মা চলে যেতেই আনন্দ একটা আর্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অকস্মাৎ সুধার কোলে মাথা রেখে লম্বালম্বি কম্বলের উপর শুয়ে পড়ল। মুখে বললে—আর পারছি না রে সুধা! আর পারছি না ভাই। এরা সবাই যে তাকে ভুলতে বাধ্য করছে। উঃ মা, তাকে ভুলে কি ক'রে থাকব!

আনন্দকে এই দীর্ঘকাল ধরে সুধা দেখে আসছে। সে আনন্দকে বোঝে, তার চেয়ে তাকে ভাল বুঝত মাত্র আর এক জন। হিলু-বৌ। আজ হিলু-বৌ নেই। সুধা আনন্দের এই আক্ষেপের সামান্য ক'টি কথা থেকে তার মনের সমস্ত কথা বুঝতে পারলে। হিলু-বৌয়ের অন্তর্ধানে আনন্দের সংসারে এক আনন্দ ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি। বরং ওর বাবা-মা যেন নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছেন। তাই আবার তাঁরা নূতন করে সংসার রচনার কল্পনায় ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। যা রচনার কল্পনা তাঁরা করছেন তা অবশ্য আনন্দকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আশ্চর্য, আনন্দের মনের দিকে কেউ চাইছেন না। আনন্দ কি ভাবছে, কি চাইছে তা দেখবার, বুঝবার অবকাশ বা ইচ্ছা যেন ওদের কারো নেই। আনন্দ তাতেই আঘাত পাচ্ছে বেশী। আনন্দ প্রতি মুহূর্তে চাইছে হিলু-বৌকে মনে মনে রাখতে; তার চিন্তা ও কল্পনাকে শুধু তারই সম্বন্ধে জাগ্রত রাখতে। কিন্তু বাইরের জীবনের টানে, প্রতিদিনকার নব নব আঘাতে সে অবিচ্ছিন্ন ভাবনা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে। তাকে নূতন করে জুড়তে যাবার চেষ্টা করতেই নূতন আঘাত আসছে। সে প্রতিমুহূর্তে হিলু-বৌকে মনের সামনে রাখবে কি করে এই অবস্থায়! তাই সে আকুল হয়ে উঠেছে।

সুধা কিছু না বলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আনন্দের মা এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন আবার। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছেলেকে যেন অহরহ ঘিরে রেখেছে। তিনি শঙ্কিত ভাবে বললেন—কি হল আনু, অমন ক'রে শুলি কেন বাবা?

আনন্দ কোন জবাব দিলে না, সে যেমন সুধার কোলে মুখ রেখে

শুয়েছিল তেমনিই শুয়ে থাকল। সুধা বললে—না, কিছু হয়নি। এমনিই শুয়েছে! মন খারাপ করছে আর কি!

আনন্দের মা এসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সুধার মনে হল অকস্মাৎ, আনন্দ কি করে এই নূতন মমতার জাল থেকে আত্মরক্ষা করে হিলু-বৌয়ের স্মৃতিকে রক্ষা করবে!

ছয়

হিলু-বৌয়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি সব চুকে গেল নির্বিঘ্নে। কাজকর্মের প্রশংসা করলে সকলেই। এদিকে সবকিছু দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করলেন ভট্টচাজ মশাই, তেমনি ওদিকে খাওয়া-দাওয়া সব দেখাশুনো করলেন নরনাথবাবু। আনন্দ'র বাবা মা দুজনেরই কৃতজ্ঞতার শেষ নেই নরনাথবাবুর কাছে। ভট্টচাজ মশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতার যেন কোনই প্রশ্ন ওঠে না; কারণ তাঁর কাছ থেকে অকৃপণ অজস্রতায় নানান দাক্ষিণ্য এই পরিবারটি বরাবর পেয়ে আসছে। তার কারণ তিনি আনন্দ'র প্রাণের তুল্য বন্ধু সুধার বাবা। নরনাথবাবুর সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্কই এঁদের নাই। বরং যেটুকু ছিল সেটুকুও আনন্দর বাবা রাম মুখুজ্জেই ইদানীং ছিন্ন করেছেন। রাম মুখুজ্জে ভেবেছিলেন নরনাথবাবুকে একেবারে চাকরী ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে হয়তো তিনি অপ্রসন্ন হবেন, শ্লেষ ক'রে কথা বলবেন, আনন্দ'র অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলে হয়তো ব্যঙ্গ করবেন। কিন্তু তিনি কথাটা শুনে তেমন কোনো কিছুই বললেন না, বরং সর্বান্তকরণে রাম মুখুজ্জের কল্পনাকে সমর্থনই করলেন; শেষে বললেন—দেখ, মুখুজ্জে কথাটা আমার অনেক আগেই মনে হয়েছিল। তোমাকে বলতে পারি নি বলিও নি। আমি নিজে থেকে কথাটা তোমাকে বল্লে তোমার ধারণা হ'ত—আমিই হয়তো তোমাকে ইচ্ছে করে কাজ থেকে জবাব দিচ্ছি। আর এই কথাটা জবাব দেবার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছি। যাক এ তুমি ভালই করেছ। আমি তো খুব খুশী হলাম। হ্যাঁ,

আর একটা কথা বলে রাখি। চাকরী ছাড়লে বলে যে বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা ভাববে তা হবে না। তুমি যদি বাড়ী ছাড় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব এটা জেনো। নরনাথবাবুর সহৃদয়তা, বিশেষ করে এই পরিবারটির প্রতি সহৃদয়তা কতখানি তা ভাল ক'রে বোঝা গেল হিলু-বৌয়ের শ্রাদ্ধের সময়। তিনি শুধু নিজে দাঁড়িয়ে-ই রান্নাবান্না দেখাশুনো করলেন না, শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ভোজনের সমস্ত কাঠ আর মাছ এল তাঁরই কাছ থেকে। আনন্দ পয়সা দিয়ে অনায়াসে তা কিনতে পারত, সে আর্থিক স্বচ্ছলতা তার আছে। কিন্তু কাঠ আর মাছ আপনি নিজে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নরনাথবাবু। কাজেই এ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ মুহূর্তে মুহূর্তে না বেড়ে উপায় কি ?

তা ছাড়া কাজের আগের দিন থেকে নরনাথবাবু প্রায় সর্বক্ষণ এখানেই ছিলেন। সমস্ত কাজকর্ম চুকিয়ে রাত্রে বাড়ী চলে গেলেন না খেয়েই। আনন্দ'র বাবা বার বার অনুরোধ করেছিল খেয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু তিনি খান নি। হেসে বলেছিলেন—ওহে তোমার বাড়ী তো আমারই বাড়ী। কাজেই না খাওয়ার জন্যে কিছু ভেবো না। সারা গায়ে তরিতরকারীর ময়লা লেগে আছে। এখন প্রথমে ভাল করে স্নান করতে হবে। তারপর সন্ধ্যা জপ করতে হবে। তারপর যা হয় সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ব।

তিনি চলে গিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আনন্দ'র মা নিজে হাতে খাবার থালা সাজিয়ে দিয়ে এসেছিলেন নরনাথবাবুর বাড়ী; তাঁর স্ত্রীকে বারবার অনুরোধ করে এসেছিলেন সে খাদ্য রাত্রেই যেন নরনাথবাবু গ্রহণ করেন।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর জীবনে একটি স্বাভাবিক শান্তি ফিরে এল। সামাজিকতা, নিরন্তর আসা-যাওয়া, নানান লোকের ভীড় সব মিটে গেল। সেদিন সকাল বেলাতেই রাম মুখুজ্জে ডাকলেন আনন্দকে—আনু, আনু উঠেছিস না কি ?

ঘুম ভেঙে গেল আনন্দ'র। সারারাত্রি মাঝে মাঝে ঘুম হয়, ঘুম ভাঙে আর ঘুম আসতে চায় না। রাত্রির নিস্তব্ধ নিরন্ধ্র অন্ধকারে হিলুর ছবি উজ্জল হয়ে ভেসে ওঠে মনের মধ্যে, সে জাগ্রত স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আবার কখনও বার বার চেষ্টা করেও হিলুর মুখ সে মনে করতে পারে না, একবার এক ঝলক সে মুখ মনে এসেই সরে যায়। তখন মন অত্যন্ত

আতুর হয়ে ওঠে। তখন মনে আসে যত এলোমেলো কথা, আদি অন্তহীন অর্থহীন। মন থেকে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করলেও তাড়ানো যায় না তাদের। সারা মন দখল ক'রে জুড়ে বসে থাকে তারা। তখন বাধ্য হয়ে সেই অর্থহীন চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করতে হয়। তবু ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই। তখন আকারহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতেই আবার কখন ঘুম এসে যায়, নিজে জানতেও পারে না।

এমনি করেই কাটে ওর এখনকার রাত্রিগুলো। কখন ঘুম আসে, আর কখনও ঘুম ভেঙে চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে শুয়ে থাকতে হয় তার কোন স্থিরতা নাই। সেই কারণেই সে ভোরে ওঠে না, উঠতে পারে না। আর ভোরে উঠবার কথা মনে হলেই মন বিষিয়ে ওঠে, মনে হয়—কি হবে ভোরে উঠে, উৎসাহ করে আর কোন্ কাজ করার আছে! আর তাতে লাভই বা কি! বাবার ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল, বিরক্ত লাগল, প্রথমটা কোন জবাবই দিলে না। চুপ করে শুয়েই থাকল।

বাবা আবার ডাকলেন—আনু রে, আনু, ওঠ।

আনন্দ বুঝলে—সে যতক্ষণ জবাব না দেবে ততক্ষণ বাবা ডেকে যাবে। সে বিরক্ত হয়েই জবাব দিলে—কি বলছ কি?

আবার বাবার ডাক—উঠলি না? ওঠ।

—এত ভোরে উঠে করব কি?

—দোকানে যাবি না? ওঠ।

এবার সে বিরক্ত হয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল, বললে—এত ভোর থেকে কোথায় যাবে তুমি? আর তুমিই যাও দোকানে। আমি এখন আর ক'দিন যাব না। দু দশদিন পরে যাব।

আনন্দ আপন মনেই একটু হাসল। ওর বাবা অকস্মাৎ অত্যন্ত বেশী রকম উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। বাবার এত উৎসাহের কারণ কি সে ভেবে কিছুই স্থির করতে পারে না। বাবার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। যাক, বাবা তা হলে অবশেষে লাগল দোকানের কাজে।

আর ঘুম এল না। সে জানলাটা খুলে দিলে। বাড়ীর ওপাশে নিমগাছের ঘন সবুজ পাতা-ঢাকা খানিকটা অংশ নজরে পড়ল; কানে এল

পাখীর ডাক। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এ ক'দিন পাখীর ডাক একেবারে শোনে নি, শুনতেও পায় নি। মনে পড়ল, শেষ পাখীর ডাক শুনেছিল শ্মশান থেকে নদীতে স্নান করে ফিরবার সময়; সে সময় ক'টা শালিক আর চড়াই পাখী ভিজে মাটির ওপর নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে গলা ফুলিয়ে ডাকছিল আপন মনে। আজও নিম গাছের পাতার আড়ালে একটা কোকিল ডাকছে। সে অনেকক্ষণ একমনে শুনলে কোকিলের ডাক। নিমগাছের পাতার আড়ালে কোনখানে কোকিলটা বসে আছে সেইটা লক্ষ্য করতে লাগল একমনে। ভারী ভাল ভাগল তার সবটা মিলে। চোখে হঠাৎ জল এল। মনে পড়তে লাগল ছোটবেলার কথা—কবে যেন এমনি করে কোকিলের ডাক শুনেছিল। তার ইচ্ছা হতে লাগল—সারাদিন এমনি করে চুপ ক'রে এই জানালাটার কাছে বসে থাকে বাইরের দিকে চেয়ে। সে চুপ করেই বসেছিল। এমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন। মা উঠেছেন সেই কোন ভোরে, বাবার চেয়েও আগে। মা ঘরে ঢুকে ওর মাথায় একটা কি, বোধহয় কোন আশীর্বাদী পুষ্প ঠেকিয়ে দিলেন, তারপর ওকে বললেন—যা বাবা, কাপড়টা ছেড়ে আয় তো!

তার দিবা স্বপ্ন ভেঙে গেল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কেন? এত সকালে কাপড় ছেড়ে কি করব? আমি তো দোকানে যাব না এখন কিছুদিন! ও বাবাই যাবে।

মা একটু হাসলেন, বললেন—দোকানে তোমার বাবা গিয়েছে। তোমাকে দোকানে যেতে বলি নি বাবা। একটা মাদুলী আছে সেইটা পরিয়ে দোব।

—মাদুলী, কিসের মাদুলী? কি হবে আমার মাদুলী প'রে?

—পর বাবা। আমি কত কষ্ট করে যোগাড় করে এনেছি।

—মাদুলীটা কিসের তাই বল না আগে।

মা একবার ঢুবার ঢোক গিললেন, তারপর বললেন—এই বউমা গেল বাবা তোর কাছ থেকে, এই সংসার থেকে। সংসারের মায়া কাটানো কি সোজা কথা বাবা? মানুষ মরেও তা ভুলতে পারে না। তাই—। মা আর কথাটা সম্পূর্ণ না করেই ছেড়ে দিলেন।

আনন্দ একবার মায়ের মুখের দিকে চাইলে। তারপরই ঘর হতে বেরিয়ে

গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাতে জল দিয়ে, কাপড় ছেড়ে মায়ের কাছে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলে। মা তাড়াতাড়ি মাদুলীটা ওর হাতে বেঁধে দিয়ে বাঁচলেন যেন।

আনন্দ বারান্দাতেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সেই নিমগাছের দিকে চেয়ে। কিন্তু ভাঙা স্বপ্ন আর জোড়া লাগল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবছিল এইবার কি করবে সে। এই সময় বাইরে থেকে সুধা ডাকলে—আনন্দ।

সমস্ত মন দিয়ে আনন্দ যেন ওকেই চাইছিল! ডাকলে—আয়, আয় ভাই।

—কি ব্যাপার রে? আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে। তার নজরে পড়ল সুধার সমস্ত মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। আনন্দ'র মন যে শোকের মেঘে অবিরাম ছেয়ে আছে তারই ছায়া পড়ে সুধার মুখে, অন্তত যতক্ষণ সুধা এখানে থাকে ততক্ষণ আনন্দের বিষণ্ণতা সে মনে মুখে মেখে বসে থাকে। আজ নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।

—পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে রে! আমি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছি। কমলার মামা কলকাতা থেকে খবর পাঠিয়েছেন।

—আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। আনন্দ অকপট আনন্দে জড়িয়ে ধরল সুধাকে। পর মুহূর্তেই ওকে ছেড়ে দিলে। ওর সব হাসি খুশীর রৌদ্র ঢেকে গেল বিষন্নতার ছায়ায়। বললে—আজ এই খবর শুনে যে সব চেয়ে বেশী খুশী হত সে-ই নেই। আমার আনন্দ যে সব সে-ই নিয়ে গিয়েছে। আর এই দেখ না—বলে সে আপনার ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিলে সুধার দিকে।

—কি?

—হিলু যাতে ভূত হয়ে আমার কোন ক্ষতি না করতে পারে তার ব্যবস্থা। আনন্দ একটু সখেদ হাসি হাসল।

—আরে, নরনাথ বাবু আসছেন। সঙ্গে আবার এক ভদ্রলোক আসছেন দেখছি।

বিরক্ত হল আনন্দ—কি জ্বালা বল দেখি! এখন বাবা নেই, আমাকেই এখন বসে বসে আদর করতে হবে, নমস্কার করতে হবে, চেষ্টা করে

হাসতে হবে। কি মুস্কিল বল দেখি। তুই শুদ্ধ থাক ভাই। চলে যাস না। অবিশ্যি হিলুর কাজে ভদ্রলোক অনেক করেছেন, অনেক দিয়েছেন। ওঁর কাছে কৃতজ্ঞতার কারণ আছেই। কাজেই সমাদর করতে হবেই।

ততক্ষণে নরনাথ বাবু বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন—ও মুখুজ্জে! মুখুজ্জে হে! রয়েছ নাকি?

আনন্দকেই বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'ল, সম্ভাষণও করতে হল—আসুন। বাবা তো নেই। দোকানে গিয়েছে।

নরনাথবাবু বললেন—ও তা হ'লে দোকানে যাচ্ছে মুখুজ্জে? ভাল, খুব ভাল। তা মুখুজ্জে নেই, তুমি তো আছ।

আনন্দ'র সঙ্গে সঙ্গে সুধাও বেরিয়ে এসেছিল। তাকে দেখে নরনাথবাবু বললেন—এই যে আমাদের ভট্চাজ মশায়ের ছেলে, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে।

আনন্দ বললে—ফাষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে সুধা।

সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রথা-অনুযায়ী প্রণাম করলে সুধা নরনাথবাবুকে। কেবল মাত্র নরনাথবাবুকে প্রণাম করেই থমকে গেল সুধা। সঙ্গে সঙ্গে নরনাথবাবু বললেন—এঁকেও প্রণাম কর বাবা। ইনি আমার ভগ্নিপতি। কাজে কাজেই তাঁকেও প্রণাম করতে হল সুধাকে। আনন্দ সচরাচর এই ব্যাপারগুলোতে ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু বোধহয় নরনাথবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতই তাঁর ভগ্নিপতিকে প্রণাম করলে সে।

নরনাথবাবু ও তাঁর ভগ্নিপতি দুজনেই বিগলিত কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন ওদের দুজনকেই। নরনাথবাবু বললেন, কেমন প্রসন্নবাবু, তোমাকে বলি নি-এই জোড়মানিকের মত ছেলে আর নেই আমাদের গ্রামে! এ গ্রাম কেন, আশেপাশের গ্রামেও এমন সোনার চাঁদ ছেলে খুঁজে পাবে না।

তারপর সুধাকে দেখিয়ে বললেন—একে তুমি আগে দেখেছো, ও তখন অবিশ্যি খুব ছোট ছিল। তুমি তো বছর বারো আগে এসেছিলে? তবে তুমি আনন্দকে দেখ নি! ওরা তার পরে এ গ্রামে এসেছে।

সুধা আর আনন্দ দুজনেই, বিশেষ করে আনন্দ এতক্ষণ বুঝতেই পারলে না নরনাথবাবুর ভগ্নিপতি কেন এসেছেন। বসতে দিতে হল কম্বল পেতে? ওঁরা দু জনেই জাঁকিয়ে বসলেন।

নরনাথবাবু বললেন—মুখুজ্জে তো নেই। তার আর কি করা যাবে। আনন্দ'র সঙ্গেই খানিকটে গল্প সল্প করে যাওয়া যাক। কি বল প্রসন্নবাবু!

—আরে আমি তো সেই জন্যেই এসেছি। আমার দেশ তো এখান থেকে কম দূর নয়, হাঁটা পথেও আঠার ক্রোশ। সেখানে বসেও বাবা আনন্দ, তোমার নাম শুনেছি। আমাদের গ্রামের একজন চাকরী করে জংশনে একটি কাপড়ের গদীতে। সে-ই তোমার আশ্চর্য উন্নতির কথা প্রায় গল্প করে বাড়ী এলেই। আমাকে একদিন বললে—জানেন রায় মশায়, আপনার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের একটি ছেলে ব্যবসা করে ক' বছরের মধ্যে খুব উন্নতি করেছে। নাম জিজ্ঞাসা করলাম, নাম শুনেও বুঝতে পারলাম না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বাবার নাম শুনেও কিছু ধরতে পারলাম না। তা ভাবলাম—আচ্ছা, যখন শ্বশুর বাড়ী যাব তখন খোঁজ নিয়ে আসব। তা এখানে এসে নরনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, জিজ্ঞাসা করতেই তোমার কথা জানতে পারলাম।

নরনাথবাবু ভগ্নীপতির কথায় মাঝখানে বাধা দিলেন, হেসে বললেন—আরে প্রসন্নবাবু আমাকে কি বললে শোন। বললে—ওহে নরনাথবাবু, তোমাদের গ্রামে এই রকম ব্যবসা করে কে একটি ছেলে আশ্চর্য উন্নতি করেছে এই ক' বছরের মধ্যে, সেই কৃতী ছেলেটিকে আমাকে একবার দেখাতে পার? আমি বললাম—আরে প্রসন্নবাবু, তুমি কার কথা বলছ? আমাদের আনন্দ'র কথা, আমাদের রামমুখুজ্জের ছেলে আনন্দ'র কথা? আরে সে তো আমাদের ঘরের ছেলে!

নরনাথবাবুর কথার শেষ অংশটি ধরলেন প্রসন্নবাবু, আমাকে সব বলে বললেন—আহা বেচারীর এদিকে অমন আশ্চর্য ভাগ্য, অথচ ওদিকে রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত স্ত্রী—সে সন্তান হতে গিয়ে মারা গেল। বেচারী এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। তা আমি এসেছি কাল বিকেলে। রাত্রে সব শুনে নরনাথবাবুকে বললাম—চল, সকালে গিয়েই ছেলেটিকে দেখে আসি।

আসার কারণ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করে সখেদে প্রসন্নবাবু বললেন—আহা বাবা, তোমাকে দেখে যত আনন্দ হল, তত দুঃখ হল। এই তো সামান্য বয়স তোমার। এরই মধ্যে জীবনের একটা পর্ব একেবারে

শেষ হয়ে গেল। বড় দুঃখের কথা কিন্তু এর উপর তো কারো হাত নেই। কি করবে। করারও কিছু নেই।

সুধা দেখলে কথাগুলি যেন আনন্দের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তার দুই চোখ জলে ভরে এসেছে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে থর থর ক'রে।

প্রসন্নবাবু বললে—কি করবে বাবা, ভগবানের প্রহার, এ সহ্য করতেই হবে। আমার জীবনে তোমার মত বয়সে আমিও এ আঘাত সহ্য করেছি। তোমারই মত বয়স তখন আমার, আমার স্ত্রী মারা গেলেন নিঃসন্তান অবস্থায়, ভেবেছিলাম আর সংসারী হব না। ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসী হয়ে যাব। সংসারে দায় বলতে কিছু ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিলেন একমাত্র নিঃসন্তান কাকা। আমার মনের অবস্থা দেখে মাস দুয়েক যেতে না যেতে এই নরনাথবাবুর ভগ্নীর সঙ্গে জোর করে বিবাহ ঘটিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সব সয়ে গেল, মেনে নিলাম সব। শুধু তাই নয়, ভালও বাসলাম, আনন্দও পেলাম সংসারে থেকে ভগবানের আশীর্ব্বাদে। দেখ বাবা, জীবনটা যেন নষ্ট না হয়। আর বিশেষ ক'রে তোমার জীবনের মত জীবন। আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে।

প্রসন্নবাবু থামলেন। অনেকক্ষণ আর কেউ কোনা কথা বললেন না। তাঁর কথাগুলির আন্তরিক গাম্ভীর্য্য সকলেরই মনকে স্পর্শ করেছে যেন। নিজে যে সুখ আর শান্তি পেয়েছেন সংসার থেকে, যার কথা প্রসন্নবাবু এতক্ষণ কীর্তন করলেন সেই সুখ আর শান্তির প্রসন্ন ছায়া যেন তখন ভাসছে তাঁর উপর। কথাগুলি শুনে বাচাল নরনাথবাবুও আত্মস্থ হয়ে চুপ ক'রে গিয়েছেন। সুধার স্বভাব-প্রসন্ন মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আনন্দ ইদানিং সব সময় মাথা হেঁট করে থাকে, সে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রসন্নবাবুর মুখের দিকে, ভাবছে এও কি সম্ভব? যে আঘাতে তার মনখানা দু টুকরো হয়ে গিয়েছে সে আঘাত কি সে সত্যই ভুলে যেতে পারবে? সে মন কি আবার জোড়া লাগবে? তার এই জীবনের ভাঙা দেউল আবার মাথা উঁচু করে উঠবে? এও কি সম্ভব। কিন্তু তাতে ক'রে কি সে ভুলে যাবে না হিলুকে? মর্মান্তিক অভিমানে আর অপমানে হিলুর ব্যথিত মুখ বার বার কি তাকে মনে মনে পীড়িত করবে না?

হিলু-বৌয়ের স্মৃতিকে এ অপমান সে করবে কি ক'রে? সে সম্ভব নয়, কিছুতেই সম্ভব নয়।

সকলে আপনার আপনার চিন্তায় মগ্ন হয়ে চুপ করে আছে। বাইরে সদা-ধ্বনিমুখর পৃথিবীর সঙ্গীত মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে পাখীর গানে। নিম গাছে পাখীর দল কল কল করছে। দাওয়ার সামনে রাস্তায় শালিক আর চড়ুইয়ের দল নেচে নেচে কল কল করে চলেছে। তারই স্পর্শে মনে যেন অমৃতের প্রলেপ পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন নরনাথবাবু,—ওঠ প্রসন্নবাবু, চল। আবার আসা যাবে এক দিন। তুমি তো এখন আছ।

—চল। মুখুজ্জে মশায়ের সঙ্গে আলাপ করা যাবে। কিন্তু আমি ভাই বেশীদিন থাকতে পারব না।

—হ্যাঁ, থাকতে পারবে না কি? এক যুগ পরে এসেছ? আর যে কাজের জন্য এসেছ তা না ক'রে?

—সে পরের কথা। এখন যাই বাবা। কল্যাণ হোক তোমাদের। তোমার বাবাকে বলো। আনন্দ সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি।

তাঁরা চলে গেলেন। আনন্দর খুব ভাল লেগেছে প্রসন্নবাবুকে। সে বললে—বেশ মানুষ, নয়? অনেকটা তোর বাবার জাতের মানুষ। ভট্টচাজ মশায় একটু গম্ভীর। এ ভদ্রলোক খানিকটা হাল্কা সে তুলনায়।

দুপুর বেলায় দোকান থেকে ফিরতেই আনন্দ বললে—নরনাথ বাবু তাঁর ভগ্নীপতি প্রসন্ন বাবুকে নিয়ে এসেছিলেন।

সংবাদটা শুনেই মুখুজ্জে মশাই খুশীতে যেন জ্বলে উঠলেন। বাবার এই খুশীর পরিমাণ আনন্দের চোখে আশ্চর্য লাগল। তার বাবা স্বভাবতই ঠাণ্ডা স্তিমিত স্বভাবের মানুষ। কোন আবেগ তাঁর ভিতর প্রবল ভাবে প্রকাশ পায় না। তিনি বললেন—কখন এসেছিলেন? কতক্ষণ ছিলেন? কি কি বললেন?' এক সঙ্গে অজস্র প্রশ্ন।

আনন্দ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আনন্দ যেমন চুপচাপ ক'রে বসে থাকে সেদিনও তেমনি বিকেল বেলা আপনার ঘরটিতে কম্বলের উপর চুপ করে বসেছিল মাথা হেঁট করে।

বিকেল বেলা সুধা যেমন আসে তেমনি এসে দাঁড়াল ঘরের দাওয়ায়, সেখান থেকেই ডাকছে—আমু !

সুধা ওর পাশে বসে পড়ল, বললে—তোর অসুখ বিসুখ করেনিতো আমু ?

—না। একটু হাসল আনন্দ।

—তবে ? শরীর ভাল আছে ত ?

—হ্যাঁ !

—তবে চল, ওঠ, একটু বেড়িয়ে আসি। বলে সে আনন্দ'র হাত ধরে টানতে লাগল, বললে—এই বসে বসে তোর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মনও বেশী খারাপ হচ্ছে। চল, ওঠ।

আনন্দ ওকে টেনে বসালে—বস। বেড়াতে যেতে ভাল লাগছে না। আর বসেই বা থাকব ক'দিন ? আর বসে থাকতেও তো কেউ দেবে না। য'দিন বসে থাকতে পারি, থাকি।

—কি হ'ল তোর বল দেখি আমু ? উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে সুধা।

—কিছু না। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না ভাই। প্রায় মুহ্যমান মানুষের মত জবাব দিলে আনন্দ।

সুধা কোন উত্তর দিলে না, কেবল কাতর ভাবে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। আনন্দ'র মনের সঠিক অবস্থা সে বুঝতে পারছে না, তবে এইটুকু বুঝতে পারছে যে আনন্দ মনে মনে যে কোন কারণেই হোক অত্যন্ত বিভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে।

সুধা বুঝবে কি আনন্দই কি ভাল করে আপনার অবস্থা বুঝতে পেরেছে ? অতি স্পর্শকাতর অভিমানী মন ওর বাল্যকাল থেকেই। সেই স্পর্শকাতর মনকে রক্ষা করবার জন্যেই সে আপনার অজ্ঞাতে একটা ক্রোধের সতত আক্রমণশীলতার কঠিন আবরণ রচনা করেছিল আপনার বাল্যকাল থেকেই। হিলু-বৌ এসে ধীরে ধীরে দীর্ঘদিনের নিয়মিত ও প্রতি মুহূর্তের মমতায় আর প্রেমে ওর বিশ্বাস উৎপাদন করে ওকে সেই কঠিন আবরণ থেকে মুক্ত করেছিল, ওকে সহজ ও সুন্দর করে তুলেছিল, ওকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু আজ তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ওর সেই মন নিয়ে বিব্রত বোধ করছে, অসহায় বোধ করছে আতুরের মত—কোনখানে

দাঁড়াবে সে ! সেই আর্ত আতুর মনোভাবের সময় সে যার মমতার হাত যার স্নেহই পেয়েছে, সেই মুহূর্তে তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে আত্মসমর্পণ করেছে বাবা আর মায়ের কাছে'। প্রতি মুহূর্তের সদা আগত সেবার আর মমতার সঙ্গে সে প্রত্যাশা করেছিল তার মনের প্রতিটি বেদনা, প্রতিটি মনোভাব মা আর বাবার কাছ থেকে সহানুভূতি পাবে। সেই প্রত্যাশাতেই সে আপনার আতুর মনকে মেলে ধরেছিল বাবার কাছে একটি বিহ্বল মুহূর্তে। সেবা সে পেলে, মমতাতো ছিলই; কিন্তু ওর মনের সেই মুহূর্তের সারাহৃদয়ব্যাপী যে মূল বেদনা—হিলু-বৌর প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক মমতা প্রদর্শন—তা কোন সহানুভূতি তো দূরের কথা, কোন সমর্থনও পায় নি। সে বিহ্বল হয়ে মনে মনে প্রশ্ন করেছে বাবা তার প্রতি সুপ্রচুর মমতা সত্ত্বেও তার মনের দিকে তাকায় না কেন ? তার মন একদিকে চলেছে, ওদের মন যাত্রা করেছে ভিন্ন পথে, ভিন্ন লক্ষ্য-বস্তুকে কেন্দ্র করে। সে বেশ ভাল করে লক্ষ্য করেছে—এই সামান্য কয়েক দিনে এক সে ছাড়া তার সমস্ত সংসার যেন হিলু বৌকে ভুলে গিয়েছে। শুধু ভুলে যাওয়াই নয়, একটা গাছ থেকে পাকা পাতা ঝরে গেলে গাছ যেমন তা সহজ ও স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়, আপনার সবুজ পাতার চোখ দিয়ে যেমন সহজে দেখে আপনার অঙ্গ-বিচ্যুত সেই ঝরা পাতাকে, তারপর আপনার হাজার বাহুর তাড়নায় তাকে কোন দূর দূরান্তরে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তেমনি করে তার সংসার থেকে মা আর বাবা যেন কোন নিঃশব্দ গূঢ় তাড়নায় হিলু-বৌকে নিশ্চিহ্ন করছেন। তার বেদনার দিকে ওঁরা তো কই একবার ফিরেও চাইলেন না ! ওর বেদনার দিক থেকে যেন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে আছেন। এই উপেক্ষা সে সহ্য করবে কি করে ? যতই সে অবস্থাটা চিন্তা করছে ততই মনে মনে কাতর হয়ে উঠছে সে। এইখানে চুপ করে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগ্রত করে সব কিছু লক্ষ্য করছে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। যেখানে হিলু-বৌ নেই সেখানে হিলু-বৌয়ের সঙ্গে গিঁঠে গিঁঠে গাঁটছড়া বাঁধা মন থাকবে কি করে ? সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে এত সেবা সত্ত্বেও। সেই কথারই সে পুনরুক্তি করলে—সব কিছু বিস্বাদ লাগছে।

কি জবাব দেবে সুধা ? সে চুপ করে থাকল। যার কাছে সমস্ত সংসার,

সংসারের সব কিছু বিস্বাদ লাগছে, বর্তমানের সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যার কাছে তিক্ত লাগছে তাকে আশ্বাস বাক্য কোন্ সান্ত্বনা দেবে?

পায়ের শব্দ উঠছে। আনন্দ মুখ তুললে না, সে বোধ হয় পায়ের শব্দ শুনতেও পায় নি। সে বোধ হয় আপনার মনের তিক্ততার সমুদ্রে অবগাহন করছে। সুধা মুখ তুললে, বললে—বাবা আসছেন।

আনন্দ বোধ হয় সমস্ত মন দিয়ে তাঁকেই কামনা করছিল। সে সাগ্রহে বললে—কে, ভট্‌চাজ মশায়? কৈ? সে সসব্যস্তে ভাল হয়ে বসল।

—কি করছ বাবা আনন্দ? তিনি বসলেন আনন্দ'র পাশে। বললেন—ক'দিনই আসতে পারিনি বাবা। সংসার বিষয়কে যে বিষ বলেছে আমাদের দেশে এ অতি খাঁটি কথা। সেই বিষয়-বিষ ঘাঁটতে ঘাঁটতেই প্রাণ গেল। অথচ না ঘেঁটেও উপায় নাই। কর্তব্য হিসেবে তা করতে হবে। তিনি নিজের অনুপস্থিতির কৈফিৎ দিলেন যেন।—তারপর তুমি কি করছ বাবা? বাইরে বেরোওনি? বরাবর এমনি চুপ করে বসেই আছ? এমন করে বাড়ীতে চুপচাপ বসে থেকো না বাবা। একটু করে বেড়াও, যদি ভাল লাগে বরং দোকানে যাও, কাজকর্মে মন ভাল থাকবে। তা যদি ভাল না লাগে একটু একটু করে বেড়াও। সুধার তো এখন ছুটি। সুধার সঙ্গে একটু একটু করে বিকেলের দিকে একবার, সকালের দিকে একবার ঘুরে এস। তিনি চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—বাবা জীবনে কত আঘাত আসে, মর্মান্তিক আঘাত। আঘাত লাগবার আগের মুহূর্তে মনে হয়—এই আঘাত পড়ছে আমার ওপর, এতেই আমার শেষ হবে। আঘাত পড়ল, তুমি আঘাতের প্রচণ্ডতায় মোহগ্রস্থ হয়ে, মুহ্যমান হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে। চেতনা যখন আবার ফিরল, তুমি আশ্চর্য হয়ে দেখলে কই আমার তো শেষ হয় নি। আমি তো তা হ'লে আঘাতকে সহ্য করতে পেরেছি! আমি তো তা হ'লে আঘাতের চেয়ে বড়। ওর শক্তির চেয়ে আমার শক্তি তো বেশী! তখনও তোমার দেহে মনে সেই প্রচণ্ড মর্মান্তিক আঘাতের বেদনা। ধীরে ধীরে সে ক্ষতও জুড়ে এল, বেদনার আরোগ্য হল। তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলে। সে ক্ষতচিহ্ন হয়ত থাকল তোমার অঙ্গে। সেই ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের মহিমা অনেক বাবা।

একটু চুপ করলেন ভট্টচাজ মশায়। আবার আরম্ভ করলেন—হিলু বৌমার মর্যাদা বুঝবার মত মানুষ আমাদের চারিপাশে কোনদিন খুব বেশী ছিল না বাবা! মা আমার কত ভাল ছিলেন, কত সুন্দর ছিলেন তা আমরা দু'চার জনই জানতাম। সবাই বলত—হিলু বৌমার মত সুন্দর মেয়ে, অমন ভাল বৌ হয় না। কত সুন্দর ছিলেন তিনি তা সকলেরই অনুমানের অতীত ছিল।

অকস্মাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল আনন্দ। ভট্টচাজ মশায় ওর কান্না দেখে চুপ করে গেলেন। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল আনন্দ ছোট ছেলের মত। সে চুপ করলে ভট্টচাজ মশায় বলতে লাগলেন—বাবা সেই জন্তেই তোমার এই আঘাত এত মর্মান্তিক হয়েছে। এমন জিনিষ হারানোর বেদনা তাই আরও বেশী বাবা। তাই সে বেদনায় মুহ্যমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে চিরকাল মুহ্যমান হয়ে থাকলে তো চলবে না। শোককে জয় ক'রো এই আঘাত থেকে যে শিক্ষা যে অমৃতলাভ করলে তাকে জীবনে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে নূতন করে অমৃতময় ক'রে তোল। আবার সংসারের মধ্যে নেমে এস! তোমার এই মুহূর্তে শুনতে খারাপ লাগবে, তবু বলছি—আবার বিবাহ কর।

আবার কেঁদে উঠল আনন্দ। সে যেন নূতন করে আঘাত পেল, বললে—আপনি এই কথা বলছেন? আবার বিয়ে করব?

জোরে ঘাড় নাড়লেন ভটচাজ মশায়—নিশ্চয়! সামনে তোমার কত সম্ভাবনাময় জীবন পড়ে আছে! বিবাহ করবে না? বিবাহ না করলে জীবন পরিপূর্ণ হবে কেন বাবা?

আনন্দ কিছু বললে না, শুধুমাত্র বিহ্বলের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। তাই দেখে ভটচাজ মশায় বললেন—তোমাকে এই মুহূর্তে বিবাহ করতে বলছি না। তুমি মনে মনে প্রস্তুত হও, তারপর।

আনন্দ মুখ নামালে। সে বোধহয় কিছু একটা বুঝলে তাঁর কথা থেকে। ভট্টচাজ মশায় বসে থাকলেন আরও কিছুক্ষণ। এ কথা সে কথার পর তিনি উঠলেন, বললেন—আজ উঠি বাবা। বেশী মন-টন খারাপ ক'রো না। এর তো কোন উপায় নেই। সহ্য করতেই হবে। মন বেশী খারাপ হলে বাড়ীতে বসে না থেকে আমার ওখানে চলে যেয়ো বরং। সুধার মা আছেন, বৌমা আছেন, আমি আছি।

রাস্তায় নামতে নামতে হঠাৎ বোধহয় কথাটা মনে পড়ল, জিজ্ঞাসা করলেন—মুখুজ্জে মশাই কোথায়? তাঁকে দেখছি না? ওঃ হো, তিনি বোধ হয় দোকানে গিয়েছেন, না?

ভট্চাজ মশায় চলে যাবার পরই সুধার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে আনন্দ বললে—চল্ বেড়িয়ে আসি। সত্যিই তো, ঘরে আর বসে থাকব কত?

ঘর থেকে বেরুবে হঠৎ পিছন থেকে মা ডাকলেন—আনু, এই ভর সন্ধ্যে বেলায় কোথায় বেরুবি?

তিনি যেন পাহারা দিয়ে কাছেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে ছিলেন।

আনন্দ বিরক্ত হয়ে পেছন ফিরে তাকালে। মুখে কিছু বললে না।

মা তার বিরক্তি লক্ষ্য করলেন কি না কে জানে, লক্ষ্য করলেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বললেন—বৌমা মারা যাবার পর আর তো বাড়ী থেকে বেরোস নি। এতদিন পরে আজ প্রথম বেরুচ্ছিস, এই ভর সন্ধ্যে বেলায় না বেরুলেই চলবে না? আজ আর বেরিয়ে কাজ কি! কাল বেরুস বরং।

আনন্দ কোন কথার জবাব দিলে না কিন্তু বেরুবার জন্যে সে পা বাড়ালে।

মা এবার বিরক্ত হলেন, বললেন—বড় হয়ে কথা তো আমার তুমি কোন দিন শোনোনি বাবা। আজই বা শুনবে কেন?

মায়ের অভিযোগের ইঙ্গিতটা বুঝতে তার এক মুহূর্ত বিলম্ব হল না। মায়ের কথার অন্তর্নিহিত অভিযোগ তাকে যথাস্থানে আঘাত করলে, তবু সে কোন উত্তর দিলে না, কেবল বললে—সে যাই হোক, আমি বেরুচ্ছি।

এক মুহূর্তে মায়ের মনের শঙ্কা অকপটে আত্মপ্রকাশ করলে; তিনি বললেন—যখন কথা শুনবি না, তখন আর কি করব? হাতে সেই মাদুলিটা আছে ত?

সুধা ভাবলে এইবার হয়তো তারই সামনে আনন্দ তার মাকে কঠিন কিছু বলে বসবে। কিন্তু আনন্দ সে রকম কিছু করলে না। মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে হঠাৎ খানিকটা হাসল, তারপর অকস্মাৎ সুধার হাত ধরে বললে—চল।

রাস্তায় সুধার হাতটা ছেড়ে দিলে আনন্দ, আক্ষেপের হাসি হেসে বললে—তোর বাবা এসে আমার মন থেকে যে ভারটা নামিয়ে দিয়েছিলেন মা আবার বেশ হিসেব করে সেইটাই বুকের ওপর চাপিয়ে দিলে। মন আর

শান্ত হবে কি ক'রে? যার সঙ্গে এতদিন ঘর করলাম, যে স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে এতদিন বাঁচিয়ে গেল তাকে যাতে তাড়াতাড়ি ভুলে যাই তারই চেষ্টা চলেছে অহরহ। শুধু কি তাই, সেই মরে যাওয়া, একেবারে-নিশ্চিহ্ন-হয়ে-যাওয়া মানুষটার হাত থেকে আমাকে আগলে রাখবারই বা কি চেষ্টা!

এতদিন আনন্দর বুকের মধ্যে যে কথাগুলো বেরুতে পারেনি, অথচ অহরহ পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই সব কথা প্রবল স্রোতে বার বার আবেগ, বেদনা আর ক্ষোভের ঘূর্ণী তুলে বেরিয়ে আসতে লাগল। কি বলবে সুধা? সে চুপ করে সব শুনে যেতে লাগল। কেবল একটা অবাক লাগল তার। আনন্দর বুকে হিলু-বৌ এই ক'বছর ধরে তিল তিল ক'রে যে অমৃত সঞ্চয় ক'রে রেখে গিয়েছিল, হিলু-বৌয়ের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার সবটুকু একেবারে বিষ হয়ে গিয়েছে?

এত আক্ষেপ, এত ক্ষোভও সঞ্চিত হয়ে আছে আনন্দ'র জীবনে? না আনন্দ সংসারের সব কিছুর মধ্যে থেকে আপনার স্বভাব-অনুযায়ী খুঁটে খুঁটে এই আক্ষেপকেই সংগ্রহ করেছে? অথচ তারই আড়ালে হিলু-বৌয়ের জন্যে কী উত্তপ্ত আবেগ এখনও ওর বুকের মধ্যে ও সঞ্চয় করে রেখেছে! আজ হিলু-বৌয়ের সঙ্গে গাঢ় আনন্দে কাটানো দিনগুলির অন্তরঙ্গ-স্মৃতি—যা কোনদিন আনন্দ হিলু-বৌয়ের জীবিত কালে সুধাকে বলে নি অথবা বলতে পারেনি, যা সে একান্ত তাদের দুজনের কথা বলেই মনের সংগুপ্ত সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে কৃপণের মত লুকিয়ে রেখেছিল, অথচ আজ দু জনের অবর্ত্তমানে যে অপরূপ সঞ্চয়ের মূল্য বুঝবার মানুষটির অভাব ঘটেছে—সেই কথাগুলি একের পর এক গভীর আবেগের সঙ্গে সে সুধাকে বলে যেতে লাগল। কত তুচ্ছ ঘটনার কথাই সে বললে!

—এক দিনের কথা তোকে বলি সুধা। তোর সেদিনটা নিশ্চয় মনে আছে। তোর ফুল শয্যার রাত্রি। বৌমাকে পৌঁছে দিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলে তোকে দরজা বন্ধ করতে বলে ও বেরিয়ে এল—তোর নিশ্চয় মনে আছে?

ঘাড় নাড়লে সুধা বললে—নিশ্চয় মনে আছে। আজও বৌ-ঠাকরুনের সে দিনের হাসি মনে পড়ছে।

আবেগের সঙ্গে আনন্দ বলতে লাগল—মনে থাকবে বৈ কি! আমি ছাড়া তোর মত তাকে তো কেউ আর ভালবাসত না। সেদিন তোর সঙ্গে

যখন কথা বলছিল তখন সারা দিনের খাটুনীর পর আমি তোদের দাওয়ার তক্তার ওপর শুয়েছিলাম। তোদের কথা খানিকটা শুনতে পাচ্ছি, খানিকটা তন্দ্রা এসেছে। তন্দ্রার মধ্যেই তোর দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। আমার বেশ তন্দ্রা এসে গিয়েছে তখন। হঠাৎ কপালের ওপর ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁওয়া লাগল। ঘুমটা ভেঙে গেল। নরম গলায় ফিস ফিস করে আমাকে হিলু ডাকলে—শুনছ, ওঠ ওঠ।

শুয়ে শুয়েই বললাম—উঁ। কি বলছ।···আমার তখন আর উঠতে ইচ্ছে করছে না, ঘুমে চোখ ভেরে আসছে।

হিলু আবার আমাকে নাড়া দিলে—ওঠ, ওঠ।

উঠলাম। চোখ কচলাতে কচলাতে বললাম—কি বলছ?

—চল বাড়ী চল। সে হাত ধরে আমাকে টানতে লাগল।

রাস্তায় নামলাম। নির্জন পথ। অন্ধকার। হিলু আমার হাত ধরলে। আমাকে বললে—আজ ওদের ফুলশয্যা হচ্ছে, আমাদের ফুলশয্যা হবে না?

অন্ধকারের মধ্যেই হাসলাম, ওর হাতের উপর একটু চাপ দিলাম, বললাম—আগে বললেই তো পারতে, কিছু ফুল নিয়ে আসতাম।

অন্ধকারের মধ্যেই সে একটু হাসল বুঝতে পারলাম, আমার হাতের ওপর চাপটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে—আমার ফুলশয্যায় ফুল লাগবে না। তোমার হাত—এই-আমার ফুলের মালা।

আনন্দ চুপ করে গেল। অন্ধকার চারিপাশে ঘন হয়ে এসেছে। সুধা ওর মুখটা দেখতে পেলে না। কেবল শুনতে পেলে অন্ধকারের মধ্যেই আনন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুধা বললে—চল আনু, বাড়ী ফিরি। ভাল লাগছে না।

ওর হাতটা ধরে আনন্দ বললে—চল। ভাল আর লাগবে না।

বাড়ীর সামনে এসেই সুধা বললে—ঘরে বোধ হয় লোকজন আছে। অনেকের গলার আওয়াজ অসছে।

আনন্দ'র মুখটা ভার হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বরে বিরক্তি পরিস্কার ফুটে উঠল, বললে—আঃ, কি জ্বালা বল দেখি। সারা সন্ধ্যে তোর সঙ্গে হিলুর কথা বলে মনটা ভার হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে ছিল বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়ব। তার কি আর উপায় আছে? কিন্তু এল কে?

বাড়ীর দরজাতে দাঁড়িয়েই ওরা দেখতে পেলে ঘরের মেঝেতে পাতা কম্বলের উপর বসে আছেন নরনাথবাবু আর প্রসন্নবাবু। পিতলের দুখানা খালি থালা আর দুটো জলের গেলাস কম্বলের পাশে নামানো। অতিথি সৎকার করা হয়েছে। তার শোবার ঘরে জ্বালাবার জন্যে যে সৌখীন আলোটা কিনে এনেছিল কলকাতা থেকে হিলু-বৌকে ডাক্তার দেখিয়ে আসবার সময় সেইটা জ্বলছে মেঝের উপর। বাবা ওপাশে বসে আছে। তিনজনের কণ্ঠ থেকে উচ্ছ্বসিত হাসি ঘরখানাকে ভরিয়ে রেখেছে। কে বলবে যে এই কিছুকাল আগে এই সংসারের কেন্দ্রস্বরূপা বধূর মৃত্যু ঘটেছে!

শুধু মাত্র সেই দিনই নয়। নরনাথবাবু আর প্রসন্নবাবু প্রতি সন্ধ্যায় আসতে লাগলেন। প্রতি সন্ধ্যায় আনন্দ'র আর হিলু-বৌয়ের একান্ত সুখের একমাত্র সাক্ষী সেই সৌখীন আলোটা জ্বলতে লাগল, দুটি পিতলের রেকাবী করে আর কাঁসার গেলাসে জল দিয়ে অতিথি-সৎকার চলতে লাগল। আনন্দের শোক ও ব্যাথাভারাক্রান্ত হৃদয়ের চারিপাশে তার হৃদয়বেদনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তিনটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-উল্লাসের হাসি তাকে জর্জরিত করে তুললে। সে সহ্য করতে পারে না প্রতি সন্ধ্যার অকারণ সমারোহ, তবু মুখে কিছু বলে না। বাবার প্রতি সন্ধ্যার অতিথিরা আসবার পুর্বেই সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে, চলে যায় সুধার কাছে, সেখান থেকে তাকে ডেকে নিয়ে বেড়াতে চলে যায়; অতিথিরা বাড়ী ফিরে গিয়েছে এমনি সময় বুঝে সে বাড়ী ফেরে। বাবা মা বোধ হয় বোঝেন না; না হয় যদি বা বোঝেন তবু ভ্রূক্ষেপ করেন না।

এই প্রতি সন্ধ্যার অতিথি-সমাগমকে একটা নিত্য নিয়মিত উপদ্রব বলে তার মনে হলেও সে সেটা সহ্য ক'রে নিয়েছিল। ঠিক সেই সময় সে বাড়ীতে না থেকে এটাকে কোন ক্রমে মেনে নিয়েছিল। সেদিন রাত্রে খেতে বসে বাবা-মায়ের আলোচনা থেকে সে আরও একটা সংবাদ সংগ্রহ করলে। তার মনে হল বাবা-মা যেন তাকে ইচ্ছা ক'রে শোনাবার জন্যেই কথাগুলো বললেন। এর আগে তার বাবা মা দুজনেই একাধিক দিন বেড়াতে বেরুবার আগে তাকে সন্ধ্যে বেলায় আসরে উপস্থিত থাকবার অনুরোধ করেছেন। সেদিন মা বললেন—প্রতিদিন বিকেল বেলা ভদ্রলোকেরা আসবার আগেই

অমন ক'রে চলে যাস কেন? ওঁরা প্রায়ই বলেন—আনন্দ থাকে না কেন?

আনন্দ কোন জবাব দিলে না। মা আবার বললেন—আজকে আর নাইবা বেরুলি। আজ থেকেই যা বাড়ীতে।

বাবাও মায়ের কথার প্রতিধ্বনি তুললেন, বললেন—থেকেই যা আজ। ওঁরা প্রতিদিনই বলেন—আনন্দ থাকে না কেন?

আনন্দ এক কথায় জবাব দিয়ে দিলে—না। হা হা করে হাসবার মত আমার মনের অবস্থা নয়।

বাবা মা দুজনেই যেন মার খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আনন্দ সেই অবসরে তাঁদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল।

আনন্দ খানিকটা আশ্চর্যই হল। বাবা মা দুজনের কারুরই তো এমন ভাবে সহ্য করবার স্বভাব নয়। অথচ দুজনেই সহ্য করে গেলেন কেন কে জানে?

সেদিন রাত্রে ওর মা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল দিনের বেলা থাকবি তো বাড়ীতে?

নিবিষ্ট চিত্তে খেতে খেতে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুললে—কেন?

—কাল তোর বাবা দিনের বেলা নরনাথ বাবু আর প্রসন্নবাবুকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি তুই থাকবি তো?

—বেশ কথা। কিন্তু আমার থাকায়-না থাকায় কি যাবে আসবে?

মা বাবা দুজনেই আবার চুপ করে গেলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন ছেলে হয়তো নিমন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সে তার কিছুই করলে না, কেবল বললে—তা হ'লে এক কাজ ক'রো। সুধাকেও ঐ সঙ্গে খেতে বলব।

বাবা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—সত্যি কথা। খুব ভাল কথা। আমারই মনে হওয়া উচিত ছিল কথাটা। বেশ ভাল হবে, খুব ভাল হবে। আমি নিজে গিয়ে বলে আসব।

বাবার এই অকারণ উচ্ছ্বাসের উত্তরে সে কিছুই বললে না। আবার ঘাড় হেঁট করে খেয়ে যেতে লাগল।

পরদিন মহাসমারোহে অতিথিদের মধ্যাহ্নভোজন হল। ছিনু পরম যত্নে তিল তিল করে যে সমস্ত বাসন পত্র কিনেছিল, যা সে প্রাণান্তে কোন নিমন্ত্রণ-

আমন্ত্রণের ব্যাপারেও ব্যবহার করত না, আনন্দ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে মা সেই সমস্ত বাসনগুলি আজ ব্যবহারে লাগিয়েছেন। খেতে খেতে প্রসন্নবাবু এ সম্পর্কে একটা মন্তব্যও করলেন—বাঃ, এ যে চমৎকার ভারী থালা বাসন। সব উৎকৃষ্ট কাঁসার।

তার মা সহজ সুরে বললেন—আপনাদের মত মানুষেরও চোখে লেগেছে এই আমার ভাগ্যি। সব এই বাড়ীতে এসেই আমি এক এক করে বেছে বেছে কিনেছি।

আনন্দ'র বুকের ভিতর তখন কান্না পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সমস্ত আহার্য বিস্বাদ লাগছে মুখে। মুছে দিয়েছে, এরা হিনুকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে সংসার থেকে। কিন্তু যত তাকে সংসার থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে ততই যে তার স্মৃতি অসহায় আশ্রয়প্রার্থীর মত তার সারা বুক জুড়ে বসছে এটা এরা কিছুতেই বুঝবে না। তার খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কেবল সামাজিকতার খাতিরে অন্যদের খাওয়ার শেষ পর্যন্ত খাবার চেষ্টা করল।

খাওয়া হয়ে গেল। পান মুখে দিয়ে অতিথিরা হাসিমুখে প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন। যাবার সময় কি একটা কথা যেন বাবার সঙ্গে পাকা করে গেলেন। নরনাথবাবু বলে গেলেন—ত হ'লে ঐ কথাই থাকল।

বিগলিত হয়ে হাত জোড় করে বাবা বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চই। সন্ধ্যেবেলা আসছেন নিশ্চয়ই।

আনন্দর মন অত্যন্ত সন্দেহাকুল হয়ে উঠেছে। তার আড়ালে একটা কি যেন ঘটছে, সে আবছা বুঝতে পারছে। কিন্তু কি ঘটছে সেটা বুঝতে পারছে না।

খাওয়া দাওয়ার পর সুধাও চলে যাচ্ছিল। আনন্দ বললে—কি রে, কোন কাজ আছে না কি? নাই তো? বসে যা।

সুধাকে সে বসাল বটে কিন্তু সে নিজে নিঃঝুম হয়ে কম্বলের উপর শুয়ে পড়ল। একটা কথাও বললে না।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। মা বোধহয় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কাঁসার রেকাবী গেলাস, সেই সৌখীন আলোটা নিয়ে পরিষ্কার করতে গেলেন। আনন্দ হঠাৎ উঠে বসল তারপর ঘরের ভিতর দাওয়ায় গিয়ে

দাঁড়াল। এ তার অসহ্য লাগছে। মা আলোটা পরিষ্কার ক'রে থালায় হাত দিয়েছেন। আনন্দ হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার বল দেখি মা?

বাবা দাওয়ায় চৌকীর উপর বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি হুঁকো হাতেই এসে তার কাছে দাঁড়ালেন। মা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন আনন্দ'র দিকে। তাঁর মুখে সকৌতুক হাসি তিনি যেন সেই মুহূর্তে চেষ্টা করেই ফুটিয়ে তুললেন। বললেন—তোর বিয়ের সম্বন্ধ করছি বাবা।

বাবা গম্ভীর মুখে বললেন—নরনাথবাবুর ভাগ্নী, প্রসন্নবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ ঠিক করেছি বাবা।

ঘরে শুয়েও সুধা দেখতে পেলে, আনন্দ'র মুখে কি আশ্চর্য বেদনা, ক্ষোভ আর যন্ত্রণা একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। সে সব শুনে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে তার মুখ চোখের চেহারা পালটে গেল। সুধা সবিস্ময়ে দেখলে সেই বাল্যকালের অসহিষ্ণু আত্মপর আনন্দ পরিণত বয়সের তেজ ও শক্তি নিয়ে ওর সমস্ত মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। ওর চোখ দুটো দু খণ্ড কাঁচের মত জ্বলছে, নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে, সমস্ত মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে গিয়ে কপালের শিরাগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে। সে আস্তে আস্তে কেটে কেটে ভয়াল কণ্ঠে বললে—এ চেষ্টা ক'রো না। ফল ভাল হবে না।

বাবা মা দুজনেই এক মুহূর্তে যুদ্ধোদ্যত হয়ে উঠলেন। মা বললেন—কেন? কেন এ চেষ্টা করব না?

বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি।

সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললে—আমি আবার বলছি এ চেষ্টা ক'রো না। তাই তো বলি, এতো আয়োজন কেন। তারই কেনা শখের আলো জ্বালিয়ে, তারই কেনা বাসনে খেতে দিয়ে তারই সতীন আনার ব্যবস্থা হচ্ছে, খুব ভাল, খুব ভাল। বলতে বলতে সে আলোটা তুলে নিয়ে সজোরে দাওয়ার ওপর আছাড় মেরে ফেলে দিলে।

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে সে ঘরের মধ্যে এসে সুধার হাত ধরে টেনে বললে—আয়। আমার সঙ্গে আয়।

সুধা অবাক হয়ে বললে—এই দুপুরবেলা কোথায় যাবি?

—আয় না আমার সঙ্গে। সে সুধার হাত ধরে টানতে টানতে হন হন করে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেল।

আনন্দ যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। আপন মনে বলছে—চক্রান্ত, সকলে মিলে একটা চক্রান্ত করে আমাকে বেকাদায় বাঁধবার তালে আছে। চারিদিক থেকে সকলে মিলে আমার পিছনে আমাকে বাঁধবার জাল বুনছে। জানিস সুধা, আজ সব পরিষ্কার জলের মত দেখতে পাচ্ছি। নরনাথবাবুর এত আপ্যায়ন, এত উদারতা, এত দয়া—সে সব কেন? আমি বুঝেছি, সব বুঝেছি। ওরাই চেষ্টা ক'রে তোর বাবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল বিয়ে করার কথা বলতে! বিয়ে করতামই। আজ না হোক, কাল করতাম; তাও সহ্য হ'ল না। সবুর সইল না। তাই চারিদিক থেকে ষড়যন্ত্র চলেছে। বাবা মা এই চেষ্টা করছে! আর কাকে দুষব বল?

সুধা বাধা দিলে, বললে—আরে আনু, তুই খেপে গেলি না কি?

একটু হেসে আনন্দ বললে—না রে পাগল হই নি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় আছি। এখুনি আমাকে দুটো কাজ করতে হবে। তুই সেই সময় আমাকে বাড়ীটা কিনতে দিলি না। দিলে কত ভাল হ'ত বলত? চল এখুনি বাড়ীটা কিনব।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল সুধা। অনন্দ বললে হাসতে হাসতে—আজ আর বাধা দিস না, শুনব না। আয়, আয় আমার সঙ্গে।

দত্ত'র বাড়ী গিয়ে দত্তকে ডেকে দু' মিনিটের মধ্যে বাড়ী কেনার কাজ মিটিয়ে ফেললে আনন্দ। বললে—বিকেলে এই সুধাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী মেরামত করিয়ে রাখবে। আমি সুধাবাবুকে টাকা দিয়ে যাব। তুমি একটা রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ো। কেমন? এই কথা থাকল।

রাস্তায় নেমে আনন্দ আপন মনে হাসল, বললে—'এই কথা থাকল।'

সুধার মনে পড়ল এই কিছুক্ষণ আগে আনন্দর বাবা নরনাথবাবু আর প্রসন্নবাবুকে বিদায়ের সময় ঐ কথাই বলেছিলেন। আনন্দ বোধহয় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে অকস্মাৎ—সুধা, এটা কি মাস রে? শ্রাবণ মাস নয়? ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অকস্মাৎ আনন্দ বললে—রাগ করিস না সুধা। যা, এইবার বাড়ী যা।

সুধাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে তাকে ছেড়েই সে হাঁটতে লাগল।

সুধা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বাড়ীর পথ ধরলে।

পরদিন আনন্দ আর তাকে বিকেল বেলা ডাকতে এল না। কাজেই আনন্দ'র খোঁজ করতে আনন্দ'র বাড়ী যেতে হল তাকে। আনন্দ'র মা চুপ করে বাড়ীর দাওয়ায় বসে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, খুব শান্ত কণ্ঠেই বললেন—কই, আজ সকাল থেকে তো তাকে বাড়ীতে দেখছি না। বোধহয় জংশন গিয়ে থাকবে দোকানে।

কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হল। চারিদিকে সংবাদ নিলে, কোথাও তার কোন সংবাদ পেলে না। কেবল দেখলে দত্ত ওর কথা অনুযায়ী বাড়ী মেরামত করতে বেশ ক'জন লোক লাগিয়েছে।

এমনি করে সাত দিন চলে গেল। সেদিন সকাল বেলায় বাইরের ঘরে বসে পড়ছে এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ী তাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওদিকে গাড়ী থেকে নামল আনন্দ। পরণে তার গরদের কাপড়।

সে সুধার মুখের দিকে চেয়ে বললে—বিয়ে ক'রে এলাম রে সুধা। বৌমাকে, মাকে ডাক। তারপর গাড়ীর ভিতর চেয়ে ডাকলে—কই নেমে এস। প্রণাম কর।

চেলিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা বধূ গাড়ীর মধ্যে। শাঁখ বেজে উঠল, জলধারা পড়ল, তারই মধ্যে মাথায় ঘোমটা দেওয়া বধূ নেমে এল গাড়ী থেকে। ধীরে ধীরে সুগৌর একখানি হাত এসে স্পর্শ করল সুধার মায়ের দুই পা। সুগৌর দীর্ঘ হাত, কিন্তু বড় কঠিন।

সুধার মা ঘোমটা খুলে তার সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। ফর্সা রঙ, একমাথা চুল, বড় বড় চোখ, চোখের তারা কপিশ, দৃষ্টি উজ্জ্বল।

গাড়ীতে আবার বধূকে নিয়ে উঠল আনন্দ, সুধাকে ডাকলে—সুধা আয় আমার সঙ্গে।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে গাড়ীর ভিতর থেকেই আনন্দ ডাকলে—মা, কোথায় আছ। এস। আমি বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে এসেছি।

মা ছুটে এসে স্থাণুর মত দরজার কাছে দাঁড়ালেন।

আনন্দ গাড়ী থেকে নামল হাসতে হাসতে। সুধা লক্ষ করলে আনন্দর চোখে দীপ্ত উগ্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্ম দ্বিপ্রহরের সূর্য-প্রতিফলিত জলের মত ওর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে হাসতে হাসতে বললে—নাও, বৌ বরণ করে তোল।

সাত

সুধার মনে হল আনন্দর সঙ্গে আজ এই ঘটনার মধ্যে না এলেই ভাল হত। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ঘটনা।

গাড়ী থেকে নিজে নেমে সমস্ত কাজগুলি সে অতি শান্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে করতে লাগল। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ীর মাথার উপর থেকে বৌয়ের একটা প্যাটরা আর একটা বাক্স নামালে সুধার সাহায্যে। তারপর ধীরে সুস্থে গাড়ীর মধ্যে অন্তরালবর্তিনীকে সম্বোধন করে বললে—এইবার নাম। আর ওঠানামা করতে হবে না। উপস্থিত এই আমার নিজের বাড়ী।

বধূ নামল গাড়ী থেকে।

আনন্দ বিরক্ত হয়ে বললে—কি মা, বউ কি নিজেই নামবে?

মা বললেন—এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বাবা? কোন কাজটা জিজ্ঞাসা ক'রে করলে যে এটাতে জিজ্ঞাসা করছ? মা এতক্ষণে খানিকটা সামলে

নিয়েছেন। সেই স্নায়ুর মত পঙ্গু ভাবটা কেটে গিয়েছে, মন যেন অনেকখানি সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বধূ ততক্ষণে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটবার জন্যে উদ্যত হয়েছে। সুধার মনে হল এই স্বল্প কালের মধ্যে আনন্দর মা ঠিক করে নিলেন তিনি পুত্রের সঙ্গে কোন পথে ব্যবহার করবেন। মা ধীরে ধীরে এসে বধূর হাত ধরলেন। হাত ধরবার সঙ্গে সঙ্গে বধূ আনত হয়ে প্রণাম করলে। তিনি বধূর হাত ধরে, জলধারা দিয়ে, উলু দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। তার পিছনে পিছনে ঢুকল আনন্দ। বাক্স প্যাটরাগুলো ঘরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করলে সুধা।

ঘরে ঢুকে সে দেখলে আনন্দ'র নূতন বৌ বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। আনন্দ চঞ্চল হয়ে ঘুরছে ফিরছে। আর আনন্দের মা মৃদু অথচ কঠিন গলায় বলে যাচ্ছেন—তুমি পরের মেয়ে, তোমার আর অপরাধ কি! আমরা তো তার দাসী বাঁদীর সামিল। আমাদের কাছে তার কোন অপরাধ হয় না। এই দেখ আমার ভুল হচ্ছে মা। তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

ইতিমধ্যে সুধা একখানা আসন এনে নূতন বধূর কাছে পেতে দিয়ে বললে—বসুন। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন।

নূতন বৌ ঘোমটার ভিতর থেকে তার দিকে চেয়ে দেখলে। সুধা লক্ষ্য করলে তার গৌরবর্ণ মুখের মাঝখানে সুবিশাল দুই চোখের কপিশ তারা স্থির উজ্জ্বল হয়ে তার মুখের দিকে নিবদ্ধ। সুধার মনে হল যেন সে চোখের দৃষ্টি তাকে ওজন করে দেখে নিচ্ছে। সুধা একবার তাকালে নববধূর মুখের দিকে। পরক্ষণেই চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। গলা নামিয়ে সে আবার অনুরোধ করলে—আপনি বসুন।

নূতন বৌ আসনের উপর বসল ধীরে ধীরে।

আনন্দ এতক্ষণ চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জিনিষপত্র যথাস্থানে রাখবার জন্যে। তার বোধ হয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সে এসে সুধার কাছে দাঁড়াল। অকস্মাৎ মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—মা, নূতন বৌয়ের মুখ দেখলে না? মুখ দেখবে না না কি? যদি না দেখতে চাও সে অবিশ্যি স্বতন্ত্র কথা। আর যদি দেখতে চাও তা হলে আর দেরী করে লাভ কি?

মা মার-খাওয়া মানুষের মত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি হাতের কাজ সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রেখে সিঁদুরের কৌটা নিয়ে ছুটে এলেন,

বললেন—তোমাদের জন্তেই সরবৎ করছিলাম বাবা। মুখ দেখব বই কি! মুখ না দেখে আর কি করব?

তিনি সিঁদুরের কৌটা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন নববধূর সামনে। বললেন—দেখি মা, ঘোমটা একটু তোল তো।

সচরাচর এমন ক্ষেত্রে ঘোমটা তোলার হুকুম দিয়েও বর্ষীয়সী মহিলাকেই নিজের হাত দিয়ে ঘোমটা তুলে লজ্জাশীলা বধূর লজ্জা ভাঙাতে হয়। একক্ষেত্রে বলার সঙ্গে সঙ্গে নববধূ আপনার ঘোমটা উঠিয়ে সিঁথি উন্মুক্ত করে দিলে সিঁদুর দেবার জন্তে। একমাথা চুলের ভিতর সরু পরিষ্কার সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে তিনি নববধূকে দেখে নিলেন। তার চোখের অলজ্জ উজ্জল দৃষ্টি থেকে, কুণ্ঠাহীন স্পষ্ট ভাবভঙ্গি থেকে আনন্দর মা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন—খুব সোজা ব্যাপার হবে না এই বধূকে নিয়ে সংসার করা।

সিঁদুর দিয়ে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন—জন্ম আয়তী হও মা; দীর্ঘজীবী হও। স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে সংসার কর।

বধূটি আপনার কর্তব্য জানে, সে সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা হেঁট করে শাশুড়ীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। সহজ করে নিলেন আনন্দর মা-ই—সে শুধা লক্ষ্য করলে। ব্যাপারটা অনেক কুৎসিত অনেক বিশ্রী হতে পারত। আনন্দর মা সচরাচর যে পথে আপনার মতকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেন সেই অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ এ নয়। সহ্য করে, সেবা ক'রে মিষ্ট বাক্য বলে, তারই বদলে দ্বিগুণ অভিমান প্রকাশ করে প্রতিপক্ষের মনকে দুর্বল করে জিতবার যে রাস্তা সেই রাস্তা ধরেছেন আনন্দের মা।

কিন্তু আনন্দ আশ্চর্য! সে আপনার চক্ষুলজ্জাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছে যেন। কোন কথা আজ তার মুখ দিয়ে বের করতে কোন লজ্জা লাগছে না। আর তার সঙ্গে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা যুক্ত হয়েছে যেন। মাকে সে আজ আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

মায়ের হাত থেকে সরবতের গ্লাস নিয়ে আনন্দ বললে—এই ভাল হয়েছে মা। খাসা লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে এলাম। কোন গোলমাল নেই, ঝামেলা নেই। তোমাকেও চেষ্টা করে কোন আনন্দ করতে হল না, কোন দেবকর্ম করতে হল না। এমন কি শাঁখ পর্যন্ত না বাজিয়ে কেমন

বিয়ে হয়ে গেল। তা এ বাড়ীতে যে শাঁখ বাজবে না তা জানতাম মা। সেই জন্যেই সুধাদের বাড়ী থেকে বউকে বরণ করিয়ে নিয়ে এসেছি।

আনন্দের ইচ্ছাকৃত আঘাত অনেকক্ষণ থেকে সহ্য করেছেন ওর মা। আর পারলেন না, তিনি চীৎকার করে উঠলেন—আনু!

তিনি আরও কিছু বলতেন হয়তো কিন্তু থেমে গেলেন। আনন্দের বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ছুটতে ছুটতে এসেছেন পাগলের মত। তাঁর সারা অঙ্গে ধুলো লেগেছে, মাথার চুলগুলো যেন খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে, চোখ দুটোতে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তিনি বাড়ী ঢুকেই সামনে স্ত্রীকে দেখে প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁগো, রাস্তায় কি যেন শুনলাম! আনু না কি আবার বিয়ে করে এসেছে!

—হ্যাঁ। ঐ যে! তিনি যেন স্বামীকে পেয়ে এতক্ষণে ঝগড়ার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। বললেন, ঐ যে, বৌ বসে আছেন দাওয়ায়।

মুখুজ্জে স্তম্ভিতের মত সেই চেলী-পরা অবগুণ্ঠিতা মূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আনন্দ বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরম উপভোগের দৃষ্টিতে তা দেখে অল্প অল্প হাসতে লাগল।

অনেকক্ষণ ছেলের হাসি হাসি মুখ এবং অবগুণ্ঠিতা সম্পূর্ণ অপরিচিতা পুত্রবধূর দিকে ক্রমান্বয়ে চেয়ে থেকে মুখুজ্জে মশাই ধীরে ধীরে সামলে নিলেন। চরম সর্বনাশ নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখার পর মানুষের মুখের যে চেহারা হয় সেই রকম মুখের চেহারা হয়ে গেল মুখুজ্জে মশায়ের। তিনি লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে অতি শান্ত কণ্ঠে বললেন—বুঝলাম সবই। ভালই করেছ বাবা তুমি। একটা কাজ কর কেবল। অনেক দিন আগে তোমাকে পৃথক হবার কথা বলেছিলাম। তুমি রাজী হও নি। আজকে আবার তোমাকে বলছি, তুমি পৃথক হয়ে যাও। এখন তোমার নিজেরই যথেষ্ট অর্থবল হয়েছে। তোমার কোন অভাব হবে না। আমার আর তোমার মায়ের দিন কোন রকম চলে যাবে।

কথাগুলো বলে মুখুজ্জে মশায় বোধ হয় প্রত্যাশা করেছিলেন যে আনন্দ আগের মত তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, এমন কি একেবারে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। মমতা আর বাধ্যবাধকতার বন্ধন পিতাপুত্রের মধ্যে এতকাল ধরে বিদ্যমান ছিল, যার জোরে এতকাল পর্যন্ত তিনি

আনন্দকে অবনত করে এসেছেন সেই মমতার উপরেই তিনি আজ আবার জোর দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আনন্দ'র মুখের ঐ মৃদু মৃদু অস্ফুট নিষ্ঠুর হাসি এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মুখুজ্জে মশাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন আনন্দের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল না। বরং সে হাসি আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল। আনন্দ বললে—তোমার মুখে এই কথাটারই প্রত্যাশা করছিলাম বাবা।

সমস্ত ব্যাপারটায় দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে সুধা অস্বস্তি ভোগ করছিল। সে আনন্দকে বললে—আনু ভাই, আমি যাই এখন। পরে আসব বরং।

আনন্দ হেসে বললে—তুই যাবি কোথায় ভাই? তোকে কি আমি মিছামিছিই নিয়ে এসেছি! আমার কাজ আছে তোকে দিয়ে। একটু দাঁড়িয়ে যা। তোকে এক্ষুনি ছেড়ে দেব।

তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি এই কথাটা আমাকে বলবে আমি জানতাম। আমি তার ব্যবস্থা করেই রেখে গিয়েছি। আমি এখান থেকে যাবার আগে বাড়ী কিনে গিয়েছি। আমি সেই বাড়ীতেই উঠব গিয়ে। সুধা ভাই, তুই ওকে নিয়ে যা তোদের বাড়ীতে। তোর মাকে গিয়ে বল এবেলা আমরা দু'জন তোদের বাড়ীতে খাব।

তারপর অবগুণ্ঠিতা বধূর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—তুমি শুনছ? তুমি ওঠ, সুধার সঙ্গে ওদের বাড়ী চলে যাও।

তার কথায় সমস্ত মানুষগুলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। সুধা অবাক হয়ে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এই অতি কুশ্রী দৃশ্যের একমাত্র দর্শক। সমস্ত দেখে সে যেন লজ্জায় মরে গেল। আনন্দর মা পাথরের মূর্তির মত চুপ করে বাক্যহীন হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার বাবা ক্রোধে, ক্ষোভে, অপ্রত্যাশিত আঘাতের প্রচণ্ডতায় কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে সেইখানেই বসে পড়লেন। কেবল আঘাত-কারীই অত্যন্ত শান্ত সহজ কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যটা যেন চেখে চেখে উপভোগ করছে আর অল্প অল্প হাসছে।

তারই আঘাতের প্রচণ্ডতায় সমস্ত মানুষগুলিকে সে যেন পাথর করে দিয়েছে। সে-ই আবার নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিলে সকলকে। সে সুধাকে

তাগাদা দিলে—এই সুধা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? একবেলা ভাত দিতে খুব কষ্ট হবে না কি?

নববধূকেও হয়তো সে আবার তাগাদা দিত। কিন্তু অবগুণ্ঠিতা নব বধূ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত সুধার পিছন পিছন অবগুণ্ঠিতা নব বধূও দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে আর আনন্দর মা স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আর্ত স্বরে বলে উঠলেন—ও বাবা সুধা, বৌমাকে নিয়ে যেও না। অন্ততঃ যাবার আগে এ বাড়ীতে এ বেলাটা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে যাক।

আনন্দ অত্যন্ত সহজ ভাবে বললে—না, মা, তা হয় না। এ বাড়ীতে যখন আমরা থাকব না তখন একবেলা খেতে দিয়ে আর সম্মান করবার কি আদর দেখবার চেষ্টা ক'রো না।

আনন্দর বাবা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তিনি বললেন, আনন্দ ঠিকই বলেছে। ওদের ও-অনুরোধ করে আর নিজের অসম্মান ক'রো না।

সুধার সঙ্গে নূতন বৌ যেতে যেতে একবার দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই আলোচনার মধ্যে সে সুধার সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল।

আনন্দ তারপর বললে, আমার আর নূতন বৌয়ের এই জিনিষপত্র এই ঘরটায় এ-বেলার মত রেখে গেলাম তালা বন্ধ করে। বিকেল বেলা আমার লোক এসে সেগুলো সব আমার নূতন বাড়িতে নিয়ে যাবে। আচ্ছা আমি এখন আসি।

সে মা বাপ দুজনের কাউকেও প্রণাম করল না। বেরিয়ে যাবার মুখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে আপনার হাত বাড়িয়ে দিলে। বললে—আমার দোকানের চাবি দাও। চাবি তো তোমার কাছেই আছে।

বাবার হাত থেকে চাবি খসে মাটিতে পড়ে গেল। আনন্দ চাবির থোলোটা হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে দ্বিতীয় কথামাত্র না বলে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

সুধা আর নূতন বউ তখনও ওদের বাড়ী পৌঁছয় নি এমন সময় খানিকটা প্রায় ছুটতে ছুটতেই আনন্দ ওদের সঙ্গ নিলে। দ্রুত পায়ের চঞ্চল শব্দ শুনে সুধা পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলে হাসি-খুশী ছোট ছেলের মত

আনন্দ মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে হাসতে হাসতে আসছে। সুধা মনে মনে অবাক হয়ে গেল। আনন্দর এত হাসি কেন? ও নিজের বাপ-মাকে আবার কোন নূতন অপমান করে এল না কি? ও কি এত খুশী তারই জন্যে? না ও এই নূতন বউকে পেয়ে এত খুশী হয়েছে যে ওর সেই সুখে বাপ-মাকে পৃথক করে দিতে বাধল না, এমন কি ও হিলু-বৌকে সুদ্ধ ভুলে গেল! ওর এই হাসি খুশী সহজভাবটা, বিশেষ করে এই রকম ঘটনার পর, সুধার কাছে মোটেই ভাল লাগল না। সে আনন্দর সব কিছু সহ্য করে, ওর ত্রুটি দেখলেও কোন কথা বলে না। আজ আর সে সহ্য করতে পারলে না। তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা আনন্দর নববধূর উপস্থিতি কথা বিবেচনা করেও সে আজ আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না। সে ওর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আবার কি ক'রে এলি রে আনু?

—কিছু না; কিছু না। কেবল সম্পর্কটা ভাল করে চুকিয়ে দিলাম। অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিলে আনন্দ।

—মানে?

—মানে আবার কি। বাবার কাছ থেকে দোকানের চাবিগুলো নিয়ে এলাম।

এক মুহূর্তে সুধার মন ঐ অপমানিত মানুষ দুটির জন্যে করুণায় আর মমতায় ভরে গেল। আশ্চর্য, আনন্দ তাদের একমাত্র সন্তান হয়ে এমন নিষ্ঠুর আঘাত কি ক'রে দিতে পারলে নিজের বাপ-মাকে! সে গম্ভীরভাবে বললে, কিছু মনে করিস না আনন্দ, তোকে একটা কথা বলি। বলব?

অত্যন্ত লঘু হাসি হেসে সে বললে—বল, বল। অত ভণিতা কিসের?

—আজ তুই কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে এলি। তুই কি ক'রে আজ এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলি তাই ভাবছি।

—আমিও তো তাই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। বলে সে হাসল। তার ভাবে ভঙ্গিতে কোথাও কিন্তু কোন অনুশোচনা প্রকাশ পেল না। সে অত্যন্ত লঘু মনে সব কিছু করেছে বলে মনে হল সুধার কাছে।

তার কথার ভঙ্গিতে আহত হয়ে সুধা বললে, তুই অমন করে হাসছিস? কি আর বলব বল!

এবার হা হা করে হাসল আনন্দ, বললে—নে, আর তোকে গুরুঠাকুর সাজতে হবে না।

সমস্ত কথার সে পরিসমাপ্তি ঘটালে।

বাড়ী ঢুকে আনন্দ সোজা চলে গেল সুধার মায়ের কাছে, ডাকলে—মা! আপনার বৌমা আর আমি আজ এবেলা আপনার কাছে গোপালের প্রসাদ পাব।

সুধার মা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাশালা থেকে। তিনি অনুমান করতে পেরেছেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি কথা বাবা! আজ তুমি নতুন বৌমাকে নিয়ে এলে! আজ বাড়ীতে তোমার মায়ের কাছে না খেয়ে আমার এখানে খাবে কোন দুঃখে?

আনন্দ একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললে, দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না মা। দুঃখের কথা সে পাহাড় প্রমাণ। বাড়ীতে মায়ের কাছে আর ভাত জুটবে না আমাদের কোনদিন। বাড়ী থেকে আমরা চলে এসেছি মা।

সুধার মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, এ কাজ কেন করলে বাবা?

—মা আমার অপরাধ—আমি তাঁদের পছন্দ-করা, বড়লোকের ভাগনীকে বিয়ে করিনি; আমার অপরাধ আমাকে চারিপাশ থেকে যে জাল দিয়ে বাঁধতে চাইছিলেন সে জাল কেটে বেরিয়ে এসে তাঁদের ঠকিয়েছি; আমার ওপরে বাজী মারতে দিইনি। তাঁদের সবারই ইচ্ছার মুখে ছাই দিয়ে আলাদা বিয়ে করে এসেছি—এই আমার অপরাধ।

সব শুনেও মা চুপ করে থাকলেন, অনেকক্ষণ পর বললেন—তা যাই হোক, বাড়ী থেকে চলে এসে ভাল কাজ করনি বাবা। তারপর মা ডাকলেন কমলাকে—বৌমা, এসে নুতন বৌমাকে নিয়ে যাও।

সুধা বললে একটু হেসে, তাঁকে অনেকক্ষণ আগেই ঘরে নিয়ে গিয়েছে।

মা বললেন—আর কি হবে? যা হয়েছে হয়েছে। যা হয় পরে হবে। আনন্দ তুমি বস বাবা। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন আবার।

আনন্দ চারিদিকে তাকাতে লাগল। সুধা বুঝে একটু হেসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। নুতন বৌ তখন চেলির কাপড় ছেড়ে বোধহয় কমলার দেওয়া একখানা কাপড় পড়ে সহজ হয়ে

বসেছিল। মাথার থেকে ঘোমটা খোলা। তারই অবকাশে ওর মুখখানি ভাল করে দেখতে পেল সুধা। পরিপূর্ণ ভরাট মুখ, ধাঁরালো খাঁড়ার মত নাক, কঠিন চিবুক, টানা মোটা দীর্ঘ ভ্রূ, বড় বড় চোখের কপিশ তারায় তীব্র দীপ্তি। সমস্ত মুখ কেমন অসহনীয় কাঠিন্যে স্থির হয়ে আছে। দেখে সুধার অত্যন্ত মমতা হল। আহা বেচারী, নূতন বউ হয়ে এসে আদর পেলে না, অভ্যর্থনা পেলে না, ভাল করে শাঁখ বাজল না, অবিচ্ছিন্ন জলধারায় ওর পায়ের আলতা ভিজল না, ওর গৃহপ্রবেশের সময় দুধও উথলে উঠল না। এই অপ্রত্যাশিত ও অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে একটি তরুণ আগন্তুক অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে এসে ব্যর্থ হয়েছে। ওর ক্ষোভ হবে বৈ কি? ওর মুখ এই কাঠিন্যের রেখায় রেখাঙ্কিত হবে না তো কার হবে? সে সকরুণ মমতার দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ওর এই দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ বুঝতে পেরেই সে আস্তে আস্তে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলে। সে স্বামীকে আর সুধাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও মাথার ঘোমটা টানেনি, বোধহয় ভুলেছিল। এবার অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ হতেই ঘোমটা টেনে একটু নড়ে চড়ে বসল। কমলা হেসে উঠল খিল খিল করে। সে আজকাল আর আনন্দকে দেখলে বিশেষ ঘোমটা দেয় না, কথাও বলে তার সামনে। হাসতে হাসতেই সে বললে, ওমা তুমি কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছ? ও যে তোমার দেওর গো?

কমলার এই হাসিতে নূতন বউ মোটেই বিচলিত হল না। কিম্বা মাথার ঘোমটাও খুললে না, সহজ স্বাভাবিক ভাবে বললে, উনি যে দেওর সে আমি এখানে আসবার আগেই জেনেছি, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। তবু খানিকটা ঘোমটা থাকা ভাল।

কমলা আবার হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জোর করে নূতন বৌয়ের মাথার ঘোমটা খুলে দিলে। বললে, তা চলবে না ভাই। ওর সামনে আমি থাকতে যে ঘোমটা দেবে সে ও সইলেও আমি সইতে পারব না।

তারপর স্বামীর দিকে ফিরে কমলা বললে, দিদির নাম কি জান? উনি বলেন নি তো তোমাকে? ওঁর নাম বিদ্যুৎবরণী। তা নামে আর চেহারায় এমন মিল বড় একটা দেখা যায় না।

নূতন বউ সামান্য একটু হাসল। যে ঘোমটা কমলা জোর করে খুলে দিয়েছিল মাথার সেই পড়ে-যাওয়া ঘোমটা আবার সে মাথায় তুলে দিলে।

সুধার মনে হল নূতন বউ যেন চারিদিকের ব্যাপার দেখে নিজেকে আপনার মনের ভিতর গুটিয়ে নিয়েছে। সমস্ত পরিবেশকে ও দেখছে গভীর অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে। এই অবিশ্বাস কেটে আস্থা ফিরে আসতে সময় লাগবে, অন্ততঃ এই বধূটির বেলা ফিরে আসতে বেশ দেরী হবে। কমলা কি ছিলু-বৌ যে ধাতুতে তৈরী এ মেয়েটি সে ধাতের মেয়ে নয়।

আনন্দ বিদ্যুৎকে বললে, তুমি বস বৌমার কাছে। এ বেলা তো এইখানেই গোপালের প্রাসাদ পাব। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে বস, কথা বল, বুঝেছ।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বিদ্যুৎ বললে—বুঝেছি।

তার বলার ভঙ্গিতে আনন্দ কোথায় সূক্ষ্মভাবে আহত হল যেন। তবু আপনার উৎসাহিত কণ্ঠস্বরকে ম্লান হতে দিলে না সে, বললে—বেশ কথা। তুমি থাক, আমি নূতন বাড়ী খানিকটা গোছগাছ করে আসি। আয় সুধা, তোর জন্যে অনেক খেটেছি, আমার জন্যেও খানিকটা খাট। বলে সুধার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে আনন্দ বললে, অনেকখানি যেন আত্মগতের মতই অথচ সুধাকে বললে—আনলাম তো ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে। বাপ-মা নেই। গরীবের মেয়ে, মামার বাড়ী মানুষ। দেখি কেমন হয়!

সুধা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায়, যাবি কোথায়?

—আমার নতুন ঘরটা সাজাতে হবে না? জিনিষপত্র জোগাড় করতে হবে তো?

তারপর তিন চার ঘণ্টার ছুটোছুটি, যথেষ্ট অর্থব্যয়, অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে বাড়ীটা আর ঘরগুলো কিছু কিছু আসবাব ও জিনিষপত্রে ব্যবহারযোগ্য করে তুলে স্নান করে ভাত খেলে।

বিকেল বেলা হাত জোড় করে সুধার মাকে আনন্দ বললে—মা, এইবার আদেশ করুন, আমার ঘরে যাই। আজ তো আর নতুন ঘরে যাবার মুখে পুরানো সংসার আবার নতুন করে পাতবার মুখে নিজের বাবা-মার আশীর্বাদ পেলাম না। আপনার আর বাবার আশীর্বাদ আজ আমার কাছে আমার

নিজের মা-বাপের আশীর্বাদের চেয়ে বড়। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার তা হলেই হবে।

সুধার মা তাকে সান্ত্বনা দিলেন—ওকথা কেন বলছ বাবা। মা-বাবার সঙ্গে আবার মিল মিশ হয়ে যাবে। আর আমরা তো তোমাকে অহরহ আশীর্বাদ করছি বাবা। তুমি নতুন জীবনে সুখী হও। যাকে এনেছ সে যেন তোমাকে সুখী করতে পারে, সে যেন নিজে সুখী হয়।

ভট্টচাজ মশায় বললেন—এই বিকেল বেলা আর যেও না বাবা। এখন -ত্তি বারবেলা। সন্ধ্যের পর এইখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেও।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ আর বিদ্যুৎকে সুধা আর কমলা পৌঁছে দিয়ে এল। আসবার সময় কমলা বললে, আমাদের কাছে ওঁর একটা পাওনা ছিল, আমরা আজ শোধ করলাম।

সুধা আর কমলা চলে গেল। আনন্দ আর বিদ্যুৎ তখনও বিছানার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে। বিদ্যুৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে পাথরের বোবা মূর্তির মত তারই মুখের দিকে চেয়ে। নিস্তব্ধতা অসহনীয় লাগছে আনন্দের কাছে। সে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাপড়-চোপড় ছেড়ে শোও। ওই তো আলনাতে কমলা-বৌমা কাপড় রেখে গিয়েছে।

বিদ্যুৎ সে কথা যেন কানেই তুললে না, তার দিকে যেমন স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল তেমনিই তাকিয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে কেটে কেটে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলে—তুমি সব জেনে শুনে কেন আমাকে বিয়ে করলে?

আনন্দ ব্যথাহত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন জবাব দিতে পারলে না। সে বুঝলে, বিদ্যুতের এই যে প্রশ্ন এ তো তার প্রেম আর মমতাকে সুদুর্লভ বিবেচনায় সকরুণ প্রার্থনা নয়, এ যে মর্মান্তিক অভিযোগ। এ অভিযোগের কি জবাব আছে? আর এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রির নায়িকার মুখ দিয়ে এই একান্ত নির্জনতার মধ্যে যে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে অন্ধকার বর্ষারাত্রির চকিত বিদ্যুৎচমকের মত তার চরিত্রের যে পরিচয় এক মুহূর্তের জন্য স্ফুরিত হল তাতে আনন্দের মত দুঃসাহসীও ভয়ার্ত হয়ে উঠল।

বিদ্যুৎ আর কিছু বললে না। নিঃশব্দে কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আনন্দ বিছানার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার উপস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যুৎ ভ্রূক্ষেপও করলে না।

আনন্দ অনেকক্ষণ সেই একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জামা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারিপাশে দীঘির নিথর কালো জলের মত অন্ধকার, মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত কালোয় আর আলোয় ঝলমল আকাশ। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে মন অত্যন্ত শূন্য আতুর হয়ে উঠল, চোখ জ্বালা ক'রে অকারণে চোখে জল এল। তারপর অকস্মাৎ নিদারুণ ক্রোধে সমস্ত মন ভরে গেল। সে দ্রুত পদক্ষেপে বিছানায় এসে ঢুকল।

ক্রোধের পাত্রের দিকে তাকালে সে। সেজের ম্লান আলোয় সে দেখলে বিদ্যুতের দেহ প্রগাঢ় নিদ্রার গাঢ় নিঃশ্বাসের তালে তালে দুলে উঠছে। তার দেহ এলিয়ে পড়ে সমস্ত কাঠিন্য মিলিয়ে গিয়েছে, তাকে অত্যন্ত অসহায় লাগছে। সে গভীর আবেগে সেই প্রসুপ্ত যৌবনপুষ্ট দেহকে সবলে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

আলোয় ধোওয়া উজ্জ্বল প্রভাত। শান্ত পরিবেশ। আনন্দ চুপ ক'রে আপনার সমস্ত সংসারকে লক্ষ্য করছে এক জায়গায় বসে। বিদ্যুৎ লঘু-চপল পায়ে এঘর ওঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নূতন সংসারের গোছগাছ ক'রে। তার মুখের অস্ফুট হাসি, প্রসন্ন দীপ্তি, লঘু পদক্ষেপ থেকে আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারছে বিদ্যুৎ কতখানি প্রসন্ন আছে। তার নিজের মনেও এই প্রসন্নতার ছোঁয়াচ লেগেছে সে বুঝতে পারছে। প্রতি মুহূর্তে সে আবার নূতন ক'রে কাজে লাগবার প্রবল তাগিদ অনুভব করছে আপনার মনে। তার এই সংসারযাত্রার শান্ত উজ্জ্বল পরিবেশ ছেড়ে যেতে তার মন উঠছে না। হিলু-বৌ সব নিজের হাতে করত। এবার সে রান্নার জন্যে রাঁধুনী এবং একটি ঝি কাজে বহাল করে দিয়েছে পাছে বিদ্যুতের কোন অসুবিধা হয়। ঘরে বসে বসে সে শুনতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ তাদের ওপর কেমন হুকুম চালাচ্ছে। হুকুম চালানোর আনন্দটাও সে যে পুরোপুরি অনুভব করছে সেটাও বুঝতে পারে আনন্দ।

অকস্মাত গত রাত্রির কথাটা একবার মনে পড়ল আনন্দর। রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটলে অন্ধকারের বিগত অস্তিত্ব যেমন অর্থহীন মনে হয় তেমনি এই মুহূর্তে বিদ্যুতের আনন্দিত প্রসন্ন ভঙ্গি দেখে গত রাত্রির কথাটা মিথ্যা মনে হল তার কাছে। সে বোধ হয় বুঝতে ভু

রেছিল বিদ্যুৎকে। মনের যে কঠিনতা, যে জেদ সেই মুহূর্তে সে বিদ্যুতের
ধ্য দেখেছিল বলে তার মনে হয়েছিল সেটা একান্ত ভ্রান্তিই। আর সারা
দিনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে নববধূ যে অপ্রত্যাশিত বেদনা আর অপমানের
ধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে তাতে যদি সে স্বামীর কাছে একটু অভিমান
জানিয়েই থাকে তাতেই বা কি হয়েছে। সারা দিনের অবাঞ্ছিত ঘটনার
শেষে তার নিজের মনও তো কম ক্লান্ত ছিল না। সেও সেই মুহূর্তে ভুল
বুঝেছিল বিদ্যুৎকে। সে বিদ্যুতের সঙ্গে কথা বলবার জন্তেই বিদ্যুতের
কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ডাকলে—বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ ফিরে দাঁড়াল, মুখে অস্পষ্ট সলজ্জ হাসি। মুখ তুলে কথার উপর
অত্যধিক জোর দিয়ে ছোটছেলের মত প্রশ্ন করছে—কি বলছ?

একটু হেসে আনন্দ বললে—কিছুই বলিনি। একবার তোমাকে দেখতে
এলাম শুধু!

এবার বিদ্যুৎ হাসল একটু বেশী করে, তেমনি ঝোঁক দিয়ে বললে—যাও।
বলে ফিরে দাঁড়াল।

আনন্দ এবার জোরে হেসে উঠল, বললে—তোমার গিন্নীপনা দেখতে
বেশ লাগছে কিন্তু বিদ্যুৎ।

এবার বিদ্যুতের মধ্য থেকে আসল গৃহিনী বেরিয়ে এল, বললে—ছি ছি,
ঘর দরজা কি হয়ে ছিল! চারিদিকে জিনিষপত্র একেবারে ছতক্কার হয়ে
পড়ে ছিল। সেই কোন ভোরে উঠে এক এক করে সব জিনিষগুলো
গুছালাম। এখনও কত কাজ বাকী।

আনন্দর খুব ভাল লাগল এই দেখে যে বিদ্যুৎ তার সংসারকে অত্যন্ত
সহজভাবে গ্রহণ করেছে পুরানো গৃহিনীর মত। সে সস্মিত মুখে বিদ্যুতের
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বিদ্যুৎ হঠাৎ বললে—ও বাড়ীতে তোমার যে জিনিষপত্রগুলো রেখে
এসেছ তালাবন্ধ করে সেগুলো আনাবার ব্যবস্থা করো।

কথাটা গত রাত্রি থেকে আনন্দ ভুলে ছিল; যেন ভুলে থাকতেই
চেয়েছিল একটা দুষ্ট স্মৃতিকে মানুষ যেমন ভুলে থাকতে চায়। বিদ্যুৎ তাকে
কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে। কথাটা মনে পড়তেই তার মনের আলো ঝলমল
খুশীর উপর বিষণ্ণতার মেঘের ছায়া পড়ল। মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেল

সঙ্গে সঙ্গে। এক মুহূর্তে নিদারুণ সঙ্কোচে তার সমস্ত মন ভরে গেল। সে কি করে আবার তার বাবা আর মায়ের সামনে দাঁড়াবে! কি করে তাঁদের ব্যথাহত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঘরের তালা খুলে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসবে? আজ তার নিজেরই কাছে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার গতকালের ব্যবহারের কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে। কি করে অনেকক্ষণ ধরে একের পর এক হিসেব করা নিষ্ঠুর আঘাত পর্যায়ক্রমে বাবা আর মায়ের উপর করতে পেরেছিল। ভাবতে ভাবতেই আবার নিদারুণ রাগ মনের মধ্যে পুঞ্জিত হতে সুরু হল। হিলুর প্রতি বাবা-মায়ের দীর্ঘদিনের অনাদর ও সুগভীর অবহেলা ও প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের কথা মনে হল। তার মৃত্যুতে তাঁদের মনে সামান্য ব্যথার আঁচড়টিও যে পর্যন্ত লাগেনি এ কথাও তার মনে পড়ল। হিলুর মৃত্যুতে তাঁরা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। সেই থেকে দুজনে নরনাথবাবুর ভাগনীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্যে যে জটিল জাল রচনা করেছিলেন তার কথাও মনে পড়ল। সেই জটিল জাল থেকে মুক্ত হবার জন্যেই সে অকস্মাৎ নিজের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত বন্ধন কাটাবার জন্যে এক অপরিচিতি অজ্ঞাত সমুদ্রে লাফ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জটিল বন্ধন সামান্য পচা সুতোর মত ছিঁড়ে গেল। ভাবতে ভাবতেই সমস্ত মন আবার এক হিংস্র আনন্দে ভরে গেল। সমস্ত মুখ আবেগে উত্তেজনায় থমথম করে উঠল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ যেন একটু শঙ্কিত হল। তবু আপনার মনোভাবকে চাপা দেবার জন্যে অতিরিক্ত জোর দিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বললে, কী, জিনিষগুলো এখন আসবে না না-কি? কত দেরী হবে?

আনন্দ তার ঘাড়ে একটা কঠিন চাপ দিয়ে বললে—আসবে, একটু পরেই আসবে। কিছু চিন্তা করো না বিদ্যুৎবরণী।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালে। এটা স্বামীর আদর না পীড়ন সে ঠিক বুঝতে পারলে না। সে তার কপিশ চোখের তীব্র দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের ভিতর তার এই অভিব্যক্তির অর্থ খুঁজতে লাগল। মুখে বললে—সমান ঝাঁজের সঙ্গে, তবু কখন আসবে সেটা জানতে পারি?

আনন্দ গভীরভাবে বললে, আমি এখন দোকানে যাচ্ছি। দোকান থেকে ফিরবার সময় নিয়ে আসব।

বিদ্যুৎ হয়তো এর জবাবে কিছু বলত। কিন্তু সেই সময় নীচে থেকে ভারী গম্ভীর গলায় কে ডাকলে—আনন্দ, আনন্দ আছ?

আনন্দ সমস্ত গাম্ভীর্য যেন এক মুহূর্তে ত্যাগ করলে। চাপা গলায় বিদ্যুৎকে বললে—ভটচাজ মশাই মানে সুধার বাবা ডাকছেন। আমি নীচে যাচ্ছি। স্ত্রীর উত্তরের অপেক্ষা না করে নীচে নেমে গেল।

বিদ্যুৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে সেও নেমে গেল।

বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে আনন্দ বললে, আসুন। আমার নতুন বাড়ীতে এই প্রথম আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।

ভট্‌চাজ মশাই হাসলেন। সে হাসি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি ঘরের ভিতর একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন, তারপর ঘরের ভিতর যাবার দরজা দিয়ে আনন্দের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। তারপর বললেন—বাঃ খাশা বাড়ী হয়েছে। বেশ বাড়ী, বেশ শক্ত। চমৎকার হয়েছে।

খুশী হল আনন্দ। খুশী হয়ে সে তাঁর মুখের দিকে চাইলে। ভট্‌চাজ মশাই গম্ভীর ভাবে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি বাবা।

তাঁর মুখের গাম্ভীর্য দেখে আনন্দ একটু শঙ্কিত হল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—বলুন।

—বাবা, তোমাকে আর সুধাকে পৃথক করে দেখি না, ছেলে বলেই মনে করি তোমাকে। সেই হিসেবেই তোমার শুভাশুভ কল্যাণ-অকল্যাণ সব সময়েই চিন্তা করি। তুমি কাল রাত্রিতে চলে আসার পর তোমার কথাই, মানে তোমার বাবা-মাকে পরিত্যাগ করে আসার কথাই চিন্তা করলাম। তুমি কিছু মনে ক'রো না বাবা কাজটা তোমার উচিৎ হয় নি। প্রথমতঃ সমাজের যা প্রচলিত পদ্ধতি ও লোকাচার সেই অনুযায়ী বাপ-মায়ের অমতে বিবাহ করা তোমার উচিৎ হয় নি। কিন্তু সে যাই হোক, যখন বিবাহ করেছ তখন আর সে সম্পর্কে কোন আলোচনার ক্ষেত্রই নেই। আমি অবশ্য আমাদের সন্তোষ ঘটকের কাছে বৌমার পিতৃকুলের খোঁজ নিয়েছি। কুলে কোন খুঁত নেই। সে কথা যাক। কিন্তু তুমি কাল বাবা-মাকে ত্যাগ করে এসে, গৃহত্যাগ করে এসে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছ।

এইখানে বাধা দিলে আনন্দ। সে ব্যাকুল ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললে, আমি তো নিজে বাবা-মা কিম্বা বাড়ী ছেড়ে আসতে চাইনি। বাবাই আমাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বললে। আর ও বাড়ী নরনাথবাবুর বাড়ী। বাবাকে এমনি থাকতে দিয়েছেন তিনি। এই ব্যাপারের পর ও বাড়ীতে থাকা হবে না বলেই আমি এখান থেকে চলে যাবার আগে এই বাড়ী কিনে গিয়েছিলাম। তবু বাবা আমাকে বাড়ী থেকে চলে আসতে না বললে আমি আসতাম না।

ভট্টচাজ মশায় একটু কঠিন কণ্ঠে বললে—আমি সুধার কাছে সব শুনেছি বাবা। তুমি তোমার বাবাকে কাল ঐ কথাগুলি বলতে বাধ্য করেছ। তুমি কাল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ আনন্দ।

অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর নরম ক'রে বললেন—বড় অন্যায় করেছ বাবা। যা হয়েছে হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ বাবা-মায়ের দীর্ঘশ্বাসে কি সংসারে সুখী হতে পারবে বাবা? পারবে না।

আনন্দর ইচ্ছা হল বলে—পারব, খুব পারব। যে মা-বাপ কোনদিন হাসিমুখে সন্তানের দাম্পত্যজীবনের দিকে চাইলে না তাদের দীর্ঘশ্বাসে আর কতখানি ক্ষতি হবে। কিন্তু মুখে সে কিছু বললে না, চুপ করে থাকল।

ভট্টচাজ মশাই বললে—এক কাজ কর। বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এস।

আনন্দ ব্যাকুলভাবে তাঁর মুখের দিকে চাইলে তাঁর কথা শুনে।

আনন্দর কোথায় লাগছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন ভট্টচাজ মশাই, বললেন—আচ্ছা তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে যাবে তুমি। তা হ'লে তো আর যেতে সঙ্কোচ লাগবে না।

আনন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বললে—আজ্ঞে তাই হবে। আপনি যখন নিয়ে যাবেন তখনই যাব।

ভট্টচাজ মশাই বললেন—আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যাব। তখন মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে। কেমন?

কথা শেষ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন আনন্দও অত্যন্ত লঘু মন নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে অন্দরে ঢুকল। মনে মনে ভাবলে এ ভালই হবে। বাবা-মায়ের ক্লিষ্ট ব্যথিত মুখ মনে পড়ে তারও ক্লেশের অবধি নেই।

সবচেয়ে এই ভাল। ঘর থেকে বেরুতেই নজর পড়ল বিদ্যুত দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। সে মুখ তুলে তাকালে বিদ্যুতের দিকে। বিদ্যুতের চোখের কপিশ তারা দুটো যেন জ্বলছে, ফর্সা শাদা মুখের পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে। আনন্দ মুখ তুলে তাকাতেই সে একটু বক্র হাসি হেসে বললে—বাঃ, এতক্ষণ খাসা রামায়ণ গান শুনলে তো?

আনন্দের মনের চাপা ক্রোধ এক মুহূর্তে জাগ্রত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নাক ফুলে উঠল, সেও একটু হাসি হেসে বললে—তুমিও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে রামায়ণ শুনছিলে বুঝি?

বেশ হেসে হেসে বিদ্যুৎ বললে—হ্যাঁ শুনলাম তো। তারপর ভক্তের মত তুমি কেমন গলে গেলে তাও তো দেখছি।

আনন্দর আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। তবু সেই উদ্যত ক্রোধ চেপে স্ত্রীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিদ্যুৎ তাতে সামান্য মাত্র বিচলিত হল না। সমান হেসে বললে—তা হ'লে এইবার সীতা নির্বাসনের ব্যবস্থা হোক আর কি! পরমুহূর্তেই হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা ভাষায় সে পরিস্কার বললে—আমি বলে রাখছি বাপু তোমাকে তোমার বাবা মা এলে তাঁরাও আমাকে সহ্য করতে পারবেন না, আমার পক্ষে তাঁদের রাগ সহ্য করে ঘর করা অসম্ভব হবে।

আনন্দ সহজ ভাবে বললে—সীতার সঙ্গে নিজের তুলনাটা তুমি ঠিকই দিয়েছ বিদ্যুৎ।

তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বিদ্যুৎ বললে—যেমন রাম তাঁর ভাগ্যে তেমনি সীতাই জুটবে তো! কাল রামচন্দ্রের পিতৃভক্তির নমুনা তো স্বচক্ষেই দেখেছি।

আনন্দের ইচ্ছা হ'লো ছুটে গিয়ে বিদ্যুতের গলাটা টিপে ঐ কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তার তো উপায় নেই। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভয়াল কণ্ঠে চাপা গলায় বললে—রামচন্দ্রের পত্নী প্রেমের পরিচয় একদিন পাবে এই বুঝে রেখ। নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে বিদ্যুৎ।

—আছে নাকি? জানি না তো। সীমানাটা দেগে দিও। তখন দেখা

যাবে। বলে স্বামীকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিদ্যুৎ ধীর পদক্ষেপে উপরে চলে গেল, যেন কিছুই ঘটে নি।

আনন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মনের সমস্ত লঘু আনন্দ কোথায় চলে গিয়েছে। সমস্ত মনের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে জ্বালা করছে যেন। অকস্মাৎ মনে পড়ল হিলুকে। কোন দিন তার সঙ্গে ঝগড়া দূরের কথা, একটা কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয় নি। সে তো কোন দিন এমন করে আপনার মনের আগুন দিয়ে তাকে পোড়ায় নি! বরং তারই মনের আগুন যেদিন রাগের বাতাসে জ্বলে গনগনে হয়ে উঠেছে অমনি চোখের জল দিয়ে সে তা নিভিয়ে তাকে শান্ত শীতল করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কি? উপায় তো নেই। সে নিজে হাতে এই আগুন তুলে নিয়ে এসেছে। তার দু হাত বুক সব পুড়ে যাবে, তবু ফেলা যাবে না। দুই হাতের আঙুলের মধ্যে সে আগুন পরম সমাদরে ধরে রাখতেই হবে।

সে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সত্যিই তো, এই হয়তো বাবা-মায়ের দীর্ঘশ্বাসের প্রথম দাহ! এ দাহ নিবৃত্তি করতেই হবে।

আট

আনন্দ সমস্ত ক্ষণটা বিভ্রান্ত হয়েই ছিল। একদিকে বিক্ষুব্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকার অন্যদিকে সহানুভূতিহীন স্ত্রীর সঙ্গে দৈনন্দিন সংসার যাত্রা এই দুই বেদনাদায়ক চিন্তাতে সে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। সে ঠিক করেছিল সেদিন আর কিছু খাবে না। না খেয়ে উপবাসী থেকে সে স্ত্রীকে শাস্তি দেবে। মনে মনে তাই ঠিক করে সে স্নান করে এল, এসে যথারীতি কাপড়-চোপড় ছেড়ে চুল আঁচড়ে গায়ত্রী জপ করে, বিছানায় চুপ করে শুয়ে পড়ল। নীচে বিদ্যুতের গলা এই সময়েই সে শুনতে পেলে—কৈ গো বামুন মা, বাবুকে ভাত দাও। কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দ উঠল। সে পিছন ফিরে শুল। বিদ্যুৎ ডাকলে—কি, শুয়ে পড়লে কেন? ভাত দিয়েছে, খাবে এস।

আনন্দ কোন জবাব দিলে না। চুপ করে যেমন শুয়েছিল তেমনি থাকল।

পরক্ষণেই বিদ্যুতের ঠাণ্ডা হাত তার কপালের উপর পড়ল আস্তে আস্তে। ঠাণ্ডা নরম হাত। তার মনে হল বিদ্যুতের মনটাও যদি এমনি ঠাণ্ডা আর নরম হত। তার ইচ্ছা হ'ল বিদ্যুতের হাতখানা সে আপনার হাত দিয়ে একবার পরম আদরে চেপে ধরে। কিন্তু সে নিজেকে সম্বত করলে। আস্তে নরম গলায় বিদ্যুৎ বললে—শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

এবার আনন্দ তার দিকে তাকাল, শান্ত কণ্ঠে বললে— না শরীর খারাপ হয়নি। আমি খাব না, খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিদ্যুতের দৃষ্টিতে কলহ স্পষ্ট ঘনিয়ে উঠল, বললে—কেন, খাবে না কেন? চল, ওঠ, খাবে চল।

—না। স্থির দৃষ্টিতে তার দৃষ্টির উত্তর দিয়ে আনন্দ জবাব দিলে।

বিদ্যুৎ আর কোন কথা বললে না। সে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আনন্দও আবার পিছন ফিরে শুল। তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল বাড়ীর উঠোনে কতকগুলো কাক মাঝে মাঝে ডাকছে। আনন্দ'র হঠাৎ মনে হল বিদ্যুৎও বোধহয় না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। তারই পন্থায় বিদ্যুৎও তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। সে বিদ্যুতকে এই ক'দিনেই বেশ বুঝে নিয়েছে। সে সারাদিন না খেয়ে পড়ে থাকবে, কিন্তু নিজের কঠিন দম্ভ রক্ষা করতে আর তাকে খেতে অনুরোধ করতে আসবে না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে আনন্দ উঠল, এদিক ওদিক ঘুরে পাশের ঘরে বিদ্যুতের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ স্নান করে নতুন সাড়ী পড়েছে, চুল আঁচড়ে কপালে ডগডগে করে সিঁদুর নিয়েছে। বিদ্যুতকে বড় নম্র, বড় পূর্ণ, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যুৎ ঘুমিয়ে গিয়েছে। আনন্দ আস্তে আস্তে ডাকলে—বিদ্যুৎ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদ্যুৎ উঠে বসল তার দিকে কঠিন ভাবে তাকিয়ে।

—চল, খাবে চল বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ সামান্য একটু হাসল, তারপর বললে,—চল।

আনন্দ'র মনে হল—আচ্ছা শুয়ে শুয়ে বিদ্যুৎ কি কেঁদেছিল? না, জলের চিহ্ন মেঝের উপর কোথাও নেই। বিদ্যুৎ বোধহয় কাঁদে না, কাঁদতে জানে না। যদি জানত বড় ভাল হত।

আনন্দ বললে—এক কাজ কর বিদ্যুৎ। আমাদের দুজনেরই ভাত উপরে নিয়ে এস। এক সঙ্গে খাওয়া যাক।

বিদ্যুৎ আবার হাসল। এবারকার হাসি চিনতে পারলে আনন্দ। এ লজ্জার হাসি। বিদ্যুৎ নেমে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে গল্প করতে লাগল দুজনে। এমন সময় নীচে থেকে ডাক এল—আনন্দ।

—আমি আসি বিদ্যুৎ বাবার সঙ্গে দেখা করে। ভটচাজ মশাই ডাকছেন। লক্ষ্মী মেয়ের মত বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে। আনন্দ খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। নীচে ভট্‌চাজ মশাই তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন হাসিমুখে, তাকে যেন উৎসাহ দেবার জন্যেই, বললেন—এস আনন্দ।

আনন্দ সস্মিত মুখে তাঁর অনুগমন করলে। কিন্তু যত লক্ষ্যস্থান এগিয়ে আসতে লাগল আনন্দ'র উৎসাহও কমে আসতে লাগল, পায়ের গতিও তত মন্থর হতে লাগল। আনন্দর মনে হতে লাগল এইখান থেকে সে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল—এই মনোভাব যদি প্রতিদিন তাকে রক্ষা করে চলতে হয় তা হলে আর বাঁচা যাবে না। এই কঠিন যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে।

ভট্‌চাজ মশাই বোধহয় তার মনের দ্বিধার কথা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বললেন—এ সম্বন্ধে তোমার নিজের মনে কোনো দ্বিধা নেই তো বাবা? তুমি এ-সম্পর্কে ভেবেছ তো?

আনন্দ জোরে মাথা নেড়ে বললে—আজ্ঞে না, কিছু দ্বিধা নেই। আর তা ছাড়া আপনি সঙ্গে রয়েছেন।

তাদের বাড়ীর দরজার প্রায় কাছে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা। সামনের দরজায় কার জুতো খোলা। একজোড়া জুতা। তাহ'লে ঘরে কেউ আছে নিশ্চয়। আর এ-গ্রামে জুতো পড়ে চলাফেরা করবার মানুষ তো বেশী নেই। তা'হলে কে আছেন ঘরে? নরনাথবাবু?

ভট্‌চাজ মশাই বললেন,—আনন্দ, ঘরে নরনাথবাবু রয়েছেন। তিনি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। এখন এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমি ঘুরে আসি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমি আসব। তুমি বরং দাঁড়াও এখানে।

আনন্দ একা দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। নরনাথবাবুই বাবার সঙ্গে

কথা বলছেন। সে কান পেতে শুনতে লাগল। তারই সম্পর্কে কথা হচ্ছে দুজনের। নরনাথবাবু বলছেন—আমি সেই দিনই সব শুনেছি। শুনে আমি অবাক হইনি মোটেই। অবাক হইনি কেন জান? তুমি কিছু মনে ক'রো না মুখুজ্জে। তোমার ছেলেকে আমি আগে থেকেই চিনি। ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ বোধ ওর কম, সে আমি সেই দিন—যেদিন আমার ওখানে ওর প্রথম স্ত্রীকে ডাক্তার দেখানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলাম। নিজের শুভাশুভ বিচার না করে একটা সর্বনেশে, নিজের ক্ষতিকর কাজ করবার ক্ষমতা আর ইচ্ছা দুই-ই ওর চরিত্রে আমি লক্ষ্য করেছিলাম সেই তখনই। এর কারণ কি জান? তোমার ছেলে যত দাম্ভিক তত অহঙ্কারী। তার উপর দোকান করে সামান্য কিছু পয়সা হওয়াতে ওর ধারণা হয়েছে ওর তুল্য শক্তি কারো নেই।

নরনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে আনন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন ধরে গেল। তার মনে হল চীৎকার করে বলে—হ্যাঁ, আমার তুল্য শক্তি তোমাদের কারো নেই। যোগ্যতায় আমার পায়ের নখের সমান একটা মানুষ নেই তোমাদের মধ্যে। নরনাথবাবুর বক্তব্য, বক্তব্য আর কি তার নিন্দা, তখনও শেষ হয় নি। তিনি বলছেন—তোমার ঐ এক মাত্র ছেলে, সে যতই অন্যায় করুক, আমার যতই অসম্মান করুক, তার অকল্যাণ কামনা করব না আমি। তবু বলি—ও নিজের সর্বনাশ করবে নিজে এ তুমি দেখে রেখো। আর আমার ভাগনীর, মানে প্রসন্নবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবি না। সে অবস্থাপন্ন মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে, তার বিয়ে ভালই হবে। তার বিয়ের জন্যে ভাবি না। তবে তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার আগ্রহ ছিল এ কথা অস্বীকার করি না। কেন আগ্রহ ছিল সেকথাও বলি। তোমার ছেলের জন্যে কি তার পয়সার জন্যে নয়। তোমার মত শ্বশুর, তোমার স্ত্রীর মত শাশুড়ী পেত সে। আর মেয়ে চোখের উপর থাকত।

আনন্দ বুঝলে শুধু বাবাই তাঁর একমাত্র শ্রোতা নয়, মাও দাঁড়িয়ে নরনাথবাবুর কথা শুনছে। সে নরনাথ বাবুর শেষ কথাগুলো শুনে আপন মনেই মুখ বাঁকালে। হ্যাঁ, ছেলের দিকে, বিশেষ করে ছেলের টাকাপয়সার দিকে তাঁর কি আর নজর ছিল! সাত্ত্বিক মহাপুরুষ। একেবারে রাধামাধব ভট্‌চাজের সহোদর ভাই যেন। মিথ্যাবাদী কোথাকার।

নরনাথবাবু এবার কথার মোড় ফেরালেন, বললেন—সে কথা যাক। এখন যে জন্যে এসেছি তা বলি। শুনলাম, তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে অপমান করে সে বাড়ী থেকে তার নতুন-বৌকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নতুন বাড়ীতে উঠেছে? মুখুজ্জে, তোমাকেও নাকি সে মারতে গিয়েছিল? তোমার হাত থেকে নাকি জোর করে দোকানের চাবি নিয়ে গিয়েছে?

এবার বাবার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে আনন্দ। মুখুজ্জে বললেন—না, সেরকম কিছু হয়নি। মারধোর করবার বা চাবি কাড়বার কথাগুলো সব বাজে কথা! নিজের অপমানকে মিথ্যা অকারণ বাড়াতে বোধ হয় মন চাইল না তাঁর।

তাঁর কথা ডুবিয়ে দিয়ে নরনাথবাবু বললেন—সে কি হে, আমি তো তাই শুনলাম। যে আমাকে বলেছে সে তো মিথ্যা বলবার লোক নয়। তুমি কথা চাপা দিতে চাইলে হবে কি? অবশ্য অমন দুর্বিনীত ছেলের কথা চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? তা আর কি করবে?

বাইরে থেকে আনন্দ'র ইচ্ছা হতে লাগল এখনি ছুটে গিয়ে ঐ মিথ্যাবাদী, কুটিল চরিত্রের মানুষটার গলা টিপে ধ'রে ওর এই সুকৌশল কুটিল মিথ্যা ভাষণ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে থাকল।

নরনাথবাবু বোধহয় এবার আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছেন, তিনি বললেন—আবার একটা কঠিন কথা বলছি। তুমি কিছু মনে ক'রো না মুখুজ্জে। আপনিও কিছু মনে করবেন না। আপনাদের একমাত্র সন্তান, সে দীর্ঘজীবি হোক। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে পৃথক হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। ও কাণা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল। তা তুমি এখন করবে কি? কিছু ঠিক করেছ?

বাবার সকরুণ কণ্ঠস্বর কাণে এল, তিনি বললেন—কি আর করব! ছেলের উপর ভরসা করে বড় আশা করে আপনার চাকরী ছেড়ে দিয়েছি! এখন আর কোন মুখে আপনাকে কিছু বলব! এবার ভগবানের নাম করতে করতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে না খেয়েই মরব।

আনন্দ'র ইচ্ছা হল এখনি ছুটে গিয়ে সে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে যেমন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরের বিষদুষ্ট বাক্যালাপ শুনতে লাগল। নরনাথবাবু বললেন—আমি সেই

জন্যেই তো এসেছি হে! তোমাকে অত কিন্তু হতে হবে না। তোমার ছেলের সঙ্গে আমার ভাগনীর বিয়ে হ'ল না সে অপরাধটা তো আর তোমার নয়! আর অত নীচই বা ভাবছ কি করে আমাকে? তুমি যেমন কাজ করছিলে কাল থেকে তেমনি কাজ কর আবার।

আনন্দ'র বাবা মা দুজনেই কেঁদে উঠলেন বোধহয়। আনন্দের মা বোধহয় কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আপনি গত জন্মে আমাদের বাবা ছিলেন। জানেন আজ দু' দিন আমরা কিছু খেতে পারি নি। দুঃখে লজ্জায় না খেয়ে আজ দু' দিন শুয়ে আছি।

আনন্দ'র দুই চোখ এক মুহূর্তে জলে ভরে এল। কিন্তু ঘরের সকরুণ আবহাওয়াটাকে এক মুহূর্তে অগ্নিতপ্ত করে তুললেন নরনাথবাবু। বললেন—তুমি কেবল আমাকে সমর্থন ক'রো মুখুজ্জে তা হ'লেই হবে। আমি তোমার দুষ্ট পুত্রটিকে কেমন করে শায়েস্তা করি তুমি কেবল দু' চোখ দিয়ে দেখবে। আচ্ছা তা হলে কাল থেকে আবার কাজে লেগে যাও। আমি আজ উঠলাম।

আনন্দ চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ীর সামনে থেকে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তবু সে নরনাথবাবুর চোখে পড়ে গেল। নরনাথবাবু কিছু বললেন না। কেবল যেতে যেতে সকৌতুক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে বার দুই তিন তাকিয়ে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ভট্চাজ মশাই এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বললেন—নরনাথবাবু বুঝি তোমার খুব নিন্দে করে গেলেন তোমার বাবার কাছে? তা বেশ।

আনন্দ বললে—বাবার কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না।

—তবু চল। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোর দিয়ে বললেন ভট্চাজ মশাই।

ঘরের দরজায় গিয়ে ভট্চাজ মশাই ডাকলেন—মুখুজ্জে মশাই! আমি রাধামাধব ভট্চাজ। একবার ভিতরে যাব।

—আসুন।

ভট্চাজ মশায় আপনার পিছনে আনন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে মুখুজ্জে বিদ্যুতাহতের মত লাফিয়ে উঠলেন। রাগে

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন—যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। সেদিন আমাকে অপমান ক'রে গিয়েছ। তাজ আমি তোমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব। বেরিয়ে যাও।

ভটচাজ হাত জোড় করে বললেন—মুখুজ্জে মশাই, আপনাকে হাত জোড় করছি আপনি শান্ত হোন। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি শান্ত হোন। আনন্দ আপনার ছেলে, একমাত্র সন্তান, তাকে ক্ষমা করুন।

আনন্দ বাবার রাগ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তার বাবার মত অমন আপাত-শান্ত মানুষের মধ্যে এত ক্রোধ কি করে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল?

মুখুজ্জে মশাইয়ের রাগ যেন আরও বেড়ে গেল, তিনি বললেন—সেদিন আমার অপমানের সাক্ষী ছিল আপনার ছেলে। আর আজ আমার ছেলের অপমানের সাক্ষী থাকুন আপনি। আপনাকেই বা আমি কি বলব। আপনিই আমার ছেলেকে এমন করে নষ্ট করে দিলেন।

রাধামাধব একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে একটা অজগরের মত নিঃশ্বাস গ্রহণ করলেন। কয়েক মুহূর্ত পর সেটা পরিত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল, মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, শান্তভাবে বললেন—আপনি ভুল করেছেন মুখুজ্জে মশাই। সে যাই হোক, আমাকে যা বলবেন বলুন, আপনি আনন্দকে মার্জনা করুন। আমার অনুরোধ।

মুখুজ্জে মশায় শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন—বেশ কথা। আপনার সঙ্গে অন্য কোন কথা নাই আমার, আপনারা আসুন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভট্টচাজ মশাই বললেন—আনন্দকে মাপ করলেই ভাল করতেন মুখুজ্জে মশাই। আচ্ছা যাই।

—আনন্দ কোনো কথা বললে না, সে শুধু নীরব সাক্ষীর মত ভট্টচাজ মশাইয়ের অনুনয় ও বাবার অপরিসীম ক্রোধ দেখে ভট্টচাজ মশাইয়ের পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় দুজনেই নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন মাথা হেঁট করে। আনন্দর বাড়ীর দরজায় এসে তিনি বললেন—যাও, বাড়ী যাও বাবা। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাও। তোমার তরফ থেকে আর কিছু করার নেই। তোমার বিবেক

পরিষ্কার হয়ে থাকল! তোমার বাবা তোমাকে মার্জনা করলে ভাল করতেন। তোমারও ভাল হত, তাঁরও উপকার হত। তবে এও মন্দের ভাল হয়েছে।

ভট্টচাজ মশাই চলে গেলেন। আনন্দও মাথা হেঁট করে বাড়ী ঢুকল। দরজার মুখেই বিদ্যুৎ দাঁড়িয়েছিল যেন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই। তাকে সামনে দেখেই আনন্দ তার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটু বক্র হাসি হেসে সে বললে—কি হল? রাজা দশরথ কলির রামকে ক্ষমা করলেন না? বাল্মীকির তপস্যা মিথ্যে হয়ে গেল?

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, যেন আপনা আপনি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কাতর ধ্বনি, তারপর বললে—তুমি কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ আপনার স্বভাব অনুযায়ী আর কিছু বললে না। একটু হেসে চলে গেল।

আনন্দ শূন্য দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে থাকল। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এল। কেবল তার মনে হতে লাগল—একেই নিয়ে তাকে আজীবন ঘর করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে যেন আপনাকেই বললে—না, সে কিছুতেই নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল সুধার কথা। সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

কয়েকটা দিন এর পর নির্বিবাদে কেটে গেল। বিদ্যুতের মুখ দিয়ে বিষাক্ত বৃশ্চিক-দংশনের মত কটু কথাও বেরিয়ে তাকে জর্জরিত করেনি, কিম্বা বাইরে থেকে আর কোন নূতনতর আঘাতও আসে নি। সে নিয়মিত যেমন আগে প্রাতঃকালে উঠত তেমনি উঠে প্রাতঃকৃত্য করে সামান্য কিছু খেয়ে দোকানে বেরিয়ে যায়। খাবার সময় কাঁসার রেকাবীতে সামান্য কিছু জলখাবার নিয়ে এসে দাঁড়ায় বিদ্যুৎ। একটু সপ্রতিভ হাসি হেসে খাবারের রেকাবীটি স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরে। হাসিতেই তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বিদ্যুতের হাতের ধরা রেকাবী থেকে একটু একটু করে খাবার তুলে নিয়ে খেতে খেতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এ সময়ের অধিকাংশ কথাবার্তাই ব্যবসা-সংক্রান্ত। বিদ্যুৎ বলে—তোমাকে প্রতিদিন বলছি একটু একটু করে বেশী খাও।

এমনি খোসখোরাকী খাবার খেয়ে প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত দোকানে খাটছ। শরীরে সইবে কেন?

আনন্দ হেসে বলে—খুব সইবে, খুব সইবে। দুপুর বেলা আচ্ছা করে খাইয়ো না, কে বারণ করছে। সকাল বেলা কি বেশী খাওয়া যায়, না এক পেট খেলে কাজ করা যায়।

বিদ্যুৎ বলে, হেসেই বলে—যায় না বুঝি? আমরা তো সকাল বেলাতেই অনেকখানি খাই বাপু। কই আমাদের তো কাজ করতে কষ্ট হয় না। তোমার যত সব আশ্চর্য কথা!

আনন্দ বলে—আচ্ছা, আচ্ছা খাব। কিছুদিন যাক, সকালবেলাই তুমি দিও, আমি এক পেট খেয়ে ঘরে বসে ঝিমুবো। কেবল কিছুদিন যাক। আমার মাথায় একটা নূতন ব্যবসার কথা খেলছে। দেখি কি হয়!

বিদ্যুৎ বলে—তুমি শুনেছি লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ। যাতে হাত দেবে তাতেই তোমার জিত হবে।

আনন্দ বিদ্যুতের মুখ থেকে এই অযাচিত প্রশংসায় খুবই খুসী হয়, তার মুখের দিকে চেয়ে বলে—মিথ্যা কথা! যদি সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ হতাম তা হলে ঘরের লক্ষ্মী, যাঁকে আশ্রয় করে লক্ষ্মী ঘরে আসবেন, তাঁকে পুরোপুরি জিততে পারতাম।

সলজ্জ হাসি হেসে বিদ্যুৎ বলে—আহা, তাঁকে জিততে যেন বাকী আছে! কি কথার শ্রী!

—খুসী হলাম, খুব খুসী হলাম এবার আমার ঘরে মা লক্ষ্মী নিশ্চয় ছুটে আসবেন। কে রুকবে আমাকে! যাই একবার সুধার সঙ্গে দেখা করে যাই। ব্যবসাটার সম্পর্কে ওর সঙ্গে দুটো পরামর্শ করে যাই। এ দিকে ওর মাথা খুব সাফ।

খানিকটা যেন বিরক্ত হল বিদ্যুৎ। বললে—তুমি অত 'সুধা' 'সুধা' কর কেন বলত? আর ওদের উপরেই বা এত নির্ভর কর কেন?

আনন্দ গাঢ় কণ্ঠে বললে—তুমি জান না বিদ্যুৎ ওরা আমার কি! কিছুদিন ঘর কর, করলেই সেটা বুঝতে পারবে। আমার মায়ের পেটের ভাই নেই। সুধা আমার কাছে তার বাড়া। ভট্টাজ মশাই আমার বাপের অধিক! আমার সুখে দুঃখে, সম্পদে এত বড় বন্ধু আর নেই। সে সুধার

মা আর কমলার নামোল্লেখ করলে না। সে জানে বিদ্যুৎ তাদের প্রশংসা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

আনন্দ বেরিয়ে পড়ল। বর্ষার বৃষ্টি-ধোওয়া রৌদ্রস্নাত আকাশের মত নিরুদ্বেগ, দুশ্চিন্তাশূন্য, স্নিগ্ধ-আনন্দপ্লুত মনে নূতন ব্যবসার চিন্তাটা একটি ভ্রমরের গানের মত গুন গুন করছে। নূতন করে, একেবারে নূতন করে জীবন আরম্ভ করবার গানেরই একটা কলি, যেন তার এই নূতন ব্যবসা থেকে লাভ হবেই। ভাল লাভ হবে সে জানে। এর থেকে যা লাভ হবে তার সমস্ত টাকাটা সে বিদ্যুতের হাতে তুলে দেবে। কালই সে বিদ্যুতকে বলবে—এই ব্যবসার মালিক পুরোপুরি তুমি। এর যা লাভ সব তোমার। আমি তোমার কর্মচারী মাত্র থাকব।

সুধাকে ডাকতেই সুধা বেরিয়ে এল। বললে—কি রে, তুই যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি?

—তুইও তো একবার গেলে পারতিস? আনন্দ উলটো চাপ দিলে।

—সেই রকম বললেই যেতাম। তুই বিকেল বেলা না এলেই বুঝি হয় তুই কোন কাজে আটকে পড়েছিস আর না হয় এখানে নেই, জংশন গেছিস। তা এ ক'দিন করছিলি কি?

—কাজ করছিলাম, কাজ। আয়, একবার নেমে আয়, কাজের কথা আছে তোর সঙ্গে।

সুধা নেমে এল। পথে চলতে চলতে ব্যবসার কথা হল। শেষ হতেই আনন্দ বললে—যা বাড়ী যা। হ্যাঁরে, তুই বর্ধমানেই পড়বি তো? কবে যাবি বর্ধমান? এখনও কিছু ঠিক হয় নি?

—না। দিন পনর বিশের মধ্যেই যাব। তোর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল আনু। গম্ভীর ভাবে বললে সুধা।

—কি বল? খানিকটা শঙ্কিত হয়েই বললে আনন্দ।

—আচ্ছা তোর বাবার সঙ্গে সেদিনের সেই ঝগড়ার সম্পর্কে আর কিছু শুনেছিস?

আনন্দ মনের গভীরে এই আশঙ্কাই যেন করছিল, বললে—সে সম্পর্কে আবার কি শুনব? কি কথা বলছিস আবার? প্রশ্ন করতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল।

সুধা গম্ভীর ভাবে বললে—তা হ'লে তুই কিছু শুনিস নি? এদিকে হাজার লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

উদ্বিগ্নভাবে আনন্দ বললে—কিসের কৈফিয়ৎ?

সুধা বললে—হাজার লোকে আমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছে জানিস? বলছে—হ্যাঁগো, সেদিন নাকি তোমার বন্ধু আনন্দ নতুন বৌকে নিয়ে এসে তারই সামনে নিজের মাকে অপমান করেছে, বাবাকে মেরে তার কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে নিজে আলাদা হয়ে গিয়েছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এত বড় খবরটা কোথা থেকে পাওয়া গেল? তা জবাব এল—কার নাম করব? এ কথা তো সবাই বলছে। আলাদা করে কারো নাম করতে হবে কেন? এইতো একজন গেল। আর একজন জিজ্ঞাসা করলে আমাকে—হ্যাঁগো, আনন্দ নাকি ওর নতুন বৌয়ের সামনে বাবাকে আর মাকে ধরে মেরেছে, চাবি কেড়ে নিয়েছে। তুমি নাকি সেখানে ছিলে? কি ব্যাপার, মানে সত্যি ব্যাপারটা কি বল দেখি! আমি বললাম—সত্যি ব্যাপারটা তো জেনেই গেছেন সেখানে না থেকেও। তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি! বুঝলি আনু, এমনি ক'রে ক'রে বহুজনকে আমাকে জবাব দিয়ে বলতে হয়েছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গোটা গ্রামে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি কাল রাত্রে বাবাকে বললাম সব কথা, বললাম—নরনাথবাবুই রটাচ্ছেন এই সব। বাবাকে জিজ্ঞাসাও করলাম—এ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য। বাবা সব শুনে একটু হাসলেন, বললেন—বাবা, আমার অনেকখানি বয়স হল। সত্য আর মিথ্যার তফাৎটা আমি বুঝতে পারি। আর একটু বুঝেছি—সত্যকে চিৎকার ক'রে ক'রে প্রচার ক'রে বেড়াতে হয় না, সে স্বয়ংপ্রকাশ, সে অনির্বাণ, তার দীপ্তি অনন্তকাল না হোক, বহুকাল আপনার ভিতরের শক্তিতেই উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান থাকে। আর মিথ্যা খড়ের আগুনের মত একবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে পরক্ষণেই ছাই হয়ে যায়, অগ্নির উত্তাপও তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। তাকে জ্বালিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে নূতন মিথ্যার ইন্ধন বারবার যোগ দিয়ে। ওর জন্য চিন্তা করো না বাবা। ও মিথ্যা আপনিই মরে যাবে। আনন্দকে কেবলমাত্র একটি কথা বলো—সে যেন শক্ত হয়ে থাকে।

সমস্ত শুনে আনন্দে'র মুখ বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল। তার মনের ক্ষণ পূর্বের শুভ্র উজ্জ্বলতার উপর কে কালি গুলে ঢেলে তাকে কালো, কুৎসিৎ ও কলঙ্কিত করে দিলে। তার ভিতরটা বাঁশ পাতার মত কাঁপতে লাগল। গ্রামের সমস্ত মানুষের বিদ্বিষ্ট দৃষ্টির সামনে সে তার দৈনন্দিন জীবন যাপন করবে কি ক'রে? মিথ্যেই হোক আর যাই হোক, যে আগুন এই মুহূর্তে জ্বলে উঠে এখানকার প্রতি মানুষের চোখের তারায় তারায় শিখার মত তাকে পোড়াবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে সেই আগুনের বেড়াজাল থেকে এই মুহূর্তে আত্মরক্ষা করবে কি করে? সে প্রতি মুহূর্তে বেশী করে অসহায় আর ভীত হয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে আপনার ঘরে আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানেই কি রক্ষা আছে? সেখানে অনির্বাণ মশালের মত বিদ্বেষের আগুন বিদ্যুতের চোখের কপিশ দুই তারায় ঘুমিয়ে আছে, বাইরের হাওয়া পাবা মাত্র সে আগুন এমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাকে পোড়াবার জন্যে ছুটে আসবে।

সে ভয়ার্ত হয়ে সুধাকে ছোট ছেলের মত জিজ্ঞাসা করলে—এখন কি করি বলতো সুধা?

সুধা অবাক হয়ে গেল আনন্দের এই মনোভাব দেখে, সে বললে—হ্যাঁরে আনু, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? হয়েছে কি? চুপ করে বসে থাক। নিজের মনে নিজের কাজ করে যা। ব্যস। দেখ না কি হয়!

আনন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে থাকল। তারপর লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে সুধার দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক বলেছিস, শক্ত হতে হবে। নইলে দশ হাজার মিথ্যাবাদী, কুটিল, স্বার্থপর মানুষের সঙ্গে লড়াই করব কি করে।

সুধা দেখলে আনন্দের চোখে তার স্বাভাবিক প্রদীপ্ত উগ্র দৃষ্টি ফিরে এসেছে, নাকের প্রান্ত স্ফুরিত হচ্ছে, রক্তোচ্ছ্বাসে ভারী প্রকাণ্ড কালো মুখখানা থমথমে হয়ে উঠে আরও বড় দেখাচ্ছে। সে সুধার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে—তুই আমার তেজ। আমি ঘুমিয়ে পড়লে এমনি করে জাগিয়ে দিস আমাকে। তারপর তাকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সে বললে—আচ্ছা, আমি চললাম।

সুধা হাসল একটু আপন মনে। এই আসল আনন্দ। এই আনন্দ

লক্ষ মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাবে না। এই আনন্দ সব পারে। এই আনন্দ প্রয়োজন আর ইচ্ছা হলে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, সমুদ্র পার হতে পারে। ইচ্ছা হলে প্রশান্ত মনে একজনের প্রাণ নিতে পারে, আবার আর একজনের জন্যে প্রাণ দিতে পারে। তার মত অমন উপরে উঠতেও এখানে কেউ পারবেনা, তার মত নীচে নামবার ক্ষমতাও কারো নেই। এ আনন্দকে এখানে কেউ চেনে না। চিনত একমাত্র হিলু-বৌ। আর চেনে সে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আনন্দ সোজা এসে উঠল মঙ্গল দত্তের গদীতে। মঙ্গল দত্তর এখন পড়তি কারবার। তবু তার নাম ডাক সকলের চেয়ে বেশী। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না, আনন্দ বুঝতে পারে সব। শুধু তাই নয়, মঙ্গল দত্তও আপনার সুখ দুঃখের কথা অকপটে এই তরুণ সগোত্রীয় ব্রাহ্মণের কাছে প্রকাশ করে, প্রয়োজন হলে দু পাঁচশো টাকা বিনাখতে আনন্দের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আনন্দ যেতেই দত্ত সমারোহ করে উঠল—ওরে বাবারে, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। আজ গাঁয়ের ব্রাহ্মণ-শেঠের মুখ দেখলাম সকাল বেলাতেই। আজ আমার কপালে নিশ্চয় মোটা লাভ আছে।

দত্তর কথায় আনন্দ'র আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এল, সে অল্প একটু হেসে বললে—ঠিক তো! দেখুন। লাভ যদি হয় তবে আমাকে তার বখরা দেবেন তো? কথা দেন।

দত্ত হাসতে লাগল, বললে—ব্যবসাদার কথা দিতে পারে আগে? তবে তুমি কি ব্যবসা শিখলে বাবা? বস বস, আগে বস।

আনন্দ বসল, তারপর আরম্ভ হল ব্যবসার কথা। বিশ্বাস আছে পরস্পরের মধ্যে, কাজেই ব্যবসা পাকাপাকি হতে সময় লাগল না। ধানচালের ব্যবসা। আধাআধি বখরায়। গ্রামের এ মাথায় দত্তর লোক বসবে, ও মাথায় বসবে আনন্দ'র লোক। সেখানে ধানচাল কেনাবেচা হবে।

কথা শেষ হলে আনন্দ বললে—এবার উঠি। এখনও দোকানে যাইনি।

—আরে বস বস। দুটো কথা বলি। তুমি না এলে তোমার কাছেই যেতাম আমি।

—কি বলুন?

দত্ত হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে বললে—তুমি তো বাবা শেঠ গোত্র। রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হল, বিয়ে করলে না। বিয়ে করলে এতদিনে কেমন রাজার জামাই হয়ে যেতে হে শেঠ থেকে। তা রাজকন্যার বিয়ে হচ্ছে এখানেই, শুনেছ? নরনাথবাবুর ভাগ্নীর, প্রসন্নবাবুর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে মুখুজ্জেদের সেই মুখ্যু গান-করা টেরী-কাটা ছেলেটার সঙ্গে।

আনন্দ মনে মনে অকারণেই বিশেষ খুসী হল। পাত্র হিসাবে নিজেকে মুখুজ্জেদের ছেলের সঙ্গে তুলনা করে নিলে এক মুহূর্তে। হেসে বললে—তা ভালই হল। পাত্র যেমন-তেমন হলে কি হয়, মেয়ে ওঁদের চোখের সামনেই থাকবে।

দত্তও হেসে ওর কথা সমর্থন করলে। পর মুহূর্তেই হাসি সম্বরণ করে গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু একটা কথা। আজ সকালে নরনাথবাবু আমাকে ডেকেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম তোমার বাবা ওদের দপ্তরে আবার কাজ করছেন।

তাকে বাধা দিয়ে আনন্দ বললে—আমি জানি সে কথা।

—আমি সে কথা বলিনি। তোমার বাবা কর্তার হুকুম মত ফর্দ করে দিলেন। কর্তা অনুরোধ করলেন—জিনিষগুলো এখন ধারে দিতে হবে। সবই বুঝলাম। ও টাকা আর পাব না। তলা তো ফাঁক হয়ে গিয়েছে। ও কথা যাক। তা ওখানেই সব শুনলাম। এই আঠারো তারিখ মানে আর পাঁচ দিন পরে বিয়ে। তা তোমার স্ত্রীর নাকি কি কুলের খুঁত আছে। তোমাকে বাদ দিয়েই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ হবে। তার মানে তোমাকে প্রায় পতিত করবার ব্যবস্থা। আমার সামনেই সব কথা হল আর কি। দেখলাম, তোমার বাবা বেশ সায় দিয়ে গেলেন।

আনন্দ'র মুখখানা আবার বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা আবার ঝড়ের দিনে বাঁশপাতার মত কাঁপতে লাগল। ঠোঁটের প্রান্ত থেকে গলা পর্যন্ত সব শুকিয়ে গেল। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। তারই মধ্যে দত্ত'র কথা ওর কানে এল—তুমি এক কাজ কর আনন্দ। তুমি সোজা ভটচাজ মশাইয়ের কাছে চলে যাও। তাঁর মত উপেক্ষা ক'রে এ অঞ্চলে কেউ যে কোন সামাজিক কাজ করবে সে ক্ষমতা কারো নেই।

কথাটা শুনেই কোন জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে আনন্দ উঠে দাঁড়াল। ওর অবস্থা দেখে দত্ত বললে—আমি তোমার সঙ্গে যাব? দেখ?

হাত নেড়ে তাকে নিবৃত্ত করে আনন্দ পথে নেমে পড়ল।

সমাজচ্যুত? তাকে সমাজচ্যুত করা হবে? এই অপমান মাথায় নিয়ে সে গ্রামে থাকবে কি ক'রে? সে টলতে টলতে চলতে লাগল।

সে হিহ্বল ভাবে একেবারে গিয়ে ঢুকল ভট্চাজ মশায়ের ঘরে। সে দরজার মুখ থেকেই দেখলে—নরনাথবাবু ভটচাজ মশাইয়ের পাশে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। ভটচাজ মশায়ের মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর। অত দেখেও নিজেকে সম্বরণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। সে প্রায় টলতে টলতে ভটচাজ মশাইয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল। নরনাথবাবু চকিত হয়ে বললেন—তা হলে আমি উঠলাম।

সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভটচাজ মশাই হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন—আসুন।

নরনাথবাবু বেরিয়ে যেতেই ভটচাজ মশাই সস্নেহে আনন্দের মাথায় হাত দিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, সহজ ভাবে বললেন—এরই মধ্যে সব শুনেছ দেখছি!

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তোমার শ্বশুর কুলে কোথাও কোন কলঙ্ক কি খুঁত নেই বাবা—সে তো আমি আগেই খোঁজ নিয়েছি, আর সে কথা তো তোমাকেও আগে বলেছি। তবে তুমি অত উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? এখানে যদি তোমাকে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়, সে নিমন্ত্রণে আমি বা আমার বাড়ীর কেউ যাবে না। এ আমি তোমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করি বলে বলছি না। সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বলছি। তোমার ভয় কি? আমার সম্মান যদি থাকে তবে তোমার সম্মানও থাকবে।

এতক্ষণ কোনক্রমে আনন্দ সহ্য করে ছিল, এবার ছোট ছেলের মত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ভটচাজ মশায় বললেন—নরনাথবাবু তোমাকে বাদ দেবার কথা আলোচনা করতেই এসেছিলেন। আমিও তাঁকে পরিষ্কার করে বলে

দিয়েছি। তুমি বরং এক কাজ কর। বৌমাকে তুমি এই কদিন আমার বাড়ীতে রেখে দাও। তিনি তো আমারও কন্যা। তিনি বরং কয়েকদিন এসে আমার বৌমার সঙ্গে থাকুন। তার পর নিমন্ত্রণের দিন তাঁকে বাদ দিয়ে যদি নিমন্ত্রণ করবার স্পর্দ্ধা হয় ওদের তখন দেখা যাবে। আমার প্রপিতামহ পিতামহ এই অঞ্চলে স্মৃতির বিধান দিয়েছেন বহুকাল, সমাজপতি হিসেবে সমাজ শাসন করেছেন, রক্ষাও করেছেন। একথাটা এ অঞ্চলে এখনও লোকে ভুলে যায় নি বাবা।

পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আনন্দ উঠে বসল।

বাড়ী ফিরল সে সুগভীর আশ্বস্ত হয়ে। বাড়ী ঢুকবার মুখেই সে ঠিক করে নিলে—সব সে গিয়ে বলবে বিদ্যুৎকে। সব খুলে বলে, ব্যাপারটার গুরুত্বটা তাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলে, সব শেষে তাকে বলবে—বিদ্যুৎ, তুমি কেবল বল, আজ সকালেও বলেছ—তুমি অত সুধা সুধা কর কেন? এখন বুঝছ সুধা আর ভটচাজ মশাই আমার, আমার শুধু নয়, তোমারও কতখানি বন্ধু।

বাড়ী ঢুকতেই সে দেখতে পেলে বিদ্যুৎ রাঁধুনী ঠাকুরুণের সঙ্গে কথা বলছে। তাকে ঢুকতে দেখেই রাঁধুনী ঠাকরুণ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। বিদ্যুৎ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বিদ্যুতের মুখের ফর্সা রঙ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। তার কপিশ চোখ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে যেন দংশন করবার পূর্ব মুহূর্তের এক শ্বেত নাগিনী। তার এই অসাধারণ চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ না বুঝলেও সে মুখে হাসি নিয়ে সোৎসাহে আরম্ভ করলে—আজ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েছিল জান বিদ্যুৎ?

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তার মুখের উপর সেই দৃষ্টি স্থির রেখে কেটে কেটে বললে—জানি। সব জানি আমি। সব শুনেছি। কিছু শুনতে বাকী নেই আমার।

দ্বিগুণিত উৎসাহে আনন্দ বললে—কি শুনেছ?

তেমনি গলায় বিদ্যুৎ বললে—যা শুনেছি সেগুলো শুনতে আবার যদি ভাল লাগে বলছি। কিন্তু এবার তা হলে আমার যা ব্যবস্থা করবার কর। আমাকে কবে সীতার মত কোন বনে নির্বাসন দেবে সেইটুকু শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

বিহ্বলের মত আনন্দ বললে—এ সব তুমি কি বলছ বিদ্যুৎ? এ সব তোমাকে কে বললে?

বিদ্যুৎ কোন উত্তর দিলে না, স্থির দৃষ্টিতে আগুন ছড়াতে লাগল যেন। এই সুযোগে আস্তে আস্তে আনন্দ তাকে সব কথাগুলি বলে বললে—তোমার বংশাবলীর সব খোঁজ নিয়েছেন ভট্‌চাজ মশাই। সেখানে কোন দোষ নেই। এখন নরনাথবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন একটা গোলমাল করবার জন্যে, আমাকে অপমান করবার জন্যে। তার জবাব তাঁকে দেবেন ভট্‌চাজ মশাই। এখন এই নিমন্ত্রণ পর্যন্ত ক'দিন আমরা—তুমি আর আমি ভট্‌চাজ মশায়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকব।

একটা অত্যন্ত অবাস্তব কথা বলেছে যেন আনন্দ এমনি ভাবে বিদ্যুৎ তার কথাকে মাঝখানে কেটে দিয়ে বললে—কেন? না, আমি যাব না। কথাটা বলতে তোমার লজ্জা লাগল না? এত আত্মসম্মানজ্ঞানহীন তুমি!

বজ্রপাতে যেন পুড়ে গেল আনন্দ, শুধু মরণাহতের মত সে বললে—তুমি কি বলছ বিদ্যুৎ!

বিদ্যুতের কথা তখনও শেষ হয় নি, সে বললে—বেটা ছেলে তুমি? স্ত্রীকে অকারণ কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা নেই যে বেটা ছেলের তার আবার অহঙ্কার! তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাকে যেখান থেকে ক'দিন আগে নিয়ে এসেছ সেইখানে রেখে এস। আমার দায়িত্ব নেবার ও আমাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যেদিন হবে তোমার সে দিন আনতে যেও, আসব।

আনন্দ আর এক আঘাতে যেন মৃত্যুর দরজা থেকে জীবনের তুঙ্গ শিখরে তাড়িত হয়ে গেল। তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল স্ফটিকের মত হয়ে গেল, নাকের প্রান্ত স্ফুরিত হয়ে উঠল, ঠোঁটে অতি মৃদু অস্ফুট হাসি ফুটে উঠল। তার বিহ্বল মনের মেঘাচ্ছন্ন বিষাদ অন্তর্হিত হয়ে চেতনা ও সংকল্পের স্থির আলোয় মন আলোকিত হয়ে উঠল, একটু অদ্ভুত হাসি হেসে বললে—ঠিক বলেছ! তাই হবে। দু দিন সবুর কর। সেই ব্যবস্থাই করছি।

পরমুহূর্তে তেমনি হাসি হেসে সে বেরিয়ে গেল বিদ্যুতকে অবাক করে দিয়ে।

নিমন্ত্রণের আর দু দিন বাকী আছে। সেদিন বিকেল বেলা সুধা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলে—কিরে, আসবি কবে আমাদের বাড়ী।

আনন্দ হেসে বললে—এখনও তো দু দিন দেরী আছে। বিদ্যুতের সঙ্গে কথা বলেছি। কাল সকালে আসব। চল, মহাবিপদ থেকে বাঁচালি। একবার তোর বাবা আর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুধা বললে—চল।

বাড়ীর ভিতর গিয়ে আনন্দ পরম সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অকস্মাৎ প্রণাম করলে সুধার বাবাকে আর মাকে। তাঁরা খানিকটা অবাক হলেন। ভট্‌চাজ মশাই বললেন—কি ব্যাপার, আনন্দবাবু হঠাৎ এমন ভক্তিমান হয়ে উঠলে কেন?

আনন্দ মুখ তুলতেই তাঁর চোখে পড়ল আনন্দের চোখে জল। তবু অকপট আনন্দে হাসছে আনন্দ।

ভট্‌চাজ মশাই আর কোন প্রশ্ন করলেন না; বুঝলেন আনন্দ অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছে।

পরক্ষণেই তার হাত ধরে টেনে আনন্দ বললে—আয় সুধা, বেড়িয়ে আসি; বহুদিন আমাদের সেই জায়গায় যাওয়া হয়নি। আজ সেইখানে যাব। আয়।

পরদিন বেলা এক প্রহর হয়ে গেল, তবু আনন্দ'র দেখা নেই। অথচ তার আসবার কথা ছিল সকাল বেলাতেই। ভট্‌চাজ মশাই বললেন—ওহে সুধা, তোমার বন্ধুর যে কোন খবর নেই। একবার দেখ তাকে।

খানিকটা বিরক্ত হয়েই সুধা আনন্দ'র বাড়ীর দরজায় গিয়ে ডাকলে—আনু, আনু রে।

কেউ সাড়া দিলে না। আবার সে ডাকলে আনন্দ'র নাম ধরে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সুধা শুনতে পেলে বাড়ীর ভিতর পায়ের শব্দ উঠছে। দরজার খিল খোলার শব্দ উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল আনন্দ'র বাড়ীর ঝি।

তাকে দেখে খানিকটা আশ্চর্য এবং বিরক্ত হল সুধা; জিজ্ঞাসা করলে—আনু কোথায়?

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বললে—ওঁরা দুজনে তো কাল রাত্রে গাড়ী করে চলে গেলেন। বামুন-মাকেও জবাব দিয়েছেন। কেবল আমাকে বাড়ী দেখাশুনো করতে বলে গিয়েছেন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সুধা কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেল তারা?

মেয়েটি কিছু না বলে দুখানি খামে মোড়া চিঠি তার হাতে এনে দিলে, বললে—একেবারে গাড়ীতে উঠে দিয়ে গেলেন আপনাকে দিতে।

দুখানা চিঠি। একখানায় তার নাম, অপরখানায় তার বাবার। সে আপনার নামের চিঠিখানাই প্রথমে খুলে ফেললে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে গেল চিঠিখানা।

ভাই সুধা,

বোধহয় চিরদিনের জন্যই গ্রাম ছাড়িয়া চলিলাম। কাল তোমাদের সঙ্গে কপট আচরণ করিয়া আসিয়াছি। বন্ধু বলিয়া শেষবারের মত ক্ষমা করিও। বিদ্যুতকে তাহার মামার কাছে রাখিয়া যাইব। তাহাকেও ছাড়িয়া যাইব। সেও কিছুই জানিবে না, জানেও না। তাহাকে লইয়া আজীবন পুড়িবার মত শক্তি আমার নাই। আজ গ্রামের লোকের নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইয়া চলিলাম, যদি কোনদিন আমার দুই হাতে তাহাদের সকলকে টিপিয়া মারিবার মত শক্তি আয়ত্ত করিতে পারি তবে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সকলকে টিপিয়া মারিব, ক্ষমা করিব না। আর তোমার বাবার ও মায়ের পায়ে প্রণাম করিতে আসিব। যদি সে শক্তি আয়ত্ত করিতে না পারি তবে আর ফিরিব না। অপর চিঠিখানি তোমার পুজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয়কে দিও। আসিবার সময় বৌমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ দিও। আমার ভালবাসা লইও।

ইতি

তোমার আনন্দ

বাবার নামের চিঠিখানাও সে খুলে ফেললে। সে চিঠিখানা আরও ছোট। তাতে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

আমার সহস্র কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন। মাতাঠাকুরাণীকে জানাইবেন। আমি নানান কারণে এই গ্রাম, ও আমার পত্নীর মাতুলালয়ে তাহাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। জানিনা আর কখনও আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব কি না! কাল কপট আচরণ করিয়া

আসিয়াছি। সেজন্য পুত্রজ্ঞানে মার্জ্জনা করিবেন। কাল বিকালে মঙ্গল দত্ত আপনাকে ছয় হাজার টাকা দিয়া যাইবে। তাহা হইতে বিদ্যুত এখানে অথবা তাহার মাতুলালয় যেখানেই থাকুক তাহাকে দয়া করিয়া মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া দিবেন। বাবা যদি লইতে আপত্তি না করেন তাঁহাকেও মাসে কুড়ি টাকা করিয়া দিবেন। আর বাড়ী আগলাইবার জন্য ঝিকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিবেন। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি নিজগুণে মার্জনা করিবেন।

ইতি

প্রণত

আনন্দ

সারাটা দিন সব-হারানো মানুষের মত শূন্য মনে কাটাল সুধা। কত কিছুতে মন লাগাতে চেষ্টা করলে সে, পারলে না। বার বার ভুলতে চাইলে আনন্দকে। কিন্তু ভোলা কি যায়!

বিকাল বেলা একা শূন্য মনে বেড়াতে বেড়াতে সে গিয়ে বসল তাদের সেই সঙ্কেত-কুঞ্জে। চারিদিকের গাছপালায় বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণের বাতাস সর সর করে শব্দ তুলছে। বৃষ্টিতে ধোওয়া ঘন সবুজ পাতা আর পল্লবগুলি শিশুর অকারণ হাসির মত দুলে দুলে উঠছে। মাথার উপর নানান আকারের মেঘের সমারোহ। তারই অবকাশে সাদা মসৃণ আয়নার মত আকাশ। তার ভারী মনের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কত তফাৎ! তবু তারই দিকে শিশুর হাসি হেসে যেন কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আকাশ থেকে মাটির দিকে চাইল সে। কালকে কথা বলতে বলতে একছা শুকনো কাঠ দিয়ে আনন্দ অকারণ দাগ টেনেছিল। সেগুলি এখনও খানিকটা স্পষ্ট আছে। আবার বৃষ্টি হলেই কি জোরে বাতাস দিলেই সেগুলো সব মুছে যাবে। সুধাও অকারণে সেই দাগে দাগ কেটে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে এল, চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠল ধীরে ধীরে।

বাড়ী ফিরে দেখলে বাইরের দাওয়ায় আবছা অন্ধকারে মঙ্গল দত্ত একটা থলি নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই বললে—টাকা নিয়ে এসেছি বাবা সুধা। আনন্দর টাকা। একবার তোমার বাবাকে ডাক।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

কম দিন নয়, এক এক করে ষোলোটা বছর পার হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে আপনার মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে পুরানো কথা ভাবেন সুধাকান্ত। ভাবেন আর আপনার চারি পাশের বাইরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকেন শান্ত কোমল দৃষ্টি মেলে। এই ষোলটা বছরে কত পরিবর্তন ঘটে গেল সমগ্র পৃথিবীতে। 'সমগ্র পৃথিবী' কথাটা সুধাকান্তের কাছে আজ শুধু মাত্র কথার কথাই। তাঁর কাছে পৃথিবী ছোটো হয়ে এই গ্রামের এবং এই অঞ্চলের প্রান্ত সীমায় শেষ হয়ে বাকীটা তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে তাঁর সেই বিগতকালের সঙ্কেতকুঞ্জ, হরসুন্দর বাবুদের বাগানের সেই কুঞ্জবনের মুখে গিয়ে দাঁড়ান। চারিটা পাশের সুবিস্তৃত নীল রেখাঙ্কিত চক্রবাল পর্যন্ত আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেন। সেই পৃথিবীটুকুর দিকেই চেয়ে থাকেন। সেইটুকু নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এই অঞ্চলের, বিশেষ করে গ্রামখানির সর্বত্র আপনার সত্তাকে সুগভীর গূঢ় স্নেহে প্রসারিত করে দিয়েছেন। এ অঞ্চলের, বিশেষ করে, এই গ্রামের মাটির সঙ্গে, গাছপালার সঙ্গে, আকাশ বাতাসের সঙ্গে, জীবজন্তুর সঙ্গে, সর্বোপরি এখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে স্মরণ করলে এখানকার বনশোভাকে আপনার স্মরণে স্পষ্ট দেখতে পান, এখানকার মৃত্তিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপ্তি আপনার স্মৃতিতে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারেন। বিভিন্ন ঋতুভেদে এখানকার আবহাওয়া ও বিশিষ্ট গন্ধকে যেন স্পষ্ট অতি পরিচিতের মত চিনতে পারেন। সর্বোপরি এখানকার যত মানুষকে দেখেছেন, অথচ আজ নেই; যত মানুষ আজও চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এমন কি যে মানুষকে কোনদিন দেখেন নি যাদের কথা কেবল শুনছেন, গাঢ় মমতার সঙ্গে তাদের সকলকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেই

তাদের সকলের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন স্মৃতিতে মুদ্রিত দেখতে পান। মাঝে মাঝে দৃষ্টি প্রসারিত করে লক্ষ্য করেন এখানকার মাটির কোথায় কোন পরিবর্তন ঘটল; এখানকার কোন্ শিশু-লতা থেকে কোন্ প্রাচীন বনস্পতির লুপ্তি এল; কোথায় কোন্ নূতন অঙ্কুর জন্ম নিলে। গ্রামের কোথায় কোন চতুষ্পদের কী পরিণতি হল, কোথায় এই চতুষ্পদের রাজ্যে কোন আগন্তুকের আবির্ভাব হল তাও জানেন। সর্বোপরি প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্র, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখের ইতিহাস পরম সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গ্রামের কোন প্রাচীন বনস্পতি মরে গেলে কিম্বা কেটে ফেললে; কোন প্রবীণ মানুষ মরে গেলে আন্তরিক দুঃখে তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, বলেন—পুরানো মানুষ গেল আর একজন।

মাঝে মাঝে আপনার মনে মনে হিসেব করেন পুরোনো কোন্ কোন্ বাড়ীটি ভেঙে গেল, কোন্ কোন্ বনস্পতি নিশ্চিহ্ন হল, কোন্ কোন্ প্রাচীন মানুষ সংসার থেকে গেল। হিসেব করতে করতেই মনে হয় পুরানো পৃথিবী আকৃতিতে, শোভায়, প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে প্রতিদিন যেন একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে হতে আজ যেন তার পুরানো চেহারা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। পুরানো পৃথিবী! কথাটা মনে হতেই আপন মনেই হাসেন তিনি। নিরবধি কালের মধ্যে এই বিপুলা পৃথ্বী বার বার কত রূপ গ্রহণ করছেন; রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর যাত্রা। নিরবধি কালের সামান্য একটু অংশে আপনার জীবন আরম্ভ করেছেন। কতদিনই বা বাঁচবেন তিনি। অনন্ত কোটি বর্ষের মধ্যে হয়তো বড় জোড় একটা শতাব্দী! আর বিপুলা পৃথিবী! সে তো ছোট হয়ে তাঁর কাছে এই গ্রামখানির মধ্যে আপনার আকার ধারণ করেছে। সবই বোঝেন। তবু মনে হয় আপনার বালককালে যে পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে পৃথিবী যেন নাই। বালককাল থেকে প্রথম যৌবনেও যে পৃথিবীকে প্রতিদিন দেখেছেন সেও যেন অনেক অনেক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সেদিনের পৃথিবী যেন অনেক রঙীন ছিল, অনেক বৃহৎ ছিল। সেদিনের গাছপালার সবুজ রঙ যেন অনেক বেশী গাঢ় ছিল, আকাশ যেন অনেক বেশী উজ্জ্বল ছিল। ঋতুর প্রাদুর্ভাব যেন অনেক প্রবলতর ছিল সেদিন। সেদিনের মানুষরাও যেন দৈহিক ও মানসিক দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আরও

বড় ছিল। সেই বিগত পৃথিবীর জন্যে বড় দুঃখ হয় মধ্যে মধ্যে। তবু একই সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার ও অমোঘ নিয়মের প্রতি আস্থার ফলে এই সব পরিবর্তনকে সহজ আনন্দে মেনে নিতে পারেন।

নিজের সমস্ত যৌবনটাই তো প্রায় এই গ্রামেই কেটে গেল! ষোল ষোলটা বৎসর। এই কালের মধ্যেই কি কম পরিবর্তন হয়েছে তাঁর নিজের জীবনে, তাঁর গ্রামে। এই কালের মধ্যে গ্রামের তাঁর বাল্যকালে-দেখা যত প্রবীণ, পাকাচুল বৃদ্ধ ছিলেন সকলেই অন্তর্ধান করেছেন। বেঁচে থাকবার মধ্যে বেঁচে আছেন একমাত্র নরনাথবাবু। অথচ নরনাথবাবুর বেঁচে না থাকলেই ছিল ভাল। মৃতকল্প, রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ হয়ে বেঁচে আছেন তিনি। আপনার অবস্থার অতিরিক্ত চালচলনের ফলে আকণ্ঠ ঋণের দায়ে হৃতসর্বস্ব না হলেও বেঁচে আছেন তিনি প্রায় হতশ্রী হয়ে। সংসারে তাঁর মত মানুষের কোন সান্ত্বনা নাই। পার্থিব সম্পদই যার একমাত্র ভরসা, পার্থিব সম্পদ ক্ষীণ হলে তার আর সান্ত্বনা কোথায়? তবু সান্ত্বনার মধ্যে সান্ত্বনা তার পুত্র—একমাত্র পুত্র লোকনাথ। তার চরিত্রের আপাত-কর্কশতা ও আপাত-ঔদ্ধত্যের জন্য গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে খানিকটা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু তিনি তাকে যতটুকু দেখেছেন তাতে তিনি তাকে পরিষ্কার বুঝেছেন বলেই তাঁর ধারণা। তরুণ, দীপ্তিমান, রূপবান যুবা। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-উদারতার সঙ্গে তার চরিত্রে যেন ক্ষাত্র তেজ কেমন করে যুক্ত হয়েছে। সত্যকারের তেজস্বী পুরুষ সে।

তবু এই গ্রামের মানুষ সম্পর্কে যখনই তিনি চিন্তা করেন তখনই সর্বাগ্রে একই সঙ্গে দুটি মানুষের ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এক তাঁর বাবা, দ্বিতীয় আনন্দ। আনন্দের কথা মনে হলেই মনটা আজও উদাস হয়ে যায়। কোথায় গেল, কি করছে আনন্দ! সে কি আজো বেঁচে আছে? কে জানে! ওর সঙ্গে সমস্ত জীবনটা হাজার পাকে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর নিজের সাধ্য ছিল না সে বাঁধনকে খোলেন কি ছিঁড়ে ফেলেন। অবশ্য ছিঁড়বার বাসনাও তাঁর ছিল না। পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীতের মত সে বন্ধন তাঁর কাছে বিশেষ প্রেমের ও শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল। তাকে চিরদিন অতি যত্নে রক্ষা করে এসেছেন। সে বন্ধন ছিঁড়েছে আনন্দ নিজেই। খোলে নি, ছিঁড়ে ফেলেছে। তিনি নিজে সাধারণ মানুষ। তাঁর পক্ষে সে

বন্ধন মোচনের কোন প্রশ্নও তাই ওঠে নি। কিন্তু আনন্দ চিরকালের অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা তার চরিত্রে বরাবর ছিল। আর ছিল যে কোন বিপদকে উত্তীর্ণ হবার মত ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার পরিচয় তো প্রথম জীবনে বার বার দিয়ে গিয়েছে আনন্দ। সেই ক্ষমতার বলেই সে এক আঘাতে তার পরিবারের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছেদন করতে পেরেছিল। চিন্তামাত্র আপনার স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের সঙ্গে, তাঁর পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক একখানা চিঠি দিয়ে কেটে ফেলে যেতে পেরেছিল ; এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগে নি তার।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে বাবার হাতে চিঠিখানা দিতেই বাবা কেমন বিব্রত হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে কেবলই ভেবেছিলেন এ বিষয়ে কি করবেন তিনি। সন্ধ্যায় আবার মঙ্গল দত্তর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আরও চিন্তিত হয়েছিলেন। পরদিন সকালে তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—ওহে সুধা! এ তো খুব দায়িত্বের ব্যাপারে পড়ে গেলাম! তুমি দুটি কাজ কর। প্রথমত: তুমি একবার আনন্দ'র বাবার সঙ্গে এই চিঠি নিয়ে দেখা ক'রে তাঁর মতামত নিয়ে এস। আর একবার বৌমার মামার বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এস।

আনন্দ'র বাবার কাছে যাবার ইচ্ছা একেবারে ছিল না তাঁর, তবু যেতে হয়েছিল। কি করবেন, পিতৃ-আজ্ঞা। আনন্দ'র বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর বাড়ী অথবা নরনাথবাবুর কাছারী কোথাও যেতে ইচ্ছা কি সাহস হয় নি। রাস্তাতে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা ক'রে কেবল পায়চারী করেছিলেন কখন রাম মুখুজ্জে তাঁর কাজ সেরে নরনাথবাবুর কাছারী থেকে বাড়ী ফিরবেন! অপেক্ষা করতে করতে একসময় দেখতে পেলেন মুখুজ্জে মশাই আসছেন।

তিনি যেতে যেতে রাস্তায় চুপচাপ সুধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুবার তার মুখের দিকে চাইলেন। তারপর শুধুমাত্র ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই তাকে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার, রাস্তায় রৌদ্রে এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে ?

মুখুজ্জে মশাইয়ের দাঁড়াবার সময় নেই, কারণ তাঁর মনিব-বাড়ীতে মনিবের ভাগনীর বিবাহ তার পরদিন। তিনি প্রশ্ন করেই জবাবের জন্য

অপেক্ষা না করেই চলতে লাগলেন। সুধা পিছন থেকে ডাকলে—মুখুজ্জে মশাই, একটু দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

তার কণ্ঠস্বরে নিশ্চয় সেদিন এমন কিছু ছিল যাতে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। তিনি কেমন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার সঙ্গে দরকার?

—হ্যাঁ, একটু রাস্তা থেকে এপাশে আসুন। রাস্তার পাশেই হরসুন্দর-বাবুদের পতিত বৈঠকখানা। পাশে নির্জন আমবাগান। সুধার পিছু পিছু সেইখানে গেলেন মুখুজ্জে।

গাছতলায় ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে নিজের ঘর্মাক্ত মুখখানা একবার কাপড়ের খুট দিয়ে মুছে নিজের পিরানের পকেট থেকে সে ভট্‌চাজ মশাইকে লেখা আনন্দ'র চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলে। অবাক মুখুজ্জে বললেন—এ কি?

—পড়ুন না।

মুখুজ্জে মশাই পড়লেন চিঠিখানা। চিঠিখানা পড়া যেন তাঁর আর শেষ হয় না। তিনি মুখ নীচু করে চিঠির দিকে চেয়েই আছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি চিঠি থেকে মুখ তুলে সুধার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি শূন্য, মুখের সমস্ত রক্ত যেন কে টেনে নিয়েছে, হাত আর পা মৃদু কম্পনে কাঁপছে। মুখুজ্জে শূন্য দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

সুধা তাঁর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে আবার যত্ন করে ভাঁজ করে আপনার পিরানের পকেটে রাখলে। আপনার বক্তব্য বলতে গিয়েও সে থমকে গেল। কিছুক্ষণ পর বললে—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মুখুজ্জে মশাইয়ের মুখ দিয়ে কথা বের হল না। ঠোঁটের অস্ফুট কম্পন থেকে সুধার মনে হল যেন তিনি বললেন—বল।

—যে টাকাটা মাসে মাসে আপনাকে দেবার কথা লিখেছে সেটা নেবেন তো?

এবার গলা ঝেড়ে মুখুজ্জে মশাই জবাব দিলেন—দিও। নেব।

তিনি পুতুলের মত সেই গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। মনিব বাড়ীর আসন্ন কর্মে শুধু আপনার দায়িত্বের কথা কেন সমস্ত সংসারটাই যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে তখন মুছে গিয়েছে।

রাম মুখুজ্জের সেই মুখের চেহারা দেখে সুধা যেন খানিকটা খুশীই হল। অকস্মাৎ তার মনে হল একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি হওয়ার পর হতেই যেন আনন্দ'র সংসারে দুটো বিরুদ্ধ শক্তির লড়াই চলে আসছে। একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে তার বাবা আর মা। হিলু-বৌ আসার পূর্ব পর্যন্ত বাবা মা আর পুত্রকে নিয়ে সংসারটা যেন একটা ছ'টা পা-ওয়ালা বিছের মত আপন মনে চলেছিল। তারপর যেই হিলু-বৌ এল আনন্দর সংসারে অমনি দুই প্রেমে কেমন এক দ্বন্দ্ব বেধে গেল। দ্বন্দ্বটা বাধল আনন্দকে নিয়ে সংসারে, আনন্দ'র আপনারই মনে। আর আনন্দ'র অবহেলার অদৃশ্য অস্ত্রাঘাতে সেই সংসার-সরীসৃপের দেহটা যেন দু' টুকরো হয়ে গেল। সেই দুটো দেহখণ্ডের মধ্যে যেন একটা অন্তহীন লড়াই চলে আসছে সেই তখন থেকে। কখনও আনন্দ জিতেছে, কখনও জিতেছে ওর বাবা আর মা। আজ এই মুহূর্তে রামমুখুজ্জের মুখ দেখে সুধার মনে হচ্ছে যে চিরকালের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগে আনন্দ ওর বাবাকে একেবারে শেষবারের মত চরম আঘাত করে পরাজিত করে চলে গিয়েছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দ'র কাছে মুখুজ্জের এই মর্মান্তিক পরাজয়টা লক্ষ্য করলে। মুখুজ্জে মশাই তখনও স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে। তার ইচ্ছা হল চলে যায়। বেশ হয়েছে! এতে সমবেদনার কিছু নেই। যে ছেলেকে পছন্দ হত না সে ছেলে একেবারে চোখের বাইরে চলে গিয়ে ঠিক শাস্তি দিয়ে গিয়েছে। পরক্ষণেই তাঁর আতুর মনের বেদনার কথা মনে হতেই সে আবার সহানুভূতির সঙ্গে তাকালে তাঁর মুখের দিকে। সহানুভূতির সঙ্গে বললে—চলুন। বাড়ী যাবেন না?

তার কথার মধ্যেই যেন কোথায় জলে-ভেসে যাওয়া লোকের কুটোর মত আশ্রয় পেলেন মুখুজ্জে। তাকে বললেন—আমাকে একটু ধ'রে বাড়ী পৌঁছে দাও না বাবা! বলেই ভর দেবার জন্যে আপনার হাতটা সুধার কাঁধে রাখলেন। সুধার মনে হল মুখুজ্জে বোধহয় মনে করছেন সমস্ত সংসার, সমস্ত মানুষ তাঁকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছে, অথবা বিদ্বিষ্ট দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। এই সময় একটি মানুষের দেহের ও মনের উত্তাপের স্পর্শে এই সান্ত্বনাটুকুই পেতে চাইছেন যে অন্ততঃ একটি মানুষ তাঁকে পরিত্যাগ করে নি।

বাবাকে সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করাতে বাবার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল, বাবা অত্যন্ত মমতার সঙ্গে সেদিন বলেছিলেন—বাবা, এ যে কি মর্মপীড়া, সন্তানের পিতা না হলে তা বোঝা যায় না। আজ আনন্দ'র এই চলে-যাওয়াটার সমস্ত অপরাধ মুখুজ্জে সবটা নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে তাঁরই ওপর অভিমান ক'রে তাঁর একমাত্র সন্তান দেশত্যাগ করেছে।

তারপরই বাবা বলেছিলেন—তুমি আর দেরী ক'রো না বাবা। কাল সকালেই বিদ্যুৎ বৌমার মামার বাড়ী থেকে ঘুরে এস। তিনি কোথায় থাকবেন, টাকাটা মাসে মাসে নেবেন কিনা—এগুলি সব জেনে এস। আর তাঁকে এখানে আনন্দর বাড়ীতে ফিরে এসে থাকতে অনুরোধ ক'রো। এখান এসে থাকলেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে আপনাআপনি বিবাদ-বিসম্বাদ মিটে যাবে। যাকে নিয়ে এত বিবাদ সেই যখন নেই তখন মনের কাঁটা সরে যেতে তো বেশী সময় লাগবে না। আর তাঁকে এও বলে এস—যদি তিনি ওবাড়ীতে একা থাকতে না পারেন তবে আমার এই বাড়ীতে এসে থাকবেন। কন্যার মত। কোন সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন বা কারণ নেই তাঁর।

বিদ্যুতের মামার বাড়ী, সে কি এখানে! এখান থেকে গরুর গাড়ীতে সাড়ে তিন ক্রোশ রাস্তা গিয়ে ট্রেনে ঘণ্টাখানেক ছুটে তারপরও নেমে ঝাড়া দুটি ক্রোশ হাঁটা রাস্তা! রাস্তায় যেতে যেতে সে বার বার আনন্দকে তারিফ করেছিল। বাহাদুরী আছে তার! সামান্য পাঁচ ছটা দিনের মধ্যে সে এতদূরে কন্যার সন্ধান করে বিয়ে করে ফিরে গিয়েছিল। বাবা অবশ্য তাকে রাস্তার সমস্ত হদিশ বলে দিয়েছিলেন। তবু খানিকটা গিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয় তার গন্তব্য স্থল কোনদিকে। আবার খানিকটা গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াতে হয় নূতন জিজ্ঞাসা নিয়ে।

যাই হোক, বহু কষ্টে ভাদ্র মাসের দুপুরে রোদের তাতে ঘেমে স্নান করে সে গিয়ে পেঁ ছুল তার গন্তব্যস্থলে। গ্রামে ঢুকেও অনেক খোঁজ খবর করে তবে সে বিদ্যুতের মামার বাড়ীতে পৌঁছুতে পারলে।

তাঁদের বাড়ীতে তার আসার সংবাদ তার পৌঁছবার আগেই পৌঁছে গিয়েছে দেখা গেল। এক ভদ্রলোক দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গাছতলায় বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তারই অপেক্ষায় বোধহয় দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর সামনে থমকে দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর নাম সে যা জেনে এসেছিল তাই কিনা।

ভদ্রলোকের চোখের জিজ্ঞাসু বিস্ময় মিলিয়ে গেল না, তিনি মুখে বললেন—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলে। ভদ্রলোকের চোখের অবিশ্বাসটা তখন মিলিয়ে গিয়েছে; বিস্ময়টা বেড়ে উঠেছে যেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নমালা বর্ষিত হল—মশায়ের নিবাস? মশাইয়ের ঠাকুরের নাম? মশাইয়ের নাম? মশাইয়ের কি করা হয়? মশাইয়ের আসার উদ্দেশ্য?

সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে সে বললে, আমি এসেছি বিদ্যুৎ-বৌঠাকুরণের সঙ্গে দেখা করতে। আনন্দ সম্পর্কে দু চারটে কথা জানবার জন্য এসেছি।

মানুষটি বড় ভাল। বললেন: বাবা মধ্যাহ্ন প্রায় যায়। আগে তুমি মুখ হাত ধোও, স্নান কর, খাও। তুমি তো ক্লান্ত হয়েছ বাবা। আহার কর, বিশ্রাম কর। তারপর বিদ্যুতের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। এস বাবা ঘরে এস তুমি। বলে সস্নেহে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

হাত মুখ ধুয়ে স্নান করে একখানা কম্বলের উপর শুয়ে সে বাড়ীর অন্দর মহলের দিকে তাকিয়েছিল। দরিদ্র সংসার। সামান্য গুটি তিনেক দু চালা ঘর। এক খানি ঠাকুর ঘর। সব ঘরগুলির চাল-কাঠামো, চালা অত্যন্ত জীর্ণ, চালে খড়ও নেই। কিন্তু সুপরিস্ফুট দারিদ্রের মধ্যেও এমন পরিচ্ছন্নতা সুধা এর আগে দেখে নি। ঘরে শালগ্রাম শিলাও আছেন। সামনে গোবর-মাটিতে নিকানো তকতকে উঠানে কিছু ধান মেলা আছে। ওদিকে সামান্য ক'টি ফুলের ছোট গাছ। কতকগুলো কাক আর শালিক কল কল করতে করতে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। ক্লান্ত শরীরে স্নান করে এই পরম প্রশান্ত পরিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ঘুম এসে গিয়েছিল।

এমন সময় খাবার জন্য ডাক এল। সামান্য আয়োজন, কিন্তু বড় পরিপাটী করে সাজানো। সে খেলে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে। খাওয়ার কাছে বসে খাওয়ালেন তাকে বিদ্যুতের মামী। বরাবর দাঁড়িয়ে থাকলেন বিদ্যুতের মামা।

বিদ্যুতের মামী বললেন: আমাদের কত ভাগ্যি তুমি এসেছ বাবা। এত বেলায় আর কি দেব! নারায়ণের এই প্রসাদ ছিল। তাই দিলাম।

অত্যন্ত বিনীত শান্ত ভাবে বললে সে: আমার মহাভাগ্য যে আমি অযাচিত ভাবে নারায়ণের প্রসাদ পেলাম।

বিদ্যুতের মামা বললেন—তোমার বাবাকে তো দেখিনি বাবা। তবে তাঁর নাম শুনেছি। ভাল মানুষ, মহৎ মানুষ তিনি।

খেতে খেতে সবিস্ময়ে সুধা ভাবলে—এমন মামা মামীর কাছে মানুষ হয়ে, এমন শান্ত পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে বিদ্যুৎ এমন রুক্ষ স্বভাব পেলে কি ক'রে? তার আরও আশ্চর্য লাগল—এতক্ষণের মধ্যে সে বিদ্যুৎকে একবারও দেখতে পেলে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুধা জিজ্ঞাসা করলে—কৈ, বিদ্যুৎ বউঠাকরুণকে তো দেখতে পেলাম না।

মামা মামী দুজনেই যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মামী বললেন—আর বল না বাবা, আমাদের কপাল। আমাদের নিজেদের ছেলেপিলে নেই; আমরা ঐ মা-বাপ-মরা মেয়েকে তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করেছি। আদরে আদরে মেয়ের স্বভাব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বড় অভিমানী মেয়ে। কাল জামাই গিয়েছে, যাবার সময় বোধ হয় কিছু চিঠি পত্র লিখে গিয়েছে। যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ ঘুরল, ফিরল, হাসল। তারপর বাবা ঘরে গিয়ে সেই যে শুয়েছে আর উঠছে না। হাজার ডাকাডাকি করেও, বার বার শুধিয়েও কোন জবাব পাচ্ছি না।

সুধা বুঝলে আনন্দ চিঠিতে তাকে যা লিখে গিয়েছিল তাই পালন করেছে। তারই আঘাতে বিছানায় শুয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ-বৌ ঠাকুরুণ। সুধা দু একবার ইতস্তত: করলে, তারপর বললে—তা হ'লে কথাগুলো আপনাদিকেই বলি।

সুধা আর কিছু না বলে আনন্দ'র তার বাবাকে লেখা চিঠিখানা আর ভট্চাজ মশায়ের বিদ্যুতের মামাকে লেখা একখানা চিঠি বিদ্যুতের মামার হাতে দিলে। সমস্তটা পড়ে ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে সমস্ত কথা বলে চিঠি দু খানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—বিদ্যুতকে তো অনেক যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তাকেই চিঠি দু'টো দাও, সে পড়তে পারবে।

সুধা দেখতে পেলে অমন সুন্দর মানুষটি ক্ষোভে, মর্মান্তিক কষ্টে যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে সুধাকে বললেন—তুমি আজকের রাত্রিটা থেকে যাও বাবা। কাল সকালে যাবে।

পরদিন সকালে যাবার সময় সুধা বিদ্যুতের মামা মামীকে প্রণাম করে যাত্রার উদ্যোগ করছে এমন সময় বিদ্যুৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবভঙ্গি তার। বললে—তুমি চললে ঠাকুর পো? তোমার চিঠিখানা নাও ভাই। বলে আনন্দর চিঠিখানা সে এগিয়ে দিলে।

সুধা অবাক হয়ে গেল ওর কথার ভঙ্গিতে। বিদ্যুৎ এর আগে ওর সঙ্গে কোনদিন কথা বলে নি, অথচ আজ তার কথা বলার কি সহজ ভঙ্গি, যেন কতদিনের আলাপ।

বিদ্যুৎ বললে—তোমার বাবাকে মাকে আমার প্রণাম দিও। তাঁদের আগে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি ভাই। তার জন্যে যেন কিছু মনে না করেন। আর এখন এখানেই মামা-মামীমার কাছে কিছুদিন থাকি। তারপর তোমাদের ওখানে যাব। যতদিন এখানে থাকি ততদিন এইখানেই টাকা পাঠিও।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে সুধাকান্তের। এরই মধ্যে তিনি বাহ্যতঃ ভাবে ভঙ্গিতে কথাবার্তায় প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে পোঁচেছেন। অথচ শরীরের স্বাস্থ্য আর পাঁচ জনের চেয়ে তাঁর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। নিজের মনেও তিনি যৌবনের সাহস ও শক্তির স্পষ্ট চঞ্চল সঞ্চরণ বার বার অনুভব করেন। যে চঞ্চলতা মনের মধ্যে সঞ্চরমান তা মনের মধ্যেই শিবের জটাজালবদ্ধ গঙ্গাধারার মত ঘোরে, বাইরে আসার পথ পায় না। প্রথমতঃ তিনি প্রতি মুহূর্তের সজ্ঞান চেষ্টায় সে চঞ্চলতা মনের মধ্যে রোধ করে শান্ত ধীর ভঙ্গিতে তাকে প্রকাশ করেন। তাছাড়া বরাবর তাঁর স্বভাবই অমনি। চরিত্রে কোন কিছুর প্রকাশ বরাবরই উচ্চগ্রামে হয় না। সব কিছুর প্রকাশ পরিমিত। হাসেন পরিমিত, কথা বলেন আস্তে আস্তে, চলেন ধীর পদক্ষেপে। তাঁর এই শান্ত স্তব্ধ স্বাভাবের জন্য বাইরের মানুষ মনে করে তাঁর অনেকখানি বয়স হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগের কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল

সুধাকান্তের। তখন বিদ্যুৎ বৌঠাকরুণ এইখানেই ছিলেন। বিদ্যুৎ বৌঠাকরুণের ছেলে মনীন্দ্রর বয়স তখন বছর দশেক। তারই বড় ছেলে কৈশোরের বয়সী। সকাল বেলায় সেদিন তিনি দাওয়ায় বসে কাজ করছিলেন, একটি মানুষ এসে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে প্রণাম করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবু মশায়, এই কি সুধাকান্ত ঠাকুর মশায়ের বাড়ী?

তিনি আপনার মাথার খাটো করে কাটা চুলের উপর হাত বুলিয়ে বললেন ধীরে ধীরে—হ্যাঁ এই বাড়ীই তো বাবা। তোমার কোথা হতে আসা হচ্ছে।

—আজ্ঞে আমি আসছি 'বিদু'র মামার কাছ থেকে।

সুধাকান্ত অল্প একটু হেসেছিলেন, বিদু! বিদু হল বিদ্যুৎ বৌঠাকরুণ। হেসেই বললেন—তা বল—বার্তা বল। সব খবর ভাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই 'পত্ত' আছে। 'পত্ত' এল হাতে। পত্র পড়তে লাগলেন তিনি। মামুলী পত্র। পত্র পড়তে পড়তেই বললেন—যাও বাবা বাড়ীর ভেতর যাও।

লোকটি বাড়ীর ভিতর গেল। বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই মনীন্দ্র, মণি, ছুটে এসে আগন্তুক বৃদ্ধের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। কে তুমি? কাকে চাই? বলা নেই, কিছু নেই, তুমি বাড়ীর ভেতর চলে এলে?

শেষের কথাগুলোর অর্থ সে নিজেই জানে না। বড়দের বলতে শুনেছে, নিজে কথাগুলো বলে বোধহয় নিজেকে বড় হয়েছে বলে মনে হল তার। তার পিছনে কমলা এসে দাঁড়িয়েছেন তখন।

মানুষটি তখন বলছে—ওই, আমাকে যে বুড়ো বাবু ভেতরে আসতে বললে!

কমলা জিজ্ঞাসা করলেন—বুড়ো বাবু কে?

—ওই তো বাইরে দাওয়ায় বসে খাতা লিখছেন।

কমলা অকস্মাৎ কিশোরীর মত মুখে কাপড় দিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। সে কি হাসি তাঁর। মণি অবাক হয়ে একবার কমলার দিকে তাকিয়ে সেই লোকটির দিকে তাকালে, বললে—কি, আমার কাকামশায় বুড়ো? তুমি বাড়ী থেকে যাও। চলে যাও। সে ছুটে গিয়ে লোকটিকে ঠেলতে আরম্ভ করেছিল—যাও, চলে যাও। বুড়ো? কাকামশায়কে বুড়ো বলা?

মণি তখন রাগে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। ক্ষিপ্ততার আরও কারণ এই যে কমলা এমন একটা অপমান গায়ে না মেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। তিনি হাসি কমিয়ে বললেন মণিকে—হাঁরে, তোর কাকা বুড়ো নয়তো কি? বলে আবার খিল খিল হাসি।

সুধাকান্ত ভিতর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ সজল হয়ে এল। তাঁর ছেলেরা কেউ নেই। কোথায় খেলা করছে হয়তো! তাঁর ছেলেরা থাকলে এমন করে মারামারি করবার জন্মে ছুটত না। কেবল মুখে হয়ত প্রতিবাদ করত। তবু পরের ছেলের তাঁর প্রতি গাঢ় অনুরাগের আকস্মিক উপলব্ধিতে মনটা এক মুহূর্তে কেমন চঞ্চল হল। তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে মণিকে টেনে কোলে তুলে নিলেন। কমলার ঈষৎ ব্যঙ্গ আর আগন্তুক মানুষটির কথায় সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সুধাকান্তর কোলে উঠেও সে চঞ্চল হয়ে হাত পা ছুঁড়ছিল। সুধাকান্ত তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, আস্তে আস্তে তাকে কাণে কাণে বললেন—বাবা, সত্যিই তো আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। তা না হ'লে আমাকে বুড়োবাবু কেন বলবে বল? আর তার ওপর—

মণি তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সে শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না। তার কাকামশায়ই বুড়ো এ কথা সে মানতেও রাজী নয়, শুনতে তো নয়ই। সুধাকান্ত আবার তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—আরে বোকা, তোর মামার বাড়ীর লোক। সেখানে ফিরে গিয়ে তোর নিন্দে করবে। সব শুনে তোর দাদু দুঃখ করবে।

দশ বছরের জেদী ছেলে আপনার ফর্সা রঙের ভারী টসটসে মুখখানা ঘুরিয়ে বললে—তবে আমার বয়েই গেল! ওঃ, আমার নিন্দে করলে আমি মানিই না।

এইবার তাঁকে তার কথা মেনে নিতে হল, বললেন—আর আমি তো সত্যিই বুড়ো নই, তা হলে আর তুমি রাগ করছ কেন? তারপর আগন্তুক মানুষটিকে সম্বোধন করে বললেন—ওগো বাবা, শুনছ তোমাদের দিদি ঠাকরুণের ছেলে কি বলছে। তোমাকে বলে রাখি কথাটা। আমি বাপু বুড়ো-সুড়ো নই। দিব্যি জোয়ান মানুষ আমি। হ্যাঁ, আমাকে আর বুড়ো-সুড়ো ব'লো না।

মানুষটি সব দেখে শুনে হাসছিল। সে এবার ঘাড় কাত করে তার দিদিঠাকরুণের ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবু, আমারই ভুল হয়েছিল। আমি নিজেই বুড়ো মানুষ তো, তাই সবাইকে বুড়ো দেখি।

সুধাকান্ত মণির মুখের দিকে চেয়েছিলেন। একেবারে বাপ মায়ের যুগ্ম প্রতিমূর্তি। গঠন সব আনন্দের মত, কেবল রঙ আর চোখের তারা দুটো বিদ্যুতের মত। ভারী ভারী বড় বড় গঠন, তার সঙ্গে ফর্সা রঙ, আর কটা চোখ। স্বভাবও ঠিক তেমনি। আনন্দ আর বিদ্যুৎ দুজনেরই স্বভাবের জেদ আর রাগটা ছেলে পেয়েছে। তবে ছেলেটির ভালবাসার ক্ষমতা অসাধারণ। যত সে তাঁকে ভালবাসে তত ভালবাসে কমলাকে। তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে আবার তার যত ঝগড়া তত প্রেম। ঝগড়াও সে করে আগে আবার ভাবও করে আগে সেই। আবার বাইরে তাঁর ছেলেদের সে রক্ষাকর্তা সেজে থাকে। সব মিলিয়ে এক নজরেই চোখে-ধরা ছেলে। আর হবে না-ই বা কেন? আনন্দ'রই ছেলে তো!

তাঁর নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে মণির তুলনা করলে অবাক লাগে। ঠিক যেন তাঁর আপনার বালককালটা আপনার চোখের সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হতে দেখতে পান। আনন্দর ছেলে আনন্দ'র ভূমিকা গ্রহণ করছে, আর তাঁর বড় ছেলে কিশোর তাঁর নিজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একই বয়স ওদের। আর তাঁর ছোট ছেলে দুলাল! তার কথা মনে হলেই বুকটা অকারণেই অহঙ্কারে ফুলে ওঠে। আট বছর মাত্র বয়স। অথচ এরই মধ্যে কি স্বতন্ত্র কি গম্ভীর! সে সর্বদা আপনার মনে খেলা করে। বড় ভাই কি মণির সঙ্গে পারতপক্ষে সে যায় না। গেলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই মণি আর তার মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যায়। মণিই ঝগড়া আরম্ভ করে। দুলাল ছোট, সে বড়। সেই অধিকার তাকে সে এটা ওটা করবার হুকুম দেয়। কিন্তু সে হুকুম দুলাল কোন দিনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সে আপনার মনে যা করবার করে যায়। ফলে মণি রেগে ওঠে, তাকে বকে, সময় সময় মারবার জন্যে উদ্যত হয়। আট বছরের দুলাল কিছু বলে না। কেবল সে আপনার হাতের কাজ ফেলে রেখে যেন থমকে গিয়ে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টির অর্থ বোঝা কি কঠিন। সে দৃষ্টিতে আজ্ঞা পালনের অস্বীকৃতির ঔদ্ধত্য থাকে না, বিদ্রোহের দাহ থাকে না। সে কেবল আপনার

বড় বড় চোখের ধূসর দৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রসারিত করে স্থিরভাবে শুধু চেয়ে থাকে। মনে হয় সে যেন শুধু দেখছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিপক্ষের সব দেখছে, মেপে নিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শক্তিকে স্থির বিদ্যুতের মত আপনার মধ্যে সংহত করে নিচ্ছে প্রতিপক্ষের সমস্ত আঘাতকে প্রতিহত করবার জন্যে। সেই সময় সে কেবল স্থির হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে চোখে শান্ত ধূসর অথচ কঠিন দৃষ্টি নিয়ে। মুখে কোন কথা বলে না।

কথা সে এমনিই বলে খুব কম। আপন মনে আপনার বই পত্তর শ্লেট পেনসিল নিয়েই সময় কাটে তার। ওর এই স্বভাবের জন্যেই ওকে শাসন করা যায় না। সেটা যেন প্রায় অসম্ভব মনে হয়। অবশ্য শাসন করার কোন প্রয়োজনই ঘঠে না।

সুধাকান্ত বুঝতে পারেন যে কোন ধরণের একটা অমিত শক্তি ছেলেটার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। সজ্ঞানে না হোক, স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সে আপনার শক্তি সঞ্চার আপনার মধ্যেই উপলব্ধি ক'রে আপনার আশ পাশ ও পরিবেশকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যায়। তাকে তিনি যতই দেখেন ততই আশ্চর্য লাগে তাঁর।

আবার বড় ছেলে কিশোরকে দেখলে অত্যন্ত সুগভীর মমতায় এক মুহূর্তে সমস্ত মন ভরে যায়। শান্ত, সুন্দর ভীরু পাখীর মত। তাঁর দুই ছেলেই দেখতে একই রকমের, যেন এক ছাঁচে তৈরী। লম্বা লম্বা দীঘল পাতলা পাতলা গড়ন, পাতলা ঠোঁট, টানা টানা বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, টানা পাতলা ভ্রূ, কাঁচ কাঁচ মাজা মাজা রঙ। ছেলে দুটিই কমলার দুটি প্রতিবিম্ব যেন। বাইরের গড়ন কমলার মত, তাদের স্বভাবে তাঁর নিজের ছায়া আছে যেন। তবু তাঁর দুটি ছেলে স্বভাবে দু রকমের। একদিক দিয়ে প্রায় বিপরীত চরিত্রের বললেও অন্যায় হয় না। তবু তাঁর নিজের মনে হয় যে ঐ দুই রঙই তাঁর আপনার স্বভাবেই কোথাও আছে। লুকিয়ে আছে, তিনি ধরতে পারেন না, তবে মাঝে মাঝে তাদের উপস্থিতি আপনার মধ্যে যেন উপলব্ধি করতে পারেন।

কিশোরকে দেখলেই তাঁর মনটি প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, দুলালকে দেখলে মন অকারণেই স্পর্ধিত হয়, মনে হয় কোনও বৃহৎ শক্তি নিয়ে ও এসেছে কোন বৃহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্যে। আবার মাঝে মাঝে মনে

হয় হয়তো ওর মধ্যে যে একটা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করবার স্বাভাবিক শোভন শক্তি আছে সেই শক্তি দিয়ে একদিন সে হয়তো তাঁদের সকলকে এড়িয়ে যাবে, মানবে না ; খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মানবে না। তিনি এবং কমলা দুঃখ করলেও, মনোবেদনা পেলেও সে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। সব কিছু উপেক্ষা করে সহজভাবেই সে আপনার ঈপ্সিত পথে চলে যাবে। তাই ভাল করে আট বছরের কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দেখলে মাঝে মাঝে ভয়ও হয় তাঁর। অথচ এই অকারণ অহঙ্কার এতই অকারণ যে কমলার কাছেও তা পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। কমলা হয়তো হেসেই উঠবে কিম্বা অত্যন্ত দুঃখিত হবে।

একদিন হয়েও ছিল তাই। তিনি অস্পষ্ট ভাবে কমলাকে কথাটা বলেছিলেন—জান কমলা, আমার ভয় হয়, দুলাল হয়তো বড় হয়ে আমাদিকে মানবে না।

কমলা কথাটা শুনে স্থির ভাবে অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন—কেন ? কেন তোমার এ কথা মনে হয়েছে, বলতো ?

কমলা তাঁর প্রথম কথাতেই আহত হয়েছিল সেটা বুঝেছিলেন তিনি। কারণ তিনি প্রশ্ন না করেও এ কথা জানেন এবং বোঝেন যে কমলা তাঁর মতই এই কনিষ্ঠ সন্তানটির ভবিষ্যত সম্পর্কে আকাশ-কুসুমের মত অবিশ্বাস্য আশা পোষণ করে। তিনি স্ত্রীর প্রশ্নে তাই স্বাভাবিক ভাবেই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। একটু হেসে বলেছিলেন—কোন কারণ নেই, তবে এমনি মাঝে মাঝে মনে হয়।

কমলা সজোরে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—না, সে কোনদিন হবে না এ তোমাকে আমি বলছি। আমি তার মা। আমি তাকে তোমার চেয়ে অনেক ভাল করে বুঝি এইটা জেনে রেখো। তারপর খানিকটা থেমে আবার বলেছিলেন—তোমাকে একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রো না। এ ভট্চাজ বংশের ছেলে। তোমার ঠাকুরদা বাবার কথা মনে কর। তোমার নিজের কথা মনে কর। তোমরা তো কখনও বাপের অমতে কোন দিন কোন কাজ কর নি। বাপ তোমাদের কাছে দেবতা। তোমার ছেলের শরীরে তো সেই রক্তই বইছে। সে অন্য রকম হবে কেন ?

তারপর থেমে আবার বলেছিলেন—আরও বলি শোন। তোমারই

সঙ্গে তোমার সেই দেশছাড়া বন্ধুটির তুলনা কর। নরনাথবাবুর ছেলে লোকনাথের কথা মনে কর। তারা আপন আপন ইচ্ছায় চলতে গিয়ে বাপকে মাকে কষ্ট দিতে তো কসুর করে নি। কিন্তু কই তুমি তো নিজের ইচ্ছায় নিজের পথে যেতে পারলে না। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে, নিজের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে তোমার কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু বাপের ইচ্ছায় তো তা দিয়েছ! সুধাকান্ত আর কোন কথা বলতে পারেন নি। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে হেসে চুপ করে গিয়েছিলেন। আর এ নিয়ে কমলাকে বলতে কোনদিন ভরসা করেন নি। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন কমলার মনের অত্যন্ত গভীরে আঘাত লাগবে।

কিন্তু বড় ছেলে কিশোরের মুখের দিকে যখনই তিনি তাকান তখনই ভাল লাগে। মন পরম স্নিগ্ধতায় সরস হয়ে ওঠে। ওর সর্বাঙ্গে এমন একটি কোমল লাবণ্য আছে, সর্বোপরি ওর চোখের দৃষ্টিতে আর মুখের সদাপ্রসন্ন ভাবে এমন একটি স্নিগ্ধ মিষ্টতা ও সশ্রদ্ধ নির্ভরতা আছে যা দেখলে পরম স্নেহে সুধাকান্তের মন দুলে ওঠে। সুধাকান্ত অনুমান করতে পারেন কমলার মনও অমনি স্নেহে আকুল হয়ে ওঠে।

কিশোরের মুখের এই শান্ত প্রসন্নতা দেখলেই সুধাকান্তের মাঝে মাঝে একটা দিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন সে বিদ্যুৎবৌঠাকরুণের মামার বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে। সারা দিনের ক্লান্তির পর সন্ধ্যায় স্নান আহার করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। এক ঘুমের পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশেই দাঁড়িয়ে কমলা স্বামীকে জাগাচ্ছে, গায়ে হাত দিয়ে অল্প অল্প ধাক্কা দিচ্ছে আর মৃদু গলায় ডাকছে—এই, শুনছ, ওঠ।

ঘুম ভেঙে কমলার দিকে সে পাশ ফিরে তাকালে। তাকাতেই মনে হল—কমলাকে বড় সুন্দর লাগছে। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর লাগছে। দুই হাত দিয়ে সে স্ত্রীকে আপনার বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত করে বললে—ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো!

আপনার কথার ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে কমলা বললে—দিলাম তো! দিয়েছি; বেশ করেছি। তুমি সকলকে বললে বিদ্যুতের কথা ওখান থেকে ফিরে এসে! আর আমি বাদ যাব বুঝি! সে সব চলবে না। সব বল আমাকে! না বললে ছাড়ছি না! আর বললে তোমাকে একটা খবর বলব।

সুধা আপানার বলার কথাগুলো ভুলে গেল। স্ত্রীকে সবল আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বললে—তুমি আগে বল। তারপর আমি বলব, সব বলব!

আলিঙ্গনের মধ্য থেকেই ঘাড় নেড়ে বললে কেটে কেটে—আমি কিছুতেই বলব না তুমি যতক্ষণ না বিদ্যুতের সব কথা বলবে। তুমি সব বল, আমিও বলব।

স্ত্রীর জেদটাই মেনে নিলে সুধা। তাকে একে একে সব বলে শেষে বললে—জান কমলা, আজ বিদ্যুৎকে একেবারে আলাদা রকম দেখলাম। মেয়েটির মধ্যে অবস্থাকে মানিয়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললে—যেন কিছুই হয় নি। স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে তো আর কি করা যাবে—এই রকম একটা ভাব যেন। হয় ওর আনন্দ সম্পর্কে মনে একটা গভীর বীতরাগ আছে, কিম্বা আনন্দের সঙ্গে ওর পরিচয়ই হয় নি ভাল করে—এও হতে পারে। না হয় ওর মানিয়ে নেবার প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে বলতে হবে।

—কি জানি! আমার তো বাপু একেবারে ভাল লাগে নি ওকে। ওকে যতবার দেখেছি, যতক্ষণ দেখেছি হিলু-দিদিকে মনে পড়েছে কেবল। তার সঙ্গে তুলনাই চলে না ওর। সেই মানুষ আর এই মানুষ। কমলা আপনার পরিষ্কার মতামত ব্যক্ত করলে।

আশ্চর্যের কথা কমলার কথাগুলি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলে না সুধা মনে মনে। তার মনে হল কমলা যেন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, হৃদয়হীনার মত বিদ্যুৎকে বিচার করছে। সে কথা সে বললেও কমলাকে—দেখ কমলা, তোমার কথাটা খানিকটা সত্যি বটে, সবটা নয়। বিধাতা তো সব মানুষকে এক ছাঁচে ফেলে তৈরী করেন না। একটা মানুষকে যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেন আর একটি ঠিক তেমনিভাবে তৈরী করতে তাঁর মন ওঠে না। তিনি বার বার নূতন সৃষ্টিই করেন। মনে কর না কেন তোমার যখন একটির পর একটি সন্তান হবে তখন কি তাদের প্রত্যেকটি একই রকম দেখতে, একই রকম স্বভাবের হবে? হবে না।

সুধাকে আর কথা শেষ করতে হল না। কমলার খিল খিল হাসিতে কথার সুতো মাঝখানেই ছিঁড়ে গেল। সে খানিকটা অবাক হয়ে কমলার দিকে

তাকালে—কি হ'ল কমলা, অমন হাসছ কেন? আমার কথায় এত হাসির কি পেলে?

স্বামীর প্রশ্নে কমলার হাসি কমল কিন্তু বন্ধ হল, না। সে মাঝে মাঝে হাসতেই লাগল; শেষ পর্যন্ত একটি প্রচ্ছন্ন রহস্যময় হাসি ওর ঠোঁটে যেন লেগেই রইল।

সুধা ওর কথা শেষ করলে, বললে—দেখ কমলা, নিষ্ঠুরভাবে, কঠিনভাবে কাউকে বিচার করতে নেই। তাতে অন্যায় হয়। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের বিচারে তো ভুল হবেই। যদি কঠিনভাবে বিচার করতে গিয়ে ভুল কর তা হ'লে সেই ভুল যদি কোনদিন ধরা পড়ে তখন আর মনোবেদনার অবধি থাকে না। তাই মানুষকে সহানুভূতি দিয়ে বিচার করাই ভাল। যা দেখলাম তাতে আর পাঁচটা মেয়ের মতই বিদ্যুৎ বউও সাধারণ মানুষ। দোষের মধ্যে ওর মুখটা ভাল নয়, মেজাজ ভাল নয়। চড়া ধাতের মানুষ বিদ্যুৎ-বউ। কিন্তু ওর ধাতটা কেন চড়া, কেন ওর বেজাজ খারাপ সেটা তো কোনদিন আনন্দ ভাবে নি। আমি তো আনন্দকে জানি। আনন্দ'র সে স্বভাবই নয়। আর কল্পনা কর তো—তার নূতন বউ হয়ে এখানে আসা! তোমরাও তো নূতন বউ হয়ে এসেছিলে! সে নূতন বউ হয়ে এল; তার জন্যে শাঁখ বাজল না, যেভাবে বউকে সসম্মানে সমাদরে বরণ করে ঘরে তোলে তেমন ভাবে কেউ তাকে বরণ করে তো তোলে নি। তার বদলে ঘরে ঢুকবা মাত্র ওকে ঘর থেকে ওর শ্বশুর শ্বাশুড়ী বিদায় করে দিয়েছে। তার পর আনন্দ তাকে একদিন একটা ভাল কথা বলে নি। এখানে তোমরা সমাদর করলে কি হবে, তোমাদের সমাদর সে ভয়ে অন্তরের সঙ্গে নিতে পারে নি। তবু সে অকৃতজ্ঞ নয়। সে বলেছে যদি কোন দিন সে এখানে আসে, সে আসবে তোমাদের জন্যেই, তোমাদেরই কাছে। তোমাদিকেই সে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছে এ তো আমি দেখে এসেছি। তাই বলছি কঠোরভাবে বিচার করো না, মনে একদিন দুঃখ পাবে এরই জন্যে।

সুধার কথায় কমলার মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গিয়েছে মেঘে ঢেকে যাওয়া চাঁদের মত। সে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আর কোন কথা না বলে কমলা চুপ করে শুয়ে পড়ল।

সুধা বললে—বারে, শুয়ে পড়লে যে। আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে,

উঠিয়ে বসিয়ে বক্‌বক্‌ করে বকিয়ে শেষে নিজে শুয়ে পড়লে, সে চলবে না। ওঠ। সে কমলাকে তুলে আপনার কোলে টেনে নিলে।

কমলা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সুধার হঠাৎ মনে পড়ল কমলা তাকে কি বলবে বলেছিল। পরম সমাদরে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আমি তো আমার কথা বললাম। ওসব চুলোয় যাক। বিদ্যুৎ বউ আমাদের কে! তার কথা বাদ দাও। মুখ ভার ঘোচাও। এই বার তোমার খবরটা বল।

মেঘের মধ্য থেকে আবার চাঁদ বেরিয়ে এল যেন। কমলার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সেই প্রচ্ছন্ন রহস্যময় হাসি হেসে সে বললে—বলব। কিন্তু আমাকে কি দেবে বল?

—আচ্ছা, আগে বল। বললে সুধা। কমলা উঠে গিয়ে আলোটা কমিয়ে দিয়ে বিছানায় ফিরে এল।

ঝিল্লীসঙ্গীতঝঙ্কারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত পৃথিবী, আধো আলো আধো অন্ধকারে পরস্পরের মুখ অস্পষ্ট দেখা যায় মাত্র; তার মধ্যেও কমলার সাহস হল না সেকথা বলবার। সে ধীরে ধীরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে আপনার মুখ তার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে কি বললে। অস্পষ্ট ফিস ফিস স্বর, ভাঙা ভাঙা ভাষা। কিন্তু এ কি বললে কমলা! তাতেই তার মনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত ঐ অস্পষ্ট অস্ফুট বাণীর বিদ্যুৎ প্রবাহে আলোড়িত হয়ে গেল। সে চুপ করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কমলা তার মুখের দিকে সেই প্রচ্ছন্ন হাসি মুখ নিয়ে তাকিয়ে স্বামীর অবস্থা উপভোগ করছে। সে কমলাকে ধীরে ধীরে বুকে জড়িয়ে ধরে আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দিলে। শান্ত প্রসন্ন হাসি হেসে বললে—তোমায় একবার দেখি কমলা!

সেই নরম আলোয় দু জনে পরস্পরের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পরস্পরের মুখেই পরস্পরের হাসির ছায়া পড়ল যেন। ধীরে ধীরে কমলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তবু তার মুখের প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু শরতের জ্যোৎস্নার মতই স্থির হয়ে রইল। সেই হাসিই শিবের ললাটের চন্দ্রকলার মতই কিশোরের মুখে স্থায়ী হয়ে বিরাজ করছে। সুধাকান্ত ছেলের দিকে তাকালেই দেখতে পান কমলার সে দিনের সেই হাসি অক্ষয় হয়ে ছেলের মুখে ফুটে উঠেছে।

দুই

নিজের বাড়ীর দাওয়ায় বসে বসে আপনার মাথার ছোট ছোট করে কাটা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আপনার অতীত-স্মৃতি-স্বপ্ন-মন্থর শান্ত দৃষ্টি নিয়ে সুধাকান্ত নানান ছোট বড় বাড়ীর ওপারে গ্রামের প্রান্তসীমার আকাশ আর গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা মাস কেটে গিয়েছে সুখস্বপ্নের মত। তাঁর কলেজে ভর্তি হতে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। বাবা বার বার পঞ্জিকার পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছেন। কিন্তু মনোমত দিন যেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। ঠিক হল তিনি বহরমপুরেই পড়বেন। বাবার মনের কথাটা সেদিনও তিনি মনে মনে বুঝতে ভুল করেন নি। বাবা এটা ঠিকই চাইতেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হোক, বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক, গ্রামের সম্মান বাড়াক। কিন্তু যেন তার চেয়েও বেশী করে চাইতেন, এই একমাত্র সন্তান—সে আবার তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে, তাঁর কাছেই থাকুক। এই দ্বিধা দ্বন্দ্বেই কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল বাবার সেই দিনগুলি। এই দ্বিধাগ্রস্থ চিন্তার ফলেই তিনি বার বার ছেলের কলেজে ভর্তি হবার দিন পিছিয়ে দিচ্ছেন। শেষে যখন স্ত্রীর মারফৎ ছেলের অভিযোগ শুনলেন যে আর দেরী করলে কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না, থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না তখন বাধ্য হয়েই যেন একটা দিন স্থির করলেন। তাঁর মায়ের সঙ্গে সেদিনের কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে। বাবাকে সোজাসুজি বলবার ক্ষমতা তখনও তার ছিল না। মায়ের কাছেই যত তর্জন-গর্জন। মাকে বলেছিলেন—মা, তোমাদের কি মতলব ভাল করে বল দেখি! আমাকে তোমরা পড়াবে, না পড়াবে না সেইটা পরিস্কার করে আমাকে বল। আমি সেই মত আমার ব্যবস্থা করব।

মা স্বভাব-শান্ত ছেলের রাগ দেখে হেসেছিলেন, বলেছিলেন—কেন? কি হল?

তাঁর রাগ আরও বেড়েই গিয়েছিল, বলেছিলেন—বেশ, তুমি এখনও জিজ্ঞাসা করছ কেন? বাবা তো কেবল পাঁজি উল্টো পাল্টা করছেন, কিন্তু

দিন আর পাচ্ছেন না তিনি। এ তো বড় আশ্চর্য কথা, গোটা বছরে একটা দিন নেই।

মা বলেছিলেন—দিন না থাকলেই বা যাবি ক'রে ? শুভ কাজ বলে কথা।

তাঁর রাগ চরমে উঠেছিল, বলেছিলেন—বেশ, তবে দিনই দেখা হোক। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি মা, বাবা এবারকার পাঁজিতে ভাল দিন একটিও পাবেন না। দিনই দেখা হোক, দিন দেখতে দেখতেই ভর্তির সময় পার হয়ে যাক। তখন একবার বহরমপুর গিয়ে ফিরে এলেই চলবে।

তাঁর কথা শুনে মা খানিকটা কপট রাগ ক'রে, খানিকটা হেসে বলেছিলেন—বেশ তো, যা না, গিয়ে তোর বাবাকে বল। আমাকে বলে কি হবে ? তারপর খানিকটা হেসে বলেছিলেন—বাপের কাছে সামান্য কথা বলবার সাহস নেই, যত লাফালাফি ছেলের আমার কাছে! কথা বলতে বলতেই তিনি বাইরের ঘরে স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সোজা প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কি ব্যাপার বল দেখি!

আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে সুধাকান্ত মা-বাবার কথা শুনছিলেন। বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কিসের কি ব্যাপার ? তোমার এত উত্তেজনা কেন ?

—আমি জ্বলে মলাম তোমার ছেলের জ্বালায়। সে তোমার কাছে এসে বলতে পারবে না। কেবল আমার কাছে লাফালাফি করছে আর বলছে—তার কি আর কলেজে ভর্তি-টর্তি হওয়া হবে না ?

আড়াল থেকে সুধাকান্ত বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মায়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখে কি মিষ্ট অথচ কি বিষণ্ণ হাসিই না ফুটে উঠেছিল! সে হাসি দেখে জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুধাকান্তের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। বাবা বলেছিলেন—ভর্তি হওয়া হবে বৈ কি! তবে কি জান—ঐ একমাত্র ছেলে, তাকে ছেড়ে দেওয়া তো সোজা কথা নয়।

তাঁর মাও আশ্চর্য হয়েছিলেন—সে কি, ছেলে পড়তে যাবে, তার জন্যে এত ভাবনা কিসের ? এই তো চার বছর সে বাইরে পড়ে এল! কৈ তখন তো তুমি এত ভাবনি। অথচ এখনই বা এত ভাবছ কেন ? আর তখন তো সুধা কত ছোট ছিল। এখন বড় হয়েছে, সব বুঝতে শিখেছে।

সেই হাসি হেসে বাবা বলেছিলেন—একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, সুধা যেমন বড় হয়েছে তেমনি আমারও তো বয়স বাড়ছে। আর কতদিনই বা বাঁচব! ছেলেকে ছেড়ে থাকতে আর ইচ্ছা হয় না।

পরমুহূর্তেই বাবা যেন সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—এই নাও, তোমার ছেলের ভর্তি হবার দিন ঠিক করেছি। পরশু দিন যাব আমরা।

জানলার আড়াল থেকে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার মনের আসল কথাটা বুঝতে আর দেরী হয়নি সুধাকান্তের। বাবার মনের আসল কথাটা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বাবার আন্তরিক অভিপ্রায় তার আর না পড়া! বাবা তো আর নিজে বলতে পারেন না যে তিনি পড়াবেন না। তাকে ছেড়ে থাকতে আর বাবার ইচ্ছা নেই। অথচ কীই বা করেন! তাঁর নিজের সেই মুহূর্তে ইচ্ছা হল এখনি ছুটে গিয়ে বাবাকে বলেন—আর বহরমপুর গিয়ে কাজ নেই। আমি আর পড়ব না।

অথচ তখন এক অজানা সোনার রঙের ভবিষ্যৎ তাঁকে অতিদূরে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে অস্পষ্টভাবে। তিনি তার সেই অমোঘ আহ্বান অস্বীকার করেন কি করে। তিনি আর বাবার কাছে গিয়ে সে কথা বলতে পারলেন না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

তার দু দিন পর বাবা তাঁকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এলেন বহরমপুর কলেজে। কিন্তু আশ্চর্য, বাবার মনে যে বেদনা তিনি সেদিন জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিলেন তা' আর দেখতে পাননি কোন দিন। তাঁরই মত খুসী হয়ে বাবা তাঁকে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। কেবল আসবার সময় সাবধান থাকতে বলে এসেছিলেন।

সেদিন কমলাকে ছেড়ে আসার চেয়েও বাবাকে ছেড়ে থাকতে অনেক বেশী কষ্ট হয়েছিল।

কলেজের প্রথম লম্বা ছুটি পড়ল পুজোর। পুজোয় বাড়ী এসে কী আনন্দেই কেটেছিল ছুটিটা। দুঃখের মধ্যে দুঃখ—কমলা বাপের বাড়ী চলে যাবে অগ্রহায়ণের প্রথমেই। কমলার যাবার দিনও ঠিক করে রেখেছেন বাবা। ওর বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসে ওকে নিয়ে যাবে।

ঠিক সেই সময়েই। কমলার যেতে বোধ হয় আর দিন দুই তিন দেরী আছে। সেদিন তখনও বেলা এক প্রহর সবে পার হয়েছে, একখানা

ছৈ-ওয়ালা নড়বড়ে গরুর গাড়ী এসে তাঁদের বাড়ীর দরজায় লাগল। সুধা ঘরের মধ্যে বসে পড়ছিল, সে খানিকটা আশ্চর্য হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভট্‌চাজ মশায়ও তখন খানিকটা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, তার উপর বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা আছেন। তা ছাড়া এ অঞ্চলে উদার অতিথিবৎসল বলে সুনাম আছে। আগন্তুক মানুষ এলে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরের সঙ্গেই নারায়ণের প্রসাদ প্রায়। কাজেই অতিথি আসা এ বাড়ীতে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তারা আসে পায়ে হেঁটে। গরুর গাড়ীতে চেপে কে অথবা কারা এল?

গাড়ী থেকে প্রথমে নামল বিদ্যুৎ রেশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে, মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা দিয়ে। তার আগে আগে নামলেন বিদ্যুতের মামা। সুধা বাবার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে আগন্তুকের পরিচয় দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ভট্‌চাজ মশায় দুই হাত জোড় ক'রে সসম্ভ্রম নমস্কার জানিয়ে বললেন—আসুন আসুন, কী ভাগ্য আমার! এস মা এস। সুধা বাবা, বৌমাকে ডেকে দাও, ওঁকে ভিতরে নিয়ে যান।

সুধা খানিকটা অবাক হয়ে গেল। যেদিন সে বিদ্যুতের মামার বাড়ী থেকে আসে সে দিন খুব সহজভাবেই বিদ্যুৎ তাকে বলেছিল—আমি তোমাদের ওখানে যাব। আজ কি বিদ্যুৎ বৌঠাকরুণ সেই প্রতিশ্রুতি পুরণ করতেই এসেছে? কিন্তু আসবার আগে কোন সংবাদ না দিয়ে এল কেন?

হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার পর বাবা আর বিদ্যুৎ-বৌঠাকরুণের মামা গল্প করছেন বসে বসে। সুধা এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। গভীর ভাবে আলোচনা চলেছে দুজনের মধ্যে। কিন্তু আসল কথাটা তখনও হয়নি। ভদ্রলোকের কথা থেকেই সুধা বুঝলে যে আসল কথাটা বলবার ভুমিকা করছেন তিনি মাত্র। তিনি বলেছেন—আমি তো অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি ভট্‌চাজ মশাই। আপনার নাম শুনেছি, আপনার কথা বহুজনের কাছে শুনেছি, আপনার ছেলে সুধাকান্ত বাবাজীকে দেখেছি, তাই ভরসা করে বিদ্যুৎকে নিয়ে এসেছি।

ভট্‌চাজ মশাই গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপারটা কি বলুন দেখি।

নিম্ন কণ্ঠেই কথা হচ্ছিল। গলা আরও নামিয়ে ভদ্রলোক বললেন—বিদ্যুৎ এই পাঁচমাস সন্তান-সম্ভবা!

সুধা এতক্ষণে সব বুঝতে পারলে। ভট্‌চাজ মশাই ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন—এতো অত্যন্ত আনন্দের কথা, সুখের কথা। আনন্দ'র সন্তান আসছে এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ আর কি হতে পারে! তাতে আপনার কি অসুবিধা হল?

ঘরের বাইরে দাড়িয়ে থেকে সুধা আর কোন কথা শুনতে পেলে না। তার মনে হল ভদ্রলোক বোধ হয় কাঁদছেন। ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থা সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে। বিবাহের পর আনন্দ বোধ হয় সর্বসমেত এক মাসের বেশী সংসার করেনি। কুটিল সংসার মুখে বক্র হাসি আর হাতে কলঙ্কের কালি নিয়ে উদ্যত হয়ে আছে, সুযোগ পেলেই উচ্চকণ্ঠে বীভৎস কর্কশ হাসি হেসে একটি অসহায় মেয়েকে, একটি পবিত্র সংসারকে সেই কলঙ্কের কালি মাখিয়ে কালো করে দেবে। সেই ভয়ঙ্করের দুর্ভাবনা নিয়েই দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে ভাগ্নীকে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এখানে কি কঠিন জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আর বলবামাত্র এক মুহূর্তে সেই সমস্ত ভয় থেকে আকস্মিক মুক্ত হয়ে ভদ্রলোক কাঁদছেন। বাবাও আশ্চর্য মানুষ, তাঁর কান্না থামালেন না, কোন সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করলেন না, তিনি বোধ হয় উঠে দাঁড়ালেন। খড়মের শব্দ থেকে সুধা সেটা বুঝতে পারলে। সে দরজার পাশ থেকে সরে গেল। বাবা পর মুহূর্তেই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। সুধার কৌতূহল হল, সেও বাবাকে অনুসরণ করলে।

বিদ্যুৎ তার শোবার ঘরে বসে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধা চমকে গেল! এ কি সেই বিদ্যুৎ-বৌঠাকরুণ! সেই জেদী, কলহ-পরায়ণ, দৃপ্ত স্বভাবের বিদ্যুৎ! তার সমস্ত মুখে চোখে, তার এলিয়ে বসবার ভঙ্গিতে কী অপরিসীম হতাশা, কী ক্লান্তি! সে যেন ভেঙে পড়েছে. তার যেন ক' বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে! তার মনে হল যেন অশোক বনে বন্দিনী নির্যাতিতা সীতা বসে আছে! কমলা তার পাশে বসে বাতাস করছে! বাবা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে উঠে প্রণাম করবার মত মনের বা দেহের বলও যেন নেই বিদ্যুতের। সে তাঁকে দেখে অসহায়ের

মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেবল। বাবা তার কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললেন—ভাল আছ তো মা? কিন্তু শরীর তো তোমার বড় খারাপ দেখছি! তোমার মামা-মামি বুঝি ভাল করে যত্ন করেন নি তোমাকে? অথচ এখন তো তোমাকে শরীরের বেশী করে যত্ন করতে হবে মা! তোমার শরীর তো শুধুমাত্র তোমার নয়, আর একজন আছে তোমার মধ্যে। তোমাকে আমি আর যেতে দেব না মা। তুমি এইখানেই থাক, আনন্দের প্রথম সন্তান আমার বাড়ীতেই ভূমিষ্ঠ হোক।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে নিলে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপরই জল ঝরতে লাগল চোখ থেকে। বাবা বললে—তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়, হাত-মুখ ধোও, কিছু খাও মা। তোমার সন্তান এখনও অভুক্ত আছে। বলতে বলতে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলন। এই সময়েই মা ঘরে ঢুকলেন কাঁশার গ্লাসে করে সরবৎ নিয়ে।

বিদ্যুৎ সেই তখন থেকেই বিদেশগত পুত্রের বধুর মত রয়ে গেল ভট্টচাজ মশায়ের বাড়ীতে। যেদিন সে প্রথম বধূ হয়ে আনন্দের সঙ্গে এই বাড়ীতে পদার্পণ করেছিল সেদিনের সদয় ব্যবহার সে ভুলে যায়নি বটে, তবে তাকে ভদ্র ব্যবহারের অতিরিক্ত বলে বিশ্বাস করেনি। তারপর যেদিন সুধা গিয়ে তার মামার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছিল সেদিন সে এই পরিবারটিকে নির্ভরযোগ্য বন্ধুবৎসল পরিবার বলেই বিশ্বাস করেছিল। এইবার সে এই বাড়ীর বধূ হয়ে গেল।

তার আসার কিছুদিন পরেই একদিন তাকে ভটচাজমশাই ডেকে বললেন –মা বিদ্যুৎ, তোমাকে একটা কথা বলছিলাম।

বিদ্যুৎ সহজভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলে। মাথায় ভাল করে ঘোমটাও দেয় না। সে বলে—জীবনে জ্ঞান হয়ে কখনও বাবা-মা কাকে বলে বুঝিনি। আজ ভগবান আমার সেই মরা বাপ-মা ফিরিয়ে দিয়েছেন এ তো আমার শ্বশুর বাড়ী নয়, আমার বাপের বাড়ী। সেই বোধ থেকেই সে সহজ ভাবে বললে—কি বাবা!

—মা এই পাশেই তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী রয়েছেন। তুমি এখানে এসেছ

এ সংবাদ তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন! তুমি একবার কমলা-বৌমার সঙ্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে এস।

বিদ্যুৎ মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে সহজ স্বরেই বললে—আমার যেতে খুব ইচ্ছা নেই বাবা। তবে আপনি যখন যেতে বলছেন তখন নিশ্চয় যাব।

ভটচাজ মশাই হাসলেন, বিদ্যুতের সঙ্গে তাঁর একটা অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুধা অবাক হয় দেখে, কমলাকে বলে—দেখ আমার মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-বৌঠাকরুণকে হিলু-বৌ বলে ভুল হয়ে যায়।

কমলা অত সহজে মানতে চায় না কিম্বা অতটাও মানতে চায় না; একান্তে মুখ বেঁকিয়ে বলে—ওকে হিলু-দিদি হতে হলে আরও সাতজন্ম ঘুরে আসতে হবে বুঝলে! তাতেও হবে না! তবে ও পালটে গিয়েছে একেবারে, কেমন ঠাণ্ডা মিষ্টি স্বভাব এসে গিয়েছে ওর মধ্যে।

সুধা বললে—তুমি ওকে একবার ওর শ্বশুর-বাড়ী নিয়ে যেও।

বিকেল বেলা বিদ্যুৎ আর কমলা বেরুচ্ছে, ভট্‌চাজ মশাই বললেন—এ খুব ভাল কাজ করলে মা।

বিদ্যুৎ খানিকটা ভয়ে খানিকটা রহস্য ক'রে ভট্‌চাজ মশাইকে বললে—কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেন, বলেন—বেরিয়ে যাও!

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভট্‌চাজ মশাই বললেন—তা হলে চলে আসবে বেরিয়ে। তাঁরা তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী। তোমার স্বামীর বাবা আর মা। তাঁদের কাছে তো তোমার অপমান নেই মা।

বিদ্যুৎ হেসে কমলার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলা তারা ফিরে এলে ভট্‌চাজ মশাই বললেন—কি মা, বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি তো তোমার শ্বাশুড়ী? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না বেরিয়ে যেতে বলেন নি বটে তবে বসতেও দেন নি। গেলাম, শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করলাম। তাঁরাও শুকনো শুকনো করে দু পাঁচটা কথা বললেন। যেমন খোঁজখবর করতে হয় করলেন, ঐ পর্য্যন্ত।

—যথেষ্ট যথেষ্ট মা, একদিনে ঐ যথেষ্ট। যে ঘর থেকে চলে এসেছ সেই ঘরে আবার নিজের সহজ প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া কি সোজা কথা? হবে, সব

হবে মা, মনে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ওপর ভালবাসা রেখো, বিনয় রেখো, তাঁরাই তোমাকে কোল পেতে ডাকবেন।

কয়েকটা মাস এমনি করেই পার হয়ে গেল। সুধা কলেজ থেকে গরমের ছুটিতে ফিরে এসে দেখলে দুই প্রসূতির কোলে দুই পুত্র সন্তান। কমলার ছেলে বিদ্যুতের ছেলের চেয়ে তিন মাসের বড়। কমলা ফিরে এসেছে বাপের বাড়ী থেকে। সে ফিরে আসার দিন বিদ্যুৎ তার সঙ্গে বিষম এক রহস্য করেছিল। যৌবনের প্রান্তে এসেও সে কথা মনে হলে আজও সুধাকান্ত হাসেন।

সে তখনও হাত মুখ ধোয়নি, বিদ্যুৎ তার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের ব্যবহারে সে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এই কিছু কালের ব্যবধানে বিদ্যুৎ যে তাদের সংসারে আরও আপনার জন হয়ে উঠেছে এ কথাটা সুধা খেয়ালই করেনি। তাই তার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত ভাবে মধুর লাগলেও অত্যন্ত নাটকীয় মনে হয়েছিল। তাদের সংসারে কোথাও কোন উচ্ছ্বাস নেই। আনন্দ আছে, প্রগল্‌ভতা নেই। সমস্ত সংসারে একটি শান্ত শালীন সংযত আনন্দ স্থির বিদ্যুতের মত অহরহ জ্যোতি-শিখার মত দীপ্তিমান। এই পরিবেশে বাবা মা হয়তো কাছেই কোথাও আছেন। সে সব কিছু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বিদ্যুৎ তার হাত ধরে তারই শোবার ঘরে তাকে আর কমলাকে ধরে নিয়ে গেল। তার নিজের চোখে সেটা একটু অশোভন লাগল। তবু উপায় কি! বিদ্যুতকে সে কোনক্রমে অসম্মান করবে কি করে? সে যে তার পরিবারে পরম সমাদরের অসহায় আশ্রিত। বাড়ীর খোঁপে খোঁপে বাস-করা গলা-ফোলানো পায়রার মত।

বিদ্যুৎ তাকে নিয়ে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে। দুটি ছেলে পাশাপাশি শোয়ানো। দুটিই স্বাস্থ্যবান, সবল সন্তান।

বিদ্যুৎ হেসে বললে—নাও ভাই, কই বেছে নাও দেখি তোমার আপনার ছেলে।

সে হাসল, দুটি ছেলের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললে—বেছে নেব কেন, দুই-ই তো আমার ছেলে। আমার বেছে নেবার দরকার নেই তো!

কমলা হেসে উঠল, বললে—কেমন, হয়েছে তো!

বিদ্যুৎ যেন হেরে গেল, তবু জেদ করে বললে—বেশ তাই হল, দুই

ছেলেই তোমার। কিন্তু আমাদের তো তা নয়। এদের কে কার পেটে হয়েছে কৈ বল দেখি? বিদ্যুতের মনে হচ্ছে সুধা পরীক্ষাটা এড়িয়ে যেতে চায়।

সুধাও বুঝলে সেটা। বিদ্যুৎ মনঃক্ষুণ্ণ হবে হয়তো। বলবে—আচ্ছা তোমার পরীক্ষাই দোব আমি। বলে ছেলে দুটির দিকে অল্পকাল তাকিয়ে থাকল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দুটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান সবল ছেলে হাত-পা ছুড়ে খেলা করছে। বড় ভাল লাগল তার। দরকার কি! কে তার ছেলে বোঝার দরকার কি! তবু সে চিনেছে বৈ কি! সে আস্তে আস্তে পরম সমাদরে একটি সন্তানকে বুকে তুলে নিলে।

বিদ্যুৎ আর কমলা দু জনেই হেসে উঠল। বিদ্যুৎ হাত তালি দিয়ে বললে—হোল না, হোল না, হলো না।

সুধা শান্ত হাসি হেসে বললে—হয়েছে। নিশ্চয় হয়েছে। এ তোমার আর আনন্দ'র ছেলে তাতে কি ভুল হয়। ওর তোমার মত ফর্সা বড় কটা চোখ। আর আমুর মত মুখখানা। আমুর মুখ কি চিনতে আমার ভুল হয়!

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ও মুখ ঘুরিয়ে নিলে। বোধ হয় ওর চোখে জল এসেছে অনুপস্থিত স্বামীকে মনে পড়ে, তারই উপর অভিমানে।

অবস্থাটা সহজ করবার জন্যে হাল্কা হাসি হেসে বললে—আর সত্যি কথা যদি বলি কিছু মনে ক'রো না বউ ঠাকরুণ। তোমার ছেলের ঐ ফর্সা রঙ একেবারে ডেকে হেঁকে বলছে—দেখ, আমি বিদ্যুতের ছেলে কি না। ওর কটা চোখ দুটো কটকট করে তাকিয়ে যেন ধমক মারছে—খবরদার ভুল করবি না—আমি বিদ্যুৎ-মায়ের ছেলে।

তার কথা শুনে চোখে জল নিয়েও তাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ খিল খিল করে হেসে উঠল, তারপর অকস্মাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুধা তার এই ছোট পরিবেশে মানুষের অনেক রকম পরিবর্তন দেখেছে। বিদ্যুতের আকস্মিক চোখের জল, আকস্মিক হাসি দেখে সে তাই আর সেদিন অবাক হল না। অথচ এই বিদ্যুৎ কি ছিল! যে দিন বিদ্যুৎ এখানে প্রথম এসেছিল বিয়ের সময়, সেদিন বিদ্যুৎ ছিল কঠিন তুষার স্তূপের মত। হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে তার কাছে গেলে সে উত্তাপ এক মুহূর্তে সে হিম করে দিত। সে কঠিন

হিমানীস্তূপ আজ যেন গলেছে। সংসারের আঘাতে, আর তার পরিবারের প্রতিদিনের সস্নেহ বিশ্বাসের স্পর্শে সেই ঠাণ্ডা কঠিন হিমানীস্তূপ গলে ধারায় ধারায়, প্রবাহ নেমে আসছে। এই প্রবাহ আবার হয়তো একদিন জমে বরফের পিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে যদি এই সংসারে কোনদিন সে অনাদর পায়। আর যদি কোন দিন আনন্দ আবার তাকে সস্নেহে আপনার হাতে তুলে নেয় তবে এই প্রবাহ সেদিন আবেগে আনন্দে উষ্ণ হয়ে প্রাণগঙ্গার বিপুল স্রোতধারায় পরিণত হবে।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুধা কমলাকে বললে—কমলা, খুব সাবধানে বিদ্যুতের সঙ্গে ব্যবহার ক'রো। যদি কোন দিন তোমাদের কারো কোন ব্যবহারে ও মনে মনে আঘাত পায় তা হলে ও বিগড়ে যাবে। দেখেছ, ও তোমাদের ভালবাসা পেয়ে কেমন হাসিখুসি হয়েছে।

কমলা বিরক্ত হল, বললে—তোমাকে আর কথা বলতে হবে না বাপু। আমরা জানি। আর কতদিন পরে কোন দেশ থেকে বাড়ী এলে, এসে যত বাজে কথা। নাও, আপনার ছেলেকে একবার কোলে নাও। কমলা বিদ্যুতের ছেলেকে শুইয়ে নিজের ছেলেকে কোলে তুলে দিলে।

সুধা পরম স্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করলে—ছেলেদের নাম কি হল?

—আমার খোকার নাম রেখেছেন বাবা নন্দকিশোর। আর ওর নাম রেখেছেন তোমার বন্ধুর নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে—মণীন্দ্রচন্দ্র।

—বেশ ভাল নাম হয়েছে। তা বাবা ওদের বেশ ভালবাসেন তো?

—ভালবাসেন মানে? পুজোয় যাবার আগে স্নানের জন্তে তেল মাখেন আর ওদের সঙ্গে খেলা করেন। বলেন—মা, এই তো জীবন্ত গোপালের পুজো করছি। খেলা করতে করতে প্রতিদিন এত দেরী করেন! আমরা স্নান করতে তাগাদা দি, শেষে মা এসে বার বার তাগাদা দিলে তবে ওঠেন।

বাবার খড়মের শব্দ উঠছে। বাবা এসেছেন বাইরে। সুধা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এসে বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাকে দেখে নিলেন। পর মুহূর্তে অতি সস্নেহ মমতায় সমস্ত মুখ মেদুর হয়ে উঠল। শান্ত সংযত কণ্ঠে আশীর্বাদ করে তার মাথায় হাত রেখে বললেন—ভাল ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে সে বাবার মুখের দিকে হাস্য-বিকশিত মুখে চেয়ে রইল যেমন করে সকাল বেলার সদ্য-ফোটা ফুল সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—জল খেয়েছ? খাওনি? জল খাও। বলে স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁকতে হাঁকতে গেলেন সদ্যপ্রত্যাগত ছেলেকে জল খেতে দেবার জন্যে বলতে। সুধা বুঝলে বাবার মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। হয়তো আর এক মুহূর্ত তার কাছে দাঁড়ালে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্নেহপ্রকাশে ছড়িয়ে যাবেন, সেই জন্যই তিনি সরে গেলেন।

জলখাবার নিয়ে এল বিদ্যুৎ। তার পিছন পিছন বাবা এসে তার কাছে দাঁড়ালেন, কথা বলতে লাগলেন বিদ্যুতের সঙ্গে। তিনি এই মুহূর্তে তার সঙ্গে কথা না বলে অন্য কোনো কথা বলে নিজেকে সহজ করে আনতে চান। তিনি বিদ্যুতকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি মা, শ্বশুরের কাছে ছেলেকে নিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলে সকালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি বললেন তাঁরা? তোমার ছেলেকে কোলে নিয়েছিলেন তো তাঁরা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার শ্বাশুড়ী ওকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর শ্বশুর এসে ওকে কোলে নিলেন। তিনি কিছুক্ষণ কোলে নিয়ে তারপর শ্বাশুড়ীর কোলে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। আমি যতক্ষণ থাকলাম আর ঘরের বাইরে এলেন না!

সব শুনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ভট্টচাজ মশাই। বললেন—মা, প্রবীণ পুরুষ মানুষ কি কাউকে দেখিয়ে কাঁদতে পারে! তোমার ছেলেকে মুখুজ্জে মশায়ের বুকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে আদর করে। তা না করে চোখের জল চাপতে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয়েছে। একেই তো কপাল বলে মা!

বিদ্যুৎ নিজে থেকেই বললে—দিন একবার করে যেতে শ্বাশুড়ী বললেন আমাকে খোকনকে নিয়ে।

—আমিও তোমাকে তাই বলব ভাবছিলাম মা। এ কত দুঃখ বল তো মা! তাঁদের নাতি আমার বাড়ীর আঙিনা আলো করে খেলা করছে!

অমনি করে আরও দুটো বছর পার হয়ে গেল। এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে সুধাকান্তের বাড়ী ফেরার দিনটা এখনও মনে আছে স্পষ্ট করে। গরুর গাড়ীটা বারান্দার সামনে দাঁড়াতেই গাড়ীর পিছন দিক দিয়ে লাফিয়ে নেমেছিলেন তিনি। আজও দেহে শক্তি আছে, কর্মক্ষমতা বেড়েছে বই কমে নি। কিন্তু প্রথম যৌবনের সে ক্ষিপ্রচারিতা আর নেই। মাথায় তখন বড় বড় চুল ছিল। মাথাটা বেশী দোলালেই লম্বা তৈলচিক্কণ চুল এসে পড়ত মুখের উপর। আজ সেদিনের কথা স্মরণ করে মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুলের উপর হাত বোলান আর আপন মনে হাসেন।

বাবা যেন ছেলের অপেক্ষাতেই বসেছিলেন সেদিন। বাবা কোন দিন তার সঙ্গে বেশী কথা বলতেন না। একটা দুটো কথাই জিজ্ঞাসা করতেন। সেবার প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন পরীক্ষা হল? শরীর ভাল আছে তো? তার পর সেই এক মুহূর্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আপাদমস্তক পরীক্ষা, তারপর মুখের সস্নেহ মমতা-মেদুরতা।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই তের বছর আগের কথা। বাবা সেদিন উঠে দাঁড়াতে পারেন নি। হাসি মুখে বসে বসেই পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার আর নড়বার উপায় নাই বাপু। একেবারে মহাদেবকে আর নন্দীভৃঙ্গিকে ধারণ করে স্থাণু কৈলাসের মত অবস্থা আমার।

সুধাও হেসেছিল তাঁর দিকে চেয়ে। বাবার কোলে মাস দুয়েকের দুলাল, আর দুই পাশে ঘাড় থেকে ঝুলছে কিশোর আর মণি। পিতামহের কোলের অংশ না পেয়ে দু জনের আবেদন আর অত্যাচার—ছোট কচি ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে হবে। এবং তাদের প্রত্যেককে কোলে নিতে হবে।

সুধার জিনিষপত্র গাড়ী থেকে নামানো হতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভট্‌চাজ মশাই হাসিমুখে বলেছিলেন, ধর তো, আমার দুলাল বাবুকে ধরতো হে! তার কোলে তারই নবজাতকে দিয়ে বলেছিলেন—বেশ ভাল ক'রো ধর। দেখো পড়ে না যায়।

বাবার সামনে কচি সন্তানকে প্রথম কোলে নিতে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সঙ্কোচ হয়েছিল সুধার। ভট্‌চাজ মশাই দুই বগলে দুই নাতিকে নিয়ে তাদের সন্তোষ বিধান করছিলেন। সেদিন বাবাকে দেখে সুধার মনে হয়েছিল বাবা এই বালখিল্য ক'টিকে নিয়ে আনন্দ-সাগরে ডুবে আছেন।

সুধা সসঙ্কোচে তাঁকে সেই মুহূর্তেই বলেছিল কিন্তু বিপরীত কথা, বলেছিল—এরা আপনাকে অত্যন্ত জ্বালাতন করছে দেখছি।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভট্টচাজ মশাই বলেছিলেন—আর ব'লো না বাপু! একেবারে ক্ষেপে গেলাম।

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে সুধা বুঝেছিল—ভটচাজ মশাই জীবনে যে সামান্য ক'টি মিথ্যা কথা বলেছেন এটি তার শির্ষস্থানীয়।

এই সময়েই তার কোলে দুলাল কেঁদে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু জনকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন—নামরে নাম। দেখি ওঁকে দেখি। তারপর সুধার দিকে ফিরে বলেছিলেন, এই দেখনা জ্বালা। উনি ওঁর মায়ের কোলে থাকবেন না। আমার কোল চাই ওঁরও। ভাগের ভাগ ছাড়বে কেন, ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা নিতে হবে বৈ কি!

তার কোল থেকে তিনি ক্রন্দনরত দুলালকে তুলে নিয়েছিলেন।

সুধা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার স্বভাব-গম্ভীর, সংযতবাক, ধীরচরিত্রের পিতা কেমন যেন লঘু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, অকারণ বেশী কথা বলেছেন, সামান্য কারণে কেমন অধীর হয়ে উঠেছেন। তবু সবটা মিলিয়ে বাবাকে সেদিন আরও সুন্দর লেগেছিল। সুধার মনে হয়েছিল—বহুদিনের পরিশ্রমে, প্রতি মুহূর্তের সজ্ঞান সাধনায় গাম্ভীর্য, ধীরতা সংযম দিয়ে যে অপূর্ব রাজবেশ রচনা করে ধারণ করেছিলেন আজ যেন কোন নবতর বেশের আশায় জীর্ণ জঞ্জালের মত তাকে তিনি পরিত্যাগ করতে উদ্যত।

সেদিনও সকাল বেলায় নাতিদের নিয়ে তিনি খেলা করছিলেন। সেই সময়েই ডেকে পাঠালেন সুধাকে। সুধা যেতেই গম্ভীর ভাবে কম্বলের পাশটায় হাত দিয়ে বললেন—বস।

তাঁর গাম্ভীর্য দেখে সুধার মনে হয়েছিল বাবা যেন অকস্মাৎ তাকে ডেকে গাম্ভীর্যের রাজবেশটা পরে নিলেন। বাবা অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকলেন। তারপর তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি।

সুধা অকস্মাৎ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। ছেলেদের নিয়ে খেলা করতে করতে এই চপল পরিবেশের মধ্যে চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে কী কথা বলবেন তাকে বাবা? সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকালে।

ভটচাজ মশায়ের কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলতে আরম্ভ করলেন—কথাটা তোমাকে আজ দু বছরের ওপর বলব বলব ভাবছি। তুমি এণ্টান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর হতেই আমার মনে হয়েছে। আমি তোমাকে সমস্ত অবস্থাটা বলে তোমাকে একটা অনুরোধ করব। সেটা রক্ষা করা না করা তোমার উপরেই নির্ভর করে।

কি ভয়ঙ্কর কথা বলবেন তাকে বাবা যার জন্য এমন ভনিতা করছেন তিনি? তার সমস্ত বুকের ভিতরটা অজানা ভয়ে গুরুগুরু করতে লাগল। ভটচাজ মশাই বললেন—আমার শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে আসছে ভিতরে ভিতরে, আমি বেশ বুঝতে পারছি। কেউ জানে না, বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। আমি ভিতরে ভিতরে বহু দিন বুঝছি। আর সংসার থেকে যে আনন্দ পাবার সে আনন্দের পাত্রও তো আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সুখের সংসার—এই দেখ এই ছেলেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে, আমার সুখ তো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে। আমার যা প্রাপ্য ঈশ্বর তো আমাকে তা পূর্ণ মাত্রায় দিয়েছেন। তাঁর কাছে তো আমার আর কিছু চাইবার নেই! আর যদি কিছু নিজে থেকে চাই তাহ'লে অপরাধ হবে। আসক্তির মাত্রা তো এইবার কমাবার দিন এসেছে আমার। এইবার সংসার থেকে আমার ছুটি চাই।

কথা বলতে বলতে বাবা একবার তার মুখের দিকে তাকালেন। কথাগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত মিষ্টতায়, বেদনায়, হতাশায় এবং বৈরাগ্যে তার বুকের ভিতরটা আকুল হয়ে উঠল, দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

ভট্টচাজ মশায় হাসলেন বিষণ্নভাবে। বললেন—কেঁদো না, চোখের জল মোছ বাবা। আমাকে সংসার থেকে ছুটি দেবার একমাত্র মালিক তুমি। সব বুঝে নাও আমার কাছে। সব বুঝে নিতেও সময় লাগবে। সম্পত্তি বুঝে নিতে হবে, সংসার বুঝে নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নানান কর্তব্য আছে, তা বুঝতে হবে। তুমি সব বুঝে নিলে তবে আমার ছুটি।

তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সংসারে বাবা থাকবেন না এই কথাটা ভাববার সঙ্গে তার কল্পিত সব ভবিষ্যৎ এক মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে এ কথাটাও মনের মধ্যে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাবাও ঠিক সেইখানে আঘাত দিলেন। আমি বুঝতে পারি তোমার জীবনে লেখাপড়া শিখে

অনেক কিছু করবার বাসনা আছে, কল্পনা আছে। কিন্তু বাবা, সংসারের ভার নিতে হলে তো তোমার সব উচ্চাশা, সব কল্পনায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। আমি তোমাকে জোর করব না, তোমাকে বলব না এ কথা—তুমি এসে সংসারের ভার নাও। তুমি নিজে যদি বোঝ তবে হাসিমুখে ভার নেবে। না হলে যেমন পড়ছ পড়, যেমন করতে ইচ্ছা হবে কর। সবই থাকবে, আমি গেলে নিজে সব বুঝে নেবে।

আবার হাসলেন তিনি। বললেন—তবে বাবা, আমরা পুরনো দিনের মানুষ। আমার ইচ্ছে হয় তুমি এসে সংসারের ভার আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে নাও, আমি সংসারের ভার তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সব আসক্তি পরিত্যাগের বাসনায় দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের আনন্দিত সংসারের দিকে তাকিয়ে থাকি আর তোমাদের হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে ভগবানের নাম করি।

বুকের ভিতর তার একটা কান্না ঠেলে উঠছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে কান্নাকে দমন করতে পারলে না সে। বাবা আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে তো কথাগুলি বলি নি বাবা! মোহগ্রস্থ হয়ে ভালবেসো না বাবা। তোমারও বেদনা বাড়বে, যাকে ভালবাসবে তাকেও সে ভালবাসা নাগপাশের মত পাকে পাকে বাঁধবে।

কান্না সামলে নিয়ে সুধা বললে—আমি আপনার কাছেই থাকব। সব বুঝে নেব আপনার কাছে।

আন্তরিকভাবেই বাবার অভিপ্রায়টা সে মেনে নিয়েছিল। তবু মেনে নিতে বুকটা ভেঙে গিয়েছিল। রাত্রিতে সে কিছু খায় নি সেদিন। সারা রাত্রি আপনার মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুয়ে ইষ্ট স্মরণ করে বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে তাঁকে বলেছিল—আমায় কাজ দিন বাবা।

ভটচাজ মশাই স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে কি খুঁজে দেখেছিলেন যেন, তারপর সহজভাবে বলেছিলেন—ঐ দেখ ঐ খানে জমাখরচের খাতা আছে, নামিয়ে নিয়ে এস।

সেই দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল তার শিক্ষা। দু বছর, আড়াই বছরের

মধ্যেই সে সব কিছু বুঝে নিয়েছিল। বাবা খুশী হয়েই সব ভার তাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম নিজে কোন কাজ করবার আগে একবার করে পরামর্শ নিত, তারপর আর তাও নিত না।

বাবা দাওয়ার উপর, কখনও বাড়ীর পিছনে খামার বাড়ীর গোবর মাটি দিয়ে পরিস্কার করে নিকানো উঠোনে কিশোর মণি আর দুলালকে নিয়ে খেলা করেন, তাদের আগলান! একবার গ্রামে সামাজিক কর্তব্য করতে প্রহর খানেক বেলায় বের হন। মন কিন্তু পড়ে থাকে বাড়ীতে এই ছেলেগুলির কাছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তেল মাখতে মাখতে আবার এক দফা তাদের সঙ্গে খেলা। তারপর দীর্ঘকাল পূজা। পূজা সেরে খাওয়া দাওয়া করে তারপর দীর্ঘ বিশ্রাম। তখন তিনজনের মধ্যে মারামারি লাগে কে তাঁর দুই পাশে শোবে। তারপর আরম্ভ হয় গল্প। রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ। চার পাঁচ ছ'বছরের শিশুরা সব বোঝেনা, তবু মনের আবেগে বলে যান তিনি। শুনতে শুনতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, তাঁরও ঘুম আসে। তারপর বিকেল বেলা আবার তাদের নিয়ে খেলা আরম্ভ হয়।

বাবার এই নূতন করে শিশুত্ব লাভ নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করে সুধা। বড় ভাল লাগে তার। আনন্দের পাত্র কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠে যে অমৃত সেই পূর্ণ-পাত্র থেকে ঝরে পড়ে তারই আস্বাদে তার চোখে মধ্যে মধ্যে জল আসে। সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের হাট ভাঙবার কথা বাবা শুনিয়েছেন তাকে সেই কথা মনে করে চোখ আবার নূতন করে ছল ছল করে ওঠে। বর্তমানেই বাবার ভবিষ্যৎ অনুপস্থিতি কল্পনা করে চোখের সামনের সব কিছু অর্থহীন শূন্য হয়ে ওঠে! আবার বাবার গলার আনন্দধ্বনিতে কি হাসিতে সে শূন্যতা ভরাট হয়ে যায়। মনে মনে সে নূতন করে জোর পায় বাবা যেদিন থাকবেন না সেদিনকার পৃথিবীকে আজকের মতই গ্রহণ করবার জন্য।

এর কিছু দিন পরই বাবার বিকালের সভায় এক নূতন সভ্যের আমদানী হল। সেদিন ভট্‌চাজ মশাই হাসতে হাসতে সুধাকে বললেন একটা কথা—জান হে সুধা! ক'দিন থেকে একটা নূতন ব্যাপার লক্ষ্য করছি।

সুধা কৌতুহলী হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সেই গম্ভীর স্বল্পভাষী মানুষটি এই ক' বছরে কত পালটে গিয়েছেন।

ভটচাজ মশাই খুব গূঢ় হাসি হেসে বললেন—আজ ক'দিন থেকেই দেখছি আমাদের মুখুজ্জে মশায় বিকেল বেলা আমাদের বাড়ীর দিকে তাকাতে তাকাতে বার কয়েক করে যাচ্ছেন আর আসছেন। ক'দিনই দেখলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কাল বিকেল বেলা ব্যাপার বুঝলাম।

বলেই তিনি আবার একটু গূঢ় হাসি হাসলেন। প্রসঙ্গটা একেবারে পরিবর্তন করে সেই হাসি হেসেই বললেন—এক কাজ কর তো সুধা। বিদ্যুৎকে একটু ডাক তো।

বিদ্যুৎ আসতেই তাকে বললেন—হ্যাঁ মা বিদ্যুৎ, তুমি কি এখন প্রতিদিন বিকেলে আর তোমার শ্বাশুড়ী-শ্বশুরের কাছে যাও না?

—যাই তো?

—মণিকে নিয়ে যাও না?

—কি করে নিয়ে যাব? আপনাকে ছেড়ে যে যেতে চায় না! আর তা ছাড়া আপনিও তো ছাড়েন না।

বিদ্যুতের কথা শুনে হাসতে লাগলেন ভটচাজ মশাই। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—অন্যায় করি মা, বড় অন্যায় করি। আর একজনের ভাগ কেড়ে নিই আমি এটা এতদিন খেয়াল করি নি মা। জান, যার ভাগ আমি কেড়ে নিচ্ছি সে আর বঞ্চিত হতে রাজী নয় মা। সে এইবার আপনার ভাগ আদায় করবার জন্যে আমার বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে সুরু করেছে। কাল কি দেখলাম জান মা? তোমার শ্বশুর তোমার ছেলেকে রাস্তার ঐ বাঁকটার গায়ে লুকিয়ে কোলে করে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। শুনতে পেলাম বলছেন—আমি রোজ বিকেল বেলা এমনি করে মিষ্টি নিয়ে আসব, তুমি আমার কোলে চড়ে খাবে তো? আজ ভদ্রলোককে ডাকব বিকেল বেলা।

বিকেল বেলা ভটচাজ মশাই যেন অপেক্ষা করেই বসেছিলেন। সুধাও ঘরের মধ্যে কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছিল। সুধা লক্ষ্য করছিল বাবার মুখে গূঢ় রহস্যের হাসি ক্ষণে ক্ষণে খেলে যাচ্ছিল। বাবার আশপাশে ঘুর ঘুরে বেড়াচ্ছে চার বছরের দুলাল। আর রাস্তায় খেলা করছে ছ' বছরের মণি আর কিশোর। মণি শুধু চঞ্চল নয় দুর্দান্ত, সব সময়ে প্রভুত্ব-প্রয়াসী। কিশোর ওর চেয়ে মাস কয়েকের বড়, তবু প্রায় সব সময়েই

ণির আজ্ঞা পালন করে হাসিমুখে। আর দুলাল ওদের চেয়ে ছোট হলে কি হবে সে ওদের দুজনের কাউকেই ভ্রূক্ষেপ করে না। সে আপনার মনে খেলা করে একা একা।

সেদিনও তাই চলছিল। ভটচাজ মশায় গত বছর কার্তিক পূজোর সময় তিনজনকে তিনটি ছোট ছোট কার্তিক তৈরী করে দিয়েছিলেন। নূতন খেলনা পাবার পর তিনজনেই মহা উৎসাহে কার্তিকের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। পিতামহের অনুকরণে অবিরাম কুমার-দেবতার পূজা চলল কিছুকাল। কিন্তু কুমার-দেবতা বেশিদিন এই অতি উৎসাহী বালখিল্য ভক্তদের ভক্তি-শ্রদ্ধার মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য সহ্য করতে না পেরে কলেবর পরিত্যাগ করলেন। প্রথমেই গেল মুণ্ড, তারপর হাত পা, সর্বশেষ ধড় সুদ্ধ পরিত্যাগ করে বাঁচলেন। ভক্তির আধিক্য সব চেয়ে বেশী মণির। শুধু ভক্তিই নয়; ক্রোধ, ক্ষোভ, ক্রন্দন, চীৎকার সবই তার বেশী। তারই হাতে দুই দেবতা দেহ ত্যাগ করে বেঁচেছেন। কিন্তু জরাজীর্ণ তৃতীয় দেহে তিনি তখনও অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর নাসিকা মুখের সঙ্গে সমতলে পরিণত হয়েছে, দুই চক্ষুর দৃষ্টি গিয়েছে, সেনাপতির হাতের আঙুল আঘাতে আঘাতে অন্তর্হিত, দেব-সেনাপতির আর আয়ুধ ধারণের শক্তি নেই। তাঁর বাহনের মাথার পালক, মুখের চঞ্চু, তাও বহুদিন গিয়েছে। তবু এই শেষ বস্তুটিই এখন মধ্যে মধ্যে তাদের মধ্যে ভক্তির আলোড়ন তোলে, দেবতা পূজিত হন, এবং শেষে ভক্তদের হাতে ভক্তির মূল্য বাবদ তাঁকে তাঁর নিজের কোন অঙ্গ দক্ষিণা দিতে হয়।

মজার কথা এই যে মণিই আগের দুটি মূর্তি ভেঙেছে, কিন্তু সে দুটি কিশোর আর দুলালের। তার নিজের মূর্তিটিই অবশিষ্ট। সেইটির মালিক যে হেতু সে নিজে সেই হেতু তারই কর্তৃত্বে পূজা চলবে। সে দুটো মূর্তি ভাঙার পর বিদ্যুৎ তার কার্তিকটি কেড়ে নিয়ে দুলালকে দিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মণির কান্না ও চীৎকার। ভটচাজ মশায় জানতে পেরে বিদ্যুৎকে তিরস্কার করে মণির জিনিষ মণির হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সেই দেবতার আবার আজ আবির্ভাব হয়েছে। পূজো হবে তাঁর। মণি ইতিমধ্যেই কিশোরকে টেনেছে আপনার দলে। দুলাল সহজে ওদের সঙ্গে খেলে না, অথবা খেলায় যোগ দিলেও কিশোরের মত মণিকে মানে না;

সেই কারণেই মণির দুলালকে দলে টানবার এবং তাকে বশ্যতা স্বীকার করাবার দিকে ঝোঁক খুব বেশী।

মণি অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে—দুলাল, ও দুলাল, আয়, কার্তিক-পূজো করব, আয়।

দুলাল কোন জবাবই দিলে না, যেমন খেলছিল ভটচাজ মশাইয়ের পাশে তেমনি খেলতে থাকল।

মণি এবার অতি মিষ্ট কণ্ঠে ডাকলে—দুলাল, ও দুলুভাইটি আয়।

দুলাল একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার আপনার খেলায় মন দিলে।

কিশোর চুপ করে মণির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে কোন কথা নেই। কেবল একটু অপ্রতিভ ধরণের মিষ্টি হাসি।

মণি এইবার রাগে ফেটে পড়ল, চীৎকার করে ডাকলে—এই দুলো শুনতে পাচ্ছিস না, ডাকছি যে কখন থেকে। আয়। না এলে মারব।

দুলাল এবার উত্তর দিলে সহজভাবে—বলছি তো যাব না।

মণি এবার রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এল—যাবি না; তোকে যেতে হবে। আয়। ও এসে দুলালের হাত চেপে ধরলে।

ভট্‌চাজ মশাই হাসলেন এতক্ষণ পরে। তিনি ছুটে এলেন, মাথা দুলিয়ে বললেন—তা তো চলবে না দাদু। মারামারি করতে কতদিন তোমাদের আমি নিষেধ করেছি।

মণি নালিশ করলে—ও যে আসছে না। ওকে আসতে বল।

ভট্‌চাজ মশাই বললেন—সে ওর খুশী। তুমি পার যদি ওকে ডেকে নিয়ে যাও।

পরাজিত হয়ে মণি শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলে। দুলালের হাত ধরে বললে—আয় ভাই দুলু। তুই পুজো করবি আজ।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চার্য ফল ফলল, দুলাল রাজী হয়ে গেল। ওদের খেলার মধ্যে পুরোহিতের পদই সব চেয়ে সম্মানের। কারণ ভট্‌চাজ মশাইয়ের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়ে ওরা খুশী হয় পুরোহিতের আসনে বসে। ভটচাজ মশাইকে প্রায়ই পুজার ঘরের দরজা থেকে ওদের আবেদন শুনতে হয়—আমাকে পুজো করতে দেবে?

রাস্তায় যেতেই আবার পুরোহিতের আসন নিয়ে ঝগড়া লেগে গেল।

মণি দুলালকে তার হাতে ধরে অনুরোধ করলে অনুনয় বিনয় করে—ভাই আমি আগে এই একটুকু পুজো করে নি, তারপর তুই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত পুজো করবি। কেমন বেশ? আমি আগে পুজো করি, এ্যাঁ?

দুলাল কোন কথা বললে না, আপনার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দাওয়ায় আপনার খেলার জায়গায় উঠে এল। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আবার আপনার খেলায় মন দিলে। ভাবটা এই যেন কিছুই হয় নি।

নিচে রাস্তা থেকে মণি রাগে চীৎকার করে উঠল—আয়, নেমে আয়, এসে পুজো কর। আমি পুজো করব না।

—না আমি যাব না। সহজভাবে উত্তর দিলে দুলাল।

আবার মণির সেই গলা-ফাটানো চীৎকার, আয়।

মুখ ফিরিয়ে আগের মতই সহজভাবে দাওয়ার উপর থেকে দুলাল কেবল বললে—না।

সঙ্গে সঙ্গে মণি যেন পাগল হয়ে গেল। কার্তিকের মূর্তিটা দুই হাতে মাথার উপর তুলে মাটিতে সজোরে আছাড় মেরে ফেলে দিলে। মূর্তিটা সঙ্গে সঙ্গে কুচি কুচি হয়ে গেল। ফেলে দিয়ে রাগে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, বললে—এই নে, হল তো, হল তো? তারপরই রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এল দুলালকে মারতে।

ভটচাজ মশাই আগেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বড় কষ্টে তার ক্রোধ শান্ত করে তাকে সান্ত্বনা দিলেন—ভাঙা কার্তিকটা ভেঙে গিয়েছে, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। আবার তোমাদের তিনজনকে তিনটে নূতন কার্তিক গড়িয়ে দেব, কেমন?

কিশোর ভটচাজ মশায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে এসে। দুলাল ক্রন্দনরত ক্ষুব্ধ মনির দিকে শান্ত ধূসর দৃষ্টি মেলে স্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের ভিতর থেকে সুধা বসে বসে সব দেখছিল। সে এইবার উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা—আনন্দও এমনি নিষ্ফল ক্রোধে একটা দামী বাতি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু দুলাল অমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি ভাবছে? সে একটু সরে গিয়ে দুলালের মাথায় সস্নেহে হাত দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি পড়ল—ভটচাজ মশায়ের

পাশ থেকে কিশোর সসঙ্কোচ দৃষ্টিতে একটু হাসি হাসি মুখে লুব্ধের মত তার স্নেহের অংশ-প্রত্যাশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

এই মুহূর্তে আবির্ভাব হল রাম মুখুজ্জে মশায়ের। তিনি যেন একান্ত নিস্পৃহের মতই তাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটা পার হয়ে যাচ্ছিলেন। এমনিই যেতে যেতে যেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নজরে পড়ল রাস্তার পাশের মানুষগুলির উপর। সুধা তাঁর এই ছলনাটুকু বেশ উপভোগ করছিল। কিন্তু মুখুজ্জের আর ছলনা চলল না। তাঁর নজর পড়ল ভটচাজ মশায়ের কোলের মধ্যে তাঁর নাতি মুখ গুঁজে রয়েছে। তিনি আপনা আপনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ভটচাজ মশায় সোৎসাহে বলে উঠলেন—এই, এইবার ঠিক লোককে পেয়েছি। ও মুখুজ্জে মশায়, এই দেখুন আপনার নাতিকে তো কিছুতেই থামাতে পারছি না মশায়। নাতি আপনার রাগ করেছে। দেখুন যদি আপনি পারেন ওর রাগ ভাঙাতে।

এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণে হতচকিত হয়ে গেলেন মুখুজ্জে। অপ্রতিভাবে একমুখ হাসি হেসে তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর উঠে এসে সোজাসুজি তিনি দাওয়ায়-পাতা কম্বলের উপর বসে পড়লেন। তারপর ডাকতে লাগলেন মনিকে—দাদু, ও দাদু, এস, এস। এই দেখ কত মিষ্টি এনেছি আজ। এস।

মিষ্টির লোভেই হোক, কিম্বা রাগটা শান্ত হওয়ার জন্যেই হোক মণি এসে তাঁর কোলের উপর বসল।

অনেকখানি সুকঠিন বন্ধুর পথ এক লাফে মুখুজ্জেকে পার করিয়ে নিয়ে গেলেন ভটচাজ মশাই। যেদিন আনন্দকে নিয়ে ভটচাজ মশায় মুখুজ্জের কাছে গিয়েছিলেন আনন্দর হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করতে; সেদিনকার সেই কঠিন তিরস্কারের পর থেকে আর মুখুজ্জে ভটচাজ মশায়ের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে সাহস করেন নি। আত্ম-গ্লানিতে মনে মনে পীড়িত হয়েছেন; তবু বোধ হয় সঙ্কোচেই ভটচাজ মশায়ের কাছে এসে মুখ ফুটে মার্জনা চাইতে পারেন নি; বলতে সাহস হয় নি—যা হয়ে গিয়েছে হয়েছে, আপনি সে সব ভুলে যান ভটচাজ মশাই। তারপর যখন চোখেরই সামনে তাঁর নাতি পরের বাড়ীর অঙ্গন আলো করে সেই বাড়ীতেই বাড়তে লাগল তখন আরও বেশী করে সঙ্কোচ হয়েছে, মনে হয়েছে—আজ গেলে ভটচাজ মশাই মনে করবেন

নিজের স্বার্থের খাতিরে আজ মুখুজ্জে ভাব জমাতে এসেছেন। তাই ভটচাজ মশাইয়ের বাড়ীর অঙ্গন তাঁর কাছে আজ পরম ইপ্সিত স্থান হলেও সে ধন্যমুখ পর্বত হয়েই ছিল তাঁর কাছে। তবু লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি, তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেছেন কাঙালের মত যদি তাকে দিনান্তে একবার দেখা যায়। বিদ্যুৎ অবশ্য প্রতিদিন বিকেল বেলা একবার করে যায়। কিন্তু ঐ ছ' বছরের দুষ্টু নিষ্ঠুর স্বার্থপরটা কিছুতেই এখানকার খেলা ফেলে, ভটচাজ মশাইকে ফেলে যেতে চায় না। আজ অপ্রত্যাশিত ডাকে তিনি যেন এক মুহূর্তে স্বর্গরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন লাভ করলেন। ভটচাজ মশাইও কত পালটে গিয়েছেন। সেই গম্ভীর মানুষটি এখন কেমন ছেলে মানুষের মত হয়ে গিয়েছেন। এই মানুষটির সঙ্গে নূতন করে আলাপ করতে বার বার তাঁর ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু পারেন নি। আজ এক মুহূর্তে তিনি সব পেয়ে গেলেন।

সুধার মনে এ দিনটির কথা চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। এর পর মুখুজ্জে যতদিন বেঁচেছিলেন, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা প্রতিদিন বিকেল বেলা এইখানে এসে বসতেন। ভটচাজ মশায়ের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলতেন, নাতিদের সঙ্গে সঙ্গে ভটচাজ মশায় খেলায় নামলে, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন। মোট কথা ভটচাজ মশায়ের প্রিয় বয়স্যের মত তিনি কাটিয়ে গিয়েছেন শেষ কালটা। তবে ভটচাজ যেমন অকুণ্ঠভাবে পরিপূর্ণভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, হাসতেন, তেমনটি পারতেন না। কোথায় যেন সংকোচের দ্বিধার বাধায় তিনি বাধাগ্রস্ত হতেন। ভটচাজ মশাইকে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদনও করতেন অকপটে। শেষের দিকে সেই দ্বিধাকে কাটাবার চেষ্টা করতেন, জোর করে ছুটোছুটি করতেন, মাত্রাতিরিক্ত উল্লাসে জোর করে চীৎকার করতেন। ছেলেদের সঙ্গে কোমর বেঁধে জোর করে খানিকটা হুটোপাটি করে জমাট খেলার সময় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে দাওয়ার উপর বসতেন। ভটচাজ মশাই বলতেন—ওকি, বসে পড়লেন কেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে মুখুজ্জে মশায় বলতেন, হাঁপিয়ে পড়েছি একেবারে।

হাসতে হাসতে ভটচাজ মশাই বলতেন—আরে মশায়, বুড়ো হয়েছেন এ কথাটা ভুলে যান কেন একেবারে? অমনি করে ছুটোছুটি করে?

ছেলেদের কেউ এসে তাগাদা দিত—বাঃ, তোমরা বসে পড়লে? জমাট খেলার সময় তোমরা খেলাটা ভেঙে দিলে?

নাতিদের জবাব না দিয়ে ভটচাজ মশাই মুখুজ্জের হাত ধরে টেনে এক এক দিন আবার নামতেন খেলতে। এক এক দিন মুখুজ্জে মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রহস্য করে বলতেন—ওরা কি বলছে শুনছেন মুখুজ্জে মশাই? ওরা জানে না এই জমজমাট খেলার আসর ছেড়ে আমাদিগকে একদিন যেতে হবে। বলে গূঢ় রহস্যের হাসি হাসতেন।

মুখুজ্জেও হাসতেন, বিষণ্ণ ক্লিষ্ট হাসি।

এই খেলার সব কিছু সুধা দেখেছে। এই লীলাকাণ্ডের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটুকুর একমাত্র দর্শক সে।

এক দিন বিকেল বেলা। সেদিন আর মুখুজ্জে এলেন না। ছেলেরা নিজেরাই খেলা করছে। ভটচাজ মশাই মুখুজ্জের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসেছিলেন। বসে বসে যখন প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখুজ্জে এলেন না তখন তিনি ছেলেদের ডাকলেন, বললেন—তোমরা সকলে অতি দুষ্ট ও অকৃতজ্ঞ বালক। আমাদের দলের যে একজন আজ নেই সে কথাটা তোমরা খেয়ালই করলে না। চল, আমরা সবাই মিলে গিয়ে আমাদের বন্ধু মুখুজ্জে মশাইকে দেখে আসি।

ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে সোৎসাহে রাজী। ভটচাজ মশাই ছেলেদের নিয়ে পড়ন্ত বেলায় গিয়ে হাজির হলেন মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় ডাকলেন—ও মুখুজ্জে মশাই, ব্যাপার কি? কোথায় আপনি?

দরজাটা খুলে গেল, দরজা খুলে দিলেন মুখুজ্জে মশাইয়ের স্ত্রী।

সদলবলে ঘরে ঢুকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার! আজ খেলতে যান নি যে? আমরা সবাই তাই দেখতে এলাম কি ব্যাপার?

মুখুজ্জে মশাই বিছানায় শুয়েছিলেন। শেষ রাত্রির ডুবন্ত চাঁদের মত ক্লিষ্ট হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল এবার। তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন ভটচাজ মশাই—উঠবেন না, উঠবেন না, শুয়ে থাকুন। ছেলেদের বললেন—তোমরা সব চুপ করে বসে থাক। মুখুজ্জে মশায়ের জর

হয়েছে। তারপর মুখুজ্জে মশাইয়ের হাতখানা আপনার হাতে তুলে নিয়ে বললেন—দেখি, একবার নাড়ীটা দেখি।

নিজের ডান হাতখানি ক্লিষ্ট হাসি হেসে ভটচাজ মশায়ের হাতে তুলে দিয়ে মুখুজ্জে বললেন—এইবার খেলার আসর থেকে আমার ছুটির দিন আসছে ভটচাজ মশাই, আমি বেশ বুঝতে পারছি।

তাঁকে একটা ধমকের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে ভটচাজ মশাই বললেন—কি যা তা বলছেন আপনি! সামান্য সর্দিপিত্তির জ্বর হয়েছে। এ দু দিনেই সেরে যাবে।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্জে বললেন—দু'দিনেই সেরে যাক, আপনি সেই আশীর্বাদ করুন। আমার সংসারে কিই বা আছে? কত কষ্ট আমার! ভাল ক'রে খেতে পাই না, ছেলে ছেড়ে চলে গেল আমারই উপর রাগ করে। তবু খেলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা নেই আমার! ঐ যে আনুর ছেলেটা, ওর সঙ্গে আমারও কিছু দিন খেলা করে যাবার সাধ ছিল। তা আর বোধ হয় হল না।—তাঁর চোখের কোল থেকে জলের দুটি ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে পড়ল।

ঘরের বাইরে আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ঘরের ভিতরটা অন্ধকারে ভরে উঠেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কেমন একটা অতি বিষণ্ণতায় সকলের আনন্দ মূর্চ্ছিত হয়ে হারিয়ে গেল। ছেলেগুলিও বোবার মত নির্বাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বিছানার-শোওয়া মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে। ভটচাজ মশাইয়ের কথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে।

মুখুজ্জে বললেন—দুটো কথা বলে যাই। আমার স্ত্রী থাকল। তাকে আনন্দর গর্ভধারিণী বলে আপনার একটু কৃপাদৃষ্টি দেবেন, যেন ভেসে না যায়। আর—বৌমা আর মণি থাকল, ওদের তো বুকে নিয়েছেনই, ওরা যেন আপনার বুকেই থাকে! আর, আর কি বলব! যদি কোন দিন আনু ফিরে আসে তাকে বলবেন আমি তাকে যা কটু কথা বলেছি সে সব যেন সে ভুলে যায়।

মানুষটি চুপ করতেই মনে হল তিনি যেন মৃত্যুর মত গভীর গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। আলো নিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। আলো আনতেই মুখুজ্জে কাঙালের মত বললেন—কই রে, মণি! মণি কৈ?

অনেকক্ষণ মণিকে আদর করে তবে তিনি নিরস্ত হলেন।—বললেন—যা, বাড়ী যা ভাই!

সেই রাত্রেই মারা গেলেন মুখুজ্জে। রাত্রিতেই সন্ধ্যার সব কথা ভট্টচাজ মশাই বলেছিলেন সুধাকে। সকাল বেলা সুধা শ্মশান থেকে ফিরলে একটু হেসে ভট্চাজ মশাই তাকে বলেছিলেন—ফিরলে বাবা! আমাদের খেলার আসর ভাঙল, এইবার আমি যাব।

সেই শ্মশান থেকে ফেরার মুহূর্তে বাবার কথাটা তার কাছে একটা প্রত্যাসন্ন সত্যের মত মনে হয়েছিল।

মনে আছে সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই পুরানো গম্ভীর সংসারী ভট্টচাজ মশায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিল সুধা। তিনি বাড়ীর উঠানে বসে সকলকে ডেকেছিলেন। বললেন—তোমরা সবাই আছ। আমি একটা কথা ভেবে ঠিক করেছি। মা বিদ্যুৎ, আমি ভেবে দেখলাম তোমার শ্বাশুড়ীর আর পৃথক ভাবে একলা থাকা উচিত হবে না। আমি বলি কি তোমার শ্বাশুড়ীকে এই বাড়ীতে নিয়ে আসি, সকলে এক সঙ্গেই থাকি। এ বিষয়ে আমি সুধার মায়ের মতও নিয়েছি। তাঁর অমত নেই।

বিদ্যুৎ বললে—আপনি যা বলবেন তাই আমাদের বেদবাক্য। তবে বাবা তাঁর এই বাড়ীতে থাকা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে আমি বলি কি—আমাদের ঐ পুরনো বাড়ীটা পড়েই আছে। আমরা সবাই ঐখানে গিয়ে থাকি। এখন অবিশ্যি আমার শ্বাশুড়ীকে ছেড়ে থাকা ভাল দেখাবে না। এখন আপনি যা বলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভটচাজ মশাই বললেন—এই সব দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা মা! কিন্তু তুমি তো এ কথা ভাববে না মা যে আমি তোমাকে পৃথক করে দিলাম?

সহজ হাসি হেসে বিদ্যুৎ বললে—এ কি বলছেন বাবা!

ভট্টচাজ মশাই বললেন—নিশ্চিন্ত হলাম মা। তবে একটা কথা। প্রতিদিন রাত্রিতে তোমার আর মণির মাছভাত খাবার নেমন্তন্ন থাকল।

সুধাকান্ত একবার আপনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়ালেন। নাঃ, আনন্দের বাড়ীটা এখান থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ক'টা দিনই বা তারা ও বাড়ীতে ছিল। কোথায় ভোজ বাজীর মত

তারা উপে গেল কে জানে! সেও কি আজ কম দিন হ'ল। অন্ততঃ সাত বছর।

মুখুজ্জে মশাইয়ের মৃত্যুর পর ভট্টচাজ মশাই আরও বছর দুইয়েক বেঁচে-ছিলেন। মুখুজ্জের মৃত্যুতে তিনি অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। অথচ মানুষটির সঙ্গে অনেক পরিণত বয়সে আলাপ। তাঁর সঙ্গে চরিত্রের, স্বভাবের মিল ছিল না, মানসিক গঠন অনেক ছিল ভিন্ন; পরিণত বয়সে একবার দুজনের মধ্যে তিক্ততাও এসেছিল প্রচণ্ড। অথচ শেষ জীবনে নন্দলীলার আসরে যখন দুজনের হৃদ্যতা হল সেই হৃদ্যতায় এই দুটি অসম মাপের মানুষ হাত ধরাধরি করে মর্তলোক থেকে স্বর্গ পর্য্যন্ত সঙ্গী হয়ে গেলেন।

মুখুজ্জে মশায়ের মৃত্যুর পর ভটচাজ মশাই আরও পালটে গেলেন যেন। এই সময়েই সুধা ছেলেদের গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দিলে। ছেলেরা বড় হয়েছে, খানিকটা করে লেখাপড়া তারা বরাবর ভট্টচাজ মশাইয়ের কাছেই করে যাচ্ছিল। একদিন সুধাই বললে তাঁকে—বাবা, ছেলেগুলোকে এইবার ইস্কুলে ভর্তি করে দি। বাড়ীতে আপনার কাছে একবার বই নিয়ে বসে, তারপর সারাটা দিন তো আর কিছুই করে না, কেবল খেলা করে হুটোপটি করে বেড়ায়।

তিনি একটু ভেবে বলেছিলেন—ভর্তি, করে দেবে ইস্কুলে? তা দাও। বড হয়েছে তো? তারপর একটু হেসে বলেছিলেন—দাও, সে ভালই হবে।

এর পর থেকেই বাবার হাসি খুশী প্রায় শেষ হয়ে গেল। তিনি বিকেল বেলা একবার ছেলেদের নিয়ে খানিকটা বেড়াতে বেরুতেন। আর একবার সকালে কিছুক্ষণ একেবারে পণ্ডিতের মত ওদের পড়াশুনার তদারক করতেন। তা ছাড়া বাকী সময়টা কাটাতেন পূজোর ঘরেই। পড়াশুনো করতেন, পূজো করতেন।

নাতিরা অনুযোগ করলে বলতেন—তোদের নিয়ে তো খেললাম অনেকদিন তোরা যতদিন ছোট ছিলি! এইবার তোরা বড় হয়েছিস। এইবার একবার শেষবার আমার ঠাকুরের সঙ্গে খেলে নি। আমার শ্যাম-কিশোর তো আর বড় হয় না তোদের মত। সে যে চিরকালের ছোট্ট ছেলেটি। আর ওর সঙ্গে শেষকালে খেলব বলেই তো তোদের সঙ্গে খেলা করে নূতন করে খেলতে শিখলাম।

নাতিরা ঠিক বুঝত না, ব্যথিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে বাক্যহীন হয়ে তাকিয়ে থাকত শুধু। সুধা বুঝত বাবা কথাগুলো ঐ শিশুদের শুনিয়ে কাকে বললেন! তাকেই বলছেন বাবা! আপনার মানস-জীবনের অতি সূক্ষ্ম অস্পষ্ট পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছেন তার স্মৃতিতে! ভক্তিতে অন্তর আকুল হয়ে উঠত।

বাবা শান্ত, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে সুধার মনে হত বাবা কি মৃত্যু-ভয়ে অমনি স্তব্ধ ভীত হয়ে পড়েছেন, রাজ গোক্ষুরের ব্যাদিত মুখের সম্মুখে অবসন্ন ভেকের মত! গভীর শঙ্কায় সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু না, দেখতে পেত পরম প্রসন্নতায় বাবার মুখ কেবল উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে হত যেন আপনার গৃহদেবতা গোবিন্দকে আপনার শেষ নৈবেদ্য উৎসর্গ করবার প্রত্যাশায় বাবা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে নির্ভয় হয়েছে। নিজের জীবনে নূতন ভরসা পেয়েছে।

এই সময়ে তার সংসারের দিনগুলি শান্তিতে, আনন্দে একখানি ছেদহীন মালতী মালার মত। সেই স্নিগ্ধ মেদুর কমনীয় গন্ধের মধ্যে যেন কোথায় একটু বিষাদের স্বাদ ছিল।

এই সময়ের মধ্যে কেবল একটা ঘটনা ঘটেছিল।

একদিন সকাল বেলায় সে নিজে দাওয়ায় বসে কাজ করছে এমন সময় একটি আগন্তুক এসে তাকে নমস্কার জানালেন। সম্রান্ত দর্শন, সম্ভ্রান্ত বেশ-ভূষার মানুষ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—এই কি রাধামাধব ভট্চাজ মশাইয়ের বাড়ী?

—হ্যাঁ।

আর আপ্যায়ন করতে হল না। তিনি নিজেই উঠে এলেন দাওয়ায়। জিজ্ঞাসার আগেই আপনার পরিচয় দিলেন। দূর দেশে বাড়ী তাঁর। ব্যবসায়ী। এখানে ব্যবসার প্রয়োজনেই এসেছিলেন এখানকার বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে। এখানকার কাজ তাঁর এখনও শেষ হয় নি। সেদিনটা থাকার প্রয়োজন আছে। নিজে ব্রাহ্মণ। খোঁজ নিতে গিয়ে অতিথি-বৎসল ভট্টচাজ মশায়ের আতিথেয়তার সংবাদ পেয়ে এখানে এসেছেন একবেলা প্রসাদ পাবার জন্য।

সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানালে সুধা ভদ্রলোককে—এ-তো অত্যন্ত আনন্দের কথা, সৌভাগ্যের কথা!

ভদ্রলোকের পোষাকে ভাষায় একটা নাগরিক পরিপাট্য, সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা সুপরিস্ফুট। তার উপর তিনি অত্যন্ত বাকপটু ও বাককুশলী।

ভদ্রলোক বললেন—ঐ দেখুন, আনন্দ বলতেই এক বন্ধুর নাম মনে পড়ে গেল। সে আপনাদের গ্রামেরই ছেলে। তারই কাছে আপনার, আপনার বাবার কথা শুনেছি।

আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়ে ছোট শিশুর মত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আনন্দকে জানেন? আনন্দ কোথায়? সে কেমন আছে?

তার কথায় বাধা দিয়ে সক্ষোভে বললেন ভদ্রলোক—আর বলবেন না মশায়! সে এক উন্মাদ মানুষ! কলকাতায় কিছুদিন কয়লার ব্যবসা করে কি খেয়াল হল সব বিক্রী করে দিয়ে কোথায় চলে গেল! অনেক খোঁজ করেছিলাম তার, কিন্তু কোথাও কোন হদিস পাইনি আর।

তারপর সারাদিন কেবল আনন্দের কথা, আনন্দের সম্বন্ধে বিবিধ জিজ্ঞাসা। ভদ্রলোক আনন্দের বাড়ী দেখলেন। আনন্দের ছেলেকে ডেকে তাকে কোলে তুলে তার হাতে একখানা মোহর গুঁজে দিলেন। কিশোর আর দুলালকেও ভদ্রলোক মোহর দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা নেয় নি। সব দেখে শুনে যাবার সময় সুধাকে বলে গেলেন—আনন্দবাবুর সাহায্যে অনেক টাকা লাভ করেছি মশাই! আর আনন্দবাবুর সম্বন্ধে এই সংবাদটা আর কাউকে বলবেন না। দুঃখ পাবে সকলে।

সুধাও তাই ভেবে রেখেছিল। যে বার বার হারিয়ে হারিয়ে স্বেচ্ছায় দূর দুরান্তরে চলে যাচ্ছে তার কথা ভেবে লাভ কি!

সন্ধ্যার সময় ভদ্রলোক চলে গেলেন।

এরই মাসখানেক পর।

ভট্চাজ মশায় ডাকলেন ছেলেকে। পুজোর ঘরেই ডাকলেন। ছেলে ঘরে ঢুকতেই প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন—বস।

তারপর তাকে আপনার কোলের কাছে টেনে আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—বাবা, এইবার মন বাঁধ। তৈরী হও। আমি তৈরী। ডাক এসেছে মনে হচ্ছে।

সে অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ কান্নায় তাঁরই কোলের উপর মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল। বাবা কিছু বললেন না, কেবল গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

বললেন—কাল রাত্রি থেকে জ্বর একটু হয়েছে বাবা। তোমাকে দুটো কথা বলি। তুমি সৎ, আমাদের বংশের যোগ্য সন্তান। তাই বেশী করে বলছি। লোভের বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোনদিন সত্যকে পরিত্যাগ করো না। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করো না। আনন্দর মা থেকে ছেলে পর্যন্ত তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। তাদের দেখ। তাদের গায়ে যেন কোনদিন আঘাত না লাগে। আর কি বলব! গোবিন্দে অচলা ভক্তি হোক্।

ছ·দিন জ্বরগ্রস্ত হয়ে বিছানায় ছিলেন বাবা। ছ-দিনের দিন জ্বর ছেড়ে গেল। সন্ধ্যার সময় বসে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ শরীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা হতেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সুধা ডাকলে—বাবা, বাবা!

ভট্‌চাজ মশায় বললেন—শিবজ্বর আসছে বাবা। আমার উপবীত আমার হাতের আঙুলে জড়িয়ে দাও।

তারপর একবার ডাকলেন—গোবিন্দ! গোবিন্দ হে!

তারপর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলেন।

আরও মাস দেড়েক পর।

সুধার শূন্য রিক্ত পৃথিবীতে আবার রঙ ধরে আসছে। কিন্তু সেই আগের সাত-রঙা রঙ নয়। সাতটা রঙের একটা ঘন রঙ যেন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল।

সেদিন সকালবেলা মুণ্ডিত মাথা নিয়ে আবার কাগজপত্র পেতে সে কাজে বসেছে এমন সময় আবার সেই ভদ্রলোকের আবির্ভাব। গোরুর গাড়ী করে সোজা তিনি এইখানেই এসেছেন। গাড়ী থেকে নেমে স্তম্ভিত হয়ে তিনি কিছুক্ষণ সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নমস্কার করে বললেন—ভটচাজ মশাই—?

সুধা মুখ তুলে বললে—হ্যাঁ। আসুন, বসুন।

ভদ্রলোক উঠে এসে বসলেন। কুশল প্রশ্ন-বিনিময়ের পর ভদ্রলোক হাত জোর করে বললেন—মার্জনা করবেন। গতবার আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করে গিয়েছিলাম। আমার দোষ নেই। কর্তার সেইরকম হুকুম ছিল।

সুধা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক একখানা চিঠি বের করে সসম্ভ্রমে তার হাতে দিলেন। চিঠিখানা আনন্দর হাতের লেখা। লিখেছে তার বাবাকে।

সুধা চিঠিখানা খুললে :

শ্রীচরণেষু,

আমার প্রণাম লইবেন, মাতা ঠাকুরাণীকে দিবেন। সুধাকে ভালবাসা দিবেন।

আমার লোক দ্বারা আপনার অগোচরে সব কিছুর ও সকলের সংবাদ লইয়াছি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনি আমার পিতার জন্য যাহা করিয়াছেন, আমার মাতা, স্ত্রী ও পুত্রকে যেভাবে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আন্তরিক কৃতজ্ঞ আছি।

আমি বর্তমানে ঝরিয়ায় সামান্য কয়লার ব্যবসা করিতেছি। নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের মত অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেছি। আমার অনুরোধ আমার স্ত্রী ও পুত্রকে আমার ম্যানেজারের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলে বিশেষ সুখী হইব। আমার মাতা ঠাকুরাণী যদি আসিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি না আসিতে চাহিলে তিনি সেখানেই থাকিবেন। তাঁহার জন্য মাসে মাসে আপনার নামে এখান হইতে টাকা পাঠাইয়া দিব। অধিক কি। ইতি

বিনীত

শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিঠিখানা পড়ে এক মুহূর্তে তার সমস্ত অন্তর তিক্ত হয়ে উঠল। বিনীত আনন্দচন্দ্র! কিন্তু কি ঘোর অবিনয়, আত্মম্ভরিতা, অকৃতজ্ঞতা আর দম্ভ সমস্ত চিঠিখানায় ফুটে উঠেছে! কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। শুধু হেসে বললে—আনন্দ অনেক পয়সা করেছে, নয়? চিঠি থেকে তাই মনে হচ্ছে আমার।

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে প্রথমে নিজের বাড়ী তারপর

বিদ্যুতের কাছে গেল। চিঠিখানা পড়ে তার বার বার মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এরা চলে যায় ততই ভাল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার শেষ কথা মনে পড়ল।

তারপর অনেক আলোচনা, অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হল সকলের যাওয়া। সুধা একা ছেড়ে দিতে আপত্তি করেছিল। বলেছিল—আমিও সঙ্গে যাই। একটি বৃদ্ধা, একটি যুবতী আর একটি শিশুকে একা ছেড়ে দেব কি করে!

ম্যানেজার ভদ্রলোকের সুধাকে নিয়ে যেতে যেন ঘোর আপত্তি। তিনি বিদ্যুৎকে বলেছিলেন—মা, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। বাবুর এই কত চিঠি কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে দেখুন।

সুধা আর কথা বাড়ায় নি।

পরদিন সেই ম্যানেজার ভদ্রলোকের সঙ্গে আনন্দর মা, বিদ্যুৎ আর মণি চলে গেল। আর কোন সংবাদ নেই তাদের!

আপনার মাথার খাটো করে কাটা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সুধাকান্ত ভাবছিলেন বিগত ষোলো বৎসরের কথা, আর সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ছেলেদের জন্য। ছেলেরা আজ সদর সহরের স্কুল থেকে ছুটিতে আসবে. গোরুর গাড়ী গিয়েছে জংশনে।

আসার সময় হয়ে এসেছে। তিনি রাস্তায় নামলেন। আসছে, ঐ আসছে! ঐ যে ওরা দু ভাই রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত চঞ্চল পদে আসছে।

পনের আর তের বছরের দুই কিশোর। পরিচ্ছন্ন, সংযত, শান্ত। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মুখে অল্প অল্প অপ্রতিভ হাসি, টানাটানা চোখে সুন্দর স্নিগ্ধ দৃষ্টি কিশোর, আর গম্ভীর মুখ, বড় বড় ধূসর চোখে গম্ভীর মেদুর দৃষ্টি দুলাল।

তারা এসে প্রণাম করতেই তিনি তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অকস্মাৎ আপনার বাবাকে মনে পড়ে গেল। তিনি নিজে যখন ছুটিতে আসতেন তখন ভট্‌চাজ মশায়ও এমনি করে অপেক্ষা করতেন তাঁর জন্যে দ্বিগুণ মমতায় তিনি দুই ছেলেকে আরও জোরে বুকে চেপে ধরলেন।

দুই

সুধাকান্ত আবার একবার ছেলেদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন। ওদের দুজনের মুখেই কেমন একটা নূতন রঙের ছোপ লেগেছে বলে তাঁর মনে হল। সেটা কেবলমাত্র শারীরিক পরিবর্তনই নয়। এখন অবশ্য ওদের দণ্ডে দণ্ডে লাফে লাফে বাড়বার সময়। ওরা বাইরে থাকে। অনেক দিন পরে পরে দেখেন, কাজেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দৈহিক উন্নতি ওঁর চোখ এড়ায় না। কিন্তু এ যেন একটা নূতন কিছু। গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়বার সময় যে চেহারা ওদের ছিল তারই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর মনে হল ওদের মনে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের ও মনের সচেতন কর্ষণের ফলে এক নূতন বোধের দীপ্তিতে মুখে একটা বিচিত্র উজ্জ্বলতা এসেছে। ওদের মনটাই যেন কাচের ভিতর দিয়ে আলোর মত ওদের মুখে ফুটে উঠেছে। শুধু মুখে নয়, সেই পরিচ্ছন্নতা যেন ওদের হাসি, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুতেই তার ছাপ দিয়েছে। দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল।

তিনি সস্নেহে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এইখানে এখন আর আমার কাছে বসো না। বাড়ীর ভেতর যাও। তোমাদের মায়ের সঙ্গে, ঠাকুমায়ের সঙ্গে দেখা কর।

কিশোর আর দুলাল বোধ হয় মনে মনে তারই জন্যে চঞ্চল হয়ে ছিল। বলামাত্র বাড়ীর ভিতরের দিকে পা বাড়ালে।

সুধাকান্ত ডাকলেন—ওরে একটু দাঁড়া। আসল কথাটা বলে গেলি না। তোদের বাৎসরিক পরীক্ষায় কেমন ফল হল আমাকে বলে গেলি না? না বলেই মায়ের কাছে ঠাকুরমায়ের কাছে ছুটে চল্লি।

কিশোরের মুখের অপ্রতিভ হাসিটি আরও প্রকট হয়ে উঠল, সে যেন একান্ত অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুলালও দাঁড়াল, একবার গভীর ভাবে আপনার বড় বড় চোখের শান্ত দৃষ্টি বাবার মুখের উপর রাখলে। সেই কথা বললে—একটু সামান্য হেসে বললে, দাদা এবারও ফার্স্ট হয়েছে।

মুখচোরা কিশোর অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বললে—তোমার কথাটা বল। দুলুও ওর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বাবা। তাই নয় শুধু। ও যা নম্বর পেয়েছে, আমাদের স্কুলে ওদের ক্লাসে এমন নম্বর এর আগে আর কেউ পায় নি। আমাদের বাংলার মাস্টার মশাই ওর খাতা সমস্ত মাস্টার মশাইদের দেখিয়েছেন। আমাদের হেড মাস্টার মশাই দুলুর বাংলা রচনা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত সব ক্লাসে পড়ে শুনিয়েছেন। নিজে ওকে ডেকে খুব প্রশংসা করেছেন।

দুলাল গম্ভীর ভাবে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কথা বলবার সময়। হাসলও না খুশী হয়ে, প্রশংসায় সঙ্কুচিতও হলনা। সহজ ভাবে সমস্তটাকে নিলে সে।

সুধাকান্তের একটু আশ্চর্য লাগল। তবে তাঁর এই ছোট ছেলে বরাবরই এমনি একটু অদ্ভুত। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। তবে এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ওদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দেখে তাঁর মন ভরে গেল। আহা, ওরা পরস্পরকে যেন বরাবর এমনি করে ভালবাসতে পারে। আরও ভাল লাগল ওদের পরিমিতি বোধ। নিজের প্রশংসা করা যে বিসদৃশ ব্যাপার সেটা যেন ওরা বুঝেছে! মহাভারতে আত্মপ্রশংসাকে তো আত্মহত্যার সমানই বলেছেন ভগবান।

ঘর আলো-করা ছেলে ওরা। সুধাকান্তের আর কিছু চাই না। অর্থ চাই না, শুধু ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বেঁচে থাকুক। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাঁর, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা সকালে কিছু খেয়েছ?

কিশোর বললে—না খাইনি। তবে খাব, এখুনি খাব।

—দেখ দেখি ছেলের কাজ! চল ভেতরে চল। সুধাকান্ত ছেলেদের নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

—কিন্তু আপনার সব কাগজপত্র যে বাইরের ঘরে ছড়ানো থাকল বাবা! আমি তুলে আসি। বলে হুকুমের অপেক্ষা না করে দুলাল কাগজগুলি তুলতে লাগল। অগত্যা দাঁড়িয়ে গেলেন সকলে। তার কাগজ তোলা হলে তবে সকলে বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন।

ভিতরের দরজার মুখেই ওদের মা আর ঠাকুমা দুজনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন তাঁদের দুজনকে দেখেই দুই ভাইয়ের মুখ

খুশীতে যেন জলে উঠল। তিনি বেশ লক্ষ্য করলেন কিশোরের মুখে অকস্মাৎ হাসি যেন বিদ্যুত-চমকের মত ফুটে উঠল, আর দুলালের গম্ভীর মুখখানি ধীরে ধীরে ফুল ফোটার মত খুশীতে স্তরে স্তরে বিকশিত হল। ওরা প্রণাম সারতেই তার মা দুলালকে একেবারে বুকে টেনে নিলেন—ওরে আমার দুলাল এসেছে রে! হ্যাঁরে পরীক্ষায় সব চেয়ে ভাল করতে পেরেছিস নিশ্চয়।

সুধাকান্ত কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তিনি আশ্বস্তও হলেন কিছুটা—যাক দুলালের হাসবার অন্ততঃ একটা মানুষ আছে, একটা জায়গা আছে।

তিনি আনন্দ-মন্থর মনে আবার বাইরে এসে আপনার কাগজপত্র নিয়ে বসলেন।

কিন্তু কাজে আর মন বসল না।

আজ সারা সকাল কেবল ভেবেছেন তিনি বিগত কালের কথা। সমস্ত মনটা শীতের দিনের নদীর মত শীর্ণ উদাস আনমনা হয়ে উঠেছিল। প্রত্যাশা করছিলেন মনে মনে আনন্দের বর্ষণের। ছেলেরা আসবে, ছেলেরা বৎসরান্তের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ফিরবে এই আনন্দিত প্রত্যাশাটা এই উদাস-করা অতীত স্মৃতি-মন্থনের পশ্চাতেই ছিল। সেই আনন্দ হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়াতেই মনে যেন বর্ষার ঢল নামল। মনের দু কূল ছাপিয়ে বয়ে গেল আনন্দ-স্রোত।

সেই আনন্দকে সংযত করতে আবার কাজে বসেছেন। কিন্তু কাজে মন বসছে না। নানান আনন্দ-উদ্বেল ভাবনা আসছে কেবল ঘুরে ঘুরে।

এই বৃহৎ গ্রাম। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে আজ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করেছেন তাঁদের বংশ। তিনি ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষের সংবাদ জানেন। তাঁরা সকলেই শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যা দান করতেন তাঁরা বহু বিদেশাগত ছাত্রকে; বিদ্যা বিক্রয় করার প্রথা তাঁদের বংশে ছিল না। তাঁদের বংশে একাধিক দিগ্বিজয়ী স্মৃতি ও ন্যায়ের পণ্ডিত জন্মেছেন। তামার পাতের দু তিনখানা জয়পত্র এখনও সেই পুরানো আমলের কাঠের সিন্দুকের মধ্যে অজস্র মহামূল্যবান পুঁথির সঙ্গে শায়িত আছে। দ্বাদশ পুরুষ এই গোবিন্দ বিগ্রহের সেবা করে আসছেন। তিনি বাবার কাছে

সংসার দেখতে আরম্ভ করে অনেক কথা শুনেছেন। বাবার সঙ্গে একটা বিচিত্র সখ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর। শেষ জীবনে বাবাই তাঁকে বলতেন প্রাচীন কালের কথা, নিজের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের কথা।

শাস্ত্রাধ্যায়ী ছিলেন সকলেই। জ্ঞানে বা বিদ্যায় হয়তো সকলের সমান খ্যাতি ছিল না; কিন্তু সকলেই আপন আপন কালে পিতৃ-পিতামহের শিক্ষা ও দীক্ষার অচঞ্চল আলোকবর্তিকাটি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে, অগাধ প্রেমের সঙ্গে নিজের পুত্র-পৌত্রের জন্যে ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিত্তহীন অথচ নির্লোভ, দরিদ্র অথচ বিদ্যাদাতা, সম্পদ-ত্যাগী অথচ সমাজপতি। মেজাজে অবশ্য বিশেষ ইতর-বিশেষ ছিল। কেউ ছিলেন অতি কঠোরভাষী, দাম্ভিক এবং রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন; আবার কেউ ছিলেন অতি সদালাপী, মিষ্টভাষী, আনন্দময় পুরুষ।

তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ বংশের ধারাধরনে ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনেন। তাঁর অতি বৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন অতি সদানন্দ, আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ। তাঁর টোলে কম পক্ষে গুটি তিরিশেক ছাত্র অধ্যয়ন করত। তাঁরই গৃহে কোন কিছুর বিনা বিনিময়ে সকলেই গোবিন্দের প্রসাদ পেত। অথচ গৃহকর্তা পণ্ডিত মশায়ের সাত বিঘে মাত্র ব্রহ্মত্র জমি ছিল। সারা বছর সেই জমির ধানে আর গ্রামের সমস্ত সমাজ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল মানুষের নির্দিষ্ট মত দানে টোল চলত। তাতেও টানাটানি পড়ত বর্ষার সময়। তখন পণ্ডিত-গৃহিনী আপনার হাতের রূপোর খাড়ু, গলার রূপোর মুড়কি-মালা বাঁধা দিয়ে চাল আর পোস্ত সংগ্রহ করতেন। পাকা কাঁটালের বীচিগুলি গ্রীষ্মের ও প্রথম বর্ষার সময় পণ্ডিত-গৃহিনী পরম যত্নে সংগ্রহ করে রাখতেন এই টানাটানির কালের জন্য। আর সংগ্রহ করে রাখতেন সারা বছরের জন্ত কড়াইয়ের ডাল। ভাত, কড়াইয়ের ডাল আর কাঁটালের বীচি দিয়ে পোস্ত এই খেয়ে সেই টানাটানির কালটা অতিবাহিত হত। তারপর শরৎকাল এলে, রাস্তাঘাট শুকোলে পণ্ডিত মশায় বের হতেন পার্বনী আদায়ে। দেশ দেশান্তরের রাজা-জমিদারের দপ্তরে বার্ষিক পার্বনী স্থির করা ছিল। মাস কয়েক সেই সমস্ত আদায় সেরে ফিরলে সংসারের অবস্থা আবার পালটাত।

এত সত্ত্বেও তিনি সাংসারিক দুশ্চিন্তায় মধ্যে মধ্যে পীড়িত হতেন। একদা পণ্ডিত মশায় দুক্রোশ-দূরস্থ গঙ্গা থেকে প্রত্যহ যেমন স্নান করে আসেন

তেমনি আসছেন। ভিজে কাপড়, মাথায় ভিজে গামছা, এক হাতে ঘটি, অন্য হাতে উপবীত ধরে জপ করতে করতে আসছেন, এমন সময় গ্রামের মুদীর দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় মুদী এসে সামনে প্রণাম করে বললে—ভটচাজ মশায়, প্রাতঃপ্রণাম।

ভট্টচাজ মশাইয়ের তখন উত্তর দেবার উপায় ছিল না, দু হাত বদ্ধ; অপেক্ষা করবারও উপায় ছিল না, বাড়ী গিয়ে গোবিন্দের পূজা করতে হবে। ভট্টচাজ মশায় উত্তর না দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন তখন মুদী আবার তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করে বললে—ভটচাজ মশাই, প্রাতঃপ্রণাম।

ভটচাজ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। সেই সদানন্দ পুরুষ জপ ত্যাগ করে একবার ভ্রূকুটি করে মুদীর দিকে তাকালেন। তার পরক্ষণেই প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন—একটু অপেক্ষা কর বাবা। আমি আসছি।

তাঁর আর বাড়ী ফেরা হল না। তিনি সেইখান থেকেই ফিরলেন। দেড় ক্রোশ হেঁটে সেই কাপড়েই গিয়ে উঠলেন ধনী শিষ্য বাড়ীতে। বাড়ীর সকলে গুরুকে এই অবস্থায় দেখে তো অবাক। সকলে ছুটে এল।

ভটচাজ মশায় বললেন—বাবা, আমাকে ঋণ থেকে মুক্ত কর। মুদী আমার কাছে বোধ হয় টাকা পনের পাবে। সেই ঋণটা শোধ করে দিয়ে এস।

—সে ব্যবস্থা এখনি করছি। আপনি বিশ্রাম করুন, কাপড় ছাড়ুন, সেবা করুন।

—না বাবা আগে ঋণ শোধের ব্যবস্থা কর। তারপর।

—লোক পাঠিয়ে দিলাম টাকা নিয়ে।

—আচ্ছা আমি গোবিন্দের পূজা করে আসি। এসে এইখানে আহার করব।

আবার সেই দেড় ক্রোশ পথ। তারপর গোবিন্দের পূজা সেরে আবার সেই পথ অতিক্রম করে গিয়ে নিজে রান্না করে খেয়ে শিষ্যদের খাইয়েছিলেন।

এইসব দেখে তাঁর ছেলে, সুধাকান্তের বৃদ্ধ পিতামহ সংসারের ব্যবস্থায় ঘোর পরিবর্তন আনলেন। টোল তাঁর ছিল, ছাত্রের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু ছাত্রদের অধ্যাপনা করার চেয়ে বিষয় সম্পত্তির দিকেই তিনি ঝুঁকে পড়লেন। পনর বৎসর একাদিক্রমে পরিশ্রম করে তিনি একশো বিঘার উপর

জমি করলেন। তারপর আবার ছাত্র অধ্যাপনায় মন দিলেন। কিন্তু ছাত্র অধ্যাপনায় যতখানি সময় লাগত তারচেয়ে বেশী সময় যেত এই বৃহৎ সম্পত্তির তদারকে। তবে নগদ টাকা তিনি একটিও সংগ্রহ করেন নি। বলতেন—ও মহা পাপ।

একবার একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী তাকে রহস্য করে প্রশ্ন করেছিলেন—ভট্চাজ মশাই, কত টাকা সঞ্চয় করলেন?

তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূঢ়ভাষী মানুষ। তবু সে সময় বোধহয় তাঁর মেজাজ খুব ভাল ছিল, সহজ প্রসন্ন মনে জবাব দিয়েছিলেন—না বাবা, টাকার বড় গরম, বড় দাহ। আমরা মাটির দাওয়ায় শুই, কড়াইয়ের ডাল খাই। ও গরম আমাদের সহ্য হবে না তাই করি নি।

প্রতিবেশী ভদ্রলোক আরও খানিকটা সাহস করে বলেছিলেন—তা হলে এই যে একশো বিঘের ওপর জমি, এ করলেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি ভ্রুকুটি করে বলেছিলেন—কেন করলাম? তোমাদের জন্যে করতে হল।

প্রতিবেশী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—আমাদের জন্যে?

বার বার ঘাড় নেড়ে তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁগো, তোমাদের জন্যে। সব বুঝে এখন ন্যাকা সাজছ কেন? তোমার টোলকে যে বাৎসরিক দেয় আছে সেটা দিয়েছ? দাওনি। তাই তোমাদের মত অবিবেচক মানুষের বিবেচনার ওপর যাতে নির্ভর করতে না হয়, সেই জন্যে জমি করলাম। যাতে এই তোমাদের মত পুরোহিত ব্রাহ্মণ কি পাচক ব্রাহ্মণে আমার বংশকে পরিণত না হতে হয় সেইজন্যে করলাম! এখন বুঝলে?

মধ্যে মধ্যে যখন সংসার, আর্থিক প্রয়োজন, সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন তখন সুধাকান্তের মনে হয় বৃদ্ধ পিতামহ অতি সঙ্গত এবং অতি দূরদর্শিতার কাজ করেছিলেন। তা না হলে এই ইংরাজী লেখাপড়ার আমলে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন বহুবিধ সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে জ্ঞান ও চরিত্রগত কৌলিন্য ধীরে ধীরে ধনগত কৌলিন্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন তাঁর বংশ আজ তো আর পূর্ব প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত না। আজ তো সত্য সত্যই তাঁর ঐ দুই পরম সুন্দর সন্তানকে বংশগত কৌলিন্য পালন করতে শুধু মাত্র হয় পৌরোহিত্য না হয় পাচক ব্রাহ্মণেই পরিণত হতে

হত! তাঁর ধনগত প্রতিষ্ঠা আছে বলেই না ঐ কিশোর ছটিকে তিনি এই শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারছেন!

কিন্তু ঈশ্বর যেন তাঁর সন্তানদের সম্পদের মোহ থেকে, অহমিকা থেকে রক্ষা করেন। অবশ্য তাঁর এমন সম্পদ নেই, যা থেকে তাদের মনে মোহ বা অহমিকা সঞ্চারিত হতে পারে! আর এ অবশ্য তাঁর অনাবশ্যক ও অকারণ ভয় এ তিনি বোঝেন। তাঁর বংশে তিনি নিজের পিতার মধ্যে এ মোহ লক্ষ্য করেন নি, নিজের মধ্যেও তাঁর এ মোহ নেই, তা হলে তাঁর সন্তানদের মধ্যেই বা এ মোহ, এ ভ্রান্তি আসবে কেন?

তবে আসাও কিছু অসম্ভব নয়। কারণ কাল যে ভাবে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তাতে ধীরে ধীরে সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়ছে সম্পদের উপর। আর সেই কারণেই পার্থিব সম্পদহীন বা অর্থহীন হলেই মানুষ নিজেকে দরিদ্র ও হতমান বলে ভাবতে শিখছে। অন্যদিকে কিছু অর্থ উপার্জন করলেই মানুষ নিজেকে পরম শক্তিশালী মনে ক'রে মনে মনে অহঙ্কৃত হয়ে উঠছে। আনন্দের শেষ চিঠিখানা মনে পড়ল তার। কি শুষ্ক হৃদয়, কি অকৃতজ্ঞতা, কি দম্ভ সেই সামান্য ছোট চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট।

ভগবান যেন তাঁর সন্তানদের প্রচুর অর্থ উপার্জনের দুর্ভাগ্য না দেন। যা আছে তাঁর তাই নিয়েই তারা যেন সন্তুষ্ট থাকে। সেই ভাবে সন্তুষ্ট থেকে যেন বংশগত প্রতিষ্ঠার দিকে তারা মন দেয়। অনেক লেখাপড়া শিখে, অনেক অর্থ অর্জন করে, অনেক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি লাভ ক'রে জীবনের মূল প্রয়োজন মিটবে কি? অন্তরের প্রশান্তি আর আনন্দের জন্য যে তপস্যা তার পথ তো পৃথক! সেই আনন্দ আর প্রশান্তি লাভ করতে হলে সেই সুপ্রচুর অর্থ আর প্রতিষ্ঠার আকাশস্পর্শী অহমিকাই সে লাভের পথে পাহাড়ের মত দাঁড়াবে। ভগবান যেন তাঁর সন্তানদের সে পথে চালিত না করেন। তাঁদের এই বংশগত শিক্ষা ও দীক্ষায় ছেলেদের এবার দীক্ষিত করবার সময় এসেছে।

ছেলেরা আসার পর থেকেই সুধাকান্ত আর কাজে মন দিতে পারছেন না। কাগজ পত্র নিয়ে বসলেই মনোযোগ আর সেখানে আবদ্ধ থাকে না, কেবল ছেলেদের দিকে ছুটে যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় ওদের দু জনকে ডেকে এমনি কিছুক্ষণ গল্প করেন। কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নেই। ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে সেভাবে মিশতে অভ্যস্ত নয়।

ক' দিন থেকেই তাঁর নিজের বংশের কথা, ছেলেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নানান চিন্তা আর ভাবনা তাঁর মাথায় ঘুরছে। তিনি প্রায় স্থির সংকল্প করেই ডাকবার জন্যে উঠলেন। কিছু পরিচয় অবশ্য ওদের আছে। বাবার শেষ বয়সে ওরা বাবাকে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ভাবে পেয়েছিল। সেই সময় বাবা প্রাতঃস্মরণীয় দেবতা ও পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষের নাম তাদের কণ্ঠস্থ করিয়েছিলেন। আজ তাদের নিজের বংশের বিগত পুরুষদের আরও ঘনিষ্ট পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে তিনি উঠলেন।

ওরা দু জন বড় হবার পর থেকে কমলা ওদের একখানা ঘর আলাদা করে দিয়েছিলেন। ঘরের দু পাশে দু খানা চৌকী, মাঝখানে একটি আলমারী, ওদের বইয়ে ভর্তি।

সুধাকান্ত একেবারে কোন সাড়া না দিয়ে ওদের ডাকবার জন্যে ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন একখানা চৌকীতে দুই ভাইয়ে একেবারে পিছন ফিরে বসে একমনে কি করছে। মাঝে মাঝে নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে কি কথা বলছে। তিনি বুঝলেন দুই ভাই একযোগে কিছু পড়ছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছে। আলোচনা শেষ করে আবার পড়ছে।

তিনি অত্যন্ত অবাক হলেন। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ দুইভাইয়ে মিলে একযোগে কি পডছে তারা! তিনি সন্তর্পিত পদক্ষেপে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওরা পড়েই চলেছে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। দুলাল পড়ছে, কিশোর শুনছে। সুধাকান্ত এবার ওদের ঘাড়ের ওপর খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দু ভাইয়ে মিলে পড়ছে একখানা পুঁথি! পাশে আরও ক'খানা পুঁথি রাখা।

তিনি এইবার ওদের ধ্যান ভঙ্গ করলেন; বললেন—কি পড়ছ?

তাঁর ডাক শুনে দু জনেই চমকে উঠল। ওঁর দিকে তাকাল দু জনেই। অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়েছে! খানিকটা ভয়ও পেয়েছে যেন।

তিনি ধীরে ধীরে পুঁথিখানা তুলে নিলেন। "মৃগী দ্যুৎমান কথা" নামঃ কাব্যঃ। রচয়িতা—শ্রীবিষ্ণুরথ শাস্ত্রী বাচষ্পতি! তাঁর উর্ধতন নবম পুরুষ। তিনি কবি ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এই পড়ছে দু জনে? কিন্তু

পড়ে কি বুঝতে পারছে? কিন্তু না-ই যদি বুঝবে তবে অমন মনোযোগ দিয়ে গোপনে দু ভাইয়ে পড়বে কেন?

তিনি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এ গুলো কোথায় পেলে তোমরা?

কিশোর মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল, দুলাল কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—ওঘরের বড় সিন্ধুক থেকে।

—কে বের করলে এগুলো?

কিশোর চুপ করেই থাকল। দুলাল বললে—আমি বের করেছি।

এবার কণ্ঠস্বর নরম করে আনলেন সুধাকান্ত, বললেন—আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না বের করার আগে?

এবার দুলাল চুপ করে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে পড়েছ তোমরা দু জনে "মৃগী দুষ্যৎমান কথা", এ বুঝতে পারছ তোমরা? এইবার দুই ভাইয়ের মুখেই হাসি ফুটে উঠল, তারা প্রশ্নটা শুনেই প্রথমে পরস্পর মুখের দিকে তাকালে পরম কৌতুকে। সুধাকান্ত এই সুকৌতুক হাসিটুকুতে মনে মনে বড় আনন্দ উপভোগ করলেন। তাঁরও মুখে হাসি ফুটে উঠল।

দুলাল আবার একটু হেসে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বেশ। ও তো বেশ সোজা। এই যে এই ক'খানা আছে। এগুলোও পড়েছি। এর মধ্যে কেবল এই ধ্রুব-প্রসঙ্গ খানা বেশ কঠিন। বড় বড় সমাস আর সন্ধিতে ভর্তি।

তিনি বিস্মিত হয়ে পুঁথিগুলো তুলে নিলেন। এইগুলো সব ওরা পড়েছে দু জনে? তিনি পুঁথিগুলো উল্টে পালটে দেখলেন। "মৃগী দুষ্যৎমান-কথা" "ধ্রুব- প্রসঙ্গ" "নারদ-মহিমা নাটকম্", "দেব-স্তোত্রম্" "শৃঙ্গারাষ্টকম্"।

তিনি অকপট বিস্ময়ে বললেন—তোরা এগুলো সব পড়েছিস?

মাথা নেড়ে দু জনেই বললে—হ্যাঁ!

তিনি ঠিক বিশ্বাস করলেন না, যে পুঁথিখানা তারা পড়ছিল সেখানা তুলে নিয়ে একটা শ্লোক তিনি নিজে পড়ে নিলেন। তারপর দুলালের হাতে দিয়ে বললেন—এই শ্লোকটা অন্বয় করে অর্থ বল।

দুলাল একবার জোরে শ্লোকটা পড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্বয় করে অর্থ বলে গেল—"অতঃপর মৃগী অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণরত রাজার দিকে একবার করুণ নয়নে

তাকিয়ে গাঢ় মেঘের মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ যেমন একবার প্রকাশ পেয়ে মিলিয়ে যায় তেমনিভাবে বনের ঘন সবুজ পত্রান্তরালের মধ্যে এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল।"

রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন সুধাকান্ত। তিনি পুঁথির পাতা ওলটাতে লাগলেন। প্রতি সর্গের প্রথম শ্লোকটিতে কবি সেই সর্গে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন কৌশলে সেই ছন্দ ব্যাখ্যা করেছেন। সুধাকান্ত আবার দুলালকেই সেই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করতে দিলেন। দুলালকে চিন্তা করতে হল না। সেও কৌশলটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। বললে—এ সর্গটি কবি মালিনী ছন্দে লিখেছেন। সেই মালিনী কেমন তারই বর্ণনা।

সাবাস! মনে মনে সাবাস দিলেন তিনি ছেলেদের।

মুখে একটু হেসে বললেন—ভাল, তোমরা সংস্কৃত তো বেশ আয়ত্ত করেছ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমরা দেখছি কেবল কাব্য পড়ছ। কিন্তু আমাদের বংশ তো কবির বংশ নয়। আমাদের বংশ স্মার্ত আর নৈয়ায়িকের বংশ। তিনজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মেছেন আমাদের বংশে। তাঁদের দু জন স্মার্ত, একজন নৈয়ায়িক। বস, তোমরা এইখানেই বস। আমাদের বংশের কথা বলি তোমাদের। নিজের বংশ-ধারার সঙ্গে পরিচয় করা উচিত সকলের।

কিন্তু মনে মনে তিনি একটা সঠিক বুঝেছেন যে বংশের সংস্কৃতির সঙ্গে সপ্রেম পরিচয় তাদের ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। নিজেরাই করে নিয়েছে তা। এখন কেবল সেই সংস্কৃতির মর্মকোষে জীবনের যে বীজ-মন্ত্রটি আছে সেইটির দীক্ষা দেওয়া বাকী আছে শুধু। সুধাকান্ত পরম পরিতৃপ্ত অন্তরে আরম্ভ করলেন সেই কাহিনী।

ছেলে দুটি চুপ করে বসে শুনতে লাগল সেই কাহিনী। সুধাকান্ত বলতে বলতেই লক্ষ্য করলেন কিশোরের টানা টানা, হাসি হাসি চোখ দুটি যেন প্রাণের প্রোজ্জ্বল প্রকাশে প্রস্ফুট হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি যেন হাসছে প্রস্ফুট ভাবে। মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। আর দুলালের বড় বড় চোখ দুটি যেন স্বপ্নে মেদুর হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য।

তিনি এক এক করে পিতৃপুরুষের কাহিনী বর্ণনা করলেন। বর্ণনা শেষ করে বললেন—বাবা, এই অতি দীর্ঘকাল ধরে একটি বিশিষ্ট কিছুর তপস্যা

আমরা আমাদের জীবনে দিনের প্রতিটি মুহূর্তে করে এসেছি। পার্থিব বস্তুকে, সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় বলি নি, তবে তার মূল্য অতি স্বল্প, তার প্রয়োজন জীবনের জন্যেই, এই কথা নিজেরা মেনে এসেছি, অন্যকে মানতে বলে এসেছি। নিজেরা বিত্তহীন, সম্পদহীন থেকে বিত্তই মানুষের মর্যাদার মান নয় এই কথা প্রচার করেছি। মানুষের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মনের আনন্দ শ্রেষ্ঠ ইপ্সিত এই বিশ্বাস করে এসেছি। এতেই মানুষের কল্যাণ কামনা করেছি। লাভে লুব্ধ হইনি, ক্ষতিতে ক্ষুব্ধ যাতে না হই সেই চেষ্টা করেছি। ক্রোধকে অক্রোধ দিয়ে, হিংসাকে বিশ্বাস দিয়ে জয় করবার কামনা করেছি, তপস্যা করেছি। এই আমাদের বংশের বীজমন্ত্র। আমি আশীর্বাদ করি তোমরা জীবনে সার্থকতা লাভ কর। পার্থিব সম্পদকে যেন কোন দিন শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু বলে না মনে কর। বংশের এই সাধনাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে গিয়ে পার্থিব সম্পদ যেন কোন দিন তোমাদের কাছে বাধা না হয়।

কথা শেষ করেই তিনি উঠলেন। ওরা এখন নিজেদের চিন্তায়, নিজেদের স্বপ্নে মগ্ন থাকুক।

বাইরে এসে তিনি আবার সংসার নিয়ে পড়লেন। গতদিনের জমাখরচটা পাকা খাতায় তোলা বাকী আছে। তিনি খাতাপত্র নিয়ে বসলেন। আশ্চর্য, মনে যে কথা যে চিন্তা ছিল তা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন লঘু হয়ে উঠেছে। গত দিনের জমাখরচটা তুলে তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। সমস্ত গ্রামখানা আবার আপনার মনের ভিতর ভেসে উঠল।

চারিদিক নিস্তব্ধ, পথ জনহীন। এক প্রহর বেলার রৌদ্রে শীতের দিনে গ্রামখানি যেন কোন জলচরের মত রৌদ্রে পিঠ দিয়ে চুপ করে বসে চোখ বন্ধ করে আলোক-স্নান করছে। আকাশে কচিৎ একটা দুটো পাখী আওয়াজ তুলে ভেসে চলে যাচ্ছে। এই গ্রামকে একদা তাঁরাই ধারণ করেছিলেন। কূর্ম-অবতারে ভগবান যেমন করে ধরণীকে ধারণ করেছিলেন তেমনি করে পুরুষানুক্রমিক ভাবে তাঁরা এই গ্রামের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আজ ধীরে ধীরে সকলেরই অজ্ঞাতে সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। নিজের বংশের সাধনার জন্য ও বংশগত সংস্কৃতির জন্য আজও লোকে তাঁর পরিবারকে অনন্য সাধারণ সম্মান করে, কিন্তু নিজেরা

তো জীবন থেকে ধীরে ধীরে ভিন্নপথে চালিত হতে আরম্ভ করেছে। পার্থিব সম্পদ আর বিত্তের তপস্যাই এখন ক্রমে ক্রমে একমাত্র তপস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায় নেই। এই পথে যাত্রা হয়তো কালাধিপতির অভিপ্রায়।

পথের দিকেই তাকিয়ে তিনি বসেছিলেন শূন্য দৃষ্টিতে। মনে একটি আনন্দ যেন স্থির দীপশিখার মত উজ্জ্বল। তাঁর মনে হচ্ছে চারিদিকের পরিবেশে অহরহ প্রকাশমান যে বাধাহীন জৈব-প্রকৃতি মরুভূমির সীমাহীন বালুকার মত অহরহ আক্রোশ আর অবিশ্বাসের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে অবিরাম অহমিকার আলো বিকরণ করছে সেই উজ্জ্বল, জ্বলন্ত সীমাহীন বালুকারাশির মধ্য দিয়ে তাঁর বংশের এক পুরুষের পর অপর পুরুষ ভগীরথের মত মানব-কল্যাণ, ক্ষমা ও নিবৃত্তির স্নিগ্ধ ধারা বহন করে আনার পবিত্র দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এক পা এক পা ক'রে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তিনি মনে মনে তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দকে প্রণাম করলেন। এই দায়িত্ব বহন করার কোন পুরস্কার তিনি চান না। কেবল এই দায়িত্ব বহন করবার শক্তি ও ইচ্ছা যেন তাঁর বংশকে পরিত্যাগ না করে যায়—এই টুকুই প্রার্থনা করলেন মনে মনে।

তাঁর শূন্য দৃষ্টিতে অকস্মাৎ এক সময় একটা ছবি ফুটে উঠল। ছৈ-ওয়ালা গরুর গাড়ী আসছে একখানা। গাড়ীখানা এসে ধীরে ধীরে তাঁর বাড়ীর সামনেই দাঁড়াল। সুধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন।

গাড়ী থেকে নামলেন যিনি তাঁকে দেখে সুধাকান্ত একবার চমকে উঠলেন। আনন্দর সেই ম্যানেজারবাবু যিনি এসে বিদ্যুৎ মণি আর আনন্দের মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বার বার তাদের সঙ্গে যেতে চাওয়া সত্ত্বেও যিনি পরোক্ষে আপত্তি করেছিলেন। এ ভদ্রলোক আবার কালপুরুষের মত এলেন কেন? তাঁকে দেখবা মাত্র মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে এসে সুধাকান্তকে বিস্মিত ক'রে তাঁকে প্রতিবাদ করার সময় না দিয়েই তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তারপর গাড়োয়ানকে বললেন—নামা রে, জিনিষগুলো নামা।

গাড়োয়ান নামালে একটা টিনের তোরঙ্গ, একটা বড় ব্যাগ, মস্ত বড় বিছানা, আরও টুকিটাকি জিনিষ।

সুধাকান্ত প্রশ্ন করবার আগেই তাঁর মনের প্রশ্ন অনুমান ক'রে নিয়ে

হাত জোড় করে তিনি বললেন—এবার এলাম ভট্চাজ মশায় আপনাদের এখানে থাকব বলে।

সুধাকান্ত অতি মাত্রায় বিস্মিত হলেন, কৌতুকও বোধ করলেন খানিকটা। মুখে প্রশ্ন করলেন—থাকবেন আমাদের এখানে?

অতি বিনীত ভাবে বললেন ভদ্রলোক ঘাড নেড়ে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুধাকান্ত এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন, ভদ্রলোক তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সেটা খেয়াল হতেই তিনি বললেন—ও কি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? উঠে আসুন।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে উঠে এলেন। বললেন—আশ্রয় যখন পেয়েছি আপনার কাছে, তখন সবই পাব একে একে।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য সুধাকান্ত বললেন—পাবেন বৈ কি!

—প্রথমত: আজকের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—এহ বাহ্য। পিছে কহ আর।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন। সুধাকান্ত স্পষ্টই বুঝলেন, রসিকতার মর্মভেদ তাঁর দ্বারা হয়নি। কিন্তু বাক্য ব্যবহারে কি চতুর আর কুশলী ভদ্রলোক!

ভদ্রলোক হাসি না থামিয়ে বললেন—কর্তা একখানা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।

চিঠির কথা শুনেই সুধাকান্তের মন আবার তিক্ত হয়ে উঠল। তবু তিনি ভদ্রতা করে বললেন—আনন্দ ভাল আছে? বিদ্যুৎ, মণি, আনন্দের মা সকলে ভাল আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সকলেই বেশ ভাল আছেন।

সুধাকান্তের মুখ দিয়ে অকস্মাৎ কটু কথা বেরিয়ে এল, বললেন—আচ্ছা মশায়, গতবার, সে অন্তত: আজ আট বছর আগের কথা—দুটি স্ত্রীলোক আর একটি শিশুকে আপনি আমার সম্পূর্ণ অমতে, একেবারে পুরো অপরিচিত মানুষ হয়েও নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা পৌঁছুলেন কিনা ঠিক মত এ বিষয়ে একটা সংবাদও দিলেন না আমাকে?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এই দেখুন দেখি কি বলছেন আপনি। আমি পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি—

আমরা সকলে নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। সে আজ আপনার আট বছরের কথা হলে কি হয় আপনার, এখনও পরিস্কার মনে আছে।

ভদ্রলোকের অতি সপ্রতিভ কথার ভঙ্গি থেকে সুধাকান্তের মনে হল যে ভদ্রলোক একেবারে মিথ্যা কথা বলছেন। ভদ্রলোককে তাঁর ভাল লাগছে না। তবু উপায় কি, অতিথি!

ভদ্রলোক তখন খুব ব্যস্তভাবে নিজের তোরঙ্গটা খুলছেন। তোরঙ্গ খুলে আবার তাড়াতাড়ি করে সেটা বন্ধ করে বলতে বলতে এলেন—কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া কি আর কথা আছে! এই যে ভট্‌চাজ মশাই, আপনার চিঠি।

আনন্দর চিঠি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে খুলবার আগেই তিনি মনে করে নিলেন কতকগুলো একান্ত ভাবে স্বার্থপরের মত নিজের প্রয়োজনের কথা অত্যন্ত শুষ্ক ভাষায় জ্ঞাপন করেছে আনন্দ চিঠিখানার মধ্যে।

আনন্দ লিখেছে:

পরম প্রীতিভাজনেষু,

ভাই সুধাকান্ত, বাল্যকাল হইতে তোমার কাছে নানান বিষয়ে ঋণী আছি। তুমি বাল্যকাল হইতে আমাকে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছ। হিলুর কথা মনে করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা মনে না করিয়া পারি না। তোমরা দুইজন আমার কাছে এক সোনার তারে বাঁধা। সেদিনের কথা মনে পড়লেই তোমার প্রতি ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় এখনও এই প্রবীণ বয়সেও দুই চক্ষু জলপ্লাবিত হয়। সে দিনের কথা আমার মনেই থাকুক আজ। আবার যদি তোমার সহিত কোনদিন দেখা হওয়ার সুযোগ ভগবান দেন তবে সাক্ষাতে সে সব কথা বলিব। তবে সেদিন যাহা পাইয়াছি, আজ অনেক পাইয়াও মনে হয়, আর তাহা পাইলাম না, কোনদিন পাইবও না।

পরবর্তী কালে আমার স্ত্রী, পুত্র, পিতা ও মাতাকে তোমরা যে ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছ তাহা গ্রামে একমাত্র তোমাদেরই বংশের যোগ্য। তবে আমি এতখানি প্রত্যাশা করি নাই। তোমরা কর্তব্যপরায়ণ বলিয়া বরাবর জানি। কিন্তু তোমরা আমাকে এতখানি ভালবাসিতে, তাহা কোন দিন কল্পনাও করি নাই। বিদ্যুতের মুখে, আমার ছেলে মণির মুখে তোমাদের

যে ভালবাসার সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে আমার মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া আছে। এ কৃতজ্ঞতার কথা পত্রে লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তোমার সহিত সাক্ষাতে সে প্রকাশ করিতে পারিলে করিব।

তুমি বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাকে যে ভাবে ভাল বাসিয়া আসিয়াছ তাহা আমি তোমার কাছ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর কাল দূরে থাকিয়াও বুঝিতে পারি। তুমি ভালবাস, আজিও হয়তো তোমার আমার প্রতি ভালবাসা অটুট আছে এই ভরসায় কয়েকটি কথা লিখিতেছি। আমারও বটে, উপরন্তু বিদ্যুৎ এবং মা সকলেরই ইচ্ছা আবার আমরা গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করি। আমার নিজের যে জন্মস্থান তাহার কথা আমার মনেও পড়ে না, তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্কও নাই। যেখানে তোমাদের সহিত আমার জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসর কাটাইয়াছি, যেখানে আমার হিলু-বৌয়ের সহিত সংসার করিয়াছি, যেখানকার শ্মশানে আমার হিলু-বৌ আজও ধূলার মধ্যে ঘুমাইয়া আছে, সেইখানেই বাস করিবার আমার আন্তরিক অভিপ্রায়।

সেই অভিপ্রায় অন্তরে পোষণ করিয়া তোমার কাছে আমার ম্যানেজারকে পাঠাইলাম। আমার অনেক কল্পনা আছে। ভগবানের আশীর্বাদে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছি এবং বহুতর উপার্জনের রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছি। তাই আমার ইচ্ছা গ্রামের বসতির মধ্যে দশ বিঘা জায়গায় আমি আমার বসবাসের জন্য পাকা ইমারত ও ইষ্টদেবতা নারায়ণের জন্য পাকা মন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি তৈয়ারী করাইব। আর গ্রামের বাহিরে পঞ্চাশ বিঘা পতিত ডাঙা জমি চাই। সেখানে ইস্কুল, হাসপাতাল, কাছারী, টোল, বোর্ডিং প্রভৃতির জন্য পাকা ইমারত করাইব।

তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি আমার ম্যানেজারকে লইয়া যথাযথ মূল্যে এই জায়গাগুলি খরিদ করিয়া দিও। আমার ম্যানেজার নূতন লোক, সে সেখানে প্রতারিত হইতে পারে। আশা করি তুমি আমার এই দেবকীর্তি ও সামাজিক কীর্তি স্থাপনে সাহায্য করিয়া দেবঋণ ও সমাজঋণ হইতে আমাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

পরিশেষে লিখি, আমিও অকৃতজ্ঞ নহি। তুমি আজীবন ভালবাসা ও নানান ভাবে উপকার করিয়া আমার যাহা করিয়াছ আমি আমার আপ্রাণ তাহা পরিশোধের চেষ্টা করিব।

আমার ভালবাসা লইও। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম, তোমার পত্নীকে আমার নমস্কার দিও। তোমার দুইটি পুত্র শুনিয়াছি। তাহাদের আমার আশীর্বাদ দিও।

ইতি

তোমার বন্ধু

শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আনন্দ যে এখন অত্যন্ত ধনী ও অর্থবান হয়েছে এটা সুধাকান্ত ওর চিঠিখানা না খুলেই বুঝতে পেরেছেন। মোটা শক্ত খসখসে খামের উল্টো দিকে গালার অক্ষরে ইংরেজীতে আনন্দ চন্দ্রের নাম ছাপা। বন্ধ করা খাম গালার সিল দিয়ে বন্ধ। গালার সিল ভেঙে যে কাগজখানা বেরিয়ে এল সেটাও মড় মড় করছে।

চিঠিখানা পড়ে সুধাকান্তের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি এই দীর্ঘকাল ধরে আনন্দের উপর অবিচার করেছেন। আন্তরিক অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল। আনন্দ, সেই বহু, বহুদিনের প্রাত্যহিক প্রতি মুহূর্তের বন্ধু আনন্দ কি আর তাঁর সম্বন্ধে পালটে যেতে পারে? তাঁর প্রতি আনন্দের যে ভালবাসা তা আজও অটুট আছে। সেই অটুট ভালবাসার পরিচয় তো পত্রের প্রতি ছত্রে সুপরিস্ফুট। তবে আনন্দ পালটেছে! পালটাবে বৈ কি। সে সামান্য মানুষ থেকে আজ হয়তো বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। বহু পরিবর্তন হওয়াই তো উচিত! কিন্তু মনে হচ্ছে আনন্দ টাকাটাকেই সব চেয়ে বড় বলে মেনে নিয়েছে মানুষের জীবনে। না, তাঁর বোধহয় ভুল হচ্ছে! তাই যদি হ'ত তবে এত কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবার প্রবৃত্তি থাকত না তার। কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক আনন্দের!

চিঠিখানা পড়ে তাঁর মুখে যে প্রসন্নতা দেখা দিলে তাই দেখে চতুর কর্মচারীটি বললেন—আমাদের বাবুর মত এমন দিল-খোলা মানুষ হয় না মশাই। কত কর্মচারী কত চুরি করছে; আমার কাছে ধরা পড়ল। কর্তাকে বললাম সব। সব শুনে কর্তা হাসলেন,—ওহে, ওকে সাবধান করে ছেড়ে দাও। আমার অনেক রয়েছে। ও সামান্য প্রাণী, ও আর কতটুকু খাবে? একটু সামান্য ধমক দিয়ে ছেড়ে দিই সব লোককে, আর কি করি! এই আমি এখানে এসেছি। এখন যে কি হচ্ছে, কত পুকুর চুরি হচ্ছে হবে তার ঠিক নেই।

ওর কথা শুনে সুধাকান্তের মুখে একটু হাসি খেলে গেল। অদ্ভুত মানুষ!

তিনি সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—আপনি যে জন্যে এসেছেন সব জানলাম। এতে আমার যতখানি সাহায্য করবার আপনাকে তা অবশ্যই করব।

হুঁ-হুঁ হেঁ-হেঁ করে হাসতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু সুধাকান্তকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। হাসির দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আরম্ভ করলেন ম্যানেজারবাবু, বল্লেন—এ-আমি জানতাম। জানেন ভটচাজ মশাই, আমি বাবুকে এই কথা বলেছিলাম—বাবু, দেখবেন সেখানে তাঁর কাছে যাবার অপেক্ষা! তাঁর কাছে গেলেই ভটচাজ মশাই হাসিমুখে সব করে দেবেন। আপনাকে তিনি যা ভালবাসেন দেখলাম তো! বাবুও তাই বলেছিলেন! বলেছিলেন,—তাই যাও হে সুধার কাছে। গ্রামে আর কেউ না করুক সে অন্তত আমার জন্য যা যা করা দরকার তা করে দেবে। আর সবাই ভুললেও সে আমাকে নিশ্চয় আজও ভুলতে পারে নি।

কি স্থূল কঠিন, শুধুমাত্র জৈব প্রকৃতি-সম্পন্ন মানুষ! নিজে যে জীবন ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেন সেখানে এই ধরণের মানুষের গতায়াত নেই; পরস্পরের জীবন বৃত্ত কোথাও একে অপরকে ছোঁয় না। এই ধরণের মানুষের স্পর্শ পেয়ে তাঁর মন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। অথচ কেমন সুন্দর চেহারা মানুষটির, কেমন চমৎকার বেশভূষা! চাণক্য পণ্ডিত এই সব লোককেই কি 'লম্বশাটপটাবৃত' বলেছেন? তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—আনন্দ আমার একমাত্র বাল্যবন্ধু। তার সম্পর্কে ভালবাসার কথা বেশী করে গুণগান আপনাকে অথবা আনন্দকে কেন করতে হবে? এ সাহায্য তো যে কেউ স্বাভাবিকভাবেই করবে। আর এতে উপকারেরও তো কিছু নেই। আপনারা পয়সা দিয়ে জমি কিনবেন তাতে উপকার বা সাহায্য কোনটারই তো প্রশ্ন ওঠে না।

হাঁ হাঁ করে মহা সমারোহে প্রতিবাদ করে উঠলেন ম্যানেজার বাবু—এ বলছেন কি ভটচাজ মশাই? এ আপনি কি বলছেন? আরে বাপরে বাপ! আপনার সাহায্য না পেলে কর্তা হাজার পয়সা ঢেলেও কি এখানে উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করতে পারবেন? কিছুতেই পারবেন না! এ আমি জোর গলায় বলতে পরি। আপনি সাহায্য না করলে কর্তা কি এখানে কিছু করতে পারবেন? কিছুতেই কিছু করতে পারবেন না।

লোকটির নির্লজ্জতা এত স্থূল যে অকারণ তোষামদ করতে তার বাধে না। অথবা মানুষটি এত নির্লজ্জ যে সুধাকান্তের উচিতমত প্রতিবাদেও তার উত্তাপ নিরুৎসাহ হল না! লোকটি দ্বিগুণ বেগে মিথ্যা প্রশংসা করে চলেছে। অকস্মাৎ গলা কমিয়ে সুধাকান্তকে তিনি বললেন—তা ছাড়া আর একটা কথা কি জানেন? আমাদের যে প্রচুর টাকা খরচা হবে আমার হাতে দিয়ে। বুঝে সুঝে যদি আমরা চলতে পরি তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারব। আপনাকে কিছু করতে হবে না। অপনি চুপ করে বসে বসে শুধু মাত্র হুকুম করুন আর পরামর্শ দেন। তা হলেই হবে।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে ম্যানেজার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ লোকটা বলে কি! এর তো ব্যবসায়ী-সুলভ চতুরতা, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে বলেই ভেবেছিলেন তিনি। এর কি সে সব কিছুই নেই? না সবই আছে, কেবল উদ্দাম লোভে এই মুহূর্তে সব চাপা পড়ে গিয়েছে? তাঁকে কি না বলে ঘুষ নিতে? গোবিন্দ! গোবিন্দ! দুরন্ত ক্রোধে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার জ্বলে উঠল। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন—আমাকে কিছু দেওয়া বা আমার কিছু নেবার প্রয়োজন হবে না। ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন তাই আমার যথেষ্ট। আর এখানে তো আপনার ও সব ব্যাপার চলবে না।

ম্যানেজার এতক্ষণে আবার বোধ হয় আপনার বোধ ফিরে পেলেন। তিনি আবার তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—তা তো বটেই। আমি কাকে কি বলছি দেখুন দেখি! আমাদের স্বভাবই অমনি হয়ে গিয়েছে। আমার অপরাধ নেবেন না। আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে দালালি, আইনসঙ্গতও বটে, বে-আইনিও বটে, দুইই চলে। আমারই ভুল হয়েছে। আপনার মত মানুষকে বলা সত্যিই মহা অন্যায় হয়েছে!

সুধাকান্ত আবার একটু হাসলেন। এই বার ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁর মন স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে এসেছে। তিনি বুঝলেন, এই যে পূর্ব-মুহূর্তে ভদ্রলোক তাঁকে কথাগুলি বলেছিলেন তাতে তাঁর চতুরতার কমতি প্রকাশ পায় নি। আপাত ভাবে সুধাকান্তকে যত ভদ্র, যত সৎ তার মনে হোক না কেন এ কথা তিনি মনে রেখেছিলেন যে অধিকাংশ মানুষের সততা আর ভদ্রতা একটা খোলসের মত। সময় ও সুযোগ মত সে খোলস পরিত্যাগ করে

আসল জৈব মানুষটা প্রায়ই অধিকাংশ মানুষের মধ্য থেকে অধিকাংশ সময়ই বেরিয়ে আসে। ম্যানেজার ভদ্রলোক বোধ হয় সেই জন্যে একবার তাঁকে বাজিয়ে দেখে নিলেন।

কিন্তু আর নয়। যথেষ্ট হয়েছে। ভদ্রলোকের প্রস্তাবটা শুনে মনটা এতই সঙ্কুচিত হয়েছে যে স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর। তিনি উঠলেন। এই চতুর, কুটিল, সংসার-সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মানুষটির সঙ্গে চলার একটি মাত্র আছে, সোজা রাস্তা। সহজ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে চলতে গেলেই এই মানুষটি রাহুর মত তাঁকে সম্পূর্ণ গিলে খেয়ে ফেলবে। ও মানুষটিকেও সোজা পথে চালাতে হবে। এ ভালই হয়েছে। বাড়ীতে তো যথেষ্ট কাজ নেই। অনেক সময় এমনি কেটে যায়। আনন্দকে কীর্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে সময়টা কাটবে ভাল।

ম্যানেজারবাবু তাঁকে বললেন—আর একটা কথা বলছিলাম। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি কর্তার যে বাড়ীটা আছে সেইখানে থাকি।

সুধাকান্ত মনে মনে অত্যন্ত খুসী হলেন। এই অশুচি জটিল মানুষটিকে বার বার দেখতে হবে না এতে সুবিধাই হবে। বললেন—সে তো ভাল কথা। তাই হবে। আজ আমার এখানে থাকুন। কাল থেকে ওখানে থাকবেন।

ম্যানেজার ভদ্রলোক বাঁচলেন যেন। সেটা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন সুধাকান্ত।

সুধাকান্ত উঠলেন। বুঝলেন, মানুষটি বুঝেছে তাঁর সঙ্গে বৈষয়িক কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না। কাজেই কাছাকাছি থাকলে হৃদ্যতা বাড়বে না, ভাঙবে বরং। অকস্মাৎ মানুষটির প্রতি এক ধরণের মমতা হল। ঈশ্বর কত রকমের মানুষই না সৃষ্টি করেছেন! যেতে যেতে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপানার নামটি তো বলেন নি ম্যানেজারবাবু!

ম্যানেজারবাবু এবার বিগলিত হয়ে গেলেন। আন্তরিক প্রীতির স্পর্শ বুঝতে পেরে বললেন—যাক, আমার নামটা শুধিয়ে আমাকে মানুষ বলে মেনে নিলেন আপনি। আমার নাম রসিকচন্দ্র ঘোষাল। তা এখন আমি নিজের কাছেও ম্যানেজারবাবু হয়ে উঠেছি। কর্তাবাবুও বোধ হয় আমার নামটা ভুলে গিয়েছেন।

—আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি ঘরে এই তক্তাপোষের উপর বিশ্রাম করুন। আমি আসি।

রসিকবাবু আপনার তোরঙ্গ থেকে কাগজপত্র বের করে কাজ করতে বসলেন।

নিজের হাতে কতকগুলি কাজ ছিল সুধাকান্তের। রসিকবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে—রসিকবাবু কয়েকদিন ঘুরে গ্রামটি এবং গ্রামের চারিপাশ দেখুন। ইতিমধ্যে তিনি হাতের কাজ শেষ করে রাখবেন। সে কাজ তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ থেকেই তিনি বের হবেন রসিকবাবুর সঙ্গে। জায়গা পছন্দ করে তাড়াতাড়ি জায়গা কিনে ফেলে কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। রসিকবাবু বলেছেন—গত দু বছর ধরে আনন্দ তার অবসর সময়ে আর কিছু করে নি। কেবল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে নক্সা তৈয়ারী করিয়েছে। সে নক্সাগুলোও আজ দেখাবেন রসিকবাবু। জায়গা কেনা হলেই ইঁট তৈরীর কাজ আরম্ভ হবে। জায়গা কেনা হলেই ইঞ্জিনিয়ার, নানান ধরনের মিস্ত্রী, মজুর সব এখানে আসবে।

সুধাকান্ত রসিকবাবুর অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। এ রাস্তা দিয়ে মানুষ জন এমনিই কম যায়। এটা প্রায় বাড়ীর ভিতরের রাস্তার সামিল। রাস্তায় লোক নেই। হঠাৎ দূরে বাঁকের মুখে একজনের ছবি ফুটে উঠল। সুধাকান্ত দাওয়ায় বসে চিনবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। মানুষটি এই দিকেই আসছে। চলার ভঙ্গি দ্রুত চঞ্চল, বেশ-ভূষা বেশ পরিচ্ছন্ন, এত দূর থেকেও জামা-কাপড় ধবধব করছে। কোন পরিচ্ছন্ন তরুণ হবে।

হ্যাঁ, পরিচ্ছন্ন সুবেশ তরুণই বটে। তাঁর প্রায় অপরিচিত। ইদানীং গ্রামে এসেছে। নরনাথবাবুর ছেলে লোকনাথ। বি এ পাশ করে আইন পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে বসেছে। এতদিন কলকাতায় মামার বাড়ীতে থেকে পড়ছিল। গ্রামের সকলেই জানত সে বি এ পাশ করে এম এ পাশ করবে, আইন পাশ করবে, তারপর জেলা-আদালতে ওকালতী করবে। হঠাৎ আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গ্রামে এসে বসল? সুধাকান্ত শুনেছেন, তাঁর কানে এসেছে, এই নিয়ে তার পিতা নরনাথবাবুর সঙ্গে তার বাদানুবাদ হয়েছে। প্রথমে সে নাকি বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল

সে কেন পড়া ছেড়েছে। বোঝাবার চেষ্টা করেও সে নরনাথবাবুকে বোঝাতে পারেনি, নরনাথবাবু বুঝতে চান নি তার কথা। তাকে নানান রকম তিরস্কার ও কটুকাটব্য ক'রে আবার আইন পড়বার জন্য আদেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাতে ছেলে কানও দেয়নি। সে গ্রামে বসেই আপনার ইচ্ছা-অনুযায়ী যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সে-ই আসছে এদিকে। কিন্তু এদিকে সে যাচ্ছে কোথায়? ঐ তো এসে পড়েছে সে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন—হ্যাঁ, সে তো তাঁরই এখানে আসছে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পরম সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলেন—এস, এস।

লোকনাথ একটু হাসল মাত্র তাঁর সমাদর ও অভ্যর্থনার বিনিময়ে। সে সপ্রতিভাবে দাওয়ায় উঠে এসে বললে—আপনার কাছেই এলাম একবার।

সুধাকান্ত তাকে দেখছিলেন। কঠিন কর্মঠ চেহারার তরুণ। চওড়া কঠিন কপালের নীচে মোটা সোটা দুই ভ্রূ, তার নীচে উদ্ধত উজ্জ্বল বড় বড় দুই চোখ। মানুষের কথা যখন শোনে মনে হয় কথাগুলোকে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তীর দিয়ে যেন বিদ্ধ করছে। মস্ত বড় খড়্গের মত নাক। দুধারের হনুর হাড় দুটো উঁচু হয়ে আছে। শক্ত চিবুক। চওড়া দেহ। শ্যামবর্ণ রঙ। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন তার মূর্তিমান ঔদ্ধত্যের মত। তাকে একবার দেখলেই সে যে কী ধাতুর মানুষ তা বুঝতে পারা যায়!

কঠিন মুখের অবিরাম সঙ্গী তার গাম্ভীর্য। সে এই যে হাসল, সুধাকান্তের মনে হল যেন সে অত্যন্ত কৃপা করে একবার একটু হাসল। বয়স কতই বা, বছর ছাব্বিশ পঁচিশ।

সুধাকান্ত তার আসার কারণটা অনুমান করতে পারেন নি। একে অপরিচিত, তার উপর তার আসার কারণটা জানেন না সুধাকান্ত। সেই কারণে তিনি একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই অপেক্ষা করতে লাগলেন সে কি বলে শুনবার জন্যে।

লোকনাথ বললে—আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। আপনি শুনে খুসী হবেন। আমি নিজেও খুব খুসী হয়েছি বলেই আরও তাড়াতাড়ি এলাম

সুধাকন্তের উৎকণ্ঠা তাতে বাড়ল বই কমল না।

লোকনাথ বললে—আপনার ছেলে যে স্কুলে পড়ে সেখানে আমার এক বন্ধু ওদের শিক্ষক। তিনিই আমাকে চিঠি লিখেছেন আপনার ছেলে দুটি সম্পর্কে।

উৎকণ্ঠার বদলে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে সুধাকান্ত তাকালেন তার মুখের দিকে। মুখে চোখে গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল, বললেন—কি লিখেছেন ওদের শিক্ষক ওদের সম্পর্কে ?

—সেই কথা বলতেই এসেছি। আপনার দু'টি ছেলেই লেখাপড়ায় খুব ভাল। স্বভাবও খুব ভাল তাদের। পড়াশুনোয় ভাল দু'জনেই। তবে আপনার ছোট ছেলেটি আমার বন্ধুর মতে প্রতিভাসম্পন্ন। সে সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা সবেতেই অতি চমৎকার। তার উপর সে অতি চমৎকার কবিতা লিখতে পারে।

সুধাকান্ত মনে মনে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আপনার স্বাভাবিক অভ্যাস বশে মুখে কিছু বললেন না, শুধুমাত্র হাসি মুখে লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে লোকনাথ একটু হাসল। অসঙ্কোচেই বললে—আমার কথা শুনে আশা করি আপনি খুসী হয়েছেন। আপনার মুখ দেখেও অবশ্য সেটা আমি বুঝতে পারছি। আমি নিজেই খুসী হয়েছি চিঠিখানা পেয়ে। তা আপনি বাপ, আপনি তো খুসী হবেনই।

সুখী হওয়ার কথা, সুধাকান্ত সুখী হয়েছেনও। কিন্তু লোকনাথের কথাবার্তার ধরনে কোথায় যেন অতি স্পষ্ট কাঠিন্য উদ্ধতভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতেই তাঁর আন্তরিক উচ্ছ্বাস অতি সহজেই সংযত হয়ে এল। একটু যেন আহতও হলেন তিনি মনে মনে। লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কথাবার্তায় এমন কঠিন উদ্ধত ভঙ্গি কেন ?

লোকনাথের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলে চলল—জানেন, আমার এই বন্ধুটি অত্যন্ত গুণগ্রাহী, তবে সহজে কারও গুণপনা সে স্বীকার করে না। তাই সে যখন প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে লিখলে তখন আমিও স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত খুসী হয়ে আপনাকে জানাতে এসেছি। সে নিজে অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিল। লেখাপড়া ছেড়ে মাষ্টারী করতে গেল।

এইবার সুধাকান্ত সামান্য একটি কথা বললেন একটু হেসে—প্রায় তোমারই মত তা হ'লে!

লোকনাথ কথাটা গায়ে মাখলে না, তার বলার মধ্যে যেন এক ধরনের কর্কশতা আত্মপ্রকাশ করেছে, সে অকারণ জোর দিয়ে একটু রূঢ়ভাবে বললে—না, আমার মত নয়। আমি অত্যন্ত সাধারণ ছাত্র ছিলাম। আর যার কথা বলছি সে অসাধারণ ছাত্র ছিল।

সুধাকান্ত খানিকটা দমে গেলেন। তিনি আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

লোকনাথ বললে—সে যাই হোক। আমার আসল কথাটা এখনও আপনাকে বলা হয়নি। আমার বন্ধু, আপনার ছেলেদের শিক্ষক আপনাকে অনুরোধ করবার জন্য লিখেছেন যে তিনি ওদের দুজনকেই ইংরাজী পড়াতে চান। তাঁর ধারনা ওদের দু' জনকেই একটু করে ইংরেজী দেখে দিলে ওরা দু জনেই অসাধারণ ছাত্র হয়ে উঠতে পারবে।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গেলেন লোকনাথের কথা শুনে। মুখে বললেন—সে তো ওদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের কথা।

লোকনাথ ওঁর কথা মাঝখানে কেটে বললে—সে যদি আপনার ছেলেদের পড়ায় তা হলে সেটা তাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের হবে এটা আমিও মনে করি। সৌভাগ্যের কথা হলেও সেটা আপনার পক্ষে সুবিধার কথা হবে এমন তো নাও হতে পারে।

সুধাকান্ত অবাক হলেন—কেন? আমার পক্ষে সুবিধার হবে না কেন?

হাত নেড়ে লোকনাথ বললে—সে আপনারাই বলতে পারেন। আমি কি ক'রে বলব। আমি আমার জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে সহরে মানুষ হয়েছি। আমি আপনাদের সব ব্যাপার বুঝতে পারি না। এই ধরুন না, আমার বাবা হলে তিনি কিছুতেই রাজী হতেন না। আপনাদের আমলের মানুষদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না মশায়।

সুধাকান্ত আর কথা বাড়ালেন না, শুধু বললেন—তিনি ভূস্বিমী, অপরের সাহায্য তো তিনি সহজে গ্রহণ করবেন না। আর আমি? আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, বিনামূল্যে বিদ্যাদান আর বিদ্যাগ্রহণ কোনোটাতেই তো আমার আপত্তির কারণ নেই। যদি তোমার বন্ধু তোমার কাছ থেকে এই কথা

জানতে চেয়ে থাকেন তবে এই কথাই জানিয়ে দিও। আমি এবং আমার ছেলেরা একে মহাভাগ্য মনে করব।

লোকনাথ বললে—নিশ্চিত হলাম। আমি তা হ'লে ওকে তাই লিখে দেব। ভাল কথা, আপনার ছেলেদের একবার ডাকবেন, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই।

সুধাকান্ত নিজে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে নিয়ে এলেন। বাড়ীর ভিতরেই দু এক কথায় তাদের সমস্ত সংবাদ জানিয়ে দিয়ে তাদের বাইরে নিয়ে এলেন।

লোকনাথ তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। ছেলে দুটি গিয়ে প্রথমেই তাকে প্রণাম করলে। লোকনাথ বোধহয় এর জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। সে বিব্রত হয়ে বললে—একি, প্রণাম কেন? কি দরকার এর? আরে থাক থাক। আমার নিজের তো বাপু প্রণাম ট্রণাম একেবারে আসে না।

ছেলে দুটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবার মুখেই আপনার সবল দুই হাতে ওদের দু জনকে কোলে জড়িয়ে ধরে সে সকৌতুকে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, বললে—খুব যত্ন করে পড়াশুনো কর আর আপনার চরিত্রকে তৈরী কর। ভাল করে লেখাপড়ার সঙ্গে সবল সুন্দর মন আর দেহ তৈরী কর। নিজের এবং দেশের অনেক কাজ হবে তোমাদের দিয়ে।

তারপর দুলালের দিকে তাকিয়ে সে বললে—তুমিই তো দুলাল? তুমি খুব ভাল কবিতা লিখতে পার আমি শুনেছি তোমাদের ললিত মাষ্টারমশাইর কাছে। সে আমার খুব বন্ধু কিনা। খবরদার কবিতা লেখা ছাড়বে না। সবাই গাল দেবে, বলবে—ছেলেটা পদ্য লিখছে, খারাপ হয়ে গেল, বয়ে গেল ছেলেটা। লোকে যা বলে বলুক, খবরদার ছাড়বে না।

দুলাল বড় বড় চোখ মেলে ওকে দেখছিল। সে লোকনাথের কথার কোন জবাব দিলে না। লোকনাথ এক মুহূর্ত তার চোখে চোখ দিয়ে তাকে বেশ ভাল করে দেখে নিলে। তারপর তার পিঠে একটা সস্নেহ আঘাত করে বললে—আচ্ছা, চললাম। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে রাস্তায় গিয়ে নামল।

সুধাকান্তের অকস্মাৎ অন্যকথা মনে পড়ল, তিনি ডেকে বললেন—একটু দাঁড়াও।

তিনি লোকনাথের কাছে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন—একটা কথা বলছিলাম। তুমি বোধ হয় আনন্দ মুখুজ্জের নাম শুনেছ?

একবার ভ্রূকুঞ্চিত করলে লোকনাথ, তারপর বললে—হ্যাঁ, তাঁর নাম ইদানীং কালেই শুনেছি। আমাদের নায়েব ছিলেন রাম মুখুজ্জে, তাঁরই ছেলে। আমি অবশ্য কলকাতাতে মস্ত ব্যবসাদার হিসেবে তাঁর নাম শুনেছি। তিনি আপনার বাল্যবন্ধু না?

—হ্যাঁ। সে এখন এই গ্রামে এসে বাস করতে চায়। শুধু বাসই করতে চায় না, এখানে অনেক জনহিতকর কীর্তিও করতে চায়। ইস্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, টোল, দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

লোকনাথের মুখ চোখ এক মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠল। সমস্ত মানুষটার যেন এক মুহূর্তে চেহারা পালটে গেল। হাসি মুখে বললে—বা, বা, বা, বড় ভাল, খুব ভাল। আমি আমার প্রাণপণ পরিশ্রম করব এর জন্যে। আমাকে যখন ডাকবেন পাবেন। ও সব দেবতা-টেবতার ব্যাপারে আমি নেই। ইস্কুল হাসপাতালের জন্যে আমাকে যদি মজুর হিসেবে চান তাও আমি বিনা পয়সায় অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে করব।

সুধাকান্ত এক মুহূর্তে মানুষটার মর্মমূলের পরিচয় পেয়ে গেলেন ওর এই কটা কথা থেকেই। মানুষটা আলোর একটা সরল তীরের মত। কেন সে লেখাপড়া ছেড়েছে, সে কি করতে চায়, তা যেন সব এক মুহূর্তে বুঝতে পারলেন সুধাকান্ত। তিনি মনে মনে পরম প্রীত হলেন। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করার উপায় নেই। ওর বাইরের অতি কর্কশ বর্মে আহত হয়ে সেই পুষ্পমাল্যও ফিরিয়ে দেবে সে। ও একটি বিচিত্র ধরণের মানুষ।

তিনি তাকে বললেন—তোমার কথা আমি নিশ্চয় মনে রাখব। আনন্দকেও লিখব।

—হ্যাঁ লিখবেন—আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার আপ্রাণ শক্তি দিয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করব।

সুধাকান্ত হেসে বললেন—লিখব। কিন্তু এই সম্পর্কেই অন্য একটা কথা বলছিলাম তোমাকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে লোকনাথ বললে—বলুন।

এই সমস্ত কাজ করতে গেলে তো প্রথমেই ভাল উঁচু শক্ত ডাঙা জমি

চাই। সেই জমি কিনিতে হবে। এখন আনন্দ দশ বিঘে জমি চায় গ্রামের ভিতরে বসত বাড়ী আর দেবমন্দিরের জন্যে। আর গ্রামের বাইরে পঞ্চাশ থেকে একশো বিঘে জমি চায় ঐ সমস্ত কীর্তি করবার জন্যে।

লোকনাথ অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইল। তারপর সুধাকান্তের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—আমাকে কেন বলছেন এ বিষয়ে?

সুধাকান্ত বললেন—খুব সহজ কথা। তোমাদের পতিত জমি গ্রামের ভিতরেও আছে, গ্রামের বাইরে পশ্চিম দিকে ডাঙা জমি, তাও পড়ে আছে হাজার বিঘের ওপর। সে তো এমনিই পড়ে আছে, তার থেকে যদি এই সমস্ত কাজের জন্যে তোমার বাবা আনন্দকে দেন শ খানেক বিঘে জমি সেই জন্যেই বলছিলাম তোমাকে।

লোকনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে—আচ্ছা, বলব, বলব আমি বাবাকে। দেখুন, ঐ সব বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে আমি থাকি না, থাকতে চাইও না। কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আলাদা। খুব সৎ আর পবিত্র কাজ এসব। কাজেই বলব বাবাকে, আজকেই বলব।

সুধাকান্ত প্রবীণ গৃহী লোক। তিনি বুঝতে পেরেছেন, বৈষয়িক ব্যাপারে এই ছেলেটি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন। সে জমি দেবার কথা নরনাথবাবুকে বললেই স্বভাবতই নরনাথবাবু ভাববেন বোধ হয় সুধাকান্ত জমিটা নিছক দান করতে অনুরোধ করেছেন। একেই তো গ্রামে এক বিরাট সম্পদশালী ব্যক্তির নূতন আবির্ভাবের সংবাদে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন, তার উপর এই অনুরোধ করলেই তিনি ঈর্ষায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছেলেকে কটুকাটব্য করবেন। একমাত্র ঐ নিষ্ফলা পতিত উষর প্রান্তরের পরিবর্তে তিনি যদি যথেষ্ট অর্থ পান তা হলে বোধ হয় সানন্দেই জমিটা বিক্রী করতে রাজী হবেন। সে কথা বিবেচনা করে তিনি লোকনাথকে বললেন—আর তোমাকে আটকে রাখব না। কেবল একটা কথা বলে নিই। ঐ জমির যা ন্যায়সঙ্গত মূল্য হবে, তোমার বাবা নিজে যে ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধারণ করে দেবেন আমি সেই মূল্য দেবার জন্যেই আনন্দের কর্মচারীকে অনুরোধ করব।

এইবার লোকনাথ হাসল, বললে—ঐ দেখুন, দাম দেবেন কি দেবেন না

সে কথাটা আমার একবারও মনে হয় নি। ও সব আমার একেবারে আসে না। বাবা আমাকে এই জন্যেই বিশেষকরে বকাবকি করেন। আচ্ছা আমি যাই। কাল পরশু একবার এসে আপনাকে খবর দিয়ে যাব।

লোকনাথ চলে গেল। আশ্চর্য ধাতের মানুষ! প্রথমে দেখেই চমক লাগে, ধোঁকা লাগে! বাইরেটা কি কঠিন, আর কি কর্কশ! ওর সহজ সরল স্বভাবের সঙ্গে এই কর্কশতা আর কাঠিন্য যেন জড়িয়ে আছে। মনে হয় বিধাতা ওকে যেমনটি রচনা করেছিলেন ও আর তাতে কোন নূতন রঙ দেয়নি। বিধাতার দেওয়া রঙের উপরেই বার বার সেই রঙেরই প্রলেপ বুলিয়েছে। তাই সেই রঙই ফুটেছে ওর চরিত্রে অত্যন্ত গভীর হয়ে। এ যেন ঠিক রত্নগর্ভ একটা ন্যাড়া পাহাড়। কর্কশ, রুক্ষ, কঠিন কিন্তু সহজ সরল। প্রথমে দেখে ভয় লাগবে, বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আসবে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে দেরী লাগবে না। পরিচয় হয়ে গেলে খুব ভাল লাগবে।

একটু পরেই রসিক বাবু এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন। নূতন ইমারতের নক্সা। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ভট্চাজ মশায়, এখনি একজন কে আপনার এখান থেকে গেল? ছোকরা মত, কাল, ইয়া লম্বা শক্ত চেহারা! আমার দিকে কি রকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে গেল মশায়! যেন আমি কত অন্যায় করেছি। বোধ হয় আমার পোষাক দেখে অমনি করে তাকিয়ে গেল।

সুধাকান্ত আর ও কথার আলোচনা করলেন না, বললেন—তা যাক। তাতে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। আপনার জমি কেনার সব ব্যবস্থা করেছি। ঐ যাকে রাস্তায় দেখলেন সেই আপনাকে জমি বিক্রী করবে। এত সহজে জমি কেনার ব্যবস্থা হবে আমি ভাবিনি। ও হল আমাদের নরনাথ বাবুর ছেলে লোকনাথ।

রসিক বাবু কি বলতে গেলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে সুধাকান্ত বললেন—চলুন জমি দেখি আসি। এমনিই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

জায়গা দেখে ভারী পছন্দ হয়েছে রসিকবাবুর। তিনি তাই বলছিলেনও। জায়গা যে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে সেটা অত্যধিক কথা বলা থেকেই বুঝতে পারছিলেন সুধাকান্ত। রসিকবাবু বলছিলেন—আজ আলো পড়ে এসেছিল, তাই বেশ ভাল করে দেখা গেল না। তা যা দেখলাম তাতেই একেবারে

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি, বুঝলেন ভটচাজ মশায়। গাঁয়ের বাইরে শক্ত কড়া মাটি, চারিপাশের গাঁ হতে সব চেয়ে উঁচু। ওঃ, এখানে যখন সারি সারি নানান চেহারার হরেক রঙের ইমারত তৈরী হবে তখন চারিপাশে তিন চার মাইল দূর থেকে সব দেখতে পাওয়া যাবে। খড়ে-ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের থেকে দেখে এই সারা অঞ্চলের মানুষ অবাক হয়ে যাবে। দূরে বাদশাহী সড়ক থেকে যাত্রীরা গাড়ীতে যেতে যেতে এই সারি সারি ইন্দ্রভুবন দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করবে—ওহে, এই ফাঁকা প্রান্তরে এ ইন্দ্রভুবন কে তৈরী করেছে? তখন গাড়োয়ান বলবে—রাজা আনন্দচন্দ্র স্কুল, হাসপাতাল, কাচারী এই সব দিয়েছেন।

তাঁর কথা শুনে বিষণ্ণভাবে হাসলেন সুধাকান্ত। রসিকবাবু যা ভাবছেন, যা বলছেন, তাতে সাধারণ কুঁড়ে ঘরের মানুষদের থেকে এ মানুষ কত স্বতন্ত্র এই কথাটাই সদম্ভে ঘোষণা করা হচ্ছে। রসিকবাবু অবশ্য আপনার ভাবনা মতই কল্পনা করেছেন! কিন্তু আনন্দও কি এমনিভাবেই সবটা ভেবেছে? কে জানে।

রসিকবাবু বলেই চলেছেন আপনার ভাবনায় মশগুল হয়ে—আচ্ছা, এই ডাঙ্গাতে সব বাড়ীর মাঝখানে সব চেয়ে উঁচু করে নিজের বাড়ী আর দেবতার মন্দির করলে কেমন মানাত বলুন দেখি। আচ্ছা হত কি না! আমিও তাই বলেছিলাম। মা ঠাকরুণও তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—রসিকবাবু যা বলেছেন তাই ঠিক। নূতন করে তুমি নগর বসাবে। তার মাঝখানে সব চেয়ে উঁচু হয়ে উঠবে তোমার ঠাকুরবাড়ী আর বসত বাড়ী। সেই সব চেয়ে ভাল হবে। তা বাবু হেসে বললেন—ও তুমি ঠিক বুঝবে না। গ্রামের পুরণো বসতির মধ্যে তোমার বাড়ী সব বাড়ীর মাথা ছাড়িয়ে উঠুক, তোমার বাড়ীর শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তুমি নীচে তাকিয়ে যখন অন্য বাড়ীর চালগুলো দেখবে, যখন সেই সব বাড়ীর মানুষদের চোখে তোমার চোখ পড়বে তখন বুঝবে গ্রামের মধ্যে বসতবাড়ী করলাম কেন? সেদিন তুমিও বুঝবে, তারাও বুঝবে। বাবু বলার পর আমি বুঝলাম, বুঝলেন ভটচাজমশাই। বুঝলাম একেই বলে রাজবুদ্ধি।

সুধাকান্ত রসিকবাবুর মুখ থেকে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করলেন। আনন্দ'র কীর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারলেন।

দোষ নেই, কারও দোষ নেই, মহামায়ার লীলা, সামান্য মানুষ কি করবে! সিদ্ধির রাজপথে রথের উপর তুলে দিয়ে বলেন—এই তো সব পেয়ে গিয়েছ তুমি। তোমাকে অর্থ-সম্পদ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার রাজছত্র দিয়েছি, এইবার বিশ্রাম কর, মানুষের উপর প্রভুত্ব কর। আর কি চাই! যাত্রার আয়োজন সব ঠিক। সেই মুহূর্তে যাত্রা স্থগিত রেখে মানুষের উপর রক্তচক্ষু পড়ে। ভয়ার্ত মানুষ কাতর চোখে হাতজোড় করে তার প্রসাদের প্রত্যাশায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দম্ভের হাসি হেসে প্রসাদ দান করে। আবার কখনও লীলাচ্ছলে আপনার অঙ্গদ, কুণ্ডল, কণ্ঠহার নিয়ে খেলা করে, সেই রত্ন-অলঙ্কারে আলো প'ড়ে পাশের মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাদের দৃষ্টিতে ক্ষোভ আর ঈর্ষার দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হাসে, গান করে।

সুধাকান্ত অকস্মাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। চোখের দৃষ্টির সম্মুখে আকাশে একের পর এক তারা ফুটে উঠছে। কানের পাশে বিষণ্ণ একটানা গানের মত মশা গুন গুন করছে। তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে একবার ডাকলেন—গোবিন্দ হে! তারপর বললেন—এইবার উঠি রসিকবাবু। সন্ধ্যার সময় হয়েছে।

রসিকবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়। তা হ'লে নক্সাগুলো রেখে যাই। আপনি দেখবেন।

সুধাকান্তের মনে কেমন অবসাদ এসেছে, বললেন—না, না, আপনি নিয়ে যান। কোথায় ইঁদুরে পোকায় কেটে দেবে। দামী জিনিষ। আমি বরং কাল সকালে আপনার ওখানে গিয়ে দেখে আসব।

তিনি আবার একবার গোবিন্দ স্মরণ করলেন।

অন্যদিনের চেয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে জপ করলেন, ইষ্ট স্মরণ করলেন সুধাকান্ত। আপনা আপনি মন অনেকখানি তার সহজ প্রসন্নতা ফিরে পেলে। জপ করে উঠে জল খেতে বসলেন। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। কিশোর আর দুলাল এই কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে এসে হাত-পা ধুয়ে সন্ধ্যা ক'রে পড়াশুনো করতে বসেছে। এখন পরীক্ষার পর। পড়াশুনো বিশেষ কিছু নেই। তবু ওরা পড়াশুনো করে। ওদের পড়তে ভাল লাগে এটা জানেন সুধাকান্ত।

তিনি চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠলেন, ঠিক করলেন কিছুক্ষণ ওদের কাছে গিয়ে বসবেন। এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে—সুধা। সুধাকান্ত! সুধাকান্ত বাবু বাড়ী আছ না কি?

ভরাট, দরাজ গলা! তাঁকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছেন। কে? মনে পড়ে অথচ পড়ে না! আলো নিয়ে তিনি বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি।

দরজার সামনে একটি শুভ্রবেশ মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকারে, হাতে লাঠি। তাঁর পিছনে একটি লোক লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। সুধাকান্ত তাকেও ঠিক চিনতে পারলেন না। নিজের হাতের আলোটা তুলে ধরলেন!

কি সর্বনাশ! বৃদ্ধ নরনাথ বাবু!

নরনাথবাবু হেসে বললেন—কি হে, চিনতে পারছ না নাকি? আর চিনতে না পারারই বা দোষ কি? আমি তো আর বাড়ী থেকে বের হই না বড় একটা। আজ একবার এলাম তোমার কাছে।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গিয়েছেন। গ্রামেরই মানুষ গ্রামেই এক জনের বাড়ী আসবেন এতে হয়তো অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু নরনাথ বাবু সেই শেষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন আনন্দর বাবা রাম মুখুজ্জের বাড়ী। সেখানেও অসঙ্কোচে যেতেন, কারণ সে বাড়ীও তাঁর নিজের। সেখানে যেতে তাঁর অসম্মান ছিল না। কিন্তু সেই বিয়ের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উপহাসাস্পদ ও অপমানিত হওয়ার পর আর কারো বাড়ী যান নি। অভিমানী দুর্যোধনের মত মানুষ তিনি। তার উপর ইদানীং তাঁর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়ায় সে অভিমান তাঁর বেড়েছে বই কমেনি। আর তা ছাড়া সুধাকান্ত ভাল করেই জানেন যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে নরনাথ বাবুর বরাবর একটা সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং শেষ কালে আনন্দ'র নূতন বিবাহ নিয়ে তাঁর স্বর্গত পিতার সঙ্গে নরনাথবাবুর খানিকটা বিরোধিতা এবং মনোমালিন্যও হয়েছিল। সেও অবশ্য আজকের কথা নয়। অন্ততঃ ষোল বছর আগের কথা। এই কালের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম ছাড়া সুধাকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। সেই নরনাথবাবু এই রাত্রিকালে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর কাছে আসবেন এটা ভাবতে অবাক লাগে বৈ কি!

সুধাকান্ত তাঁকে দেখেই অনুমান করতে পেরেছেন তিনি এসেছেন কেন?

তাঁকে দেখে একটি সকরুণ মমতায় তাঁর সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি অবাক হয়েই ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে সসম্ভ্রমে ও সাগ্রহে বললেন—আসুন, আসুন। আমার কি সৌভাগ্য!

সহজ হাসি, যে হাসি কেবল বৃদ্ধেরা হাসতে পারেন, সেই সহজ সরল হাসি হেসে নরনাথবাবু বললেন—তা সৌভাগ্যই বল, আর দুর্ভাগ্যই বল, এলাম বাপু তোমার কাছে।

তারপর সঙ্গের লোকটিকে বললেন—তুই বরং আলোটা রেখে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আয়। আমি এখানে বসি। খানিকক্ষণ পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দাওয়ার উপর আলোটি নামিয়ে রেখে চলে গেল। সুধাকান্ত নরনাথবাবুকে সসম্ভ্রমে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন।

নরনাথবাবু ধীরে সুস্থে হাতের লাঠিটা পাশে নামিয়ে রেখে চৌকীর উপর বেশ আরাম করে বসলেন।

সুধাকান্ত বললেন—আপনি কেন এলেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত।

নরনাথবাবু হাসলেন গূঢ় ভাবে। খানিক হেসে বললেন—ওহে, আরও খানিকটা বয়স হোক তখন বুঝতে পারবে সব কাজ একরকম ভাবে হয় না। কখনও গাড়ীর ওপর নৌকা চড়ে। কখনও গাড়ী চড়ে নৌকোর ওপর। বুঝলে? যাক, এখন যে জন্যে এসেছি তোমার কাছে শোন।

সুধাকান্ত ভাল করেই জানেন নরনাথবাবু তাঁর কাছে কেন এসেছেন। তবু তিনি মুখে সবিশেষ আগ্রহ ফুটিয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালেন।

নরনাথবাবু নড়ে চড়ে গায়ের বালাপোষটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—আজ লোকনাথ বুঝি তোমার কাছে এসেছিল। তাকে নাকি তুমি বলেছ যে আনন্দ'র জন্যে তুমি ঐ আমার যে পতিত প্রান্তর পড়ে আছে তার থেকে শ'খানেক বিঘে কিনতে চাও। আমি তো আর লোকার মুখ থেকে শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। একটা বদ্ধ উন্মাদ হয়েছে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে।

পুত্রের প্রতি স্নেহ আর ক্ষোভ একসঙ্গে বুঝতে পারলেন সুধাকান্ত।

'কিন্তু উত্তর পেলেন প্রথম কথাটার। তাঁর মনে হল নরনাথবাবু গ্রামের ভিতরে জমি দেবার কথাটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে যাচ্ছেন। সুধাকান্ত বললেন— সে আমি ওকে আজ সামান্যক্ষণ দেখেই বুঝেছি। একেবারে বিষয় আসক্তিহীন এবং বিষয়-জ্ঞানহীন। ওকে যা যা বলতে বলেছিলাম আপনাকে তা সব বলেনি বুঝতে পারছি। গ্রামের বাইরে একশো বিঘে জমি তো আনন্দ নেবেই, তা ছাড়া গ্রামের ভিতরে বসত বাড়ী আর দেব মন্দিরের জন্যে দশ বিঘে জমি চাই তার। তার সামাজিক কীর্তি আর বৈষয়িক প্রয়োজনের বাড়ী ঘর সব কিছু সে গ্রামের বাইরেই করবে, কিন্তু নিজের বসত বাড়ী আর দেবমন্দির সে গ্রামের মধ্যেই করতে চায়। বাস সে সকলের সঙ্গেই করতে চায়, পৃথক হয়ে থাকতে চায় না।

তাঁর কথা শুনে নরনাথ বাবু অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—দেখ সুধাকান্ত, আমার গ্রামের মধ্যে জমি কোথায়? জমি তো নেই। তার চেয়ে গ্রামের বাইরে একশো বিঘের জায়গায় দেড়শো বিঘে জমি নাও, আমার কাছ থেকেই নাও, আমি দিচ্ছি। আর আনন্দ'র সম্পর্কে যা শুনতে পাচ্ছি, সে যা কাজ কর্মে নামছে তাতে, দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট বুঝতে পারছি সে বহু বহু সম্পদের মালিক। সে কেন গ্রামের সাধারণ অবস্থার আর দরিদ্র মানুষের সঙ্গে বসবাস করবে? তার বসবাসের পাকা ইমারত গ্রামের বাইরে নিরিবিলি হওয়াই তো ভাল।

সুধাকান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারলেন গ্রামের ভিতরে জমি দিতে নরনাথবাবুর একান্ত অনিচ্ছা। অনিচ্ছার কারণ যে শুধু একটা তা নয়, অনেক—সেও তিনি অনুমানে বুঝতে পারছেন। প্রথমত: গ্রামের ভিতরে দিতে হলে তাঁকে দিতে হবে তাঁর খাস বাগানের পাশের পতিত জমি। সেই বাগানের মধ্যে তাঁর বাড়ীর অন্দর মহলের পুকুর। বাগানের পাশে বাড়ী হলে যে অন্দর মহলের পুকুরের গোপনীয়তা ও আবরু কিছু পরিমাণে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে। দ্বিতীয়ত: ঐ জমি বিক্রী করলে লোকের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নরনাথবাবুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে। তৃতীয়ত: তাঁর বাড়ীর পাশে আনন্দ'র বিশাল প্রাসাদ উঠবে এবং তাঁকে ও তাঁর বংশাবলীকে প্রতিদিন তা দেখতে হবে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—এ কল্পনা, এ সম্ভাবনার

ভূমিকা তিনি নিজে হাতে রচনা করে দেবেন কি ক'রে! সুধাকান্ত পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন বৃদ্ধের মনের ভিতরের দ্বন্দ্বটা। তাঁর টাকার দরকার, আর এই রকম পতিত প্রান্তর বিক্রী করে টাকা কোথায় পাবেন! অথচ গ্রামের বাইরের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের জমি শুদ্ধ দেওয়ার অসুবিধা নানান রকম। সুধাকান্ত বললেন—কিন্তু আনন্দ গ্রামের মধ্যে বসবাস করবার জন্যে বদ্ধপরিকর।

নরনাথবাবুর প্রাচীন তেজে কোথায় যে আঘাত লাগল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—বদ্ধপরিকর? গ্রামের মধ্যে যে পরিমাণ জমি তোমরা তার জন্যে চাইছ তা আছে কেবলমাত্র আমার আর হরসুন্দরবাবুদের। আমাদের দুজনের কাছ থেকে জমি না পেলে তো বাধ্য হয়ে তাকে গ্রামের বাইরেই বাস করতে হবে।

রসিকবাবুকে নরনাথবাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছিলেন সুধাকান্ত। কথাবার্তার মাঝখানেই তিনি এসেছেন। এইবার তিনি কথাটার জবাব দিলেন। বিশাল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি যে বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছেন তা এখানকার বিলম্বিত, ঘটনাহীন জীবনে অভ্যস্ত, শান্ত ও মন্থর বুদ্ধির মানুষের কাছে অজ্ঞাত। তিনি সবিনয়ে বললেন—বাবু, আমি আনন্দচন্দ্রের কর্মচারী। আপনি যে কথা বললেন তা খুবই সত্য। আপনি আর হরসুন্দরবাবু না দিলে আমার মালিকের পক্ষে জমি পাওয়া কঠিন হবে। সে কথা আপনি বলবার আগেই আমরা জানি। সেই জন্যেই আমরা হরসুন্দরবাবুর সদর কাছারীতে তাঁকে চিঠি লিখেছি। এই সংবাদটা বৃদ্ধকে হজম করবার জন্যে সময় দিতে থামলেন রসিকবাবু। সুধাকান্ত রসিকবাবুর এই আর একটা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সেই অদ্ভুত কুটিল, মিথ্যা চাটুকার মানুষটার মধ্য থেকে কি শক্ত বুদ্ধিমান মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে। নরনাথবাবু এতক্ষণ সোজা হয়ে বসেছিলেন। এই সংবাদের আঘাতে তিনি যেন এলিয়ে পড়লেন। রসিকবাবু বললেন—আর বাবু, আর একটা কথা বলি। আপনারা দুজনেই যদি জমি না দেন তা হলেও আমরা জমি পাব। টাকা আছে আমার মালিকের। এখানকার বসতবাড়ীর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আমাদের প্রয়োজন মত জমি কিনেও আমরা বাড়ী তৈরী করতে পারি।

রসিকবাবু আস্তে আস্তে সবিনয়ে কথাগুলি বললেও তার আড়ালে যে

অপরিসীম দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল তার আঘাতে অর্থহীন নরনাথবাবু ধরাশায়ী হলেন। তিনি কিছুক্ষণ মুখ নামিয়ে বসে খানিকটা ভেবে নিলেন, তারপর মাথা তুলে বললেন—বেশ তাই হবে। আমিই জমি দেব। গ্রামের ভিতরে বসতবাড়ী আর ঠাকুরবাড়ীর জন্যে দশ বিঘে আর গ্রামের বাইরে একশো বিঘে। তবে একটা কথা—গ্রামের ভিতরে বসতবাড়ী আর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।

সুধাকান্ত বললেন—বেশ কথা। দাম? কি দাম নেবেন?

নরনাথবাবু বললেন—তোমরা বল। আমি কি বলব!

সুধাকান্ত বললেন জোরের সঙ্গে—না, আপনি বলুন। আপনি যে সঙ্গত দাম বলবেন আমরা তাই মেনে নেব।

—আমি বলব? আচ্ছা, গ্রামের ভিতরে একশো এক টাকা বিঘে আর গ্রামের বাইরে একান্ন টাকা বিঘে—এই দিও তাহলে।

সুধাকান্ত বললেন—বেশ তাই হবে। তবে একটা কথা। এক টাকা করে বিঘে পিছু আপনি রসিকবাবুকে দালালি দিয়ে দেবেন দয়া করে।

নরনাথবাবু বললেন—দালালি? তা আমরা তো জমিদার, দালাল তো দেখি নি! তা দালালের হাতে যখন পড়েছি, তখন দেব, দালালি দেব। বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন। সুধাকান্ত বুঝলেন নরনাথবাবু মনে মনে নিশ্চিন্ত ও খানিকটা খুসী হয়েছেন।

সুধাকান্ত বললেন—একটা কাজ করুন রসিকবাবু। আজ কর্তামশায়কে কিছু টাকা দিয়ে দেন।

রসিকবাবু হাসলেন, বললেন—আমি একেবারে কাগজ স্ট্যাম্প টাকা সব নিয়ে এসেছি দেখার জন্যে তৈরী হয়ে।

পাকা রসিদ তৈরী হল, অগ্রিম তাঁকে দু হাজার টাকা নগদ দিয়ে রসিকবাবু সই করবার জন্যে রসিদ আর কলম বাড়িয়ে দিবেন।

নরনাথবাবু কলম হাতে নিলেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই। নিজের মনোভাব সংহত করবার বা গোপন করবার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি কোন দিন। তিনি আপনার ক্ষোভটা প্রকাশও করলেন, বললেন—আমাদের দেশে আজও টাকা সম্পত্তি সব লেন-দেন এখনও মুখে মুখে হয় মশাই। তা ছাড়া আমার মুখের কথারও একটা বিশেষ দাম আছে ঘোষাল মশাই।

আমার কাছ থেকে লিখিত রসিদ না নিলেও চলত। কথা শেষ করেই তিনি রসিদ সই করে দিলেন।

সুধাকান্ত বুঝলেন নরনাথবাবুর অভিমানে আঘাত লেগেছে। এবং সঙ্গত ভাবেই লেগেছে। এ অঞ্চলে এখনও মানুষ মানুষকে তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে টাকা সম্পত্তি দুই-ই ছেড়ে দেয়। সুধাকান্ত হাত জোড় করে বললেন—ওঁর অপরাধ নেবেন না আপনি। টাকা ওঁর নয়। যাঁর টাকা উনি তাঁর সামান্য কর্মচারী মাত্র।

নরনাথবাবু বুঝলেন, বললেন—হ্যাঁ, তা বটে, অবশ্যই। আর যার যেমন নিয়ম। ওদের ব্যবসার যে রীতি-পদ্ধতি তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই।

কাজ শেষ করেই রসিকবাবু উঠলেন, সবিনয়ে হেসে বললেন—আজ আমি আসি। দুজনকে পৃথকভাবে নমস্কার করে রসিকবাবু বেরিয়ে গেলেন।

নরনাথ আবার উঠে চৌকীতে বসলেন, বললেন—আমি তোমার কাছে আরও একটু বসব হে। তোমার অসুবিধা হবে না তো?

সুধাকান্ত বললেন—না, না, সে কি। বসুন। আমার হাতে কোন কাজ নেই।

নরনাথবাবু আবার বালাপোষখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আনন্দ সত্যিই সব দিক দিয়ে মহাভাগ্যবান হে!

সুধাকান্ত বুঝলেন, নরনাথবাবু নতুন আলোচনার পত্তন করছেন। তিনি সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ তা তো অবশ্যই বটে। তবে ও খুব শক্তিশালী মানুষ বরাবরই।

গভীর সমর্থনের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে নরনাথবাবু বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? প্রচণ্ড শক্তি আর কর্মক্ষমতা না থাকলে কি কোন মানুষ এত বড় হতে পারে? পারে না। তবে সেটাই শেষ কথা নয়। তার সঙ্গে বৃহৎ সৌভাগ্যও যুক্ত না হলে মানুষ এমন সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। ভাল কথা, আচ্ছা সুধাকান্ত, আনন্দ'র এত সম্পত্তি হল কি করে হে? যে পরিমাণ খরচ করে সে এখানে এই সব কাজ কর্ম করতে চলেছে তার পরিমাণ অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা তো বটেই।

সুধাকান্ত বললেন—আজ্ঞে না, রসিকবাবু আমাকে খরচের একটা *আনুমানিক হিসাব দেখিয়েছিলেন—সে প্রায় তিন লক্ষ টাকা!*

নরনাথবাবু স্তম্ভিত হয়ে সুধাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুধাকান্ত বললেন—রসিকবাবুর কাছে যা শুনেছি তাতে আনন্দ'র বাৎসরিক আয় পাঁচ লাখ টাকার ওপর, আর ওর সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় এক ক্রোড় টাকা।

নরনাথবাবু শূন্যদৃষ্টিতে সুধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে চোখে কেমন একটা হতাশা আর অবসাদের ভাব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। তিনি যেন এই মুহূর্তে ঈর্ষ্যা করবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বলতে লাগলেন—সবই ভাগ্য সুধাকান্ত, সবই ভাগ্য। নইলে অমন ছেলে আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে কেন? তখন অহমিকায় খানিকটা অধৈর্য হয়ে না পড়লে সবই হোত। আজ আমার ভাগনী তা' হলে রাজরাণী হয়ে ফিরত। আজ তার ধনসম্পদের কথা শুনে—তোমার কাছে মিথ্যা বলব না সুধাকান্ত, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার কাছে অকপটেই বলছি—আনন্দ'র অগাধ ঐশ্বর্যের কথা শুনে বুকের ভেতরটায় আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই সেদিনে আমার অন্নে যার বাপ জীবনযাপন করেছে সে এই গ্রামে এসে আমার মাথার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে এই কথা ভেবে আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছে।

নারনাথবাবু চুপ করলেন। তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর তখন যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুধাকান্ত কি বলবেন, চুপ করেই আছেন তিনি। নরনাথবাবু আবার বললেন—আর আমার ভাগ্য দেখ। একটি মাত্র ছেলে। তাকে মামার বাড়ী পাঠালাম লেখাপড়া করে আইন পাশ করে ওকালতী করবার জন্যে। তা কোথায়! ছেলে আমার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বসল। বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝে না, বুঝতেও চায় না। কিছু বলতে গেলেই কঠিন কর্কশ কথায় তার উত্তর দেয়, পরিষ্কার বলে—কেন আমাকে এসব দেখতে বলছেন, আমি পারব না। আমার কাজ ভিন্ন। বিষয়-সম্পত্তি দেখা আমার দ্বারা হবে না।

সুধাকান্ত বাধা দিয়ে বললেন—ও কথা বলবেন না। আপনার ছেলে সত্যি সত্যই ব্রাহ্মণ। সে একেবারে গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

নরনাথবাবু বললেন—তা আমি বুঝি বলেই তো ওকে কিছু বলতে পারি না, ওর রূঢ় কর্কশ কথা পর্যন্ত সহ্য করি। কিন্তু আমার দুঃখ কি জান? আমার একমাত্র ছেলে আমার দুঃখ বুঝলে না। ছেলে আমার এরই মধ্যে পাগল হয়ে উঠেছে, বলছে—এইবার সত্যিই দেবতার মত একটা মানুষ আসছে গ্রামে। আসবার আগেই গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে ইস্কুল, রোগের প্রতিকারের জন্য হাসপাতাল দিয়ে তবে মানুষটা গাঁয়ে ঢুকবে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই কাজ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তা দেখতে হবে। এ পাগলকে কি বলব বল তো? আর কিছু বলবারও উপায় নেই একে।

সুধাকান্ত এই অগ্নির মত শুদ্ধ চরিত্রের মানুষটিকে কল্পনা-করে একবার হেসে উঠলেন। নরনাথ বললেন—তুমি হাসছ সুধাকান্ত? আমিও আমার ছেলেকে দেখে হাসতে পারতাম যদি আমার ছেলে আমার কষ্টটা একটু বুঝত। ও যত ভাল কাজই করুক, যত ভাল মানুষই হোক, ও যে আশ্চর্য রকমের স্বার্থপর তাতে আমার অন্ততঃ সামান্যও সন্দেহ নেই। ও নিজের কাজ, নিজের চিন্তা, নিজের জগত নিয়েই আছে। অন্য কোন দিকে, কারো দিকে চাইবার সময় ও ইচ্ছা কোনোটাই ওর নেই।

নরনাথবাবু কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে এল, তিনি বললেন—সব চেয়ে আমার দুঃখ কি জান? সব চেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে আমার অর্থাভাব। সংসারে খরচ যেমনকার তেমনি আছে, অথচ আয়ের পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। ঋণের অঙ্ক দিন দিন বেড়ে উঠেছে। কী করব! এখন অর্থাভাবে গোপনে গোপনে একের পর এক সম্পত্তি বিক্রী করে চলেছি। এই বিক্রী আর কতদিন গোপন থাকবে বল? এদিকে অর্থাভাব দিন দিন বেড়ে উঠেছে, ওদিকে সামাজিক দৃষ্টিতে দিন দিন হেয় হয়ে যাচ্ছি। এ যে কী কষ্ট এ যেন তোমাকে কোনদিন ভোগ করতে না হয়। আর তার উপর যে এই দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারত সেই ছেলে আমার এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাকে বলেছি—হ্যাঁরে, সম্পত্তি দেখাশুনো না করলে খাবি কি? অট্টহাস্য করে আমাকে জবাব দিলে—ভগবানে বিশ্বাস করি না, তা হলে বলতাম ভগবান দেবেন। আপনার এখানে আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন

চারটি করে শাক-ভাত আমার জুটে যাবে। তারও যদি অভাব হয় তবে আমি যে সহস্র কোটি দেবতার সেবা করি, সেই মানুষই আমাকে খেতে দেবে। আমাকে ডেকে খেতে দেবে, আমাকে হাত পেতে চাইতে পর্যন্ত হবে না। আমার নিজের ভাবনা কিছু নেই।

নরনাথবাবু একটু থেমে আবার বললেন—সেই জন্যেই ওর ভাবনা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ওর যা হবার হবে। ভেবেছিলাম শেষ বয়সটা আমার এমনি করেই সুখে দুঃখে কেটে যাবে। তা আজ বুঝতে পারছি, স্পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি—শেষের দিনগুলো আমার সব চেয়ে দুঃখে আর মনোকষ্টে কাটবে। এই আনন্দ'র কাছ থেকে দুঃখ পেতে হবে আমাকে। তবে তোমাকে আজ বলে যাই সুধাকান্ত—

বৃদ্ধের সকরুণ কণ্ঠস্বর যেন কোন মন্ত্রবলে অকস্মাৎ ক্ষোভে জ্বালায় অগ্নিগর্ভ হয়ে বেজে উঠল—তোমাকে বলে যাই একটা কথা। সে আসবে তার অগাধ ঐশ্বর্য নিয়ে। কিন্তু সে যদি মদমত্ত হয়ে কোনদিন আমার মাথায় ওপর দিয়ে যেতে চায় তা হলে তার পা দুখানাকে আমার মাথা থেকে নামিয়ে ভেঙে দিয়ে ওকে খোঁড়া করে ফেলে দেব।

আন্তরিকভাবে সুধাকান্ত বলে উঠলেন—না, না, আনন্দ সম্পর্কে এ কথা আপনি বলছেন কেন? তার প্রতি অবিচার করছেন আপনি! এই ঐশ্বর্য আর কীর্তি তাকে নিশ্চয় বিনয় দিয়েছে, মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েছে। তা না হলে কি মিথ্যা মানুষ এত বড় ভাগ্য পায়!

বার বার অস্বীকার করে ঘাড় নাড়লেন নরনাথবাবু। গভীর কণ্ঠস্বরে একটা অমোঘ সত্যের সুর মিশিয়ে তিনি বলেন—তোমরা মহৎ বংশের সন্তান, তোমরা সম্পদের তপস্যা কোনদিন করনি। তোমরা চিরকার সম্পদের মত্ততাকে বাল্যকাল থেকে অস্বীকার করবার শিক্ষা পেয়েছ। তাই তুমি জান না। সম্পদের মত্ততা কি তুমি জান না, আমি জানি। সেই মত্ততার তপস্যাই চিরকাল করেছি, তাই আমি জানি। ভগবান যেন তাকে সে মত্ততা থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তা বোধহয় হবে না। তুমি দেখো।

তারপর।

আরো দু'টো বৎসর কাটল। অত্যন্ত সমারোহের আর কোলাহলে-ভরা

দুটো বৎসর। তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের জীবনে সমারোহের আতিশয্য কিম্বা কোলাহলের ঘনঘটা কোনটাই নেই। স্বভাবত সেখানে জীবন যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ, অনাবশ্যক তরঙ্গহীন। বৃহৎ দুঃখকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণের শিক্ষা বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পরিবারে চলে আসছে। ঘটনা সেখানে সহজ হয়ে দেখা দেয়। গত বৎসর কিশোর এণ্ট্রান্স পাশ করেছে। খুব ভাল করে পাশ করেছে। বৃত্তি পেয়েছে সে।

সুধাকান্ত লেখাপড়ার ব্যাপারে ছেলেদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন বরাবর। তারা যা-ই পড়ুক কখনও বাধা দেন নি তাদের। পাশ করার খবর পেয়ে হাসিমুখে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এইবার কি পড়বে কিশোরবাবু?

কিশোর একবার লাজুক মুখে বাবার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়েছিল। দুলাল হেসে বলেছিল—বল না দাদা। বল। বাবাকে তো বলতেই হবে।

সুধাকান্ত হেসে লাজুক সন্তানকে উৎসাহিত করেছিলেন—বল, বল, সঙ্কোচ কিসের হে এত?

কিশোর মুখ তুলে এবার বাপের দিকে তাকালে, বললে—আমি কলেজে পড়ব না বাবা। টোলে পড়ব।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন। তাঁর বংশে কালের গতিতে কবে সংস্কৃত-চর্চ্চার ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর যখন সেই সংস্কৃতি ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্রম-লুপ্তির পথে চলেছে তখন তাঁর এই অসমসাহসী সন্তান কেমন করে এক আশ্চর্য বাসনার অগ্নিকে অতি সংগোপনে আপনার হৃদয়ে লালন করেছে! তিনি বললেন—তুমি যা পড়বে আমি তোমাকে তাই পড়াব। কিন্তু তুমি সংস্কৃত পড়ে করবে কি? দিনকাল তো দেখছ। সংস্কৃত পড়ে তুমি কি করবে, জীবনে কোন্ কাজে লাগবে? তা তুমি কোথায় পড়তে চাও?

কিশোরের লজ্জা ও সঙ্কোচ অনেকখানি কেটে গিয়েছে, সে বললে—আমি খোঁজ নিয়েছি বাবা। নবদ্বীপ কি ভট্টপল্লী যেখানে হোক পড়ব।

সুধাকান্ত হাসলেন। বললেন—বোকা ছেলে, অসমসাহসীর মত কথা বললে বাবা। আচ্ছা যখন তোমার সংস্কৃত পড়ার ইচ্ছা তখন সংস্কৃত কলেজেই পড়বে। কেমন?

সেই থেকে কিশোর সংস্কৃত কলেজে পড়ছে। দুলাল এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে।

তাঁর নিজের জীবনের আর কোন সংঘটন নেই, কিন্তু আনন্দ'র কাজের সঙ্গে আপনার অজ্ঞাতে জড়িয়ে পড়ে একটা অতি বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সমস্ত কোলাহল সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে।

জমি কেনার সঙ্গে সঙ্গে সুধাকান্ত সপরিবারে এখানে আসবার এবং কাজকর্ম দেখে করবার অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তরে আনন্দচন্দ্র তাঁকে জানিয়েছিলেন—তুমি আমাকে যেরূপ সস্নেহ আহ্বান জানাইয়া ডাকিয়াছ তাহাতে পত্রপাঠমাত্র আমার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিল। তোমাদের কাছে যাইবার জন্য আমার মন সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু যাইতে পারি কৈ? এখানকার অতি বৃহৎ কর্মভার কাহার হাতে যে দিয়া যাইব এমন কেহ তো আমার নাই। মনি এখনও ছোট। সে অবশ্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কাজ শিখিতেছে। সে বড় ও যোগ্য হইয়া উঠিলে তাহাকে সব বুঝাইয়া দিয়া আমি তোমাদের কাছে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিব। তবে মাঝে মাঝে যাইব বৈ কি! বিশ্রামের জন্যই যাইব। এখানে আমার খাদের একজন মজুর যে পরিশ্রম করে আমাকে তাহার চেয়ে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়। আর এখানে থাকিলে পরিশ্রমের হাত হইতে নিস্তার নাই। কাজ করিতেই হইবে। অথচ কাজ ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইবে না। সমস্ত বাড়ীগুলি শেষ হইয়া গেলে ঐগুলির দারোদ্ঘাটন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় যাইব। তোমাকে আন্তরিক অনুরোধ, তুমি যেরূপ একান্ত যত্ন লইয়া সব দেখিতেছ সেইরূপ দেখিও। তাহা হইলে আমি এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার কাজ করিতে পারিব।

চিঠির ভাব থেকে সুধাকান্ত পরিস্কার বুঝেছেন—আনন্দ এখন আসবে না। এই সমস্ত কীর্তি তৈরী হয়ে গেলে সে নাটকীয় মুহূর্তে এখানে আসবে।

আনন্দচন্দ্র দূরে, অনেক দূরে, এখানকার সাধারণ মানুষের স্মৃতির বাইরে বসে আছেন। তবু তিনি কত শক্তিমান, কত বৃহৎ সম্পদের অধিকারী তা কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের লোক বুঝতে পারলে। এখানকার দরিদ্র অল্পবিত্ত মানুষগুলির ক্ষুদ্র জীবনের পরিধি অতি সীমাবদ্ধ, অপরিসর। তার উপর শান্ত নিরুদ্বেগ। নিজের ক্ষুদ্র অপরিসর জীবনের বাইরে যা কিছু তার

প্রতি অতি স্বাভাবিক এক বিচিত্র অবহেলা আছে এদের চরিত্রে। বাইরের সম্বন্ধে এরা আশ্চর্য রকম নিরাসক্ত, তার সব কিছুই এদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। সুধাকান্ত নিজেও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই যখন মহাসমারোহে ইঞ্জিনিয়ার, মজুর, মিস্ত্রী, নানান ধরনের যন্ত্রপাতি, লোহা লক্কর, কাঠ এসে গ্রামের মধ্যে ও পাশে পৌঁছুতে লাগল তখন মানুষগুলি হত-চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, আলোচনা করলে আনন্দচন্দ্রের সম্পদের পরিমাণ।

পতিত প্রান্তরের মধ্যে বড় বড় সাদা পাখীর মত সাদা কাপড়ের সারি সারি তাঁবু পড়ে গেল, মানুষ জনের কলকোলাহলে এত কালের নির্জন প্রান্তর মুখর হয়ে উঠল। রাত্রে বৃহৎকায় রক্তখদ্যোতের মত সারি সারি আগুন জলতে লাগল। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের আকাশ প্রথম কিছুকাল কালো হয়ে থাকল সারি সারি সাজানো ইঁটের ভাটার আগুনে। এ যেন এক ময়-দানব তার অসংখ্য মুখ ও অসংখ্যতর বাহু নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উষর পতিত প্রান্তরটার উপর; আপনার খেয়ালে দিবারাত্রি আপনার কল্পনামত সৃষ্টি করে চলেছে।

ক্রমে সেই কোলাহলের একটা অংশ এসে পড়ল গ্রামের ভিতর। গ্রামের মানুষের শান্ত জীবন চকিত হয়ে উঠল। গ্রামের ভিতরেও কাজ আরম্ভ হল আনন্দচন্দ্রের বসত বাড়ী আর ঠাকুর বাড়ীর। গ্রামের বাইরে রচিত হতে লাগল তাঁর পার্থিব কীর্তি সৌধ, আর গ্রামের ভিতরে মানুষের বসতির মধ্যে রচনা আরম্ভ হল তাঁর বিশ্রামের মন্দির আর শান্তি ও সান্ত্বনার সৌধ দেবমন্দির।

সুধাকান্ত রসিকবাবুকে ঘরে বসেই সাহায্য করেন, পরামর্শ দেন। লোকনাথের উৎসাহ প্রচণ্ড। সে প্রায় রসিকবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আনন্দিত মুখে কাজকর্মের অগ্রগতি দেখে বেড়ায়। সে প্রায় অনুযোগ করে তার মনের সঙ্গে তাল রেখে রচনা যেন অগ্রসর হতে পারছে না। রসিকবাবু তার কথা শুনে হাসেন। সুধাকান্ত সস্মিত মুখে এই স্বার্থহীন অর্দ্ধোন্মাদ মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ধীরে ধীরে সমস্ত ইমারত একে একে তৈরী হয়ে গেল। পতিত প্রান্তরটা নানান রঙের, নানান আকারের বৃহৎ ইমারতের সজ্জায় সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় আকাশের আয়নার দিকে তাকিয়ে আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে হাসছে যেন।

আর গ্রামের ভিতরে সমস্ত খড়ের চাল, টিনের চাল আর পাকা বাড়ীর উপরে, অনেক উপরে, গ্রামের সমস্ত সবুজ গাছপালার উপরে অতি রূপবান ফর্সা একমাথা তুষারশুভ্র চুল, অতি দীর্ঘকায় দৈত্যের মত সকালে, দুপুরে সন্ধ্যায় ঝলমল করছে। তারও উপরে দেবমন্দিরের মাথার উপরের কলস ঝকমক করছে। গ্রাম, গ্রামান্তরের মানুষ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই দিকে আর কল্পনা করছে এই অপরিমেয় কীর্তির কর্তাকে।

দূর দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ ভাস্কর ও মণিকার এসেছিল রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ মূর্তি রচনা করতে। রচনা সমাপ্ত করে দেবতাকে প্রণাম করে তারাও চলে গেল। রসিক বাবু এসে সুধাকান্তকে সংবাদ দিলেন—আনন্দচন্দ্রের গুরু কাশী থেকে আগামী সাতুই আষাঢ় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করে পাঠিয়েছেন। তার আগের দিন প্রাতঃকালে আনন্দচন্দ্র সপরিবারে গ্রামে আসবেন। তিনি এই কথা বিশেষভাবে জানাতে বলেছেন সুধাকান্তকে। সেই দিন রাত্রে তাঁর গুরুও আসবেন কাশী থেকে।

গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কেমন ক'রে কে জানে সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল এই সৃষ্টির প্রজাপতি আসছেন, কোন বিশেষ দিনটিতে। সুধাকান্ত শুনেছেন, সংবাদ পেয়েছেন আগের দিন সন্ধ্যায় জংশন স্টেশনে আনন্দচন্দ্র সপরিবারে নেমেছেন। লোক সেই রাত্রেই সংবাদ নিয়ে এসেছে রসিক বাবুর কাছে রসিক বাবুর কাছ থেকে রাত্রেই সুধাকান্ত জানতে পেরেছেন। সংবাদ পেয়ে লোকনাথও উল্লসিত হয়েছে। সুধাকান্ত লোকনাথকে অনুরোধ করেছিল পরের দিন সকালে আনন্দচন্দ্র যখন প্রথম এসে ঠাকুর বাড়ীতে নামবেন সেই সময় থাকবার জন্য। তাতে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—সে দেবতা দৈবতায় বিশ্বাস করে না। অন্য সময় সে আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করে আসবে। উত্তর শুনে সুধাকান্ত হেসেছিলেন, কিছু বলেন নি।

রাত্রে আনন্দচন্দ্র সপরিবারে থাকবেন জংশনের ডাক বাংলোয়। পরদিন ভোরে আপনার জুড়িতে বেড়িয়ে তিনি এখানে প্রহরখানেক বেলায় একেবারে এসে নামবেন রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে। তিনি স্নান করেই আসবেন জানিয়েছেন।

রাত্রিতে বৃষ্টি হয়ে মাটি ভিজে গেলেও পরের দিন সকালে রৌদ্র উঠল আকাশ ঝলমল করে। রসিক বাবু সুধাকান্তকে বললেন—দেখছেন ভটচাজ মশাই, আলোর বাহার! যার ভাগ্য ভাল হয় তার প্রতি দেবতারাও প্রতি মুহূর্ত প্রসন্ন হয়ে থাকেন।

সুধাকান্তর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। তাঁর মনটিও আনন্দর আগমন-প্রত্যাশায় আনন্দে আপ্লুত হয়ে আছে।

মঙ্গল ঘট পাতা হল। আমের শাখায় দরজা প্রাঙ্গন নাটমন্দির গত সন্ধ্যা থেকেই সজ্জিত করা আছে। ঠাকুর বাড়ীর ফটকের সামনে দেবদারু পাতার তোরণ রচনা করা হয়েছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর বাড়ীর সামনে রাস্তার দু ধারে লোক জমতে সুরু করেছে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠছে। ঠাকুর বাড়ীর দরজা থেকে গ্রামের বাইরে পর্যন্ত রাস্তার দু ধারে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঠাকুর বাড়ীর ফটকের সামনে চওড়া শ্বেতপাথর বসানো বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রসিক বাবু আর সুধাকান্ত অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ দু'টি ছেলে এল ছুটতে ছুটতে—আসছে, আসছে। জুড়ী গাড়ী দেখা যাচ্ছে।

সমস্ত লোক অধীর হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জুড়ী এসে ঠাকুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। চাপরাশ-পড়া সহিস প্রথমেই তাড়াতাড়ি নেমে সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিয়ে দরজা ধরে পাশে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন আনন্দচন্দ্র। তাঁর খালি পায়ের ছাপ পড়ল গ্রামের ভিজে মাটির উপর আঠারো বছর পর। এখনও গম্ভীর কাঁচা মুখ। কালো রঙের উপর মাথার একেবারে সাদা চুলগুলিতে কি অপরূপ মানিয়েছে মানুষটিকে। খালি গা, গায়ে গরদের চাদর, তার আড়ালে কালো রঙের উপর সাদা উপবীত ঝক ঝক করছে। পড়ণে গরদের কাপড়। তিনি নেমে গম্ভীর স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে সামনের কারও দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে ফটক পার হয়ে নাট মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে পিছনে গাড়ী থেকে নেমে এলেন তাঁর স্ত্রী, ছেলে মণি, আর বছর দশেকের একটি

মেয়ে। কালো রঙ, বড় বড় চোখ, আনন্দচন্দ্রেরই মেয়ে বোধ হয়। তাঁরাও আনন্দচন্দ্রের পিছন পিছন নাটমন্দিরে প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ভীড় নাটমন্দিরে ঢুকে পড়ল। সুধাকান্তও ঢুকলেন ভীড়ের সঙ্গে।

দেখলেন আনন্দচন্দ্র হাতজোড় করে বিগ্রহের ঘরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তাঁর গায়ের গরদের চাদর গা থেকে এলিয়ে পড়ল। মন্দিরের পুরোহিত এসে সশব্যস্তে তা তুলে নিলে।

প্রণাম করে উঠে ছেলেমেয়ের দিকে একবার, উৎসুক-দৃষ্টি জনতার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে ছেলেমেয়েকে বললেন—প্রণাম কর।

সুধাকান্ত দেখলেন—দেবতার দিকে মানুষের দৃষ্টি নেই। সকলের দৃষ্টি আনন্দচন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ। এই মুহূর্তে মানুষ যেন দেবতার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাল লাগল না। তিনি নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন। তারপর একবার তাকালেন আলোকোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের দিকে।

তিন

সুধাকান্ত আপন মনেই ভাবতে ভাবতে বাড়ীর পথ ধরলেন। রাস্তার সমস্ত মানুষ গিয়ে তখন নাটমন্দিরে ঢুকেছে। রাস্তায় তখন আরও কিছু লোক দ্রুত পদে চলেছে ঠাকুর বাড়ীর দিকে দেখবার জন্যে। সুধাকান্ত ভাবতে ভাবতেই চললেন—মানুষ জন এমন করে ছুটে যাচ্ছে কেন। খানিকটা ভাবতেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল তাঁর কাছে। তিনি বুঝলেন—দরিদ্র-সামান্য, এখানকার অপরিসর-গণ্ডীর মানুষের জীবনে এক বিরাট সম্পদশালী পুরুষের সপরিবারে আবির্ভাবের মধ্যে যে কল্পনাতীত সমারোহ রয়েছে তারই বিস্মিত দর্শক হিসাবে ওরা ছুটে চলেছে। সমস্ত সমারোহের কেন্দ্রস্থল যে মানুষটি তাকেই দেখবার আগ্রহে ছুটে চলেছে সব। এর মধ্যে বিস্ময় আর কিছুটা ভয় ছাড়া ভালবাসা, প্রীতি বা শ্রদ্ধার নাম মাত্র নেই। তবে বিস্ময়ে

আর ভয়ের মিলিত সিঞ্চনে এখানকার মানুষের চিত্তভূমি একেবারে সিক্ত হয়ে আছে। আনন্দ যদি ওদের মনে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারে সহজ বিশ্বাস উৎপন্ন ক'রে ভালবাসতে পারে তা হলে কৃতজ্ঞতায় প্রেমে ওরা আনন্দকে স্নান করিয়ে দেবে। ওকে ভালবাসার জন্যে সমস্ত মানুষ তৈরী হয়ে আছে। আনন্দের সে দিকে একটি পদক্ষেপের অপেক্ষা।

তিনি আপনার বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছে গিয়েছেন। এতক্ষণে তার সম্বিত ফিরল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন—এটা তার ঠিক হয় নি। ওখান থেকে এই মুহূর্তে চলে আসা তাঁর ঠিক হয় নি। একবার মনে হল—তাঁর মনে কোথাও কি গোপন ঈর্ষ্যার বিষধর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে? তিনি থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের একদিন দু জনের গলা ধরাধরি করে যাওয়ার কথা মনে পড়ল; সেদিন তাঁদের দুজনকে গলা-ধরাধরি করে যেতে দেখে এক বৃদ্ধ বলেছিলেন—জোড় মাণিক! সেই আনন্দ! তাঁর বাল্যকাল থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত সমস্ত কালটার প্রাণের বন্ধু! তাঁর চোখে এখন জল এসেছে। সেই আনন্দকে কি তিনি ঈর্ষ্যা করতে পারেন! সেই আনন্দ আজ এসেছে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়ে। এ তাঁর কত বড় সৌভাগ্য! আর আনন্দ যা পেয়েছে, যা পাবার তপস্যা করে তা তো তাঁর কামনার বস্তু নয়। তবে তাঁর ঈর্ষ্যা হবে কেন! তিনি আবার আনন্দের ঠাকুর বাড়ীর রাস্তা ধরলেন। আনন্দ এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে দেখা না করে তাঁর আসা উচিত হয় নি।

খানিকটা যেতেই তিনি দেখলেন—রসিক বাবু ছুটে আসছেন।

সুধাকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার রসিক বাবু, আপনি ছুটছেন কেন?

রসিকবাবু থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন, বললেন—আচ্ছা লোক যা হোক আপনি! কর্তা আপনাকে খুঁজছেন। বললেন তার সঙ্গে দেখা না করে কারও সঙ্গে দেখা করব না। সে কোথায়? তাকে ডাক আগে। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি মশায়। অথচ এদিকে ইস্কুলের ছেলেরা, মাষ্টাররা হাসপাতালের ডাক্তার, গ্রামের লোক সব অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। চলুন।

সুধাকান্তের বুকের ভিতরটা আবেগে একবার মোচড় দিয়ে উঠল।

আনন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না? সুধাকান্তের পায়ের গতি বেড়ে গেল।

একদিকে বিগ্রহের বিশাল মন্দির। মাঝখানে নাটমন্দির। তার চারিপাশে চকমিলানো দালানের সারি। পূর্ব দিকে ঠাকুরবাড়ীর ভাঁড়ার আর ভোগমন্দির; পশ্চিম দিকে চতুষ্পাঠী, দক্ষিণ দিকে একখানা ঘরে দেবোত্তর কাছারী। তার পাশে তিনখানা ঘর ভদ্র সম্ভ্রান্ত অতিথির থাকবার জন্য। উত্তর দিকে সাধারণ অতিথিশালা। দক্ষিণ দিকে ঘরের সামনে ভীড় করে দর্শনার্থীর দল দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই সামনে দিয়ে সুধাকান্তকে নিয়ে গিয়ে একটা ভেজানো দরজা আস্তে আস্তে ঠেলে রসিকবাবু ঢুকলেন।

একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বসেছিলেন আনন্দচন্দ্র। পিছনে অতিকায় চেহারার একখানা তালপাতার পাখা নিয়ে একজন চাকর তাঁকে বাতাস করছে। তিনি তখনও বেশ বাস পরিবর্তন করেন নি। সুধাকান্ত ঘরে ঢুকতেই আনন্দচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর জড়িয়ে ধরলেন সুধাকান্তকে আপনার বুকের মধ্যে। তাঁর পিঠের উপর বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলেন। বললেন—আরে, আরে, পাগল করে কি! কেঁদে আমার পিঠটা ভিজিয়ে দিলি? বলতে বলতে তাঁর নিজের দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন—ওরে বোকা, আমাকে কাঁদিয়ে দিলি তো!

গরদের শাড়ী-পরা বিদ্যুৎ কখন এসে ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি। তিনি এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীকে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কাঁদতে দেখেন নি। ইতিমধ্যে একবার লাখ কয়েক টাকা এক দফায় লোকসান হয়েছে, সে সময় বিদ্যুৎ দুঃখিত হলেও আনন্দচন্দ্র প্রকাশ্যে হেসেছিলেন। তারপর একটি ছেলে হয়ে মারা গেলেও আনন্দচন্দ্র চোখের জল ফেলেন নি। আর সেই মানুষ আজ কাঁদছেন। অবাক ব্যাপার বৈকি!

অনেকক্ষণ পর দুজনেই কান্না থামিয়ে কথা বলতে লাগলেন। বিদ্যুৎ একখানা তোয়ালে এনে স্বামীর হাতে দিলেন। আনন্দচন্দ্র নিজের চোখের জল মুছে তোয়ালেখানা সুধাকান্তের হাতে দিলেন, বললেন—ওরে চোখ

যাছ। নইলে এই অবস্থায় বাইরে বেরুলে লোকে ভাববে আমরা দুজনে ঘর বন্ধ করে মারামারি করেছি।

সুধাকান্ত আনন্দের হাত থেকে তোয়ালেটা নিলেন, কিন্তু মুখ মুছলেন না। আপনার কাপড়ের খুঁট দিয়ে আস্তে আস্তে চোখ মুছে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

আনন্দচন্দ্র বললেন—তোমাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভাই! তোমাকে কিছুই বলব না। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি বাল্যকাল থেকে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন তাই পাই।

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—কিছু বলতে হবে না ভাই। তুমি কিছু বলবে বলে তো করি নি। এমনিই করেছি। আবার যখন দরকার হবে এমনিই করব।

আনন্দচন্দ্র কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন—এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত পালটে ফেললাম, বুঝলে ভাই সুধা। আমি ঠিক করলাম এবার থেকে এখানেই থাকব আর মধ্যে মধ্যে আমার কলিয়ারীতে যাব, কিছুদিন করে থেকে আসব। এখানে মানুষ আমাকে এত ভাল বাসে! আজ আমি এখানে এসে সে কথা বুঝতে পারলাম।

সুধাকান্ত হাসলেন। কোন কথা বললেন না। এই তো কিছুক্ষণ আগে তিনি নিজেই এ কথা ভাবছিলেন। আনন্দ ভুল দেখেছে। আজ ওর চোখে অস্বাভাবিক গাঢ় মোহের অঞ্জন মাখানো রয়েছে। আজ ওর ভুল হয়, হোক। আর ও যদি এখানকার মানুষকে ভাল বেসে এখানে থাকতে পারে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য এখানকার মানুষের আর কিছু হতে পারে না। সুধাকান্ত মুখেও তাই বললেন—ভাই আনন্দ, তোমাকে ভালবাসার জন্যে এখানকার মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। তুমি এক পা এগিয়ে গিয়ে ওদের কাছে যাও। তোমার পাখানি ওরা ভালবেসে বুকে তুলে নিতে চাইবে।

সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন আনন্দর দুইচোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এল। কিন্তু সুকৌশলে চোখের জল সামলে নিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন—তুমি আমার এক পা এগিয়ে যাবার কথাটা কি বললে আমি ঠিক বুঝলাম না! বলে তিনি সকৌতূহলে সুধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সুধাকান্ত বললেন—ভাই, একথা ঠিক যে তোমাকে ভালবাসার জন্যে

এখানকার মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, এ কথা আমি আবার বলছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার অগাধ ঐশ্বর্য, ধন, প্রতিষ্ঠা দেখে সহজভাবে তোমার কাছে আসতে ওরা এখন ভয় পাবে। ওদের সেই ভয় তোমাকেই ভাঙাতে হবে। সেই জন্যেই একপা এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

—এই কথা। বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন আনন্দচন্দ্র।

সুধাকান্ত একটু অবাক হলেন। এটা আনন্দের চরিত্রে নূতন।

হাসি থামিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—হ্যাঁহে, নরনাথবাবু কেমন আছেন। আমার মনে হয় তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে। তা না হলে তিনি কি আর আত্মসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করে আমাকে জমি বিক্রী করতেন?

সুধাকান্ত জবাব দিলেন না, কেবল হাসলেন। বুদ্ধিমান আনন্দচন্দ্র ঠিকই ধরেছেন। সুতরাং সেই মানী লোকটির দুঃখের কথার পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি!

আনন্দচন্দ্র বললেন—এক কাজ করা যাবে সুধা। তুমি একবার বিকেল বেলা এস তোমার সুবিধা করে। একবার নরনাথ বাবুকে দেখে প্রণাম করে আসা যাবে। এখানে এলাম যখন তখন আর ঝগড়া করে কাজ কি!

সুধাকান্ত খুব খুসী হলেন। বললেন—তুমি সত্যিই মহৎ, তাই মহতের মত কথা বলেছ। আমি আসব। নিশ্চয় আসব।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন। বললেন—জয় করবার মত আর কিছু নেই এখানে সুধা!

সুধাকান্ত চমকে উঠলেন। এ কি কথা! জয় করতে হবে কেন? ওঃ, আনন্দ বোধহয় ভালবাসা দিয়ে মনোহরণের কথা বলছে।

আনন্দচন্দ্র অকস্মাৎ ডাকলেন—রসিক! এক কাজ কর। গ্রামের ইতর-ভদ্র সমস্ত বাড়ীর একটা ফর্দ করে দু সের করে মিষ্টি ধর। তারপর মিষ্টি এই দুপুর বেলা এখানে তৈরী করিয়ে সমস্ত বাড়ী বাড়ী পাঠাবে রাত্রেই, বুঝেছ?

সুধাকান্ত বললেন—ভাই, আমি এখন যাই। তোমার দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুধাকান্ত বেরিয়ে যেতে যেতে দেখলেন ইস্কুলের অনেকগুলি কিশোর মোটা মালতীফুলের সুন্দর এক গাছি মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার গন্ধে

সমস্ত জায়গাটি মোহময় হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে যেতেই তারা হুড়মুড় করে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিকেল বেলা সুধাকান্ত আনন্দচন্দ্রের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলেন আনন্দ-চন্দ্র ঠাকুরবাড়ীতেই আছেন। তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর শুভক্ষণ দেখে বসত বাড়ীতে প্রবেশ করবেন। আনন্দচন্দ্রকে খুজতে তিনি ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলেন। একটা চাপরাশ-পরা দারওয়ান দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুরবাড়ীর ফটকের মুখে হাতে সঙ্গীন-লাগানো বন্দুক নিয়ে। তাঁকে দেখে সে সসম্ভ্রমে একটা ফৌজী সেলাম ঠুঁকে দিলে। সে বোধহয় সকালবেলা সুধাকান্তকে অত্যন্ত হৃদ্যভাবে আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। নাটমন্দিরের নীচে দক্ষিণ দিকের ঘরের দরজার সামনে টুলের উপর একজন বেয়ারা বসে আছে। সে তাঁকে দেখে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সসম্ভ্রমে হাসলও একটু। তারপর বললে, কর্তা এই একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন। উঠেই আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনি ভিতরে যান। তিনি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

বেয়ারাটির কথা থেকে তাঁর মনে হল যেন বেয়ারাটি মনে করছে সুধাকান্তের কোন্ এক মহৎ ভাগ্যবলে আনন্দচন্দ্রের কাছে ডাক পড়েছে। সুধাকান্ত মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন। পরক্ষণেই নিজের রাগটা কতটা অকারণ সেটা অনুমান করে আপন মনেই একটু হাসলেন। তারপর ঘরের দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন।

আনন্দচন্দ্র ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপরেই বসে আছেন। পুরু নরম সাদা বকের পালকের মত বিছানা। ঝালর দেওয়া দুটো বালিশ। দুটো পাশ বালিশ এলোমেলো হয়ে গড়িয়ে পড়ে আছে। পাশেই রূপোর রেকাবের উপর রূপোর গেলাস রাখা। রূপোর রেকাবীতে নানান রকমের মশলা। দেওয়ালের গায়ে একটা হুকে-জড়ানো ক'ছড়া মালা ঝুলছে। তার মধ্যে সকালের সেই মালতী ফুলের মোটা গড়ে মালাটায় ঘরের বাতাস গন্ধ-মন্থর হয়ে আছে। একটা চাকর ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় পাখা নিয়ে দুহাতে ধরে বাতাস করছে।

খালি গায়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরে বিছানায় বসে আছেন আনন্দচন্দ্র।

তাঁর কোলের কাছে তাঁর ন বছরের মেয়ে বসে বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। বড় বড় চীনে মাটির পুতুল, কাঁচের পুতুল, নানান সজ্জায় সজ্জিত, নানান অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। মেয়ে খেলা করছে আর বাবার সঙ্গে গল্প করছে সুধাকান্ত ঘরে ঢুকতেই সে একটু সঙ্কুচিত হয়ে আপনার পুতুলগুলি গোছাতে লাগল।

আনন্দচন্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে সম্ভাষণ করলেন তাঁকে—এস ভাই এস। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকি তুমি পালাচ্ছ কেন? বস ওঁকে চেন না তুমি। উনি তোমার কাকা, ওঁকে প্রণাম কর।

তারপর সুধাকান্তকে সম্বোধন করে নিজের বিছানার পাশটা দেখিয়ে তাঁকে বসতে বললেন—এস ভাই, বস এইখানে। সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন—আনন্দচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সকাল বেলাকার সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উদ্বেল স্পর্শ আর নেই। তার পরিবর্তে একটি স্নিগ্ধ হৃদ্যতায় তাঁর কণ্ঠস্বর প্রসন্ন, উত্তপ্ত।

কালো কালো মোটা-সোটা শান্ত মেয়েটি আপনার মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দু'চোখের উপর ছড়িয়ে-পড়া চুলের রাশি দু-হাত দিয়ে সরাতে সরাতে এক ফাঁকে সুধাকান্তের দু পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। সুধাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুখানি ধরে তাকে আপনার কোলে টেনে নিলেন। অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি মা?

আপনার বড় বড় শান্ত চোখ দুটি সুধাকান্তের দিকে তুলে সে আস্তে আস্তে বললে—রাণী, রাধারাণী।

তাকে একবার পরম স্নেহে বুকের সঙ্গে চেপে সুধাকান্ত বললেন—সত্যিই মা তুমি রাধারাণী। তোমাদের মন্দিরের রাধারাণীকে দেখেছ মা? দেখনি?

—এখনও দেখিনি! কাল দেখব। আজ যে ঘোমটা ঢাকা রয়েছে বেনারসী কাপড় দিয়ে। কথা বলতে বলতে সে ধীরে ধীরে আবার বিছানায় গিয়ে আপনার পুতুলগুলি নিয়ে বসল। হঠাৎ একটা বড় চীনে মাটির পুতুল নিয়ে রাণী বললে—বাবা, আমার এই সায়েব পুতুলটা দেখতে আমাদের ম্যানেজার লরেন্স সায়েবের মত নয়? দেখ!

হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন আনন্দচন্দ্র। অট্টহাস্য করতে করতে তিনি বললেন—হারামজাদীর কথা শুনলে বিদ্যুৎ। ওর পুতুলটা নাকি

আমাদের নরেন্দ্রের মত দেখতে। আচ্ছা, তুই যখন যাবি তখন আমি সব বলে দেব নরেন্দ্রকে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বাপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—না বাবা, তুমি বল না নরেন্দ্র সায়েবকে। বললেই আমার পুতুলটা কেড়ে নিয়ে আমাকে বলবে—ই পুতুল আর থাকবে না। হামি তোমার লড়কা হব। হামাকে কোলে নিতে হবে। এস, হামাকে কোলে নাও। সে আমি পারব না বাবা।

হাসতে হাসতে আনন্দচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা বলব না। বলতে বলতে তিনি উঠলেন। সুধাকান্তকে বললেন—বস ভাই, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

আনন্দচন্দ্র উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। সুধাকান্ত বসে বসে রাণারাণীর পুতুল-খেলা দেখতে লাগলেন। বড় ভাল লাগছে তাঁর আনন্দর কন্যাটিকে। একবার করে পুতুলকে কাপড় পরাচ্ছে, গয়না পরাচ্ছে; পরক্ষণেই বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না, সব খুলে ফেলছে। মাথার চুলগুলো চোখের উপর এসে পড়ছে, সেগুলো হাত দিয়ে একবার করে সরিয়ে নিচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে সুধাকান্ত বুঝতে পারছেন যে তিনি পাশে বসে আছেন তারই দিকে তাকিয়ে এ কথাটা সে ভুলতে পারছে না। হঠাৎ সে পুতুল-খেলা ছেড়ে দিলে, বললে—ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল!

সুধাকান্ত উঠে ভেজানো দরজা খুলে দিলেন। বাইরে নাটমন্দিরে অনেক লোক কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। একদল লোক তরকারী কুটছে; অনেক মানুষ চঞ্চল পদক্ষেপে নানান কাজে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। আগামীকালের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রস্তুতি চলছে। তবু চাপা গুঞ্জন ছাড়া কোনো গোলমাল নাই। সুধাকান্ত বুঝলেন—আনন্দচন্দ্র যে এইখানে কাছেই আছেন সে কথা মনে করেই সকলে কাজ করছে। আনন্দচন্দ্রের উপস্থিতি সম্পর্কে মানুষগুলি প্রতি মুহূর্তে সচেতন হয়ে আছে দেবতার কথা ভুলে গিয়ে মানুষ এই মুহূর্তে একটি মানুষকেই যেন বসিয়েছে দেবতার আসনে।

হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল আকাশের দিকে। সারা আকাশ রক্তসন্ধ্যার মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। কি অপরূপ শোভা হয়েছে আকাশের। তিনি ঘর

থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই তিনি ডাকলেন—ও মা রাধারাণী, এইখানে এস, মেঘ দেখে যাও।

রাধারাণী পুতুল খেলা ফেলে ছুটে বেরিয়ে এল।

সুধাকান্ত বললেন—তুমি তো মা মানুষের তৈরী কত কাপড়-গয়না, পুতুল-খেলনা, বাড়ী-ঘর সব দেখেছ। ভগবানের তৈরী মেঘ দেখেছ কোনদিন? দেখ।

রাধারাণী তার বড় বড় চোখ মেলে আকাশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে আনন্দচন্দ্র আর বিদ্যুৎ দুজনেই বেরিয়ে এলেন। বিদ্যুৎ বললেন—ঠাকুরপো, আসার পর আপনি আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললেন না!

সুধাকান্ত শুধু হাসলেন, কি করে আর তিনি বলেন যে তাঁরই দেখা পাওয়া যায়নি তো কথা বলবেন তিনি কি করে! বিদ্যুৎ বললেন—আপনি রাত্রে আমাদের এখানে খাবেন। আমি আপনার বাড়ীতেও বলে পাঠালাম।

আবার একটু হাসলেন সুধাকান্ত। আনন্দচন্দ্র বললেন—চল সুধা। এমনিই দেরী হয়েছে। তারপর বিদ্যুতের দিকে ফিরে বললেন—এখন আর গল্প থাক। রাত্রেই হবে।

আনন্দচন্দ্রের পরণে কোঁচানো ফরাসডাঙার থান ধুতি, কোঁচাটা উল্টে কোমরে গোঁজা, গায়ে শক্ত কফ-আলা সাদা সার্ট, কাঁধে পাটকরা গরদের চাদর, পায়ে স্প্রিংওয়ালা চকচকে কালো জুতো, হাতে রূপো-বাঁধানো লাঠি। পিছনে একজন চাকরের হাতে মস্ত একটা মিষ্টির ঝাঁকা।

আনন্দচন্দ্র আর সুধাকান্ত রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। আকাশের রক্তসন্ধ্যার প্রবল সমারোহের ছায়া পড়েছে মাটিতে, মাটিও রক্তিম আভা ধরেছে। আনন্দচন্দ্র একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর চলতে চলতেই যেন আপন মনে বললেন—ওঃ, কি রক্তসন্ধ্যা হয়েছে! যাক কাল তা হলে কড়া রোদ হতে পারে! বর্ষার দিন! কালকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে বাঁচি।

সুধাকান্ত বললেন—তুমি কিছু ভেবো না ভাই! যাঁর কাজ তিনিই

করাবেন সব সুষ্ঠুভাবে। আর তা ছাড়া তুমি দেব-আশ্রিত মানুষ, তোমার কাজে কোন ব্যাঘাত হবে না।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন, বললেন—জান সুধাকান্ত, এই দেবতার আশ্রয় পেতে আমাকে কি কম ক্লেশভোগ করতে হয়েছে?

সুধাকান্ত বললেন—তা হবে না? দেবতার আশ্রয়ের জন্য তপস্যা করতে হয় না মানুষকে?

আনন্দচন্দ্র বললেন—কি দুস্তর কঠিন পরিশ্রম! কত ক্লেশ! তোমাকে সব বলব ধীরে ধীরে।

সুধাকান্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন—সে সব ক্লেশ পার হয়ে তো ভাই রাজার মত ঐশ্বর্যলাভ করছে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এই রাজার মত ঐশ্বর্য তোমাকে তোমার অন্তরেও রাজার মত ঐশ্বর্য দিক।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন—তোমার কথাগুলো আগেকার দিনে ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম, এখন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। এক আধ সময় বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, প্রায় হেঁয়ালীর মত লাগছে এক আধ সময়!

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—আবার কদিন তোমার সঙ্গে মেলা মেশা করি, তা হলেই আর বুঝতে কষ্ট হবেনা। আর তোমার কথা বুঝতে তো কই আমার একটু কষ্ট হচ্ছে না। অবশ্য এখনকার তোমাকে বুঝতে আমার সময় লাগবে। তবে তোমাকে চিরকাল প্রাণের মত ভালবাসি। বুঝতে তোমাকে ঠিক পারব। কোন কষ্ট হবে না আমার।

ছোট ছেলের মত কৌতুহলী হয়ে রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন আনন্দচন্দ্র, সুধাকান্তের কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকেও থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বলনা, বলনা, আমাকে কি বুঝলে তুমি! বল না, যেখানটা তুমি বুঝতে পারছ না আমার, তার কথা আমি তোমাকে বলে দেব।

সুধাকান্ত হাসলেন। সেই চিরকালের আনন্দ যে নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা বলতে চায় না, আর কারো কথায় যার কোন উৎসাহ নাই। তার উপর ঐশ্বর্যশালী আর প্রতিষ্ঠাবান হয়ে নিজের অহমিকাটা আকাশস্পর্শী হয়েছে। নিজের সম্পর্কে শুনবার উৎসাহের তার অন্ত নেই। আশেপাশের মানুষ শক্তিমান মানুষদের এই দুর্বলতাটুকু তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে এবং তার সুযোগ নেয়! কেউ সোৎসাহে সত্যের সঙ্গে বহুগুণ মিথ্যা

মিশিয়ে তার চরিত্র-চিত্রণ করে, মনোরঞ্জন করে, কেউ বা ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে করে। শক্তিমান প্রতিষ্ঠাবান মানুষ শোনে আগ্রহ সহকারে; অহঙ্কার আরও স্ফীত হয়, তার প্রায় সবটাই সত্য বলে অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বাস করে নেয়। সুধাকান্ত সে পথে গেলেন না। তিনি তো আনন্দচন্দ্রের চাটুকার নন, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি তোমার নিজেকে কতটুকু জান ভাই যে আমাকে তোমার সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে? না পারবে না তুমি। কেউই পারে না। আমি তোমার মধ্যে কি খুঁজছি জান? তোমাকে তো বললাম—তোমাকে আমি দেব-আশ্রিত পুরুষ বলে মনে করি, তাই খুঁজছি দেবতার আশীর্বাদ তুমি পুরোপুরি পেয়েছ কি না।

আনন্দচন্দ্রকে সুধাকান্ত যেন ধীরে ধীরে একটা বিচিত্র প্রশ্নের সামনে নিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে আনন্দচন্দ্রের দৃষ্টি থেকে লঘু কৌতুহল মুছে গিয়ে একটা কঠিন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টি ফুটে উঠল। মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি গভীর, কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সুধাকান্ত তাঁর দিকে স্নিগ্ধ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আমি খুঁজছি—তুমি যা সঞ্চয় করেছ, উপার্জন করেছ সেই পার্থিব বিত্তের চেয়ে তুমি বড় কি না! এই সম্পদ যদি কোন দিন তোমার না থাকে তা হলে আজ যে মহিমায় মানুষ তোমাকে দেখেছে সেই মহিমাতেই আবার তুমি মানুষের কাছে দাঁড়াতে পারবে, না পারবে না তাই খুঁজে দেখছি!

আনন্দচন্দ্রও এক নূতন সুধাকান্তকে দেখছেন। নিজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষের কাছে তিনি শুনে এসেছেন—তিনি শুধু অসাধারণ বিত্তবানই নন, অসাধারণ চরিত্রবান মানুষ। প্রতিদিন আশপাশের মানুষের কাছে শুনে শুনে নিজের সম্পর্কে নিজেও সেই ধারণা পোষণ করে আসছেন। নিজের ধারণার কথা নিজের মুখে আকারে ইঙ্গিতে কোথাও প্রকাশ করলে তা প্রতিবারই চারি পাশের মানুষের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ ও সোৎসাহ অনুমোদন পেয়েছে। আজ অকস্মাৎ এই প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে,—যার সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই ছিল যে তাঁর অন্যায় কাজেরও সমর্থন মিলবে এর কাছে,—অন্য রকমের কথা শুনে তিনি যেন হত-চকিত হয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজছেন। একবার মনে হল সুধাকান্ত সুতীব্র ঈর্ষ্যায় বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁকে আঘাত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের বিশাল ও বৃহৎ

অভিজ্ঞতায় ঈর্ষ্যাও তো অনেক দেখেছেন। সেখানে তো অমন শান্ত অথচ কঠিন প্রত্যয় থাকে না। এ তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তিনি সুধাকান্তকে প্রশ্ন করলেন—খুঁজে খুঁজে কি পেলে তুমি ?

সুধাকান্ত তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেই বললেন—সে মহিমায় পৌঁছুতে হলে অতি দীর্ঘ মানস-যাত্রার প্রয়োজন হয় ভাই। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাকে সেই পথের যাত্রী বলেই মনে হয়েছে। তোমার যাত্রা অন্য পথে নয়।

সুধাকান্তর উত্তর শুনবামাত্র আনন্দচন্দ্রের চোখের তীব্র উজ্জ্বল দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে এল। কপালের রেখার কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। এতক্ষণ যেন তাঁর সমস্ত জীবনটা একটা মুহূর্তে এসে ঘনীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিল চরম পরীক্ষায়। সেই কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি যেন সেই মুহূর্তে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। তাঁর মুখে অতি সূক্ষ্ম গভীর হাসি ফুটে উঠল। তিনি সুধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে বুঝলে তুমি ?

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—এই তো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে সেই পথেই চলেছি। এই যে তুমি নিজের ইচ্ছায় নরনাথ বাবুর বাড়ী চলেছ দেখা করতে মিষ্টির ঝুড়ি নিয়ে এই তো সেই পথ। তুমি তো না যেতেও পারতে। সেই আগের বিরোধ আর ক্ষোভের কথা মনে করে যদি না যেতে তাহলেও তো কিছু বলবার থাকত না! কিন্তু সেই ক্ষোভকেই তুমি শুধু অতিক্রম কর নি, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা আন্তরিক প্রীতি আর ক্ষমার পর্যায়েও উঠেছ। এ না হলে প্রীতির প্রকাশ হিসেবে ঐ মিষ্টির ঝুড়িটা তোমার সঙ্গে যেত না।

এইবার আনন্দচন্দ্র হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। নিঃশব্দ শান্ত পল্লীপথের ধারের গাছ থেকে কটা কাক সেই অট্টহাস্যে চকিত হয়ে কা কা করে উড়ে গেল। এতক্ষণে আবার দু জনে সহজ হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর দিকেও তাঁদের নজর পড়ল।

চারিপাশে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—নাঃ, আমি যাওয়ার পর গ্রামের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি দেখছি।

মিশিয়ে তার চরিত্র-চিত্রণ করে, মনোরঞ্জন করে, কেউ বা ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে করে। শক্তিমান প্রতিষ্ঠাবান মানুষ শোনে আগ্রহ সহকারে; অহঙ্কার আরও স্ফীত হয়, তার প্রায় সবটাই সত্য বলে অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বাস করে নেয়। সুধাকান্ত সে পথে গেলেন না। তিনি তো আনন্দচন্দ্রের চাটুকার নন, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি তোমার নিজেকে কতটুকু জান ভাই যে আমাকে তোমার সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে? তা পারবে না তুমি। কেউই পারে না। আমি তোমার মধ্যে কি খুঁজছি জান? তোমাকে তো বললাম—তোমাকে আমি দেব-আশ্রিত পুরুষ বলে মনে করি। তাই খুঁজছি দেবতার আশীর্বাদ তুমি পুরোপুরি পেয়েছ কি না।

আনন্দচন্দ্রকে সুধাকান্ত যেন ধীরে ধীরে একটা বিচিত্র প্রশ্নের সামনে নিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে আনন্দচন্দ্রের দৃষ্টি থেকে লঘু কৌতুহল মুছে গিয়ে একটা কঠিন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টি ফুটে উঠল। মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি গভীর, কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সুধাকান্ত তাঁর দিকে স্নিগ্ধ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আমি খুঁজছি—তুমি যা সঞ্চয় করেছ, উপার্জন করেছ সেই পার্থিব বিত্তের চেয়ে তুমি বড় কি না! এই সম্পদ যদি কোন দিন তোমার না থাকে তা হলে আজ যে মহিমায় মানুষ তোমাকে দেখেছে সেই মহিমাতেই আবার তুমি মানুষের কাছে দাঁড়াতে পারবে, না পারবে না তাই খুঁজে দেখছি!

আনন্দচন্দ্রও এক নূতন সুধাকান্তকে দেখছেন। নিজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষের কাছে তিনি শুনে এসেছেন—তিনি শুধু অসাধারণ বিত্তবানই নন, অসাধারণ চরিত্রবান মানুষ। প্রতিদিন আশপাশের মানুষের কাছে শুনে শুনে নিজের সম্পর্কে নিজেও সেই ধারণা পোষণ করে আসছেন। নিজের ধারণার কথা নিজের মুখে আকারে ইঙ্গিতে কোথাও প্রকাশ করলে তা প্রতিবারই চারি পাশের মানুষের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ ও সোৎসাহ অনুমোদন পেয়েছে। আজ অকস্মাৎ এই প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে,—যার সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই ছিল যে তাঁর অন্যায় কাজেরও সমর্থন মিলবে এর কাছে,—অন্য রকমের কথা শুনে তিনি যেন হত-চকিত হয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজছেন। একবার মনে হল সুধাকান্ত সুতীব্র ঈর্ষ্যায় বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁকে আঘাত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের বিশাল ও বৃহৎ

অভিজ্ঞতায় ঈর্ষ্যাও তো অনেক দেখেছেন। সেখানে তো অমন শান্ত অথচ কঠিন প্রত্যয় থাকে না। এ তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তিনি সুধাকান্তকে প্রশ্ন করলেন—খুঁজে খুঁজে কি পেলে তুমি ?

সুধাকান্ত তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেই বললেন—সে মহিমায় পৌঁছুতে হলে অতি দীর্ঘ মানস-যাত্রার প্রয়োজন হয় ভাই। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাকে সেই পথের যাত্রী বলেই মনে হয়েছে। তোমার যাত্রা অন্য পথে নয়।

সুধাকান্তর উত্তর শুনবামাত্র আনন্দচন্দ্রের চোখের তীব্র উজ্জ্বল দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে এল। কপালের রেখার কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। এতক্ষণ যেন তাঁর সমস্ত জীবনটা একটা মুহূর্তে এসে ঘনীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিল চরম পরীক্ষায়। সেই কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি যেন সেই মুহূর্তে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। তাঁর মুখে অতি সূক্ষ্ম গভীর হাসি ফুটে উঠল। তিনি সুধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে বুঝলে তুমি ?

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—এই তো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে সেই পথেই চলেছি। এই যে তুমি নিজের ইচ্ছায় নরনাথ বাবুর বাড়ী চলেছ দেখা করতে মিষ্টির ঝুড়ি নিয়ে এই তো সেই পথ। তুমি তো না যেতেও পারতে। সেই আগের বিরোধ আর ক্ষোভের কথা মনে করে যদি না যেতে তাহলেও তো কিছু বলবার থাকত না! কিন্তু সেই ক্ষোভকেই তুমি শুধু অতিক্রম কর নি, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা আন্তরিক প্রীতি আর ক্ষমার পর্যায়েও উঠেছ। এ না হলে প্রীতির প্রকাশ হিসেবে ঐ মিষ্টির ঝুড়িটা তোমার সঙ্গে যেত না।

এইবার আনন্দচন্দ্র হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। নিঃশব্দ শান্ত পল্লীপথের ধারের গাছ থেকে কটা কাক সেই অট্টহাস্যে চকিত হয়ে কা কা করে উড়ে গেল। এতক্ষণে আবার দু জনে সহজ হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর দিকেও তাঁদের নজর পড়ল।

চারিপাশে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—নাঃ, আমি যাওয়ার পর গ্রামের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি দেখছি।

সুধাকান্ত হেসে বললেন—হয়েছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যে খালি বসে বসে কোথায় কি বদল হল, এই বিশ বছর ধরে তাই লক্ষ্য করছি। আচ্ছা বল ত এখানটায় কি কি বদল হয়েছে। বলে সুধাকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচন্দ্রও দাঁড়িয়ে গিয়ে সুধাকান্তের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

তাঁরা মালতী লতায় আষ্টেপৃষ্টে ছাওয়া একটা মস্ত বকুল-গাছের কাছে দাঁড়িয়েছেন, পাশে খড়ের একখানি একতলা বাড়ী। বাড়ীখানি কি পরিপাটী আর পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর ভিতরে যেন বাগানও রয়েছে। গাছের তলাটা ঝরা বকুলে আর মালতীতে প্রায় সাদা হয়ে আছে। একটা ছাগল তলায় ঘুরে ঘুরে ফুল খেয়ে বেড়াচ্ছে। আনন্দচন্দ্র হাতের লাঠিটা তুলে ছাগলটাকে তাড়া দিলেন। ছাগলটা ছুটে পালাল। আনন্দচন্দ্র তন্ন তন্ন করে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনার পূর্বস্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন—এই তো সেই বকুলতলাটা।

সুধাকান্ত হাসতে হাসতে বললেন—এ আর তুমি নতুন কি বলবে? এ তো দেখাই যাচ্ছে।

একটু থমকে থমকে আনন্দচন্দ্র বললেন—বলছি! দাঁড়াও বলছি। এই বকুল গাছটা পুরানো। আর সব নতুন। এই মালতীলতা, ঐ বাড়ী—সব নতুন। কেমন না?

সুধাকান্ত বললেন—সাবাস। এই রকম স্মৃতি না হলে কি বড় হয় মানুষ। ঠিক হয়েছে।

আনন্দচন্দ্র ছোটছেলের মত খুসী হয়ে বললেন—কেমন, হয়েছে তো? মালতী-লতা কেমন করে হল তা নয় তো না-ই জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু বাড়ীটা কার বলতো?

সুধাকান্ত হাসতে হাসতে বললেন—বাড়ীটা কার তাও বলছি। এমন কি মালতী-লতাটা কি করে হল তাও বলছি।

আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—না কি! তুমি তাও জান?

সুধাকান্ত হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললেন—হ্যাঁ তাও জানি। বাড়ীটা হল নরনাথবাবুর ভাগনীজামাই খগেন মুখুজ্জের বাড়ী। নরনাথবাবুর যে ভাগনীর

সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, যাকে তুমি বিয়ে করনি, সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে খগেনের।

চল্লিশ পার হয়েছেন আনন্দচন্দ্র। তবু এই বকুল আর মালতী ছড়ানো বকুলতলায় বকুল আর মালতীর গন্ধে-মন্থর বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে, রক্তসন্ধ্যার মেঘের দিকে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্রের বুকটা একবার দুলে উঠল। তিনি কেমন অন্যমনা হয়ে প্রাক-সন্ধ্যার বিষণ্ণ রক্তিম মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুধাকান্ত একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন—বিয়ের পর মামা-শ্বশুরের কাছে জায়গা নিয়ে বাড়ী তৈরী করে এইখানে এসে খগেন বসবাস করছে। আশ্চর্য মানুষ এই খগেন! সেই পুঁতেছে ঐ মালতী গাছ। ওর স্ত্রীর নাম মালতী। ওদের বিয়ের প্রথম বৎসর পূর্ণ হবার দিনে সে গাছটা পুঁতেছিল। কচি গাছটার ওপর ওর কি যত্ন! তারপর ধীরে ধীরে গাছটাকে বড় করে বকুলগাছটার উপর তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। কেউ কিছু বলে ঠাট্টা করলে খগেন এখনও বলে—আমি যে আমার মালতীকে ভালবেসেছি তারই জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছি।

কথাটা যেন আনন্দচন্দ্র শুনেও শুনলেন না। তিনি বাড়ীটার দিকে তাকিয়েছিলেন, বললেন—বাড়ীটা তো পরিপাটি হে! আমার ঐ পাকা বাড়ী না হলে অমনি একটা বাড়ী তৈরী করে তাতে থাকতাম। বাগানও আছে দেখছি বাড়ীতে!

সুধাকান্ত বললেন,—তবে আর বলছি কেন, খগেন আশ্চর্য মানুষ। সারা সময়টা তো সে গাছপালা নিয়েই আছে। বিয়ের আগে গান বাজনা নিয়ে থাকত। লম্বা চুল রাখত। বিয়ের পর থেকে গান-বাজনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে, মাথার লম্বা চুল ফেলে পড়েছে গাছপালা আর স্ত্রীকে নিয়ে। সেও তো অনেক দিন হয়ে গেল। তারপর থেকে সেই নিয়েই আছে।

আনন্দচন্দ্র সুধাকান্তর কথা শুনছেন কিনা কে জানে তিনি মাথা হেঁট করে হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলেন। সুধাকান্তও তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে সুধাকান্ত বলতে বলতে চললেন—আশ্চর্য মানুষ! কত পরিবর্তন হচ্ছে গ্রামে। কত কত ঘটনা ঘটে গেল গ্রামে, তবু লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। সে আপনার নিয়ে আছে। খুব সকালে যাও

দেখবে একটি ভাঙা গড়গড়া নিয়ে ফুল-ভর্তি বাগানের মধ্যে বসে আছে ফুলের মাঝখানে। খানিকটা বেলায় যাও দেখবে কোমরে কাপড় বেঁধে বাগানের মাটি খুঁড়ছে। দুপুর বেলা থাকে ঘরের মধ্যে, শুনি নাকি সে সময়টা গল্প করে স্ত্রীর সঙ্গে। বিকেলে গেলে দেখতে পাবে সে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে গাছে ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে। সন্ধ্যার সময়, কি শীত কি গ্রীষ্ম, কি শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ মালতীকে নিয়ে বাগানের মধ্যে বসে তার খানিকক্ষণ গল্প করা চাই-ই।

আনন্দচন্দ্র মাথা হেঁট করে সুধাকান্তের পাশে পাশে হেঁটে চলছিলেন, আপনার হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ বাঁকা করে মুখ তুলে সকৌতুক হাসি হেসে বললেন—বর্ষার রাত্রিতে কি ঘটে হে? তখন দাম্পত্য-আলাপ চলে কি করে?

সুধাকান্ত আনন্দচন্দ্রের কথায় কি বুঝলেন কে জানে, তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে খুব মিষ্টি করে একটু হাসলেন, বললেন—তখনও ওর গল্প চলতে অসুবিধা হয় না। বাগানে বসতে পারে না বটে, কিন্তু বাগানের সামনে ঘরের বারান্দায় বৃষ্টিতে ভেজা বাগানের দিকে তাকিয়ে গল্প চলে।

আনন্দচন্দ্র এক মনে ওদের কথা শুনছেন বুঝতে পারছেন সুধাকান্ত। আনন্দচন্দ্র অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন—ওদের ছেলেপুলে কি হে?

—ছেলেপুলে নেই বলেই একজন আর একজনকে পুরোপুরি ভালবাসতে পেরেছে, এমনি করে বাগান আর স্ত্রী নিয়ে থাকতে পেরেছে! ছেলেপুলেতে ভাগ বসায় নি পরস্পরের ভালবাসায়। ওরা দুজনে আছে বেশ!

—ভাগ্য তা হলে সে দিক দিয়ে তো ভালই হে! কিন্তু চলে কি করে? অবস্থা কেমন?

—কেমন অবস্থা? চলে কি করে? চলে না তো! অচল অবস্থার মধ্যে দিয়েও হাসি মুখে বেশ চলেছে দু জনে। সামান্য বিঘে কয়েক জমি আছে। তাতেই বছরের খোরাকটা দুজনের চলে যায় কায়ক্লেশে।

—আর কিছু করে না তোমাদের খগেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আনন্দচন্দ্র। তিনি বুঝতেই পারেন না কি করে একটা পূর্ণবয়স্ক সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ কিছু না করে থাকতে পারে।

—তবে আর বলছি কি! সে সম্বন্ধে ওকে কোন কথা বললে সে কি লম্বা লম্বা আর বিদঘুটে জবাব ওর। কিছু করবার কথা বললে ও কি বলে জান? বলে—আমি যদি কাজের মানুষ হই তবে আমার অকাজের ফসল দুটি দেখবে কে? অকাজের ফসল দুটি বুঝলে তো? এক ওর বাগান, দুই ওর স্ত্রী। ওর স্ত্রী মালতী বড় ভাল মেয়ে! সেও স্বামীকে আগে আগে নাকি এক আধবার কাজ করবার জন্যে বলেছে। তাতে নাকি ও স্ত্রীকে জবাব দিয়েছিল—কাজ করতে গেলে তো আমার খুব মুস্কিল হবে। প্রথম কথা, আমি সব কাজ করতে ভুলে গিয়ে যে অকেজো হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া দ্বিতীয় কথা আর আসল কথা—আমার মালতীকে আর আমার বাগান ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না। আমি এই দুই নিয়ে থাকি। বাগানে কাজ করতে করতে হঠাৎ আমার মালতীর কথা মনে হয়, ছুটে আসি মালতীর কাছে; আবার মালতীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বাগানের কথা মনে হলে বাগানে চলে যাই ছুটে। তাই তো বলছিলাম, আশ্চর্য মানুষ আমাদের খগেন।

খগেনকে যদি বাইরে দেখ দেখবে খগেনের হাতে একটা খুরপি, না হয় কোন চারাগাছ, না হয় দুই। আমি খগেনকে এও বলেছি—খগেন, তোমার গাছপালারই যখন এত সখ তখন ফলের বাগান কর না কেন! আনন্দও পাবে সমান, উপরন্তু ফলও ফলবে, দুটো পয়সাও পাবে। তা খগেন আমাকে কি বললে শোন। হাত জোড় করে বললে—ভাই, মাপ করো আমাকে। ফলের চাষ আমার দ্বারা আর হল না। ফলের আশা করে তো কিছু করি নি কোন দিন। চিরদিন ফুলই বুনলাম, যে খুশী হবে বলে ফুল বুনেছি সেই মালতী আমার খুসী হয়েছে এই ফলই আমার যথেষ্ট। আর কোন ফলই আমার চাই না ভাই। সে আমার সহ্য হবে না। এই মানুষ! ভালবাসায় এমন অকপট নির্লজ্জতা আছে যা দেখলে তোমার বিরক্ত লাগবে, আতিশয্য মনে হবে। কিন্তু কথাগুলি এমন মিষ্টি করে বলে যে ওর ওপর বিরক্ত হওয়া যায় না কিছুতেই।

আনন্দচন্দ্র শুনতে শুনতে নিম্নকণ্ঠে একটু হেসে বললেন—বাঃ, এযে একেবারে তোমার শিরি-ফরহাদের গল্প। বা ভাল!

চুপ করে গেলেন আনন্দচন্দ্র। সুধাকান্তের কথাও শেষ হয়েছে। দুজনেই

নিঃশব্দে চলেছেন। হঠাৎ আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা সুধাকান্ত, তোমার হিলুকে মনে পড়ে?

সুধাকান্ত একবার তির্যকভাবে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলেন আনন্দচন্দ্রের মন বিশ বছর পিছিয়ে সেই পুরনো দিনে ফিরে গিয়েছে। সুধাকান্ত গাঢ় প্রীতির সঙ্গে জবাব দিলেন—পড়ে না? হিলু বৌ ঠাকরুণকে কি ভুলতে পারি কোনদিন? আর তা ছাড়া জান আনন্দ, আজকাল তাঁকে আরও বেশী করে মনে পড়ে। মনে হয় সে তোমার এই অগাধ ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারলে না।

আনন্দচন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, বললেন—সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাকে ভুলে গিয়েছি। তাকে কেন বিদ্যুতকেই কি আর মনে পড়ে! সে চোখের সামনে আছে, তবু তাকেও মনে থাকে না। অথচ সে তো আমাকে হিলুর চেয়ে কম ভালবাসে না, কম যত্ন করে না! ভালবাসা জিনিষটাই আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি মনে হয় মাঝে মাঝে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ নিয়ে থাকি, মানুষের মুখ ভালবাসার কথা মনে করবার সময় কখন! সেবা যত্ন যা পাবার সে ঠিক ঠিক সময়ে হিসেব মত পেয়ে যাই। কে দিলে কে করলে তার খেয়ালও থাকে না। রাত্রে যখন শুতে যাই তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। আর জেগে থাকলে রাজ্যের কাজের চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরে বেড়ায়! এই তো জীবন! ভালবাসা পাবার কি ভালবাসবার সময় কোথায়? তবে হ্যাঁ, ওরি মধ্যে বিদ্যুৎ যা দেয় তা হিলুর চেয়ে কম নয়। যখন বিদ্যুতের কথা মনে হয় তখনই মনে হয় নিশ্চিন্ত আছি, আমার নিজের জন্য ভাববার দরকার কি।

সুধাকান্ত বুঝলেন, মুখে যাই বলুন আনন্দচন্দ্র তাঁর জীবনে কোথায় এ বিষয়ে একটা আক্ষেপ আছে। কি আক্ষেপ সে আর সঠিক কোনদিন সুধাকান্ত জানতে পারবেন না। আগেকার দিনে বিশ বছর আগে যে আনন্দের, তাঁকে সব না বললে ঘুম আসত না, পেটের ভাত হজম হত না, সে আনন্দ আর নেই। বিশ বছরের দূরত্বে আর অগাধ ঐশ্বর্যে সে আনন্দ তাঁর কাছ থেকে অনেকদূর সরে গিয়েছেন। হয়তো শুধু তাঁর কাছ থেকেই কেবল নয়, নিজের কাছ থেকেও হয়তো অনেক দূরে সরে গেছেন। যদি জীবনে

কোন সূক্ষ্ম আক্ষেপ থেকেও থাকে তাকে হয় আর বুঝতে পারেন না, নয় তাঁর কথা নিজের কাছেই গোপন করেন। তিনি যে সব কিছুতেই সব সুখেই যে কারো চেয়ে কম সুখী নন এই কথাটাই ধীরে ধীরে নিজেকে বোঝাতে চান। সেই কথাতেই ছেদ টানলেন আনন্দচন্দ্র। বললেন—যখন নিজের কথা ভাববার কিছুটা সময়ও পাই তখন ভেবে দেখলে দেখি কি জান? টাকা পয়সার কথা বাদ দাও জীবনে ভালবাসা সুখ শান্তির বিনিময়ে পয়সা পাই নি। ভালবাসা, সুখ শান্তি মানুষে যা পায় আমি তার চেয়ে কম কিছু পাই নি।

সুধাকান্ত বুঝলেন আনন্দচন্দ্রের এই বার বার 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলার মধ্য দিয়েই না পাওয়ার সূক্ষ্ম বেদনা আত্মপ্রকাশ করছে। হয়তো এই মুহূর্তেই খগেন আর মালতীর কথা শুনে সেটা তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। সুধাকান্ত প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন—তা যদি তুমি জীবনে না পেতে ভাই, তা হলে কি এমন সহজ মানুষ তুমি থাকতে পারতে? পারতে না! মানুষের স্বভাব এমনিই যে প্রতিদিনের জীবন তাকে বার বার আপনার সহজ চেহারাটি থেকে সরিয়ে উৎক্ষিপ্ত করে দিতে চায়। কিন্তু পারে না। মনের স্বভাবের যতটুকু ক্ষতি হয় প্রতিদিনের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আবার সেই ক্ষতটুকু আরোগ্য করিয়ে দেয়।

আনন্দচন্দ্রের মুখে হাসি ফুটে উঠল, কথাটা তাঁর মনে ধরেছে। তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ। ঠিক কথা। অন্ততঃ আমার যে কাজ তাতে যদি আমি সংসার থেকে ভালবাসা আর মমতা না পেতাম তা হলে কোনদিন পাগল হয়ে যেতাম।

অকস্মাৎ আনন্দচন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে সুধাকান্তের হাতটা ধরলেন। সুধাকান্ত চমকে বললেন—কি হল?

আনন্দচন্দ্র গলা খাটো করে বললেন—একটি মেয়ে ভিজে কাপড়ে জল নিয়ে আসছে। চল, তাড়াতাড়ি পেরিয়ে চল।

সুধাকান্ত একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—সত্যিই একটি মেয়ে ভিজে কাপড়ে জলভর্তি ঘড়া কাঁখে নিয়ে আসছে এই দিকেই। মেয়েটি তাঁদের দেখতে পেয়ে মাথার ঘোমটাটি একটু বেশী করে টেনে দিয়ে কাঁখের ঘড়া সমেত পিছন ফিরে দাঁড়াল। তাঁরা দুজনে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্র বললেন—এ সব ভুলেই গিয়েছিলাম হে! আজ এই জল নিয়ে যেতে দেখে বড় ভাল লাগল। ঘড়ার গায়ে মেয়েটির ফর্সা শাঁখাপরা হাতটা দেখে হিলুকে মনে পড়ে গেল। জান!

সুধাকান্ত বললেন—মেয়েটি খুব ফর্সাই বটে। একেবারে পাকা রঙ। এই পাড়াগাঁয়ে এতদিনেও ওর রঙ নষ্ট হয় নি।

আনন্দচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন স্বাভাবিকভাবেই—মেয়েটি কে? আর কে বললেই বা চিনব কি করে?

সুধাকান্ত বললেন—ঐ আমাদের খগেনের মালতী।

আনন্দচন্দ্র ছোট্ট একটু জবাব দিলেন—অ। কিন্তু তাঁর বুকের ভিতরটা আর একবার দুলে উঠল। ইচ্ছা হল একবার পিছন ফিরে মেয়েটির দিকে তাকান। কিন্তু মর্যাদায় বাধল। তিনি সহজভাবে এগিয়ে চললেন। চলে যাওয়া, জীবনের পথে বহু পিছনে একদা অনাদরে ফেলে-আসা মেয়েটির কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার জন্য প্রশ্ন করলেন—আর কতদূর হে তোমার নরনাথবাবুর বাড়ী। চাকরটাই বা কতদূরে?

তিনি একবার পিছনে ঘাড় ফেরালেন। চাকরটা ঐ পিছনে আসছে। তা ছাড়া রক্তমেঘের আবীর ছড়ানো পথ শূন্য! কেউ কোথাও নেই। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পথ অসহায় অর্থহীন হতাশার মত শূন্য পড়ে আছে।

সুধাকান্তের সঙ্গে নরনাথবাবুর বাড়ীর দরজায় ঢুকবার আগে আনন্দচন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন। চারিদিকটা তাকিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ দেখার পর সুধাকান্তকে বললেন, নরনাথবাবুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে সে আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথমে রসিকের চিঠি পেয়ে খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। তারপর ব্যাপারটা ওখানে বসেই অনুমান করেছিলাম। অবস্থা খারাপ না হলে তিনি যে কিছুতেই জমি বিক্রী করতেন না তা আমি জানতাম। যে অভিমানী দুর্যোধনের মত মানুষ! কিন্তু ওঁর অবস্থা যে এত খারাপ হয়েছে তা তো বুঝতে পারি নি!

তাঁদের মুখের সামনে বাড়ীর দেউড়ীর বড় দরজাটার একটা পাল্লা নেই, আর একটা পাল্লা কব্জা খুলে মানুষের ঘাড়ের উপর অতিকায় ঘটোৎকচের মত ভেঙে পড়বার অপেক্ষায় রয়েছে যেন। দেউড়ীর পাশেই বাংলো ধরনের বৈঠকখানা। আনন্দচন্দ্র যখন গ্রামে ছিলেন তখনও প্রতিদিন

সকাল-সন্ধ্যা মানুষজনে গমগম করত। বারান্দায় একটা ভারী চেয়ারে গড়গড়ার নল হাতে বৈঠকখানার ভীড় সামলে সামনের রাস্তাটা আগলে তিনি বসে থাকতেন।

আর আজ এ কি! বৈঠকখানাটা জনশূন্য, একটা লোক পর্যন্ত নেই। দরজাগুলো খোলা হাঁ হাঁ করছে। তাঁদের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা নেড়ী কুকুর ঘাড় নীচু করে লেজ কুঁকড়ে অপরাধীর মত তাঁদের দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল। কোথায় যেন খস খস শব্দ উঠছে এই অন্তহীন স্তব্ধতার মধ্যে।

আনন্দচন্দ্র নীচু গলায় বললেন, কি ব্যাপার হে! নরনাথবাবু কি আর বাইরে বসেন না? একেবারে অন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন?

সুধাকান্ত বললেন, তাইতো দেখছি! তারপর তিনি একটু জোরে গলা ঝাড়া দিলেন।

পিছনের বারান্দায় খস খস শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। সেইখান থেকেই প্রশ্ন এল—কে? তারপর পায়ের শব্দ উঠতে লাগল। ঝাঁটা হাতে একটা বার চৌদ্দ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। বোধহয় নরনাথবাবুর বাড়ীর গরু বাছুরের রাখাল।

ছেলেটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে হাঁ করে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, ওর হাতের ঝাঁটাটা খসে পড়ে গেল হাত থেকে। তার পরই ছুটে ভিতরে চলে গেল।

সুধাকান্ত ডাকলেন, ওরে শোন্, শোন্‌রে! আনন্দচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

সুধাকান্ত বললেন, তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। নিশ্চয় খবর দিতে ছুটেছে বাড়ীর ভেতর।

আনন্দচন্দ্র আর সুধাকান্ত দুজনেই দাঁড়িয়ে আছেন। মিষ্টির ঝুড়ি হাতে চাকরটা পিছনে দাঁড়িয়ে। তার মহামান্য প্রভুকে এমনিভাবে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে সে বললে, কি রকম বাড়ী! একটা মানুষ নেই, জন নেই। একটা লোক যদি দেখলে তো দেখে ছুটে পালিয়ে গেল যেন ভূত দেখেছে।

আনন্দচন্দ্রের মুখে কৌতুকের হাসি তখনও খেলা করছিল। তিনি চাকরের কথা শুনে আবার একটু হাসলেন, তারপর তাকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—তুই চুপ কর বাবা!

নরনাথবাবু ছুটতে ছুটতে অন্ধকারের মধ্যেই একা এসে হাজির হলেন। লোকজন কিম্বা আলো না নিয়েই তিনি একা ছুটে এসেছেন। তিনি রাখাল ছেলেটার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি।

প্রায়ন্ধকারের মধ্যে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন—তুমি, তুমি আনন্দচন্দ্র? তুমি এসেছ? আমার কাছে এসেছ?

আনন্দচন্দ্র কোন কথা না বলে তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতেই আনন্দচন্দ্রকে নরনাথবাবু জড়িয়ে ধরলেন। বাষ্পজড়িত কণ্ঠ ঝেড়ে পরিস্কার করে নিয়ে বললেন—তুমি আমার বাড়ী এসেছে? এস, এস, বাড়ীর ভিতরে এস। বলে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন আনন্দচন্দ্রকে। সুধাকান্তকে পৃথক ভাবে বললেন—তুমি তো আমার ঘরের মানুষ।

পরমুহূর্তেই বৃদ্ধের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে নিস্তব্ধ অন্ধকার বার বার শিউরে উঠল—ওরে আলো আন, তাড়াতাড়ি আলো আন।

আপনার শোবার ঘরে আপনার পরিপাটি বিছানার উপর দু জনকে বসিয়ে বৃদ্ধ কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

সুধাকান্ত একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি কখনও নরনাথবাবুর অন্দর মহলে আসেন নি। দাওয়া-উঁচু একতলা বাড়ীর নীচের তলার কোণের ঘর। দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খোলা। সেই দিক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। দূরে কোথাও বোধ হয় বৃষ্টি হয়ে গেল।

পুরানো বাড়ী, দেওয়ালে নোনা লেগেছে, ছাদের চুন-বালি খসে গিয়ে টালি বেরিয়ে পড়েছে। যে খাটখানায় বিছানা পাতা সেখানা ভারী হলেও অত্যন্ত জীর্ণ হয়েছে। চৌকো লণ্ঠনের ম্লান স্বল্প আলোয় সমস্ত পরিবেশ আশ্চর্য রকমের বিষন্ন লাগল সুধাকান্তের চোখে। তবু বিছানাটি কি পরিপাটি, মশারীটি পরিষ্কার ধবধবে, চার কোণ টান করে টাঙানো। নরনাথবাবুর পোষাকও আপনার বিছানার মত পরিষ্কার, পরিপাটী।

আনন্দচন্দ্র আসাতে নরনাথবাবু যেন বিগলিত হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মত বাকপটু, সামাজিক মানুষও কি বলবেন, কি করবেন যেন ঠিক করতে পারছেন না। তিনি ঝাড়া পরিপাটী বিছানা আবার ঝেড়ে বললেন—

বস, বস, এইখানে উঠে বস। ভাল করে বস পা তুলে। নইলে মশা কামড়াবে। তুমি তো আজকেই এসেছ, আজ এসেই যে আমার এখানে এসেছ এতে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব।

আনন্দচন্দ্র জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে বহু বিভিন্ন প্রয়োজনে মিশেছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা সহজে আয়ত্ত করবার বহু অভিজ্ঞতাই তাঁর আছে। তিনি বৃদ্ধের আবেগ বন্ধ করবার জন্যে নিজে কথা আরম্ভ করলেন, এ কি কথা বলছেন আপনি! গ্রামের মধ্যে প্রথম গণনীয় মানুষ আপনি। এখানে মাটিতে পা দিয়ে আপনাকে প্রথম প্রণাম না করে এখানকার জীবন আরম্ভ করলে আমার জীবন-যজ্ঞ যে শিবহীন হবে। সেই জন্যেই তো আপনাকে প্রণাম করতে এলাম।

বৃদ্ধের গলার মধ্যে আবেগজড়িত কথা আটকে গেল। সেটা তিনি বার কয়েক অল্প কাসি দিয়ে সাফ করে নিলেন। কিন্তু আবেগকম্পিত হাতখানা ধীরে ধীরে আনন্দচন্দ্রের মাথায় রেখে বললেন—আমি শুনেছি, সব শুনেছি। তুমি রাজা হয়েছ, আশীর্বাদ করছি তুমি সম্রাট হও। বহু কীর্তি স্থাপন করেছ, বহুতর কীর্তি করবার শক্তি হোক। তুমি নিজে বহুমানভাজন, তাই মানীর সম্মান জানো। তাই আজ আমাকে মান দিতে আমার কাছে এসেছ। আমি আজ আমার নিজের সম্মান নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছি।

সুধাকান্ত চুপ করে এঁদের দুজনের কথা শুনছেন। এই জীর্ণ ঘর, এই বিষণ্ণ পরিবেশের মতই মানুষটির কথাবার্তাগুলি তাঁর মনে আশ্চর্য এক বিষণ্ণতার জাল বিস্তার করেছে। অথচ এরই আড়ালে এই দুটি মানুষের আজকের সন্ধ্যার অকপট প্রীতি-সিক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরস্পরের সম্পূর্ণ হৃদয় নিবেদনের যে দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করছেন তাকে ঐশ্বরিক প্রেমেরই পরম প্রকাশ বলে তাঁর মনে হল। আজ আর তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এই আবেগ-পীড়িত, প্রীতি-সিক্ত, আজ সন্ধ্যার এই অকপট মানুষটিই একদিন তাঁর কাছে কি কঠিন সন্দিগ্ধ কালো মেঘে-ঢাকা হৃদয় নিয়ে গিয়ে এই মানুষটির সঙ্গেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আস্ফালন জানিয়ে এসেছিলেন। আর আজ প্রীতি আর শ্রদ্ধার শীতল স্পর্শ মাত্রেই সেই গভীর কালো সন্দেহ প্রীতি হয়ে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। সেই সারা-হৃদয়-ছাওয়া সাপের গায়ের মত কালো সন্দেহের মেঘ এতটুকু শীতলতায় জল হয়ে ঝরে পড়ল এইটাই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য!

আনন্দচন্দ্র সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বললেন, এমন কথা ভাবছেন কেন? আপনার আজও যা আছে তা আছে কার গ্রামে? আপনি আবার নূতন করে জীবনে ঢুকুন। আর আমি ব্যবসায়ী মানুষ। উদ্দেশ্য না নিয়ে তো কোথাও যাই না! আপনার কাছেও এই যে এসেছি তাও এসেছি একটি প্রার্থনা নিয়ে।

শশব্যস্ত হয়ে নরনাথবাবু বললেন, সে কি কথা, বল, বল। তবু নরনাথ-বাবু অনেকটা সামলে নিয়ে সহজ হয়ে উঠেছেন। রসিকতা করে হেসে বললেন—বল বল শুনি। রাজভিখারীর ভিক্ষাটা শুনি।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন। সুধাকান্তের মনে হল এমন সুন্দর হাসি কি আনন্দচন্দ্র এর আগে কখনও হেসেছেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ছেলেবেলায় আনন্দ হিলুর কথা বলতে বলতে এমনি করে হাসত। তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন আনন্দচন্দ্র। তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—সুধাকেও এখনও বলা হয়নি কথাটা; ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে তো কোন কাজ এখানে করি না। তা আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। দীর্ঘদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কিছু সম্পত্তি করেছি, টাকাও সামান্য কিছু জমিয়েছি। তা এখানেই গ্রামে যখন বসবাস করব তখন কিছু জমিজমাও কিনব মনে করেছি। সে সুধাই আমার ব্যবস্থা করে কিনে দেবে। এই সঙ্গে খানিকটা কাছে পিঠের জমিদারীও কিনতে চাই। তা না হলে এখানে এ অঞ্চলের লোকে মানবে না। আপনি নিজে দেখে শুনে খানিকটা জমিদারী আমার জন্যে কিনে দিন।

সুধাকান্ত দেখে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। যে প্রস্তাব আনন্দচন্দ্র এখনই নরনাথবাবুর কাছে করলেন, তিনি পরিস্কার বুঝতে পারছেন এই বাড়ীতে ঢুকবার মুহূর্তে তার আভাসমাত্র আনন্দচন্দ্রের মনে ছিল না। আনন্দচন্দ্র ভালবাসার বন্যায় ভেসে চলেছেন পরম আনন্দে।

বৈষয়িক নরনাথবাবু অকস্মাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন, বললেন,—নিশ্চয়, নিশ্চয় করে দেব। আমার এই বুড়ো হাড়ে যতখানি হবে তা নিশ্চয়ই করে দেব। এ আর কথা কি!

আনন্দচন্দ্র বললেন, আজ তা হলে উঠি।

নরনাথবাবু যেন এটা প্রত্যাশাই করেন নি। এই পরম আনন্দের

মুহূর্তগুলি এখনই শেষ হয়ে যাবে এ যেন তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তিনি অবাক হয়ে বললেন, উঠবে? এখনিই উঠবে? তোমার গরম লাগছে নয়? এই জানালার কাছে বস। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আর, আর একটু মিষ্টি মুখ করে যাও। তুমিই মিষ্টি এনেছ, তোমাকেই আগে খাওয়াই।

আনন্দচন্দ্র উপেক্ষা করতে পারলেন না। বসতেও হল, মিষ্টিও খেতে হল। সুধাকান্ত অবশ্য খেলেন না, তাঁর সন্ধ্যা হয় নি।

খেতে খেতে আনন্দচন্দ্র বললেন, সমস্ত বাড়ী এত নিস্তব্ধ লাগছে কেন?

নরনাথবাবু হাসলেন অদ্ভুতভাবে, বললেন—মানুষ থাকলে তবে তো কথা থাকবে বাড়ীতে। মানুষ কোথায়? মানুষ কি আছে আমার বাড়ীতে? স্ত্রী আজ বিশ বছর গত হয়েছেন, গত হয়ে বেঁচে গিয়েছেন। আমি একটা ঠাকুর আর একটা চাকর নিয়ে এই শূন্য পুরী আগলে পড়ে আছি। থাকবার মধ্যে এক ছেলে। তা সেও এই বছরখানেক আগে পর্যন্ত মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করছিল। ফিরে এসেছে বছরখানেক। তা সে এক বদ্ধ উন্মাদ, আমার জীবনের অভিশাপ হয়েছে সে। বি, এ, পাশ করে আইন পড়ছিল। মাঝখানে হঠাৎ পড়া ছেড়ে চলে এল। জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, আইন পড়া ছেড়ে এলি কেন? তা হতভাগা অসঙ্কোচে আমার মুখের ওপর জবাব দিলে, আইন পাশ করলেই তো ওকালতি করতে বলবেন, সেই জন্যেই আগে থেকে ছেড়ে দিলাম। লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ীতে এসে বসল, বললাম—, তা হলে সম্পত্তি যা আছে তাই দেখাশোনা কর। তা জবাব দিলে—ওসব আমি পারব না। ভোর থেকে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত পরোপকার করে ঘুরে বেড়ায়। নাইট ইস্কুলে, দরিদ্র ভাণ্ডার, মহামারী, নানান দৈব-দুর্বিপাক—এই সব নিয়ে আছে। আপত্তি করে কিছু বলতে গেলে ঝগড়া করতে আসে। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ! তবে তোমার এক নম্বর ভক্ত! বলে—তুমি মহাপুরুষ। তা যাক। ও কথা যাক—আমার দুঃখের কথা বলছি, তাই বলি। সংসারে ভালবাসার মানুষ নেই। একটা ভাগ্নীকে বুকে করে মানুষ করব বলে, চোখের সামনে রাখব বলে নিয়ে এলাম। এখানে বিয়ে দিয়ে।

বলতে বলতে আবেগে বৃদ্ধের গলা বুঁজে এল। গলাটা ঝেড়ে নিলেন তিনি। সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন, আনন্দচন্দ্রও একবার গলা ঝেড়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। নরনাথবাবু বলেই চললেন, তা আমার ভাগ্য।

তাকেও যার হাতে দিলাম সেও এক উন্মাদ! সে অবশ্য মালতীকে খুব ভালবাসে। সে আছে কেবল গাছপালা ফুল আর স্ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু পেটে ভাত জোটে না দুবেলা এই অবস্থা! একে আমার কপাল ছাড়া আর কি বলব!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নরনাথবাবু বললেন—জান আনন্দ, মানুষের ভালবাসবার জন্যে মানুষ চাই,—সে ভালবাসা দেবার জন্যেও বটে, পাবার জন্যেও বটে! তা আমার ভাগ্য এমনি যে ভালবাসবার মানুষ নেই আমার। এর চেয়ে বড় দুঃখ সংসারে আর নেই আনন্দ! তোমাকে আশীর্বাদ করি যেন তোমার ভাগ্যে ভালবাসার মানুষের কোনদিন অভাব না হয়। তা হলেই বোঝ আমার বাড়ী নিস্তব্ধ হবে না তো আর কোন বাড়ী নিস্তব্ধ হবে? এই অন্ধকার জনশূন্য নিরানন্দ পুরীতে আজ বিশ বছর এমনি করে কাটাচ্ছি!

তিনি চুপ করলেন। আনন্দচন্দ্র আর সুধাকান্ত দুজনেই চুপ করে আছেন। জনশূন্য অন্ধকার বাড়ীটা অকস্মাৎ তাঁদের কাছে একটা বিশালদেহ রাক্ষসের মত মনে হতে লাগল। তার বিষণ্ণ নিস্তব্ধ উপস্থিতি দিয়ে সে আজ এই মুহূর্তে আগন্তুক দুজনের হৃদ্‌পিণ্ড যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। সুধাকান্তের মনে হল বাড়ীটা এমনি করে যেন গত বিশ বছর ধরে নরনাথকে খেয়ে চলেছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নরনাথবাবু বললেন, তোমার কাছে আজ যদি আমি কিছু চাই আমি লজ্জা পাব না। এমন কি তুমি যদি দিতে না পার, বা না চাও তাতেও আজ আমি অপমানিত বোধ করব না। তোমার কাছে আমি সত্যই ভিক্ষা করব। আমার দুজনের জন্যে চাইবার আছে সংসারে। এক আমার ছেলে, দ্বিতীয় আমার ভাগনীজামাই। আমার ছেলের জন্যে কিছু চাইবার দরকার নেই। কারণ আমি দেখেছি সংসারে তার নিজের কোন প্রয়োজন নেই। আর আছে ভাগনীজামাই। তার প্রয়োজন অনেক, কিন্তু সে কারো কাছে চাইতে পারে না, লাজুক ভীরু মানুষ। তাকে তোমার এখানে একটা চাকরী দাও, দিয়ে তাকে বাঁচাও। সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে, তার বাগান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না।

আনন্দচন্দ্র সহজভাবে বললেন, এ আর বেশী কথা কী! এক সপ্তাহের মধ্যে এখানেই তার চাকরীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এর জন্যে আপনি

ভাববেন না! আজ তা হলে আমরা আসি? কাল কাজের সময় একবার যাবেন তা হলে!

তাঁরা যখন রাস্তায় নামলেন তখন চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। নরনাথবাবু তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও লণ্ঠনটা তাঁদের চাকরকে জোর করে ধরিয়ে দিয়েছেন, বললেন—আনন্দ, আলো নিয়ে যাও বাবা। অন্ধকারে যেও না। বর্ষার সময়! সাপ-খোপ তো এ সময় বেরোয়। তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক। তুমি অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক বলে বলছি না বাবা। আমি বলছি—এখানকার মানুষের বহু উপকার তোমার দ্বারা হবে। তাই তোমার জীবনের দাম এখানকার মানুষের কাছে অমূল্য।

বাইরে চারিদিক গাঢ় অন্ধকার। তারই সঙ্গে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কেবল একটানা ঝিঁঝির ডাক, আর মাঝে মাঝে ব্যাঙ ডাকছে। কিন্তু বাইরে বের হতেই ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল।

তাঁদের সামনে চাকরটা আলো হাতে দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ এই সামান্য নগণ্য মানুষটার কথা মনে হল আনন্দচন্দ্রের। তিনি বললেন—হ্যাঁরে তোর বড় কষ্ট হয়েছে বসে থাকতে, না?

চাকরটা অবাক হয়ে বললে, আমাকে বলছেন বাবু?

আনন্দচন্দ্র বললেন, তবে আর কাকে বলব? খুব মশাতে কামড়াচ্ছে তো?

চাকরটা এই সমবেদনায় গলে গেল, বললে—আজ্ঞে না খুব নয়। তবে দু চারটে মশা আছে।

সুধাকান্ত বললেন—এইবার তাড়াতাড়ি চল। কালকে তোমার কাজ আছে। একবার দেখা দরকার তোমার।

আনন্দচন্দ্র বললেন, ফিরছিই তো ভাই। কালকের কাজের কথা বলছ? ও কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার রসিক কি বস্তু তা তো জান না। ও একা সব ব্যবস্থা করে রাখবে। এখন তোমার বাড়ী যাব একবার। তোমার মাকে প্রণাম করে যাব। তোমার ছেলেরা এখানে আছে ত?

সুধাকান্তের কথাটা অবশ্য একবারও মনে হয়নি। তিনি বললেন—চল। তা হলে আর দেরী করো না! ছেলেরা বলতে বড় ছেলে তো সংস্কৃত

কলেজে পড়ে। ছোট ছেলে সহরে পড়ে। আসছেবার এণ্টান্স পরীক্ষা দেবে। সে এই ক' দিন এসেছে।

সুধাকান্তের বাড়ীর দরজাতে ঢুকেই আনন্দচন্দ্র যেন এই বিশ বছরের স্বভাবটা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলেন। মন আর গলার স্বর যেন অল্প কয়েক মুহূর্তেই তরল হয়ে এল। তিনি উঁচু দরাজ গলায় ডাকলেন—মা।

সুধাকান্তের মা এসে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর ব্যবহারে কোন আতিশয্য প্রকাশ পেল না। অত্যন্ত সস্নেহ মিষ্ট হাসি হেসে তিনি বললেন—এস বাবা আমার, এস।

আনন্দচন্দ্র এই পরিমার্জিত সস্নেহ হাসির মধ্যেই সেই বিশ বছর আগের মানুষটিকে, তাঁর স্নেহের উত্তাপকে এক মুহূর্তে অনুভব করতে পারলেন। একটু হেসে বললেন—মা, বলে গিয়েছিলাম যদি কোন দিন ফিরি আপনাদিকে প্রণাম করতে ফিরব। তা ভগবান আমার কথা শুনেছেন। আবার আপনাদের কাছে ফিরতে পেরেছি।

মা বললেন, তুমি পারবে না তো কে পারবে বাবা। তুমি সত্যিকারের বেটাছেলে, পুরুষ।

আনন্দচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আর মা, আপনার সুধাকান্ত? সুধাকান্ত কি পুরুষ নয়! ও কিছু কি কম?

মা হেসে একবার ছেলের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন—না বাবা। ওর কাজ পুরুষের নয়, ওর কাজ মানুষের। সেই মানুষের আচরণই ও পালন করছে বাবা।

আনন্দচন্দ্র ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। তিনি জানেন--গ্রামের গ্রামান্তরের মানুষ আজ তাঁকে দেখবামাত্র এলিয়ে পড়বে। কিন্তু এই একটি পরিবারের মধ্যে এমন কঠিন একটি ধাতু, বস্তু আছে যা কোন ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে বা ভয়ের ভয়ালতায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে না। তাতে নূতন যা কিছু আসবে সব একবার এই পরিবারটি আপনার কষ্টিপাথরে কষে নেবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ধারাটা পালটে দিলেন। হেসে বললেন—তাইতো মা সুধাকে ছাড়িনি। তাই ও আর আমি একসঙ্গে দুজনে মিলে পুরুষ মানুষ হয়েছি।

সুধাকান্ত ওঁর রসিকতা শুনে হাসলেন। বললেন—তুমি একটু বস ভাই, আমি সন্ধ্যেটা সেরে আসি।

সুধাকান্ত চলে গেলেন, আনন্দচন্দ্র ওঁর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। নিজের মায়ের শেষ দিকের কথা বলতে লাগলেন আনন্দচন্দ্র। তাঁর মা ওখানেই মারা গেছেন। তিনি আর কিছুদিন বাঁচলে আনন্দচন্দ্র নিজে খুশী হতেন। বললেন—মা, অনেক কষ্ট করে এই এত শত করলাম, অথচ মা ভোগ করলেন না এই একটা মস্ত দুঃখ থেকে গেল আমার।

সুধাকান্ত ফিরে আসতেই আনন্দচন্দ্র বললেন, তোমার ছেলে কই সুধা। ডাক তাকে। আমি রসিকের কাছে শুনেছি তোমার দুটি ছেলেই লেখা-পড়ায় খুব ভাল। বিশেষ করে ছোটটির নাকি জুড়ি নেই।

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—লেখাপড়াতে ওরা দু ভাই-ই বেশ ভাল। তারপর ডাকলেন—দুলাল! দুলাল! এদিকে এস। তাড়াতাড়ি এস।

দুলাল এল, আস্তে আস্তেই এল। এসে পিতামহীর পাশে দাঁড়াল।

সুধাকান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এঁকে চেন? ইনিই তোমার জ্যেঠামশায় আনন্দচন্দ্র।

দুলাল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এই কালো রঙের সাদা-চুল মানুষটির দিকে চেয়ে থাকল। তারপর হাঁটু মুড়ে গড় হয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করলে।

ভারী ভাল লাগল আনন্দচন্দ্রের। এই কিছুক্ষণ আগে সেই রাখাল ছেলেটার ছুটে পালানো আর এই প্রণাম দুয়েরই অন্তর্নিহিত অর্থ একই। কিন্তু এই ছেলেটির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা আর এই শ্রদ্ধানত প্রণাম—এমন সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁকে যেন আজও কেউ শ্রদ্ধা দেখায় নি। তিনি কোলে টেনে নিলেন ছেলেটিকে। আপনার কোলে তাকে বসিয়ে নিলেন। সে সঙ্কোচ বশতঃ নামবার চেষ্টা করতেই আনন্দচন্দ্র তাকে আরও জোরে কোলে চেপে ধরলেন। হেসে বললেন—কি গো, তোমার লজ্জা হচ্ছে না কি! বড় হয়েছ আর কোলে চাপার বয়স নেই বুঝি!

দুলাল কি বুঝলে সেই জানে, আর সঙ্কোচ না করে বেশ আরাম করে আনন্দচন্দ্রের কোলে ছড়িয়ে বসল।

আনন্দচন্দ্র বললেন—বাবা হয়ে তো কোলে বসেছ! এই বার একটা জিনিষ বাবার কাছে চাইব।

দুলাল বিস্মিত কৌতুকে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। আনন্দচন্দ্র

বললেন ঘাড় নেড়ে—বাবা হয়েছ, না বললে ছাড়ব না। তোমাকে আমার ইস্কুলে পড়তে হবে। কেমন রাজী তো ?

প্রশ্নটা শুনেই দুলাল খানিকটা বিপন্ন হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। আনন্দচন্দ্র বললেন—বাবার মুখের দিকে তাকালে কি হবে ? আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

একটু হেসে দুলাল বললে—আমি এর জন্যে বাবার মুখের দিকে চাইনি। আমাদের নিজেদের কোন ব্যাপারে বাবা কখনও আমাদের বাধা দেন না। আমি যে ইস্কুলে পড়ি সেখানে আমার এক মাষ্টার মশায় আছেন। তিনিই আমাকে এমনি বিনা পয়সায় নিজে থেকে পড়ান। তাঁর মত না নিয়ে তো আমি আসতে পারব না।

আনন্দচন্দ্র বললেন—বহুত আচ্ছা! এই কথা! তা তোমার মাস্টার মশায়কে নিয়ে তুমি চলে এস এখানে। এখানে এসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার হয়ে আসুন তিনি। ওখানে কত টাকা মাইনে পান তিনি ? সত্তর টাকা, আশী টাকা ? আচ্ছা আমি তাঁকে একশো টাকা মাইনে দেব।

দুলাল একটু হাসল। সে যেন হেসে আনন্দচন্দ্রের উৎসাহকে শান্ত করতে চাইলে। বললে—তিনি একা মানুষ। খানিকটা পাগল মত। বিয়েটিয়ে করেননি। আমাদের লোকনাথ দাদার বন্ধু। ছেলেদের চরিত্র-গঠন পড়াশুনো এই সব নিয়েই থাকেন।

আনন্দচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—আরে, এই রকম লোকই তো আমি চাই। আমি নতুন ইস্কুল করেছি। আমি নিজে কিছুই লেখাপড়া জানি না। কিন্তু লেখাপড়া খুব ভালবাসি। এই রকম লোক পেলে আমার ইস্কুলটা তিনি ঢেলে আপনার ইচ্ছামত তৈরী করুন। আমি নিজে যাব তাঁর কাছে।

দুলালও খুশী হয়ে উঠল, বললে—আপনাকে যেতে হবে কেন ? আমি এই সব গিয়ে তাঁকে বলব। আপনি একখানা চিঠি লিখে দেবেন বরং।

আনন্দচন্দ্র বললেন—এই তো ঠিক বলেছ! আচ্ছা আমি রাত্রেই চিঠি লিখে তোমার বাবার হাতে দিয়ে দেব। সঙ্গে দশটা টাকা দিয়ে দেব। তাঁর যাওয়া আসার খরচের জন্যে। সে বেশ ভাল হবে। আর আমার ছেলে মণিও আসছে বছর এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। তোমরা দুজনেই পড়বে একসঙ্গে।

তারপর সুধাকান্তের দিকে ফিরে বললেন—দেখলে সুধাকান্ত, বেড়াতে

বেরিয়ে কত কাজ করলাম। তোমার ছেলে বৃত্তি পাবেই আমি জানি। আমার ইস্কুলের ছাত্র প্রথম. বছর পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পাবে এটা ইস্কুলের ভবিষ্যতের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুখানা চেয়ার পেতে নাটমন্দিরের নীচে ঠাণ্ডায় বসে গল্প করছেন আনন্দচন্দ্র সুধাকান্তের সঙ্গে। বলছেন নিজের অতীত ক্লেশের আর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও বলছেন। এখানকার মানুষের জন্যে আরও কি কি করবেন তাও বলছেন। নাটমন্দিরের গোলমাল কমে এসেছে। ওদিকে রান্নাশালায় আগামীকালের ব্রাহ্মণ ভোজনের রান্নার শব্দ ও গন্ধ ভেসে আসছে। ঠাকুরদের গলা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রসিক বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর।

এমন সময় দারওয়ান এসে বললে—হুজুর, এক নয়া জোয়ান বাবু আপকা সাত মোলাকাত মাঙতা হ্যায়! হাম বোলা—হুজুর আভি নিদ গিয়ে হেঁ। তো উ মানতা নহি। বোলতা হ্যায়—হাম কিয়া লোকবাবু হ্যায়। হুজুরকো খবর দেও।

সুধাকান্ত হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—ভাই, তাকে আসবার হুকুম দাও। নইলে সে পাগল যখন এসেছে তখন সারারাত ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—কে পাগল?

—নরনাথবাবুর ছেলে লোকনাথ। যার কথা শুনলে সন্ধ্যাবেলায়।

অন্ধকার সান-বাঁধানো জায়গাটা পর মুহূর্তে মথিত হয়ে উঠল সবল কঠিন চঞ্চল পায়ের আঘাতে। অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াল লোকনাথ। বললে—আমি লোকনাথ। আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। একটা আলো আনতে বলুন আগে। আপনাকে আমি জ্ঞানে কখনও দেখিনি। একবার দেখব না আপনাকে?

আনন্দচন্দ্র অনুভব করলেন অন্ধকারের মধ্যে একটি বিচিত্র মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দেখবার জন্যে তাঁরও কৌতূহল হল। তিনি বললেন—ওরে একটা আলো আর একখানা চেয়ার দিয়ে যা।

আলো চেয়ার দুই এল। লোকনাথ বললে—আমি বসব না।

আলোতে দুজনে দেখলেন দুজনকে। পর মুহূর্তে লোকনাথ ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। উঠে বললে—আপনি মহাপুরুষ। এখানকার দীন দরিদ্র সামান্য মানুষের জন্যে আপনি না বলতেই অনেক করেছেন। এদের কথা কেউ ভাবে না। আপনি ভেবেছেন। আমি জানি আপনি এদের জন্যে আরও ভাববেন, আরও অনেক করবেন। তাই আপনাকে প্রণাম করে গেলাম। আজ আমি যাই, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আবার পরে আপনার কাছে আসব। আমার নিজেরই অনেক প্রয়োজন আছে আপনার কাছে।

আনন্দচন্দ্রকে অবাক করে দিয়ে পর মুহূর্তেই সবল পায়ের আঘাতে অন্ধকারকে সচকিত করে সে অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

আনন্দচন্দ্র আর সুধাকান্ত তারপর দুজনেই অনেক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। সুধাকান্তও উঠলেন। যেতে যেতে শুনলেন গলা চড়িয়ে আনন্দচন্দ্র ডাকছেন—ওরে রসিক ডাক তো!

রসিকবাবু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছেন পায়ের দ্রুত শব্দে বুঝতে পারলেন সুধাকান্ত। তিনি শুনলেন আনন্দচন্দ্র বলছেন—হ্যাঁ হে রসিক, এত বড় বড় ইমারৎ তৈরী করলে তুমি। কিন্তু তুমি শুধু শুকনো বাড়ীই তৈরী করেছ খালি। কোথাও একটা বাগানের ব্যবস্থা করনি। প্রত্যেক ইমারতের সামনে একটা করে ফুলের বাগানের ব্যবস্থা কর। আর কলকাতায় ফুলের দোকানে খবর চেয়ে চিঠি লেখ। প্রত্যেক জায়গায় একটা করে ফুলে-ভর্তি বাগান চাই। বুঝলে।

চার

আনন্দচন্দ্রকে যেন নেশায় পেয়েছে। তিনি যেন ছোট ছেলের মত হয়ে গিয়েছেন। হয় ইস্কুল, নয় হাসপাতাল, নয় চতুষ্পাঠী—একটা না একটা নিয়ে সারাক্ষণ তাকে কেমন করে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় তারই চিন্তায় আর কাজে অবিরাম লেগে আছেন। সুধাকান্ত পরম কৌতুকের আর তৃপ্তির সঙ্গে

তাই দেখেন আর হাসেন। একদিন বললেনও আনন্দচন্দ্রকে সেকথা—আনন্দ, তুমি এইবার পাগল হয়ে যাবে। চিন্তামগ্ন পরিতৃপ্ত মানুষ যেমন করে কথার কোন জবাব না দিয়ে কেবল স্বপ্নাচ্ছন্ন অকপট হাসি হাসে তেমনি ভাবে হেসে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন আনন্দচন্দ্র।

একদিন সকাল থেকে আরম্ভ করে দুপুর পর্যন্ত ইস্কুলের নতুন বোর্ডিং তৈরীর কাজে মেতে রইলেন। অস্নাত অভুক্ত হয়ে নূতন বাড়ীর ভিত্তির কাজ দেখাশোনা করলেন সমস্তক্ষণ। শেষে সুধাকান্ত এসে মৃদু তিরস্কার করে তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। রাস্তায় বললেন—তবে হ্যাঁ, একটা কথা বুঝলাম আজ! তুমি কি করে বড় হয়েছ তার গোপন কৌশলটা আজ বুঝলাম। এই ঐকান্তিকতা, এই নিষ্ঠা তোমাকে এত বড় করেছে! তুমি যখন যা কর, প্রাণ ঢেলে, সমস্ত শক্তি ঢেলে কর, সেই জন্যেই তোমার করাটা এত সুন্দর হয়।

যেতে যেতে আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—কিন্তু কই, দুলাল তো তার সেই গোকুলবাবু মাষ্টারকে নিয়ে এখনও এল না?

সুধাকান্ত জোরে হেসে উঠলেন, বললেন,—এখন আসবে কোথা থেকে তারা? তোমার যে সেই ছোট ছেলেদের মত চমকানো রোগ হয়ে গেল! তুমি এমন করে ভাবছ কেন? তোমার মত একটা মানুষ ডাক দিয়েছে একজনকে! সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় আছে? উপায় নাই। তুমি নিশ্চিত থাক, তারা ঠিক আসবে আজই। আমি গাড়ী পাঠিয়েছি স্টেশনে।

আনন্দচন্দ্রের জন্যে সারা বাড়ী উপবাস করে আছে। বাড়ী গিয়ে তিনি খবরটা শুনেই অকস্মাৎ চটে উঠলেন। জামা খুলতে খুলতে তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে বললেন—কেন, কেন সমস্ত বাড়ীর লোক না খেয়ে বসে আছে? কেন সকলে খেয়ে নেয়নি?

যে চাকরটা সামনে দাঁড়িয়েছিল সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলল—হুজুর আপনি খাননি এখনও। মাও তাই না খেয়ে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। অন্য সকলেও তাই অপেক্ষা করে আছে।

আনন্দচন্দ্র একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন—কে বলেছে চাকর-বাকরদের এখনও পর্যন্ত না খাইয়ে রাখতে?

অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে একেবারে নাটকীয় মুহূর্তটিতে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিদ্যুত পিছন থেকে বললেন,—আমি তাদের না খাইয়ে রেখেছি।

নিজের সমস্ত ক্রোধকে সংহত করে আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—কেন ?

তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে মুখ বেঁকিয়ে বিদ্যুৎ বললেন—কেন, কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি ?

আনন্দচন্দ্র প্রত্যাশা করেছিলেন মনে মনে—এই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় এসে বাড়ী ঢুকে প্রথমেই নজর পড়বে অভুক্ত বিদ্যুতের শুষ্ক উৎকণ্ঠিত মুখ। তাকে দেখেই বিদ্যুতের মুখের উৎকণ্ঠা দূর হবে, মুখে হাসি ফুটে উঠবে। অবশ্য এমনি প্রত্যাশা তিনি তাঁর জীবনে বার বার করেছেন। প্রতিদিন করেছেন। কিন্তু প্রতিদিন তাঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে। বাড়ী ফিরে এসে প্রতিদিন দেখেছেন বিদ্যুত মুখ কঠিন করে সমস্ত পরিবেশকে বিরূপ করে রেখেছে। তাই আজও যখন অকারণে সেই প্রত্যাশা পোষণ করে বাড়ী ফেরেন তখন মনের গোপনে এ বোধ নিয়েই ফেরেন যে ফিরে গিয়ে বিদ্যুতের কটু কষায় কথা শুনবেন। প্রতিদিন আশা পোষণ করে ফেরেন, ফিরে গেলেই বিদ্যুত হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। কিন্তু কোন দিন সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নাই। আজকের সেই অভ্যস্ত প্রত্যাশা আবার প্রতিদিনের মত বিদ্যুৎ এক মুহূর্তে নষ্ট করে দিলেন। তবু আনন্দচন্দ্র ভাবলেন—মুখে কটুবাক্য বললেও বিদ্যুত এখনি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে তাঁর গায়ের জামাটা ধরবেন। কিন্তু বিদ্যুত যেখানে দাঁড়িছিলেন সেইখানেই উত্তপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আপনার দুচোখ দিয়ে আগুন ছড়াতে লাগলেন।

আনন্দচন্দ্র গায়ের জামাটা খুলে চাকরের হাতে না দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন সার্টের পকেটে যে খুচরো টাকা পয়সা ছিল সে গুলো ঝন ঝন শব্দ ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আনন্দচন্দ্র আবার প্রত্যাশা করলেন—বিদ্যুত এখনও চোখের আগুন সম্বরণ করে, তাঁর ক্রোধকে সম্মান করে, এগিয়ে এসে ছড়িয়ে-পড়া পয়সা কড়িগুলো তুলে নেবে।

কিন্তু বিদ্যুত এগিয়ে এল না। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখান থেকেই বললে—তোমার টাকা পয়সা অনেক। আর রাখতে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। তা ছড়িয়ে ফেলে ভালই করেছ।

আনন্দচন্দ্র রাগে আর মনোবেদনায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেতে লাগলেন। কিন্তু কি জবাব দেবেন তিনি ! সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল চাকরটার ওপর।

ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন—এই হারামজাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিস কি? বেরিয়ে যা এখান থেকে।

চাকরটা পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। আনন্দচন্দ্র চেয়ার খানায় বসে অসহায় ক্ষোভে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর একবার মুখ বেঁকিয়ে বিদ্যুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্রের মনের ভিতরটা নিদারুণ যন্ত্রনায় আর আক্ষেপে আঘাত পাওয়া সাপের মত মোচড় দিয়ে দিয়ে নিজেকেই নিজে বার বার বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। তাঁর মনে হল—মিথ্যা, সব মিথ্যা। নরনাথবাবুর একদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর—ভালবাসার, ভালবাসা পাবার মানুষ যার নাই তার নাকি দুঃখ অনেক। কিন্তু তাঁর অবস্থাটা কি? ভালবাসা পাবার, ভালবাসার মানুষ থাকা সত্ত্বেও যে ভালবাসতে গিয়েও ভালবাসতে পারলে না, তার দুঃখ কি তার চেয়েও বেশী নয়? তার ভাগ্য! তাঁর ভাগ্য! ভগবান তাঁকে স্নেহহীন, শুষ্ক রাশি রাশি উত্তপ্ত সোনা আর রূপোর উপরে বসিয়ে ভালবাসার পানীয়টুকু মুখ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন! নিদারুণ আক্ষেপে তাঁর আপনার মাথা ঠুকে ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল এই কীর্তি, এই সারি সারি আকাশ ছোঁওয়া ইমারত সব সব লাথি মেরে এই মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দেন। আপনার এই নিদারুণ সৌভাগ্যকে ভেঙে খান খান করে দেন। আপনার ভাগ্যকে গড়তে পেরেছেন তিনি, কিন্তু আপনার ভাগ্যকে ভাঙবার মত শক্তিমান তো তিনি নন। একান্ত অসহায় হয়ে তিনি আরাম কেদারায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

অকস্মাৎ অতি প্রগাঢ় বেদনায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, বন্ধ চোখেও তিনি তা বুঝতে পারলেন। বিদ্যুতের উপর অতি অসহায় অভিমানে সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিদ্যুত তাঁকে কোন দিন এতটুকু মমতা দিয়ে, এক কণা সহানুভূতি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে না, কোনদিন তাঁর একটি অতি ছোট প্রত্যাশা আপনার হাতকে একটু নেড়ে পূরণ করে আনন্দ দিলে না! বলুক, তাঁকে একটার জায়গায় বিশটা কটু কথা বলুক। তবু বিদ্যুত তাঁকে বুঝলে না, বুঝবার চেষ্টা করলে না কোন দিন! অথচ তাঁর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যাশা, সেগুলি পূরণ করতে বিদ্যুতের কতটুকু সময়, কতটুকু শ্রম ব্যয় হত!

অকস্মাৎ তাঁর কপালের উপর অতি কোমল ঠাণ্ডা একখানি হাত কে রাখলে অতি সন্তর্পণে। তিনি চিনতে পেরেছেন চোখ বন্ধ করেও কার হাত! হাতখানি যেন মূর্তিমতী সেবা আর সান্ত্বনার মত। আনন্দচন্দ্র আপনার দুখানি হাত দিয়ে পরম ব্যাকুলতায় সেই ছোট্ট হাতখানি চেপে ধরলেন। অনেকক্ষণ ধরে সেই কচি নরম হাতখানি আপনার কপালে মুখে বুলিয়ে নিলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন—তোর হাত কি ঠাণ্ডা মা!

তিনি চোখ খুললেন। দেখলেন চেয়ারের পাশে বড় বড় শান্ত দুই চোখে অপরিমেয় সমবেদনা নিয়ে মেয়ে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আদর করে মেয়েকে ডাকলেন—মা, মাগো!

রাধারাণী এইবার একটু হাসল। বললে—অনেক বেলা হয়েছে। এইবার চান কর বাবা!

গলার স্বর কন্যার এই একটুকু আদরে এক মুহূর্তে আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল। গলা ঝেড়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—যাই মা। তোমার হুকুম কি করে ফেলব বল? আমার গত জন্মে নিশ্চয় তুই আমার মা ছিলি; নয়?

তারপর আনন্দচন্দ্র অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন—তোর দাদা কোথায় মা?

রাধারাণী বললে—দাদার কথা বলো না বাবা। এখানে এসে থেকে একবার পড়াশুনো করে না। কেবল ঘুরে বেড়ায় আর ব্যবসা শেখে রসিকবাবুর কাছে।

মেয়ের কথা বলার ভঙ্গি শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন আনন্দচন্দ্র। বললেন—ঠিক হয়েছে, এইবার তোমাকেই দাদার গার্জেন করে দেব। আমি তো আর সব সময় দেখতে পারি না দাদাকে।

তিনি মেয়ের হাত ধরে স্নান করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের স্নেহ-ভিক্ষু মনকে তিরস্কার করতে করতে চললেন। যখন ছেলের কথা মনে পড়ল তখন মনে হয়েছিল—বাবা-মায়ের কথা-কাটাকাটির শব্দে হয়তো বাবার জন্যে মণিও কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি এখনও স্নান করেন নি, খান নি এই কথা ভেবে ছেলে হয়তো বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে মুখে ব্যথিত উদ্বেগ নিয়ে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সে ভ্রূক্ষেপহীন। তাঁর হঠাৎ সেদিন সুধাকান্তের ছেলে দুলালের তার বাপের মুখের দিকে একবার

তাকানোর কথা মনে পড়ল। ওদের পিতাপুত্রে কেমন যেন একটা গূঢ় বাক্যহীন বোঝাপড়া আছে! তাঁকে বুঝবার, তাঁকে সহানুভূতি দেখাবার মানুষ স্ত্রী-পুত্র কেউ নয়। কেবল এই ছোট মেয়েটা মাঝে মাঝে তাঁর খোঁজ করতে আসে। তিনি আবার একবার তার ছোট্ট হাতখানি স্নেহের ও সহানুভূতির একমাত্র আশ্রয় ভেবে চেপে ধরলেন।

স্নান করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন আনন্দচন্দ্র। অন্যদিন খাবার সময় বিদ্যুত একবার করে পাখা নিয়ে বসেন। আজ আর এলেন না। তাঁর জায়গায় রাধারাণী পাখা নিয়ে বসে থাকল। বিদ্যুতই তাকে বসতে বলে দিয়ে নিজে আড়ালে আছেন। স্নান করে উঠে খেতে বসবার আগে তিনি ভেবেছিলেন বিদ্যুত হয়তো খাবার সময় বাতাস করতে করতে তাঁর রাগকে ঠাণ্ডা করে আনবে। কিন্তু কোথায় কি! এবার নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করলেন আনন্দচন্দ্র।

কোনক্রমে খাওয়া সেরে উঠলেন তিনি। দুধটা খেতেই ভুলে গেলেন। উঠবেন এমন সময় রাধারাণী বললে—ওকি বাবা, তুমি দুধ খেলে না? ভুলে গেছ?

আনন্দচন্দ্র বললেন—না ভুলব কেন? ওটা তুমি খাবে আজ সেই জন্যে রেখে দিলাম।

মুহূর্তে মেয়ের মুখ কেমন সকরুণ হয়ে উঠল, বললে—তুমি খেলে না। তুমি না খেলে আমি খাব না কিছুতেই। বলে সে পাখা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মেয়ের কথায়; মমতায় তাঁর চোখে অকস্মাৎ জল এল। এইতো পেয়েছেন, যা চান সব পেয়েছেন। এইতো মনের লক্ষ ক্ষতের অন্তত একটাতে একবার এই সহানুভূতির প্রলেপ পড়ল। তিনি আসনে বসে পড়লেন, বললেন—আয়, পাখা রেখে আমার কাছে আয়। একসঙ্গে খাই আমরা।

কন্যার সঙ্গে একসঙ্গে খেয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কাছারী বাড়ীর ঘড়িতে তখন ঘণ্টা পড়ছে—তিনটে বাজল।

মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় বিদ্যুত এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি প্রথমেই কন্যাকে শাসন করলেন—এই রাধা, যা গিয়ে শো। না হলে সন্ধ্যে লাগতেই ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়বি।

আনন্দচন্দ্রের তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি মেয়ের হাতটা চেপে ধরলেন। রাধা বললে—আমি যাব কি করে, বাবা যে আমার হাত ধরে রেখে দিয়েছে।

বিদ্যুত বললেন—বাবার কাছে আর আদর না নিয়ে যা বলছি তাই কর গিয়ে।

আনন্দচন্দ্র বিদ্যুতের দিকে ফিরে বললেন—তোমার খাওয়া হয়েছে বিদ্যুত?

বিদ্যুত মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিলেন—আমরা দাসী-বাঁদী, আমাদের খাওয়া হল কি না তা জেনে তোমার কি হবে!

আনন্দচন্দ্র একবার আকস্মিক মার-খাওয়া হতভম্বের মত এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে! বিদ্যুতকে প্রশ্নটা করাই তাঁর ভুল হয়েছে। বিদ্যুত তো সেই চিরকালের বিদ্যুত।

স্বামীর মুখের এই ব্যঙ্গ হাসি দেখে বিদ্যুতের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। অথচ আনন্দচন্দ্র যখন খাওয়া হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন তখন—ঈশ্বর তাঁর সাক্ষী—বিদ্যুত তো মিষ্টি করেই জবাব দিতে চেয়েছিলেন। অকস্মাৎ অভিমানে সমস্ত মনটা ছেয়ে গেল। অমনি তাঁর মনকে উপেক্ষা করে মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো বেরিয়ে এল। নিজের কানকেই বিদ্যুত বিশ্বাস করতে পারলেন না যে তিনি ঐ কথাগুলো স্বামীকে বললেন। তিনি স্বামীর ও ব্যথিত দৃষ্টি সহ্য করবেন কেমন করে? অথচ তিনি মেয়েকে নেবার অছিলা করে স্বামীর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছিলেন। তাঁর রাগ ভাঙাতে এসেছিলেন। তা আর হল না। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ব্যথিত ক্ষুব্ধ আনন্দচন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন। তিনি বুঝে নিয়েছেন—জীবনে ছোট ছোট মমতা, প্রতি মুহূর্তের সানুকম্প সহানুভূতি পাবার ভাগ্য তাঁর নয়। অথচ এই সামান্য জিনিষের জন্যে তিনি কি পরিমাণ লালায়িত তা যদি বিদ্যুত কি মণি বুঝত!

বেলা তখনও গড়িয়ে যায়নি, তবে বেলা পড়ে এসেছে। আনন্দচন্দ্র ঘুম থেকে উঠে বসলেন। রসিকবাবু দরজার আড়ালেই যেন অপেক্ষা করেই দাঁড়িয়েছিলেন। কর্তা ঘুম থেকে উঠতেই তিনি গলা ঝাড়া দিলেন দরজার পাশ থেকে। এ বাড়ীতে রসিকবাবুর যাতায়াত সর্বত্র অবারিত। গলার আওয়াজ পেয়েই আনন্দচন্দ্র ডাকলেন—কে, রসিক! এস কি খবর?

রসিকবাবু ঘরে ঢুকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন—আজ্ঞে, অনেকক্ষণ হল ভটচাজ মশায়ের ছোট ছেলে আর এক ভদ্রলোক এসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচন্দ্র লাফ দিয়ে নামলেন বিছানা থেকে। বিরক্ত হয়ে বললেন—আমাকে ডাক নি কেন তা হলে?

রসিকবাবু বললেন—আজ্ঞে আপনি অবেলায় ঘুমিয়েছিলেন তাই আর ডাকি নি।

অকস্মাৎ কটু কণ্ঠে আনন্দচন্দ্র বললেন—খবর তো সবই রাখ দেখছি। তবে ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যে আমি কতখানি ব্যগ্র তাও তো তোমার জানবার কথা। তা হলে আমাকে ডাক নি কেন? কোথায় জমিদারের পাটোয়ার নায়েব ছিলে সেইখানে আবার ফিরে যাও। ও তোমার ফিচেল জমিদারী বুদ্ধি নিয়ে ব্যবসাদারের কাছে কাজ চলবে না, বুঝলে?

রসিকবাবু অবশ্যই বুঝলেন, সব বুঝেও বোকার মত হাসতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি চটি পড়ে দোতালার সিঁড়ি ভেঙে ঘুরেফিরে তিনি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরের ঘরের এক দিকে ক'খানা ভারী ভারী চেয়ার। অন্য দিকে মস্ত ঘরের আধখানা-জোড়া চৌকীর উপর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর সুধাকান্তের ছেলে দুলাল আর একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক বসে আছে। যুবকটির সর্বাঙ্গে ধুলো। মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ছাপ। এই ধূলিধূসর বিরক্ত ও ক্লান্ত মূর্তির সামনে নিজের বিশ্রাম-স্নিগ্ধ দেহ ও ফরাসডাঙা ধুতি নিয়ে দাঁড়াতে তাঁর সঙ্কোচ হতে লাগল। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাত জোড় করে বললেন—আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। আমার অপরাধ নেবেন না। আমার বলা ছিল আপনি এলেই যেন আমাকে ডেকে দেয়। তা প্রভুভক্তির আতিশয্যে প্রভুর আজ্ঞা আর তারা পালন করে নি।

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী আনন্দচন্দ্র। জীবনে ললিত ও কঠোর কখন কোথায় কেমনভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা তিনি ভালই জানেন। এবং তা প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধেও তঁর অপরিসীম বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। যুবকটির মুখের বিরক্তি মুছে গিয়ে সন্তোষ ফুটে উঠল। তিনি মুখে অবশ্য কিছু বললেন না।

আনন্দচন্দ্র দুজনের ধূলিধূসর দেহ ও জামা-কাপড় আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। এইবার যেন অকস্মাৎ সেটা তাঁর চোখে পড়েছে এমনিভাবে তাঁকে বললেন—কিন্তু এ কি, আপনারা মনে হচ্ছে এখনও হাত-পা ধোন নি। ছি, ছি, ছি, কি বলব আর আমি রসিককে। এই রসিক, রসিক! তুমি কি হে? যাও এখন গামছা আর হাত-পা ধোবার জল দিতে বল। আগে আপনি হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে সুস্থ হোন। তারপর কথাবার্তা বলবেন।

যুবকটি এইবার মুখ খুললেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অতি দীর্ঘাকৃতি, একেবারে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তার উপর অতি শীর্ণ, কিন্তু কঠিন দেহ। চোখে নিকেলের চশমা। মালকোচা মেরে কাপড় পরা। পায়ের অনেকখানি উপরে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি কাপড় উঠে গিয়েছে। তিনি বললেন—কথাটা আগে হয়ে যাক। কথা খুব সামান্যই। আমি আপনার স্কুলে থাকব এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হয়ে। মাইনে আপনি যা বলেছেন তাই দেবেন। তবে একটা কথা, হেডমাস্টার মশায় যিনি তিনি কেমন লোক তা না জেনে এখানে থাকবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্থিরতা আমি দিতে পারছি না। আমি নিজে একটু কড়া ধাতের মানুষ। ঢিলেঢালা ভাব আমি পছন্দ করি না। তার উপরে নূতন স্কুল, এখানে ঢিলে-ঢালা ভাব থাকাও উচিত হবে না।

আনন্দচন্দ্র সায় দিয়ে বললেন—ঠিক বলেছেন আপনি। তবে আমার স্কুলের হেডমাস্টার অতি নিরীহ সৎ মানুষ। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আর আমি তাকে বলেও দেব এ বিষয়ে।

—আজ্ঞে না। আপনি তাঁকে কিছু বলবেন না। তিনি আমার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হবেন। তাঁকে যা বোঝাবার বা বলবার আমিই সব করব। আজ বিকেলে তা হ'লে একবার স্কুলটা আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

—আপনি তা হলে কাজে যোগ দেবেন কবে থেকে?

—আসছে মাসের পয়লা আমি আসব তাহ'লে!

—বেশ, সেই কথা থাকল।

মানুষটিকে বড় ভাল লাগল আনন্দচন্দ্রের। পরিষ্কার, শক্ত সপাট, অকুণ্ঠ মানুষ। তাঁর কাছে এতটুকু অকারণ সমীহ বা সঙ্কোচ এল না মানুষটির। তিনি বুঝলেন—মানুষটির কোথাও একটা অসাধারণ জোর

আছে যার বলে যে কোন মানুষের সমকক্ষ হয়ে কথা বলতে মানুষটির বাধে না।

হাত-পা ধুয়ে আসতেই মস্ত কাঁসার রেকাবীতে করে এল ফল আর মিষ্টি। ভদ্রলোক সেগুলি দেখে একটু হেসে দুলালকে বললেন—খাও হে দুলালবাবু! মুড়ির চেয়ে এগুলি নিশ্চই বেশী সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।

দুলালের সঙ্গে আনন্দচন্দ্রও অকপট হাসিতে যোগ দিলেন। অকুণ্ঠভাবে খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন—জানেন, আমি ছাত্রদের কিছুতেই মিষ্টি কি সন্দেশ খেতে দিই না। আমি জানি ওরা সব সময় আমাকে মানে না। আমাকে লুকিয়ে কখনও কখনও মিষ্টি খায়। কি বলহে দুলাল? আমি ওদের খাওয়াই মুড়ি আর ছোলাভিজে সঙ্গে খানিকটা গুড়।

আনন্দচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আপনি অমনি করে আমার স্কুলের ছেলেদের তৈরী করে তুলুন। আপনাকে কিন্তু আরও একটা ভার দেব। আমার ছেলেকে আপনার হাতে আমি দিতে চাই। তাকে আপনি আপনার পছন্দ মত তৈরী করে দিন। ওহে রসিক, মণিকে ডাকতো!

মণি এসে দাঁড়াল বাপের পাশে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে। আনন্দচন্দ্র বললেন—মণি, তুমি দুলালকে চেন না? আরে তুমি তো ওর সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলা করেছ হে!

মণি পরিস্কারভাবে বললে—আমার মনে নেই।

দুলালের মুখটা একবার কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তার বড় বড় চোখগুলি ঝকঝক করে উঠল।

আনন্দচন্দ্র বললেন—এই আমার ছেলে। আর ইনি তোমার মাস্টার মশায়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মণি আবার বাবার চেয়ারের পাশে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। আনন্দচন্দ্রের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল ছেলের সমস্ত ভঙ্গিটা দেখে। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই প্রসন্ন মুখে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার দুলালকে মনে পড়ছে না মণি? তোমার সুধা-কাকার ছোট ছেলে! তুমি যে ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে মানুষ হয়েছ? তোমার মনে নেই একেবারে? সে কি কথা! যাও, আলাপ কর ওর সঙ্গে!

মণির দুলালের কাছে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে চেয়ার ধরে যেমন দাঁড়িয়েছিল মাথা হেঁট করে তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

দুলাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। একবার আনন্দচন্দ্র, একবার আপনার মাস্টার মশায়ের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললে—এসে থেকে বাড়ী যাই নি এখনও। আমি এখন বাড়ী যাই।

মাস্টার মশায়ও উঠলেন, দুলালকে বললেন—দাঁড়াও হে দুলালচন্দ্র। আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তারপর আনন্দচন্দ্রকে বললেন—আমি উঠলাম। আমি পড়াব আপনার ছেলেকে। তারপর মণির দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমাকে পড়াব আমি। তবে তোমাকে যা দেখলাম তোমার স্বভাব অনেক পাল্টাতে হবে। তুমি যে বড়লোকের ছেলে সে কথাটা ভুলে যেতে হবে তোমাকে। তবে তুমি তোমার বাবার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে।

মণির এতক্ষণের ব্যবহার উপস্থিত সকলকেই একটা সংগুপ্ত কাঁটার মত বিঁধছিল। সকলেই এতক্ষণ সেই গোপন কাঁটাটার ব্যথা অনুভব করেও সঙ্কোচ বশতঃ যেন চেপে রেখেছিলেন। মাস্টার মশায় সেই কাঁটাটিকে যেন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আনন্দচন্দ্র অকপট সমর্থন জানিয়ে বললেন—ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু আপনি এখন যাবেন কোথায়? আজ রাত্রে এখানে অবশ্যই থাকবেন।

মাস্টার মশায় বললেন—একবার দুলালের বাড়ী যাব। ওখান থেকে কাল সহরে চলে যাব। এই টাকাটা!

বলে তিনি পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট আনন্দচন্দ্রের সামনে টেবিলের উপর নামিয়ে দিলেন। আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—একি, ফেরৎ দিচ্ছেন কেন?

মাস্টার মশায় সহজ ভাবে বললেন—আমার তো লাগেনি। আমি সহর থেকে সাইকেলে এসেছি। আবার সাইকেলেই ফিরে যাব।

তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু যাওয়ায় তাঁর বাধা পড়ল। একটি লোক ঘরের ভিতর সেই মুহূর্তে ঢুকল ঝড়ের মত। তাকে দেখে মাস্টার মশায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

লোকনাথ! লোকনাথও তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—আরে গোকুল! তুই এসেছিস। তুই এসেছিস শুনে আমি ছুটে এলাম!

মাস্টার মশায়ের নাম গোকুল, শ্রীগোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি

লোকনাথকে দেখে বললেন—আরে পাগলা, তুই এখানে! তুই এখানে আছিস তা তো জানাস নি আমাকে!

হা হা করে হাসতে লাগল লোকনাথ। সে যে আনন্দচন্দ্রের মত মানুষের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তাঁরই সামনে তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলছে এইটা একটু কটু লাগল গোকুলবাবুর চোখে। তিনি একটু হেসে বললেন—তুই চিরকালের যে পাগল সেই পাগলই রয়ে গেলি। আরে তোর পাশে একজন অত্যন্ত সম্মানী মানুষ বসে আছেন তা দেখেছিস!

লোকনাথ তার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন—হ্যাঁ তো রে! ওঁর সঙ্গে কথা বলব, তোর সঙ্গে দেখা করব—এই দুই কাজের জন্যেই তো খবর পেয়েই ছুটে এলাম। দুই পাখী এক ঢিলে মারব, বুঝলি! আমি এখানে এসে কি কি কাজ করেছি জানিস! আচ্ছা তুই বল আগে। তুই কতগুলো ছেলেকে নিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছিস। আচ্ছা, তোকে আরও সোজা করে জিজ্ঞাসা করি। বল, তোর স্কুলে ছেলে কতগুলো! কত? তিন শো? ওরে বাপরে! না, পারলাম না, হেরে গেলাম তোর কাছে। তবে তুই তো একটা হাই ইস্কুলে কাজ করছিস। আমি, আমি কি করেছি জানিস? আমি এগারোটা নাইট ইস্কুল আরম্ভ করেছি। তা সবগুলোতে মিলে শ দেড়েক ছাত্র হয়েছে। বুঝলি?

হঠাৎ লোকনাথ থেমে গেল, কি যেন মনে পড়ে গেল তার। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে বললে—এই দ্যাখ, কেবল নিজের অহঙ্কার করে মরছি। তুই কেমন আছিস এখনও জিজ্ঞাসা করিনি। বুঝলি, আমি একেবারে অত্যন্ত রকম অসামাজিক হয়ে পড়েছি। কি করে আমার এই দোষটা যায় বল দেখি!

গোকুল তার পিঠে মৃদু ভাবে একটা চপেটাঘাত করে বললেন—আরে পাগলা, তুই একেবারে পাগলা হয়ে গিয়েছিস। তোর পাগলামি আরও বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

লোকনাথ কথাটায় যেন খুব একটা মজা পেলে। সে হা হা করে হাসতে লাগল! তারপর বার বার ঘাড় নেড়ে বললে—তা এটা তুই প্রায় ঠিক বলেছিস। সাধারণ সুস্থ সহজ মানুষের হিসেবের মধ্যে আমাকে গুণতে

গেলেই আমাকে পাগল মনে হবে। আচ্ছা, আমার এই পাগলামি কিসে একেবারে যাবে বলতে পারিস? তুই ঠিক পারবি বলতে। বল দেখি।

তাহাকে থামানো প্রয়োজন এটা বুঝছিলেন গোকুলবাবু। তিনি বললেন—বলব, নিশ্চয় বলব। আজ রাত্রে তো আমি আছি। আমি থাকব এই দুলালদের বাড়ীতে। এখানকার কথাবার্তা শেষ করে আয় তুই তা হলে। এস হে দুলাল বাবু। অনেক দেরী হয়ে গেল পাগলার জন্যে।

গোকুল বাবু দুলালকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

মণি অনেকক্ষণ আগেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। আনন্দচন্দ্র পরিষ্কার বুঝেছিলেন উপস্থিত মানুষগুলিকে তার মোটেই ভাল লাগছে না। আনন্দচন্দ্র বসে বসে একমনে দুজনকে দেখছিলেন। দুটি বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ধরণের সাধারণ সামাজিক লৌকিকতাহীন বিচিত্র ব্যবহার সবিশেষ কৌতুহলের সঙ্গে দেখছিলেন। যে ধরণের গাঢ় বিশ্বাস ও হৃদ্যতার সঙ্গে ওরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়ের আদান-প্রদান করলে তা দেখে আনন্দচন্দ্রের মত বহুদর্শী মানুষও আশ্চর্য হলেন। তিনি নিজে বহু মানুষের সঙ্গে বহু বিভিন্ন কারণে বহুবার মেলামেশা করেছেন। বাল্যকাল থেকে অতি উৎকৃষ্ট বন্ধু পেয়েছেন। সুধাকান্তের মত বাল্যবন্ধু আজও তাঁর বিদ্যমান। তবু এমন ধরণের গাঢ় ও বিশ্বস্ত হৃদ্যতা তিনি কখনও দেখেননি। তিনি বুঝলেন—ওদের দুজনের চরিত্র পরস্পরের কাছে এত পরিচিত এবং দুজনের জীবনের গভীরতম স্থানে চিন্তার ও মনের আবেগের এমন মিল আছে যে দীর্ঘকাল অদর্শনের পর দেখা হবামাত্র একের প্রথম কথার আঘাতেই অপরের হৃদয়ের বাঁধা তার গানের সুরের মত বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বহু বিচিত্র সুরের মত হাজার আনন্দের ফুলঝুরি চারি পাশের দর্শককে হয় বিমুগ্ধ অথবা আশ্চর্য অথবা বিহ্বল করে দিয়ে চারিদিকে ভেঙে পড়ল।

লোকনাথ যখন তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গোকুলবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল সেই সমস্ত ক্ষণটা ধরে আনন্দচন্দ্র তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। সোজা সহজ একমুখী মানুষ। শুধু তাই নয়, জীবনের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান সাধনা সব কিছু এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মানুষটির চরিত্রে যে প্রবল গর্জনে আশপাশের দুই তীর ভাঙতে ভাঙতে এক খাতে বয়ে চলেছে এ কথা বুঝতে

আনন্দচন্দ্রের এক মুহূর্ত বিলম্ব হল না। সাধারণ মানুষ কেন একে পাগল বলে তাও বুঝতে পারলেন আনন্দচন্দ্র। সাধারণ মানুষের চরিত্র এত জটিল, এত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বদ্ধ যে তাদের দিনের পর দিন খুঁটিয়ে দেখলেও বোঝা যায় না। অথচ এই মানুষটিকে একবার দেখবামাত্র তাকে বোঝা যায়। স্বচ্ছ জলের মত এক মুহূর্তে এর হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। মানুষটি এত সহজ ও এত সরল বলেই মানুষ একে ভয়ে বুঝতে চায় না অথবা এর সঙ্গে হৃদ্যতা করবার ভরসা পায় না। তাদের মনে হয় বোধ হয় যে মানুষটির কাছে গেলে তাদের চরিত্রের হাজার গ্রন্থি এই মানুষটি কোন এক অদৃশ্য অস্ত্রের শাণিত শক্তিতে কেটে দেবে; তাদের যা কিছু গোপন সব প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাই ভয়ে তারা এর কাছে আসে না, একে পাগল বলে ছাপ মেরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

গোকুল চলে যাবার পরই লোকনাথ এসে দাঁড়ালে আনন্দচন্দ্রের সামনে। সসম্ভ্রম নমস্কার জানিয়ে সবিনয়ে সে বললে—আপনার ঘরে, আপনার সামনে অনেক চীৎকার করেছি, অনেক অভব্য আচরণ করেছি। আমাকে সে জন্য মার্জনা করবেন। এবং আপনি কিছু মনে করবেন না।

এ মানুষ যেন এই মুহূর্ত পূর্বের হাস্যময়, অর্দ্ধোন্মাদ, আনন্দময় মানুষটি নয়। গম্ভীর, কঠিন, একটি শ্রদ্ধাসম্পন্ন সামাজিক মানুষ।

আনন্দচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বললেন—বস। সেদিন রাত্রিতে তুমি দেখা করার পর প্রায়ই প্রত্যাশা করেছি তুমি আসবে। কিন্তু কৈ, তুমি তো আর তারপর এলে না!

সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নেড়ে লোকনাথ বললে—সে আর বলবেন না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ভাবছি আপনার কাছে আসব। এই কতকগুলো নাইট-স্কুলের ব্যাপার নূতন করে আরম্ভ করে আর আসতে পারিনি। অথচ আপনার কাছে না আসতে পারায় আমার নিজের কাজই অসম্পূর্ণ রয়েছে।

আনন্দচন্দ্র একটু অবাক হলেন, বললেন—কি রকম? আমার কাছে না আসতে পারায় তোমার কাজ অসম্পূর্ণ আছে—কেন?

—শুনুন। সেই কথা আপনাকে বলব বলেই তো এসেছি। আমি যে নাইট স্কুলগুলো করেছি তাতে ছোট ছেলে থেকে বয়স্ক মানুষ শুদ্ধ দু-চার জন করে পড়ে আসছে। কিন্তু ওদের মধ্যে আমি একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য

করছি। ওদের ধারণা ওদের এই লেখা-পড়া শিখিয়ে আমি নিশ্চয়ই কোন ইহলৌকিক লাভে লাভবান হচ্ছি। সেই চিন্তার বশবর্তী হয়ে ওরা কেউ কেউ ধীরে ধীরে আমাকে মোচড় দিয়ে নানান সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে। ওদের ওপর রাগ করা নিরর্থক এ আমি জানি। কার ওপর রাগ করব? পাঁকের মধ্যে কতকগুলো শূয়োর গা-ঘেষাঘেষি করে কাদা মেখে পরস্পরকে গুঁতোগুতি করছে। পাঁকের থেকে তুলে গায়ের ময়লা মাটি ধুয়ে দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে শূয়োরে যদি ভাবে, যে ওদের গা মুছিয়ে দিচ্ছে তার নিশ্চয় কোনো সুবিধা হচ্ছে, তাতে গা-মোছানো আর বন্ধ করি কি করে? মাঝখানে কাল আমার খুব অসহ্য হয়েছিল। বুড়ো বুড়ো দুটো মানুষ বলে কি জানেন? বলে—বাবু, আমাদিকে একখানা করে গামছা দাও। না হ'লে আর কাল থেকে তোমার পাঠশালায় পড়তে আসব না। শুনে আমার অত্যন্ত রাগ হয়ে গেল। আমি ওদের দু জনকে ধরে সেইখানেই আচ্ছা করে প্রহার করলাম, বললাম—লাল গামছা দিচ্ছি দাঁড়া। এই নে লাল-গামছা। মার খেয়ে লোক দুটো সঙ্গে সঙ্গে লাল-গামছার বায়না ছাড়লে। কিন্তু আমার কথা এই যে—এই রকম সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে ওদের তো কোনো উপকার করা যাবে না। আমার নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তা হলে এই তিরস্কারের সঙ্গে পুরস্কারেরও কিছু ব্যবস্থা করতাম। তা এখন আমার আপনার কাছে এই প্রার্থনা যে আপনি একবার আমার স্কুলগুলো দেখে যদি আপনার ভাল লাগে তা হলে জন পিছু একখানা করে গামছা, একখানা করে শেলেট, আর একখানা করে প্রথমভাগ দিয়ে সাহায্য করুন।

—এই কথা তোমার? তা এতে কত লাগবে? জিজ্ঞাসা করলেন আনন্দচন্দ্র।

—তা তো আমি বলতে পারব না ঠিক। আমি হিসেব করিনি। আর সে যা-ই লাগুক, যদি ধরুন টাকার অঙ্কটা বেশীই দাঁড়ায় হিসেবে, তা হলে আপনি দেবেন না? আপনি দিতে চাইলে টাকার অঙ্কের কম-বেশীতে সেটা আটকে যাবে? এ আমি বিশ্বাস করি না।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন, বললেন—লোকে তোমাকে পাগল বলে। কিন্তু তুমি পাগল তো নও, তুমি আসলে একান্ত ছেলেমানুষ রয়ে গিয়েছ। তুমি

আমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা করছ, আমাকে এর আগে দেখনি তুমি, অথচ আমার সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস তোমার কি করে হল? তা ছাড়া তোমার হিসেবের ধরণটাই দেখছি উল্‌টো রকমের। লোকে টাকার অঙ্কটা বলে অনুরোধ করে—এই কটা টাকা দিতে আপনার অসুবিধে হবে না।

লোকনাথ খুব সহজভাবে একটু হাসল, বললে—আপনার দুটো কথারই জবাব দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বললেন—আমি আপনার সঙ্গে এই প্রথম দেখা করছি। এটা একেবারে ভুল কথা! আমি আপনাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আজ দু বছরের ওপর দেখে আসছি। যেদিন থেকে আপনার এই কীর্তির বুনিয়াদ এখানে গাড়া হয়েছে সেদিন থেকে প্রতিদিন আপনাকে দেখেছি। আমি যেমন করে আপনাকে এখানে দেখছি তেমন করে কেউ কি দেখেছে, দেখতে পেরেছে আপনাকে? পারেনি! আপনার মনটিকে এই সব কাজের ভেতর দিয়ে আমি প্রতি মুহূর্তে দেখেছি। কাজেই সংসারে যারা আমার সব চেয়ে চেনা লোক আপনি তাদের মধ্যে একজন।

ওর কথা শুনতে শুনতে আনন্দচন্দ্রের বুকের ভিতরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল। এই তো একটু আগে যে বিশ্বাসের অদৃশ্য সুতোয় গোকুলবাবু আর লোকনাথকে গাঁথা দেখেছিলেন মালার ফুলের মত, এখন এই মুহূর্তে উপলব্ধি করছেন তিনিও কবে, আপনার অজ্ঞাত কোন এক মুহূর্তে এই বিশ্বসংসারের সেই বিশ্বাসের বিনিসুতোর মালায় তাদের পাশে গাঁথা পড়ে গেছেন। পাশের ফুল হাসি মুখে তার পাশের ফুলটির দিকে যেমন চেয়ে থাকে লোকনাথ তেমনিভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর মনে হতে লাগল লোকনাথ মৃত্তিকার উপরে পা না দিয়ে যে পথে চলে, সেই ধূলিস্পর্শহীন পথের উপর দিয়ে যুধিষ্ঠিরের রথের মত তিনিও কবে আপনার অজ্ঞাতে তাদের সঙ্গে যাত্রা সুরু করেছেন জানতে পারেন নি। আজ এক পথে যেতে লোকনাথের করস্পর্শে অকস্মাৎ যেন চিনতে পারলেন যে তিনিও সেই একই পথের যাত্রী। তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকনাথ বললে—আপনার প্রথম কথাটার জবাব তো দিলাম। এইবার আপনার দ্বিতীয় কথাটার জবাব দিই আপনাকে। আপনি আমাকে যে হিসেবটার কথা একটু আগে বললেন সে হিসেব তো আমার নয়। সে হিসেব আপনার! আমার একটা পয়সাও নেই, আমার হিসেবের বালাইও নেই।

আমার কথা ছেড়ে দিন। আপনি আপত্তি করবেন জানি। তবু ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিই! আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

কৌতুহলাক্রান্ত আনন্দচন্দ্র সকৌতুকে বললেন—বল।

লোকনাথ বললে—আচ্ছা আপনি আপনার এই কীর্তিগুলো করবার আগে কি ভেবেছিলেন বলুন তো? ভেবেছিলেন কি যে আমি মানুষের উপকারের জন্যে এই ধরুন তিন লক্ষ টাকা খরচ করব, না ভেবেছিলেন, আমার গ্রামের লোকের জন্যে ইস্কুল, হাসপাতাল, টোল এইসব করিয়ে দেব—তাতে যা খরচা লাগবে তা দিতে হবে। জবাব দিন আমার কথার।

জবাব না দিয়ে আনন্দচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

লোকনাথ ঘাড় নেড়ে বললে—চুপ করে হাসলে চলবে না। আমার কথার জবাব দিন।

আনন্দচন্দ্র অট্টহাস্য করে উঠলেন, বললেন—হেরে গিয়েছি হে তোমার কাছে, সত্যিই হেরেছি। তোমার যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলাম। তুমি ওকালতি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিলে কেন? তুমি তো খুব ভাল উকিল হতে পারতে!

লোকনাথ অদ্ভুতভাবে হাসল খানিকটা। তারপর বললে—আপনার ভুয়োদর্শনের অভিজ্ঞতার প্রশংসা করে সকলে। আমিও করি। কিন্তু এখন যা দেখছি তাতে তো আপনার সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

আনন্দচন্দ্র ওর কথা শুনে কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। কি অদ্ভুত আর বিচিত্র মানুষ, আর তেমনি কি কথা বলার ভঙ্গি। আনন্দচন্দ্র যে মহা-সম্পদশালী শক্তিমান পুরুষ সে কথাটা কোন মুহূর্তে তিনি ভুলতে চাইলেও পাশের মানুষ আপনার আচার আচরণে কথায় সেটা তাঁকে প্রতিমুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেয়। আর এই মানুষটির সামনে আনন্দচন্দ্র যতবার মনে রাখতে চেষ্টা করছেন যে তিনি জীবনে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর সার্থকব্রত মানুষ, এই পাগল মানুষটি ততই সেই কথাটা তাঁকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। শুধু কি তাই! তাঁর সঙ্গে ওর বয়সের একটা বিপুল ব্যবধান রয়েছে সে কথাটা পর্যন্ত সেও ভুলে গেছে, তাঁকেও যেন ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আনন্দচন্দ্র বললেন আশ্চর্য হয়ে—কেন হে, এ কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?

—বলছি। আমাকে খুব ভাল উকিল হতে হলে আর একটা জিনিষের প্রতিদিন প্রয়োজন হত। কিন্তু সেটা একেবারেই আমার আয়ত্তের বাইরে। আমার মামলায় প্রতিদিন আপনার মত একটি করে বিচারক পেলে তবে প্রতিদিন আমার জিত হবে।

আনন্দচন্দ্র প্রবল অট্টহাস্য করে উঠলেন। সমস্ত ঘরখানা হাসির দমকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। লোকনাথও হাসতে আরম্ভ করলে উচ্চকণ্ঠে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল আনন্দচন্দ্রের। এই যে মানুষটি সামনে বসে আছে, যার কথা তিনি অনেক শুনেছেন, সংসারে ও বিত্তে অনাসক্ত কাজ-পাগল মানুষ বলে, যাকে চোখের সামনে অনেকক্ষণ দেখেও ঠিক তাই বলেই মনে হচ্ছে, সেটা তার আসল চেহারা কি না সেইটা পরখ করবার একান্ত আগ্রহ হল তাঁর। তাঁর একবার মনে হল সংসারে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে সে পথহীনের পথ হিসেবে একে গ্রহণ করেনি তো! তিনি আস্তে আস্তে আপনার হাসি থামিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে আপনার হাতে পরীক্ষার যে অমোঘ শর আছে সেইটি আপনার বহু-আয়ুধের তূণ থেকে বের করে লোকনাথের উপর প্রয়োগ করলেন। বললেন—দেখ লোকনাথ, এখানে আসার পর থেকে অনেকের কাছে তোমার কথা শুনেছি। শোনার সময় থেকেই আমার তোমাকে একটা কথা বলবার বাসনা মনে আছে। তোমার কথা যা শুনেছি তোমাকে যা দেখছি তাতে অত্যন্ত কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান মানুষ বলে তোমাকে বুঝতে পারছি। তা তুমি এই সব পাগলের কাজ করে অনর্থক কেন আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা নষ্ট করছ? আমার কোলিয়ারীতে প্রতিদিন কাজ বেড়ে চলেছে। প্রায় প্রতি মাসেই আমার কেনা নূতন নূতন জায়গায় নূতন করে বোরিং আরম্ভ হচ্ছে, নূতন কয়লার খাদ তৈরী হচ্ছে। এ সময়ে আমার নিজেরই অত্যন্ত বিশ্বাসী, সৎ, লেখাপড়া-জানা মানুষের প্রয়োজন। অথচ এই ধরণের মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ! তাই তোমার কাছে আমার প্রস্তাব—তুমি আমার ব্যবসাতে এসে আমাকে সাহায্য কর। আমার পক্ষে এত দেখা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি তোমাকে প্রথম বছরে আটশো, তার পর বছর ন শো, তার পর বছর হাজার টাকা করে মাইনে দেব। তা ছাড়া তোমার হাত দিয়ে যা কয়লা

কেনা-বেচা হবে তার ওপর একটা কমিশন তুমি পাবে। তুমি চলে এস আমার ব্যবসায়।

লোকনাথের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। সে তির্যক ভঙ্গিতে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে স্থাণুর মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আনন্দচন্দ্রও স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনার অতি জটিল দৃষ্টি দিয়ে অনুমান করবার চেষ্টা করছেন তাঁর বড়শিটা কোথায় লেগেছে।

অনেকক্ষণ পর লোকনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। আবার ভাল করে নড়ে চড়ে বললে, আমি জীবনে খুব কম মানুষকে প্রণাম করেছি। যে সামান্য ক'টি মানুষকে আমি আমার জীবনে প্রণাম করেছি আপনি তাদের একজন। তাই আর আজ প্রণাম করলাম না। আপনি আমার কাছে আজ যে প্রস্তাব করলেন তাতে আমি কৃতার্থ হলাম। আমার নিজের যোগ্যতা, সততা, সম্বন্ধে আপনার মত মানুষের মত শুনে আমার নিজের দাম নিজের কাছেই বেড়ে গেল। কিন্তু আমার ও কাজে কি হবে? আমি তো ও পথ ছেড়েই এসেছি। আমি বড় ভাল আছি এই সব নিয়ে। আপনি আমাকে আর লোভ দেখাবেন না দয়া করে। আমিও মানুষ। লোভ আমারও হয়, লোভের বস্তু সামনে পেলে তাকে পরিত্যাগ ক'রে লোভ সামলাতে আমারও অনেক কষ্ট হয়। তাই জীবনের প্রথমেই ও রাস্তা থেকে সরে এসে বড় আনন্দে, বড় শান্তিতে আছি। আপনি আর আমাকে টানবেন না। কথা শেষ করে সে আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

আনন্দচন্দ্রও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, স্বস্তির নিশ্বাস।

পরমুহূর্তেই লোকনাথের মধ্য থেকে আবার সেই আধ-পাগল মানুষটি আত্মপ্রকাশ করলে। বললে—আমার আসল কথাটার জবাব দেন নি এখনও। তা হ'লে বলুন, আপনি কবে আমার নাইট-স্কুলগুলো দেখতে যাবেন?

—দেখতে যাবার আর দরকার কি? তোমার যা টাকার দরকার তা তুমি নিয়ে যাও না। কত লাগবে, একশো টাকা?

—আমি কি টাকার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি? আমি সব বলে রেখেছি—আপনি প্রত্যেকটি স্কুল দেখতে আসবেন। আপনার হুকুমেই আমি এই সব স্কুল করেছি। আপনি না দেখলে চলবে কেন?

আনন্দচন্দ্র বুঝলেন—এ পাগলের হাত থেকে পরিত্রাণ নাই। বললেন—

বেশ তো, কাল সন্ধ্যে-বেলাতে গাড়ী নিয়ে বের হব। যতগুলো পারি দেখে আসব।

লোকনাথ বললে—এই তো আনন্দচন্দ্রের মত কথা!

আনন্দচন্দ্র উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র। তাঁর আবার মনে হল লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল, কাকে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানেও না, জানতেও চায় না।

লোকনাথ বললে—আমি তা হলে উঠলাম।

আনন্দচন্দ্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এই অসামাজিক কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষকে তাঁর মত একজন মানুষ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেলেও কতক্ষণ সহ্য করতে পারবেন! তিনি হেসে বললেন—আচ্ছা, এই কথাই থাকল। আমারও এখন অন্য কাজ আছে।

লোকনাথ যাবার জন্যে উঠল। যেতে গিয়ে অকস্মাৎ আবার ফিরে বসে পড়ল, বললে—আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আপনার কাছে অন্য বিষয়ে আমার একটা সামাজিক কর্তব্য আছে, সেটা করা হয়নি।

—তোমার সামাজিক কর্তব্য? একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আনন্দচন্দ্র।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি আমার ভগ্নীপতি খগেনবাবুকে যে চাকরী দিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে শত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জানেন, আমার অল্প বয়সে মা মরে গিয়েছিল। খগেনবাবুর স্ত্রী, মানে আমার মামাতো দিদি মালতীই আমাকে ছোটবেলা থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে। এখানে এই গ্রামে আমাকে ভালবাসবার, স্নেহ করবার মানুষ বলতে একমাত্র সে। যখন মালতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তখন খগেনবাবুর বাড়ীর অবস্থা ভালই ছিল। নিজের বদখেয়ালীর দোষে বিষয়পত্র না দেখার জন্যে ধীরে ধীরে সব গিয়েছে; তবু মানুষটার চেতনা নাই। সামান্য ক' বিঘে জমি আছে, তা থেকে কায়ক্লেশে কোন রকমে বছরের খোরাক হয়। তারই ওপর নির্ভর করে মানুষটা পাগলের মত গাছপালা আর ফুল নিয়ে আছে। আর আছে স্ত্রীকে নিয়ে। ছেলে নেই, পুলে নেই, তাই সংসারের সমস্ত মমতাটা গিয়ে পড়েছে দিদির ওপর। দিদিই ভদ্রলোকের ধ্যান-জ্ঞান। দিদি অবশ্য আমার ভালবাসার মত মানুষ। যেমন রূপ, তেমনি মিষ্টি স্বভাব।

খগেনের কথা আরম্ভ হবামাত্র আনন্দচন্দ্রের বিক্ষিপ্ত মন একমুখী হয়ে উঠল, তিনি স্থির দৃষ্টিতে লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে একমনে তার কথা শুনতে লাগলেন। একটিও কথা বললেন না, একবার ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলেন না যে তিনি এই কথাগুলি এর আগেও শুনেছেন। খগেনের কথায় শুধুমাত্র তাঁর বুকের ভিতরটা আগের মত আবার দুলে উঠল।

জীবনের সূক্ষ্ম বস্তুগুলি লক্ষ্য করবার শক্তি হয়তো লোকনাথের আছে, কিন্তু দেখবার মন তার নেই। সে কোনদিকে লক্ষ্য না করে বলতে লাগল—আর দিদিকে কি আমার এই ভালবাসার দাম কম দিতে হয়েছে? খগেনবাবুর সমস্ত খামখেয়াল তিনি হাসিমুখে সহ্য করে নিয়েছেন বরাবর, কখনও কোনদিন কোন অনুযোগ করেন নি। তাঁর ভাবটা এই যেন—খগেনবাবু যা করেন তাই ঠিক করেন। তাঁর সমস্ত কাজের অকুণ্ঠ সমর্থন পান তিনি দিদির কাছে। অথচ এই মানুষটা এমনি যে তার ফুল ফোটানো ছাড়া আর কোন শক্তি নেই, ইচ্ছাও নেই। অথচ সংসার চলাই এখন কঠিন হয়ে উঠেছে। এই মানুষকে পছন্দসই কাজ দেওয়া এখানে আপনি ছাড়া আর কার সাধ্য ছিল! বাইরে গেলে হয়তো ওর পছন্দসই চাকরী কোথাও হতে পারত। কিন্তু ও কিছুতেই দিদিকে ছেড়ে যাবে না। আপনি এই মানুষকে এখানেই পছন্দসই চাকরী দিয়ে শুধু ওরই উপকার করেননি, ওদের দুজনকেই অনাহার-উপবাস থেকে বাঁচিয়েছেন। একথা আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি কেবল বাগান করবার সখেই ওকে চাকরী দিয়েছেন। বরং ওদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হয়েই খগেনবাবুকে চাকরী দিয়েছেন। এর জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো আমার প্রয়োজন ছিল।

আনন্দচন্দ্রের বুকের ভিতরে একটা অর্থহীন বেদনা বার বার অকারণে ফেনিয়ে উঠেছে। কিছু না থেকেও, এত দুঃখকষ্ট ক্লেশের মধ্যেও দুটি মানুষ পরস্পরকে ভালবাসতে পেরেছে। অথচ সুখের, শান্তির আর আনন্দের সমস্ত উপকরণ পর্বতপ্রমাণ একত্রিত করেও সুখ শান্তি আনন্দ কোনটাই পেলেন না তিনি জীবনে। অথচ—। যাক, যা হবার নয়, যা হয়নি তা চিন্তা করে কোন লাভ নাই। আনন্দচন্দ্র অকস্মাৎ আড়ামোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেসে বললেন—নিলাম। তোমার কৃতজ্ঞতার মধ্যে যা নেবার আছে সব নিলাম।

লোকনাথও উঠল। বললে—আমার কথাও শেষ হয়েছে। আমিও চললাম।

এখন থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে আনন্দচন্দ্র এই গ্রামের মানুষদের উপর প্রতিশোধ নেবার কামনায় আপনার হৃদয়ের পাত্র বিষে পূর্ণ করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বহু ক্লেশে, অকল্পিত পরিশ্রমে, অপরিসীম নিষ্ঠায় দিনের পর দিন আপনার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে অকল্পিত সৌভাগ্যের শিখরে গিয়ে উঠেছেন। এই কালে আপনার ভাগ্যকে নূতন করে রচনা করতে করতে এখানকার মানুষের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হৃদয়ের পাত্রে যে বিষ সঞ্চয় করেছিলেন তা তিলে তিলে নিজেই পান করে সে পাত্রকে শূন্য করেছেন। অথচ আজ এখানে ফিরে এসে পিছনের দিকে তাকিয়ে যা দেখছেন, তাতে দেখতে পাচ্ছেন এখানকার এই মানুষদের সেবার জন্যই এতকাল মনের পশ্চাতপটে তাদেরই মূর্তি এতকাল ধরে কালো ছায়ার মত এঁকে রেখে প্রতিদিনের শ্রমের আর ক্লেশের মধ্য দিয়ে তাদেরই পূজা করেছেন বিগ্রহ মূর্তির মত। যদি তাই না করবেন তবে কুড়ি বছর পরে অজস্র অর্থ উপার্জন করে এই দীন হীন মানুষদের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন কেন? আর ফিরে যদিই এলেন তবে এমন আগ্রহ আর গাঢ় প্রেমের সঙ্গে এদের আবার আঁকড়ে ধরবেন কেন? এখানে যে কুড়ি বৎসর অনুপস্থিত ছিলেন, সেই কুড়ি বৎসরে এই গ্রামের জীবনে যত রস তৈরী হয়ে খরচ হয়ে গিয়েছে, যা নিজের অনুপস্থিতির জন্যে তিনি আস্বাদ করতে পারেননি তার সবটা যেন আবার নিজে একা এই গ্রামের জীবন-সমুদ্র মন্থন করে পুনরায় তৈরী করে আকণ্ঠ পান করবার প্রবল তাড়নায় তিনি অহরহ তাড়িত হচ্ছেন।

সবটা যেন তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। একের পর এক এখানে আপনার কীর্তি-সৌধ রচনা করেছেন, আরও রচনা করবার পরিকল্পনা করছেন আপনার মনেই। তারই যোগানদার এই লোকনাথ।

শুধু তাই নয়। এখানে তাঁর বসবাস যাতে স্থায়ী হয়, যাতে তিনি বা তাঁর ছেলে মণি কোনদিন এখান থেকে চলে যাবার কথা না ভাবতে পারেন, যাতে এখানেও তাঁর ও তাঁর বংশের একাধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় তারই বাসনায় এখানে একের পর এক সম্পত্তি কিনতে আরম্ভ করেছেন তিনি।

ধীরে ধীরে তাঁর কাছারী সরগরম হতে আরম্ভ হয়েছে। এক দিন দু দিন অন্তর তিনি একটা দু'টো করে জমিদারী সম্পত্তি কিনছেন। দু দিন, পাঁচদিন অন্তর নূতন কাজ করবার জন্যে নূতন লোক নিয়োগ করছেন। প্রতিদিন প্রায় খানিকটা করে জমির দলিল তৈরী হচ্ছে।

এ সব কাজে তাঁকে প্রতিশ্রুতি মত সাহায্য করছেন নরনাথ বাবু, সুধাকান্ত। তাঁদের বাড়ীও সম্পত্তি-বিক্রয়-প্রয়াসী বিপন্ন ছোটখাটো জমিদারে এবং অজস্র চাষী ও ভদ্রলোকের আনাগোনায় ও কথাবার্তায় মুখরিত। সুধাকান্তের জীবনে পরিমিতি-বোধটা অত্যন্ত প্রবল। তাই তাঁর যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব তা তিনি অবিরাম করলেও নরনাথবাবুর করার তুলনায় তা অনেক কম মনে হয়। নরনাথবাবু যতখানি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কাজের সময় তার চেয়েও অনেক বেশী সাহায্য করছেন। তাঁকেও যেন আনন্দচন্দ্রের পাগলামির ছোঁয়াচ লেগেছে। তিনি শুধু আনন্দচন্দ্রের কাজেই নামেননি। তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিলেন। আবার তিনি এই পাগলামির ছোঁয়াচ লেগে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। সকাল বেলায় স্নান করে, ইষ্টস্মরণ করে, সামান্য একটু জলযোগ করে লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে কাছারীতে এসে হাজির হন। এইখানে একের পর এক জমি ও জমিদারী বিক্রেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, দাম দর করেন, সম্পত্তি যাচাই করেন, দামে বনলে কবে সম্পত্তি কিনবেন তার তারিখ দিয়ে দেন। বলে দেন—অমুক দিন রেজেস্ট্রী করে টাকা নিয়ে নেবেন। প্রথম প্রথম তিনি আনন্দচন্দ্রকে সব জানিয়ে তাঁর পরামর্শ ও সর্বোপরি তাঁর মত নিতেন। আনন্দচন্দ্র বলতেন—আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি যা মূল্য দেবেন আমার তাতেই সম্মতি আছে জেনে রাখবেন। কাজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই।

প্রথম যেদিন লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে তিনি আনন্দচন্দ্রের কাছারীতে এসে হাজির হয়েছিলেন সেদিন অবাক হয়ে আপনার আসন ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন আনন্দচন্দ্র। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি এলেন এমন সময়ে? কেন এলেন? দেখুন দেখি! আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত! আমি যেতাম আপনার কাছে।

নরনাথবাবু প্রায় বিগলিত হয়ে আনন্দচন্দ্রের কাঁধে হাত দিয়ে

বলেছিলেন—আমার কাছে তোমাকে কত ডাকব বারে বারে! আর আমি কি তোমার কাছে এসেছি। আমি কাজের জন্যে এসেছি ছুটে। বাড়ীর ভেতর বসে বসে কি আর এসব কাজ হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! এই কাজের জন্যে এইবার থেকে আমাকে প্রতিদিন তোমার কাছারীতে বসতে হবে। বুঝেছ? তা না হলে হবে না। কথা শেষ করে নরনাথবাবু একবার চারিপাশে কর্মরত কর্মচারীদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কর্মচারীরা অধিকাংশ হয় এই গ্রামের নয় আশ-পাশের গ্রামের মানুষ। তাদের মুখের দিকে চাওয়ার অর্থ এই যে—দেখ, তোমরা দেখ, তোমাদের মালিক ক্রোড়পতি আনন্দচন্দ্র আমাকে কেমন সম্মান করে দেখ, আমার ওপরে কতখানি নির্ভর করে দেখ। তারপর আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে কাছারীতে আমার বসবার একটা জায়গা করে দাও।

আনন্দচন্দ্র আলাদা ঘরে তাঁর বসবার ববস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নরনাথবাবু হেসে বলেছিলেন—বললাম তো তোমাকে, যে বিয়ের যে মন্তর! ও তোমার জমিদারীর কাজ, চোখের সামনে পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে অনবরত থাকতে হবে। তবে লোকে বুঝবে যে—হ্যাঁ জমিদারী কাছারী বটে। লোকে-জনে, পেয়াদা-চাপরাসীতে, নায়েব-গোমস্তায়, টাকায়-পয়সায় কাছারীর ভিতরটা সব সময় গমগম করবে, তবে তো! একি তোমার ব্যবসা যে বড় সায়েব আলাদা ঘরে দরজা ভেজিয়ে বসে বসে চেয়ার-টেবিলে কাজ করবে! তাতো চলবে না এখানে। তুমি কাছারী-ঘরের মাঝখানে চৌকিতে তোষক আর জাজিম পেতে, একটা ডেস্ক দিয়ে আমার বসবার জায়গা করে দাও। আমি বসে বসে তোমার জমিদারী শাসন করি।

একদিন আনন্দচন্দ্র পাকে-প্রকারান্তরে ইঙ্গিতে তাঁকে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনি এই বুড়ো বয়সে আপনার নিজের সমস্ত কাজকর্ম ফেলে আমার কাজ নিয়ে পড়লেন। আপনার নিজের সব দেখাশুনো হবে কি করে!

নরনাথ বাবু আপনার দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলেছিলেন—তার জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না। তার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কি না ভেবেছি গো! তোমার এখান থেকেই আমারও আদায় হবে, বুঝেছ?

এবার আনন্দচন্দ্রকে পরিস্কার করে বলতে হয়েছিল—আপনি কিছু মনে

করবেন না একটা কথা বলি। আপনাকে এই বয়সে আমার জন্যে এই পরিশ্রম করতে হবে, আপনি প্রণামী হিসেবে অন্ততঃ কিছু নিন।

নরনাথবাবু হেসেছিলেন, বলেছিলেন—তোমাকে কোনও দিক দিয়ে ঋণী রাখব না আনন্দ। তুমি ভেবো না। দিয়ো, প্রণামী দিয়ো, প্রণামী কেন, পারিশ্রমিক দিয়ো, নিশ্চয় নেবে। আমি যে দরিদ্র হয়ে গিয়েছি। আমাকে একশো টাকা করে দিও মাসে মাসে তা হলেই হবে।

আনন্দচন্দ্র তাঁর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। নরনাথবাবু তাঁকে বলেছিলেন—আনন্দ, না চাইতে তুমি মানুষকে দেবার জন্যে অঞ্জলি তুলেছ। তোমাকে ঋণী রাখলে যে আমারই পাপ হবে! তাই কি পারি। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব, সে ক'দিন জেনে শুনে আর পাপের বোঝা বাড়াই কেন?

এর পরই আনন্দচন্দ্র লোকনাথের কাছে যে প্রস্তার করেছিলেন তা সবিস্তারে তাঁকে জানিয়ে এও জানালেন যে লোকনাথ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। লোকনাথ আর নরনাথ ভিন্ন ধাতুতে তৈরী। এক হাজার টাকা মাইনে তাঁর ছেলে প্রত্যাখ্যান করেছে শুনে ব্যথিত বিস্ময়ে তিনি অনেকক্ষণ আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। লোকনাথের এই উন্মাদের মত ব্যবহারে ক্ষোভে রাগে ও হতাশায় তাঁর বুকের ভিতরটা মোচড় দিতে লাগল যেন। অনেকক্ষণ পর আপনার বুকের মোচড়কে বহুকষ্টে দমন ক'রে বললেন—তোমাকে বার বার ধন্যবাদ দিচ্ছি আনন্দ। আর আমার ছেলের সম্পর্কে আর কি বলব! সে একেবারে বদ্ধ পাগল এইটেই দিন দিন পরিস্কার বুঝতে পারছি। তা না হলে এই কাজ কেউ করে! তিনি চুপ করে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বললেন—তুমি আমার একটা উপকার করবে আনন্দ! একমাত্র তুমিই পার করতে। তোমার কথা কিছুতেই লোকনাথ ফেলতে পারবে না এ আমি জানি। তুমি আমার হয়ে লোকনাথকে বিয়ে করতে অনুরোধ করবে? তাকে কিছু করতে হবে না, তার কর্ম পথ পরিত্যাগ করতে হবে না, তাকে চাকরী করতে হবে না। তাকে কেবল বিয়ে করতে হবে। এইটি তুমি যেমনি করে পার ক'রে দাও। তারপর ও কি ক'রে সংসারী না হয়, ও কি করে সমস্ত সংসারের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে দূরে সরে থেকে দেখব।

আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে সংসারাভিজ্ঞ, প্রবীণ মানুষটির কুটিল দূরদর্শিতার

মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। আনন্দচন্দ্র মনে মনে আবার অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন—তিনি দেখবেন, সরল সহজ নভোচারী লোকনাথ এই অভিজ্ঞ মানুষটির গোপন জালের মধ্যে ধরা পড়ে কি না। পরদিন লোকনাথকে ডেকে তিনি অত্যন্ত কৌশলে প্রস্তাব করলেন বিবাহ করবার। লোকনাথ কোনো জবাব দিলে না, কিছুক্ষণ আনন্দ চন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অট্টহাস্য করে উঠে দাঁড়াল। বললে—আপনি আমাকে পাগল বলেন, কিন্তু আজ পরিস্কার বুঝতে পারছি আপনি আমার চেয়ে বড় পাগল। সে হাসতে হাসতে কথাটাকে আপনার হাসির ঝড়ে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এই কথার এই অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। কথাটা কেউ মনেও রাখলে না। আনন্দচন্দ্র নরনাথ দুজনেই ভুলে গেলেন সে কথা। লোকনাথ কোনোদিন কথাটা ভাবেনি। সে তো সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গিয়েছে কথাটা অবান্তর ভেবে।

ইস্কুল, হাসপাতাল, টোল সবই চলেছে সুশৃঙ্খলে। আনন্দচন্দ্র একেবারে সেদিক দিয়ে যান না। তিনি বলেন—আমি তৈরী করে দিয়েই খালাস। এবার চলা আর না চলার দায়িত্ব আমার নয়। আমি কেবল দূর থেকে দেখব।

নূতন বোর্ডিং তৈরী হচ্ছে। একটা বাড়ী তৈরী হয়েছে, আর একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে। সেটাতে প্রায় জন পঞ্চাশেক ছেলের জায়গা হয়েছে। ছেলেতে ভর্তিও হয়ে গিয়েছে। স্কুলের সামনে ঢুকতেই ছোট্ট একতলা কয়েকখানা ঘর স্কুল থেকে পৃথক ভাবে তৈরী হয়েছে। দু খানা ঘর হেডমাস্টার মশায়ের। একখানায় তাঁর বোর্ডিংয়ের অফিস। অন্যখানায় তিনি থাকেন। তার পাশে দু খানা ঘর। একখানায় থাকেন এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার গোকুল বাবু। আর একখানায় ছিল দুলাল।

দুলালের বাড়ী গ্রামে হলেও গোকুলবাবু তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখবার জন্যে নিজে উপযাচক হয়ে সুধাকান্তের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন দুলালকে বোর্ডিংয়ে রাখবার জন্য। তা হ'লে সে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সতর্ক দৃষ্টির সামনে থাকতে পারবে। সুধাকান্ত অমত করেন নি। তাই প্রথম থেকে তাকে একখানা ঘর পুরোপুরি গোকুল বাবুর নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ডিংয়ের কোন কোন ছেলে এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব

সম্পর্কে ঈর্ষিত হয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে অভিযোগ করে—দুলাল একা একখানা ঘর পাবে কেন? হেডমাষ্টার মশায় ঠাণ্ডা নরম মানুষ। অভিযোগ শুনে তিনি খানিকটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এতে তো কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ পক্ষপাতিত্ব এখানে সুস্পষ্ট; অভিযোগকারীরা তাঁকে ইঙ্গিতে একথাও বলেছিল যে তিনি যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার না করেন তা হলে তারা ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দচন্দ্রের নিকট পর্যন্ত অভিযোগ নিয়ে যাবে। হেডমাষ্টার মশায় বিশেষ বিপদে পড়েছিলেন। পক্ষপাত যে হয়েছে এ কথা ঠিক। আর এর জন্যে দায়ী গোকুলবাবু। তিনি বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট। হেডমাষ্টার মশায় উভয় সংকটে পড়ে কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না।

তবে তাঁর সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন গোকুল বাবুই। গোকুল বাবু খবরটা পেয়ে একদিন প্রাতঃকালে এসে হেডমাষ্টার মশায়ের অফিস ঘরে তাঁর সামনের চেয়ারে বসলেন। অন্য সমস্ত মাষ্টাররা হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে নিয়মিত এলেও তিনি প্রয়োজন ছাড়া আসেন না। তিনি জানেন সকাল বেলা তাঁর ঘরে একেবারে ভীড় থাকে না। তিনি পরিষ্কার ভাবে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—হেডমাষ্টার মশাই, কোন কোন ছেলে দুলালের পৃথক ঘর পাওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তাদের নামগুলি আমাকে বলুন দেখি।

হেডমাষ্টার মশায় ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সত্যিই তাঁর নামগুলো করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গোকুলবাবু তাঁকে নামগুলো বলতে বাধ্য করলেন। নামগুলো শুনেই তিনি আর অপেক্ষা না করে উঠে পড়লেন। বোর্ডিংয়ে গিয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ছেলেগুলিকে বাইরে আনালেন তারপর তাদের পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের মতলব কি বল দেখি, শুনি একবার।

অতি-সাহসীদের কথাও তখন হারিয়ে গিয়েছে। একজন সাহস করে কথাটা বললে কোন রকমে।

কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গোকুলবাবু বললেন—তা তুমি গত পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছ?

ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেল। সে আমতা আমতা করতে লাগল। কোন সঠিক জবাব সে দিতে পারলে না। গোকুলবাবু তার দিকে তাকিয়ে

কঠোরভাবে বললেন—দুলাল কত নম্বর পেয়েছে জান ? দুলালের নম্বরগুলো তিনি বললেন। বলার পর বললেন—দুলাল যে যে বিষয়ে আশি থেকে পঁচাশী পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী পায়নি, সেগুলোতে তোমাদের খাতায় ঐ হিসেবে তোমরা কেউ বিশের বেশী পাবে না। তা জেনে রেখো। কাঁচ, কয়লা আর হীরের কদর এক রকম হয় না। কয়লা যায় উনুনে, আর হীরে থাকে ভেলভেট মখমলের বাক্সে। বুঝেছ ? শুনলাম তোমরা বলেছ তোমরা আনন্দবাবুর কাছে যাবে। কাল যদি তোমরা এই অভিযোগ তাঁর কাছে না নিয়ে যাও তা হ'লে বেত মেরে তোমাদের প্রত্যেকের পিঠের চামড়া তুলে দেব।

তারপর একজনকে ডেকে বাকী সকলকে চলে যেতে বললেন। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন গলা নামিয়ে। শেষে বললেন—যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে। দুলালের কানে কোনদিন না যায়।

তারা পরদিন বিকেলবেলা দুলাল ওঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—স্যার, ঐ ছেলেগুলি—যারা আমাকে একখানা পুরো ঘর দেওয়ার জন্যে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে অভিযোগ করেছিল, ওরা কার পরামর্শ আর উৎসাহে এ কাজ করেছিল জানেন ?

গোকুলবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আরে এর জন্যে আবার পরামর্শ কিম্বা উৎসাহ লাগবে কেন বাইরের লোকের ?

—শুনলাম স্যার, মণিই এদের পরামর্শ আর উৎসাহ দিয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে পাঠিয়েছিল।

—না হে বাজে কথা। একেবারে বাজে কথা।

—বাজে হলেই ভাল। কারণ বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয় না, বিশ্বাস করাও শক্ত।

এর কয়েকদিন পরেই মণি এসে বোর্ডিংয়ে ভর্তি হল। তার মায়ের একেবারে ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে বোর্ডিংয়ে পাঠাবার। কেবলমাত্র ছেলের আগ্রহেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। বোর্ডিংয়ে থাকবার কথা বলতেই বিদ্যুৎ হাঁ হাঁ করে উঠলেন—এঁ্যা, বাড়ীর এই খাওয়া-দাওয়া, থাকা-শোওয়া ছেড়ে তোমাকে বোর্ডিংয়ে ছেড়ে দি ! আমি কি ক্ষেপেছি নাকি ?

মণি মায়ের মুখের উপর বললে—থাকব না তো তোমার কোলে থাকব না কি আমি ? বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া-ঘুমোনই হতে পারে, লেখা-পড়া হবে না। ঐ দেখ, দুলাল বরাবর বোর্ডিংয়ে থাকে। এখানে এসেও বোর্ডিংয়ে আছে। বোর্ডিংয়ে বরাবর থেকে লেখাপড়া করেছে বলেই লেখাপড়াতে ভাল হয়েছে।

ছেলের যুক্তি শুনে আনন্দচন্দ্র হাসলেন। তাঁর মনে হল তিনি ছেলের মনের আসল কথাটা ঠিক বুঝলেন। দুলাল বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করছে, সেই কারণে মণিরও ইচ্ছা সে বোর্ডিংয়ে গিয়ে থাকে। আনন্দচন্দ্র বললেন—বুঝলে বিদ্যুৎ, মণি ঠিক কথাই বলেছে। বেশী আরাম করলে বিদ্যাশিক্ষা ঠিক হয় না। সেই ভাল, আর তা ছাড়া এটা মণির পরীক্ষার বৎসর। ও বোর্ডিংয়ে থেকেই পড়াশুনো করুক।

স্বামীর কথা শুনে বিদ্যুৎ আর কোন কথা বলতে পারলেন না। ছেলের পড়াশুনোর যাতে বাধা হবে তার স্বপক্ষে কথা তিনি বলবেন কি করে ! কিন্তু ব্যবস্থাটা তাঁর মোটেই মনঃপূত হল না। মুখটা আরও ভার হয়ে উঠল।

রসিকবাবু পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বাড়ীর কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মনের কথাটা সবিনয়ে অথচ সুকৌশলে আনন্দচন্দ্রের সামনে তুলে ধরলেন। রসিকবাবু এই বছর কয়েকের মধ্যে আনন্দচন্দ্রের এখানকার সমস্ত কর্মভার সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করে এসেছেন। তাতে আনন্দচন্দ্রের তাঁর উপর বিশ্বাস তো নষ্ট হয়ই নি, উপরন্তু তিনি আজকাল রসিকবাবুকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর এখানকার সর্ববিধ কাজেই পরম নির্ভর করেন। সেই কারণেই রসিকবাবু ধীরে ধীরে এই পরিবারের একজন হয়ে উঠেছেন। এবং সেই অধিকারেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রসিকবাবু সংসারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও আপনার মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। আর এটা তিনি ভাল করেই বুঝেছেন যে সংসারে কোন বিষয়ে মতামতের ব্যাপারে কর্তা অপেক্ষা কর্ত্রীর মতের সমর্থন করাই সব দিক দিয়ে শ্রেয়। আর তা ছাড়া তাঁর ভাবনার সঙ্গে এ বাড়ীর কর্ত্রীর ভাবনা-চিন্তারও বেশ মিল আছে। এ ক্ষেত্রেও তিনি সেইরকমই ভেবেছেন। তিনি বললেন—হুজুর, মা ঠিক কথাই বলেছেন। অবশ্য দাদাবাবুর এটা পরীক্ষার বৎসর, সে হিসেবে পড়াশুনো করবার জন্যে বোর্ডিংয়ে থাকাই হয় তো ভাল হবে। কিন্তু বোর্ডিংয়ে থাকার

অনেক অসুবিধা আছে। দাদাবাবুর যেভাবে থাকা অভ্যাস তার অনেক বদল করতে হবে। আমার তো মনে হয় তাতে পড়াশুনোর সুবিধা না হয়ে অসুবিধাই হবে। বাড়ীতে একটা আলাদা পড়াশুনোর ব্যবস্থা তাঁর তো আছেই। গোকুলবাবু সন্ধ্যেবেলা তো পড়াতে আসছেনই। তিনি আর কিছুক্ষণ যদি বেশী করে পড়ান তা হলেই হবে।

আনন্দচন্দ্র বললেন—না হে, বোর্ডিংয়ে থাকলে পড়াশুনো আরও ভাল হবে। আর আমি, তোমার মা এখানে কি চিরকাল বসে থাকব? এখানে বরাবর বসে থাকলে তো চলবে না। আবার কোলিয়ারীতে ফিরে যেতে হবে।

বিদ্যুৎ কিছু বললেন না, কেবল বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টি দেখে আনন্দচন্দ্র একটু অবাক হলেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন বিদ্যুত এমন করে চেয়ে আছে কেন, সে কি ভাবছে! কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না।

রসিকবাবু বললেন—বাবুর যখন হুকুম, আর দাদাবাবুরও যখন এত ইচ্ছে তখন দাদাবাবু বোর্ডিংয়েই থাকুন। আপনি আর অমত করবেন না! তবে একটা কথা, বোর্ডিংয়ে থাকলে দাদাবাবুর একখানা আলাদা ঘর চাই।

আনন্দচন্দ্র বললেন—আলাদা ঘর এখন তো পাওয়া মুস্কিল। একখানা ঘরে দুলাল থাকে, সেই ঘরেই থাকবে মণি। আমি হেডমাষ্টারকে আর গোকুলবাবুকে বলে দেব।

রসিকবাবু সবিনয়ে বললেন—তাতে দাদাবাবুর অসুবিধে হবে না?

আনন্দচন্দ্র একবার রসিকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কি খুঁজলেন যেন। অকস্মাৎ একটা কথা তাঁর মনে বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলে গেল। দুলালকে একখানা ঘর দেওয়ার অভিযোগ-সম্পর্কিত ব্যাপারটা তাঁর কানে এসেছে। বলেছেন তাঁকে গোকুলবাবুই। অসঙ্কোচে সমস্ত কথা তাঁকে বলে, মণির প্রেরণা আর উৎসাহেই যে ব্যাপারটা ঘটেছে বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে একথাও তাঁকে জানাতে দ্বিধা করেন নি গোকুলবাবু। সে কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। আজ রসিকবাবুর কথা শুনে কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়, মণির এই ব্যাপারে রসিকবাবুরও যে গোপন সমর্থন ও উৎসাহ আছে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে। কিন্তু

রসিকের দুলালকে ঘর থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে স্বার্থ কি ? কিছুই না। পরমুহূর্তেই তার ব্যাখ্যাটাও তাঁর কাছে সরল হয়ে গেল। দুলাল সম্পর্কে মণির একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রগাঢ় বিদ্বেষ তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছেন। মণির সেই বিদ্বেষের মূলে ইন্ধন যোগাচ্ছে রসিক। আর এই ভাবেই সে মণির বিশ্বাস আর প্রীতি অর্জন করছে বোধ হয়। নিজের একমাত্র পুত্র এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য, কীর্তি ও কর্মের একমাত্র উত্তরাধিকারী এই বাল্যকাল থেকেই নানান বিদ্বেষ, কুটিলতা ও সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে এই কথাটা ভাবতেই চিত্ত যেন বিকল হয়ে এল। তিনি বরাবর মনে মনে কামনা করে এসেছেন—তাঁর নিজের চরিত্রে যে সমস্ত দোষ ত্রুটি আছে মণি যেন সেগুলি বর্জন করে, তিনি যে পথে চলতে পারেন নি সেই পথে যাত্রা করে। তিনি জীবনে যে অমৃত পান নি, অথচ সুধাকান্ত যার স্পর্শ ও আস্বাদ পেয়েছেন, সেই অমৃতের স্পর্শ যেন মণি পায়। এত ধন, এত সম্পদ, এত প্রতিষ্ঠা, এক কীর্তি নিয়ে সাধনার যে আকাশস্পর্শী বেদী তিনি রচনা করলেন সেই সু-উচ্চ বেদীর উপর থেকে সে যেন পিছলে চলে যাচ্ছে নীচের দিকে। এই কি তাঁর ভাগ্য, এই ঐশ্বর্য আর কীর্তির কি এই ভবিতব্য ? তাঁর মন অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল।

মণি অকস্মাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আপনি থামুন দিকি রসিকবাবু ! একঘরে থাকব, দিব্যি থাকতে পারব দুলালের সঙ্গে। আর দুলালের সঙ্গে একঘরে থাকতে পাব বলেই তো বোর্ডিংয়ে যেতে চাইছি।

আনন্দচন্দ্রের বুকের উপর থেকে সেই ভারটা নেমে গেল এক মুহূর্তে। তিনি এতক্ষণ যে ভয় পাচ্ছিলেন, যে ষড়যন্ত্রে মণি লিপ্ত আছে বলে ভেবে তিনি মণির ভবিষ্যত চিন্তা করে আকুল হচ্ছিলেন তা অমূলক, সব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—রসিক, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। মণি দুলালের সঙ্গে এক ঘরেই থাকবে।

আনন্দচন্দ্র বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তিনি একটা কথা ভাবতে লাগলেন—রসিকের দুষ্ট সঙ্গ থেকে মণিকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হবে।

সেই থেকে মণি আর দুলাল বোর্ডিংয়ে এসে এক ঘরেই আছে গোকুল-বাবুর সতর্ক দৃষ্টির সামনে।

গোকুলবাবুর ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত একেবারে ঘড়ি-ধরা কাজের তালিকায় বাঁধা। ভোর পাঁচটায় উঠে তিনি গাড়ু হাতে চলে যান মাঠে। সেখান থেকে দাঁতন করতে করতে ফিরে এসে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে কিছুক্ষণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশ পাঠ করেন। তারপর বের হন বোর্ডিং দেখতে। তাঁর নির্দেশে সমস্ত ছেলেদের উঠতে হয় সাড়ে পাঁচটার ভেতর। সমস্ত ছাত্রদের তাঁর বোর্ডিং দেখতে বের হবার আগেই হাত মুখ ধুয়ে গুড় ও ভিজে ছোলা খেয়ে পড়তে বসে যাওয়া চাই। কেউ আইনভঙ্গ করলে তাকে কঠিন বেত্রাঘাত অথবা কঠিনতর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়। ছেড়ে কথা বলবার মানুষ নন তিনি। ছেলেদের পড়াশুনোর তদারক করে তিনি ফিরে এসে আপনার ঘরে বসেই ডাকেন দুলালকে—দুলো, আয়রে!

দুলাল তৈরীই থাকে। ইংরেজী আর অঙ্কের বই নিয়ে গিয়ে বসে তাঁর কাছে। এ সময়টা তাঁর একেবারে দুলালের জন্যে পৃথক করে রাখা। যে সময় গোকুলবাবু ঘরে ফিরে দুলালকে ডাকেন সে সময় মণির বুকটা ফেটে যায়। সে আনন্দচন্দ্রকে বলেছিল—আমার অসুবিধা হচ্ছে বাবা। মাস্টার মশায়কে বলো আমাকে দু'বেলা পড়াবার জন্যে।

ছেলের কথার সাদা অর্থ ধরে তিনি একদিন গোকুলবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সোজাসুজি বলতে পারেন নি কথাটা। ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মাস্টার মশায়, আপনার ছাত্র কেমন পড়াশুনো করছে?

ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলেন গোকুলবাবু—ভাল। মোটামুটি ভালই।

—পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে তো?

—হ্যাঁ, ওতো ছেলে ভালই। ভাল করেই পাশ করবে। এবার তো সেকেণ্ড হয়েছে।

—ও বলছিল যে মাস্টার মশায় যদি আমাকে দু বেলা পড়ান আমি তা হলে ফার্স্ট হতে পারি।

গোকুলবাবু একটু অবাক হয়ে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর একটু হেসে বলেছিলেন—ওর পক্ষে ফার্স্ট হওয়াও কোনদিন সম্ভব নয় যতদিন দুলাল আছে, আর আমার পক্ষেও দু বেলা পড়ানো সম্ভব নয়।

ছুটো। বিরূপ স্পষ্ট উত্তর শুনে আনন্দচন্দ্র একটু চটে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—অমন জোর দিয়েই ছুটো কথা বলছেন কি করে? আপনি ছু বেলা পড়াতে পারবেন না এটা জোর দিয়ে বলতে পারেন। কারণ সেটা আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। যদিও আপনি ছু বেলা পড়ালে আপনাকে ডবল মাইনেই দেব। তবে মণি কখনও ছুলালকে হারাতে পারবে না পড়াশুনোয়, এ কথা আপনি এত জোর দিয়ে বলছেন কি করে? মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কি কিছু আছে?

শান্ত কণ্ঠে স্পষ্ট উত্তর দিলেন গোকুলবাবু—আছে। চেষ্টার অসাধ্য কাজ আছে বৈকি! সেটা মানুষের শক্তির তারতম্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ধরুন, আমি যদি হিমালয় পাহাড় পার হয়ে যাবার চেষ্টা করি, কিম্বা আপনার মত অর্থ উপার্জন করবার বাসনা করি, আমার পক্ষে তা আমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হবে না। তেমনি ছুলালকে পড়াশুনোয় হারাবার সহস্র চেষ্টা করলেও মণি তাকে হারাতে পারবে না। আর আজ ক' বছর ধরে সকাল বেলা আমি ছুলালকে পড়াই। একটি আশ্চর্য মেধা-সম্পন্ন ছাত্রকে দিন দিন খানিকটা করে সাহায্য করবার আনন্দটুকু আমার আছে অমূল্য। তাই তার কাছে পয়সাও নিই নি কোনদিন। আর ঐ সময়টুকু পয়সা নিয়ে বিক্রী করতেও পারব না। আর একটা কথা, ছুলাল এণ্ট্রাস পরীক্ষায়, আমার নিজের ধারণা ফাষ্ট হবেই। আপনার নূতন স্কুল থেকে প্রথমবার যদি কোন ছাত্র সে গৌরব পায় তা হলে সে রাস্তা বন্ধ করে দেবেন না। আর মণির সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও ভাল করে পাশ করবেই।

আনন্দচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তাই ও-বিষয়ে আর কোন অনুরোধ করেননি।

কিন্তু মণি মুখে মানতে বাধ্য হলেও মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। ছুলাল যখন গোকুল বাবুর ডাকের জন্য বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করে তখন থেকে মণির মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মণির মুখচোখ চাপা উত্তেজনায় থম থম করে, এই সময় সে গায়ে পড়ে ছুলালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে। অবশ্য ঝগড়া করবার চেষ্টা করলেও ঝগড়া হয় না। ছুলালের গম্ভীর স্বভাবের গাম্ভীর্যের বর্মে প্রতিহত হয়ে মণির তীক্ষ্ণ শায়কগুলি ব্যর্থ হয়ে যায়। ছুলাল কোন কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর

ভাবে চুপ করে থাকে। তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করা বিরক্ত মুখের একটি দুটি কথায় মণি এলিয়ে পড়ে। সে কেমন ছোট হয়ে যায়!

মুখের কথা কাটাকাটি করা ছেড়ে দিয়ে মণি অন্য পথ ধরলে। আরও সক্রিয় কলহের রাস্তা ধরলে সে। কোন দিন ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সে সময় বাড়িয়ে কি কমিয়ে দেয়। সময় কমানো থাকলে দুলাল আপন মনে পড়া শুনো করে। অকস্মাৎ গোকুল বাবুর ডাক শুনে সে চকিত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বইখাতা গোছাতে আরম্ভ করে। ঘড়িতে সময় বাড়িয়ে দেওয়া থাকলে খাতাপত্র আগে থেকে গুছিয়ে রেখে চঞ্চল হয়ে অপেক্ষা করে গোকুল বাবুর ডাকের। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই মণি আবার ঘড়ি ঠিক করে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে কষ্ট দেওয়ার সার্থকতায় আপন মনে হাসে।

ক দিন যেতে যেতেই দুলাল মণির এ কৌশলটা ধরে ফেললে। সে বুঝতে পেরে মণিকে কোন কথা বললে না। কেবল ঘড়ি দেখা ছেড়ে দিলে। ভোর বেলা আপনার বই খাতা গুছিয়ে রেখে দিয়ে আপন মনে পড়াশুনা করত। তারপর ডাক পড়লে ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে উঠে যেত।

মণির এ কৌশলও ব্যর্থ হয়ে গেল। এরপর সে দুলালের প্রয়োজনীয় কোন বই কিম্বা খাতা লুকিয়ে রাখতে আরম্ভ করলে। প্রথম দু চার দিন সে অনেক কষ্টে খুঁজে হারানো বই কি খাতা বের করে তারপর পড়তে যেতে লাগল। তারপর একদিন অনেক খুঁজেও একখানা খাতা সে পেলে না। পড়া শেষ করে ফিরে এসে দেখলে খাতাখানা সামনেই চৌকীর উপর পড়ে আছে। সে একবার মণির দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে খাতা খানা তুলে রেখে দিল। পরদিন আবার একখানা বই পাওয়া গেল না। সে মণির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে সহজ ভাবে বললে—আমার বইখানা দাও তো!

মণি অবাক হয়ে গেল। খুসীও যেন হয়েছে সে খানিকটা। অনেক দিন নিষ্ফল নির্যাতনের পর আজ আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদিনের মত অবহেলা দেখিয়ে চুপ করে নেই। সে আজ ঝগড়ার সমতল ক্ষেত্রে নেমে এসে মুখ খুলেছে। মণি অত্যন্ত নির্দোষের মত আশ্চর্য হয়ে বললে—তোমার বই, কি বই, আমি কি করে জানব?

দুলাল গম্ভীর ভাবে বললে—তুমি যদি আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহারের পরিবর্তন না কর কাল থেকে, তা হলে কালই আমি এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যাব। বলে তার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

মণি এ কথাটা ভেবে দেখেনি। দুলাল যদি এ ঘর থেকে চলে যায় তা হ'লে তার এখানে থাকার অর্দ্ধেক আনন্দই যে চলে যাবে! তার জীবনের আধখানার ওপরে যে দুলাল তার ছায়া বিস্তার করেছে; যাকে সে বিদ্বেষের বিষ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে লালন করেছে, তাকে সে ছাড়বে কি ক'রে! তবু দুলালের এই এক কথায় মণি একেবারে যেন পরাজিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে। সে দুলালকে খুব ভাল করে চিনেছে। এই যে আজ সে বলে গেল, তা একেবারে অমোঘ। আর কোনও রকম সামান্য জ্বালাতন করলেই সে নিশ্চয় ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। মণিকে এক দিনেই সব যুদ্ধ বন্ধ করতে হল।

এর পর মণি একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তায় কলহ করতে লাগল। সে একেবারে সম্পূর্ণ কথা বন্ধ করে দিল দুলালের সঙ্গে। দুলালের তাতে সামান্য মাত্রও অসুবিধা নেই। তাতে তার বরং সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু সে খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছে মণি কোন দিক দিয়ে তার সামান্য মাত্রও অসুবিধা ঘটায় না। বরং পাছে তার কোন অসুবিধা হয় সেজন্য সর্বদা সে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু কথা বন্ধ করেই চলছে তার এবারের কলহ-পর্ব। দুলাল বলে একজন মানুষ যে এই ঘরে থাকে সেটা যেন সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

দুলাল মাঝে মাঝে আপনার মনে এবং মণির আচরণে খুঁজে দেখেছে মণির তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহারের কারণ কি। কিন্তু কোন কারণই সে হাজার বার খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারেনি।

একদিন মণি আপনার মনে চুপ করে বিকেল বেলা ঘরে বসে আছে। খেলতে যায়নি। অথচ গোকুল বাবুর কড়া হুকুম যে প্রত্যেক ছেলেকে বিকেল বেলা খেলার মাঠে হাজির থাকতেই হবে। তার বসে থাকার মধ্যে দুলাল যেন কোথায় একটি বিষণ্ণ অবসাদকে দেখতে পেলে। তার সমস্ত মন কেমন এক ধরনের মমতায় ওর জন্যে এক মুহূর্তে আকুল হয়ে উঠল। সে ঘরের মধ্যে এসে নরম মিষ্টি সুরে ওকে ডাকলে—মণি!

ওর ডাক শুনে মণি একেবারে চকিত হয়ে ওর দিকে তাকালে। দুলাল কখনও কেউ নিজে কথা না বললে কথা বলে না। সেই দুলাল মৃদু কোমল স্বরে তাকে ডাকছে। মণি ওর দিকে ফিরে তাকালে। কোন জবাব দিলে না।

দুলাল বললে—তুমি খেলার মাঠে যাওনি ?

—না। ছোট্ট উত্তর।

—কেন ?

—এমনিই।

আর কোন কথা বললেনা দুলাল। তাকে মাঠে আসবার অনুরোধও করলেনা। মণি ওর মিষ্টি ডাক শুনে ভেবেছিল সে বোধ হয় ওর আপত্তি সত্ত্বেও ওর কাছে এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে খেলার মাঠে। কিন্তু দুলাল তার কোনটাই না করে চলে গেল।

মণি একমনে ওর ধীরে ধীরে বিলীয়মান পায়ের শব্দটা শুনলে বসে বসে।

সেই দিনই সন্ধ্যে বেলা।

গোকুলবাবু এই সময়টা মণিকে পড়াতে আসেন! মণির প্রথম প্রথম ইচ্ছা হত দুলালকে যেমন তিনি সকাল বেলায় ডেকে নিয়ে নিরিবিলি আপনার ঘরে পড়ান তেমনি করে তাঁর নিজের ঘরে পড়ান তাকেও। কিন্তু কে জানে কেন মণির সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। মণির তাতে মনে হয়েছে গোকুলবাবু ইচ্ছে করে তাকে তার প্রাপ্য একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

গোকুলবাবু তার চৌকীতে বসে তাকে পড়াচ্ছেন। সব পড়ানো শেষ করে গোকুলবাবু অঙ্ক নিয়ে পড়লেন। অঙ্কর খাতা খুঁজে পাচ্ছেনা মণি। গোকুলবাবু বুঝতে পারলেন অঙ্ক কষেনি মণি। তিনি সত্যবাদিতা সম্পর্কে বার বার ছেলেদের উপদেশ দেন। কোন ক্ষেত্রে কোন ছাত্র মিথ্যা বলেছে জানতে পারলে কঠিন তিরস্কার করেন, প্রয়োজন হলে প্রহারও করেন! তিনি তাঁর এই ছাত্রটি সম্পর্কে খুব ভাল করে জানেন—তাঁর সত্যবাদিতার উপদেশ এ ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়নি। মণি তাঁর ভয়ে প্রয়োজন হলেই মিথ্যা কথা বলে। মণি অঙ্ক কষেনি, তাই ভান করে করে খাতা খুঁজছে। তিনি বললেন—কি রে, অঙ্ক তো কষিসই নাই! আবার ভান করে খাতা খুঁজছিস। মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তৈরী হচ্ছিস ?

মণি বুঝলে যে এই কঠিন মানুষটির হাত হতে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। মানুষটি তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সুদ্ধ বুঝতে পেরেছেন। তার জেদ চেপে গেল। সে আপনার কথার ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে বললে, আজ্ঞে না স্যার, আমি আজ অঙ্ক করেছি। খাতাখানা কোথায় গেল, পাচ্ছি না!

গোকুলবাবু তার মিথ্যা কথা সত্ত্বেও জেদ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি এইবার প্রহার করবেন। বললেন, অঙ্ক কষিষ নাই, তার উপর মিথ্যে কথা বললি। তার উপর আবার জেদ করে মিথ্যে কথাকে সত্যি করতে চাইছিস? বেশ খাতা বের কর!

খাতা কিন্তু পাওয়া গেল না।

গোকুলবাবু প্রহার করবার জন্যে হাত উঠিয়েছেন। তিনি এর আগে কোন দিন মণিকে মারেননি। আনন্দচন্দ্রের ছেলে মণি জ্ঞান হবার পর থেকে মানুষের কাছে আদরই পেয়েছে। প্রহার দূরের কথা, তিরস্কার পর্যন্ত পায়নি। আসন্ন প্রহারের জন্য উদ্যত হাত দেখে তার সমস্ত শরীরটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে একটা হাত প্রহার রোধ করবার জন্যে তুলে আর্ত স্বরে বললে—আমাকে মারবেন না স্যার। আমি সত্যি বলছি অঙ্ক কষেছি। খাতাখানা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। আপনি দুলালকে জিজ্ঞাসা করুন।

সমস্ত ঘটনাটা দেখে দুলালের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ব্যথিত হয়ে উঠেছে। উপায় নেই, এই প্রহারের অপমান থেকে মণিকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। সে গোকুলবাবুর উপদেশ পালন করেই চলে। সে কি করে মিথ্যা কথা বলবে? মিথ্যা কথা সে বলতে পারবে না।

মণির আর্তস্বরের কথা শুনেই সে তার মুখের দিকে চাইলে। তার আর্ত, বিপন্ন মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়তেই তার মনে হল মণি যেন আপনার দুই চোখের আর্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকে রক্ষা করবার জন্যে ডাকছে! সেই দাম্ভিক, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, আত্মপর মণির চোখের এই বিপন্ন দৃষ্টিতে তার মন দুলে উঠল। সে গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ স্যার, মণি আজ অঙ্ক কষেছে। আমি দেখেছি ওকে অঙ্ক কষতে। খাতাখানা আমাকে দেখতেও দিয়েছিল। আমিই কোথায় রাখলাম। আর খুঁজে পাচ্ছি না।

তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোকুল বাবুর প্রহারোদ্যত হাতখানা নেমে এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুই বলছিস তুই দেখেছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আবার আপনার মিথ্যার পুনরুক্তি করতে হল দুলালকে।

গোকুলবাবু নিরস্ত হলেন। দুলাল এতক্ষণ কথা বলছিল মণির মুখের দিকে চেয়ে। সে দেখলে মণির মুখের সেই ভয়ার্ত চেহারা ঘুচে গিয়ে সহজ প্রসন্ন নির্ভয়তা ফুটে উঠেছে তার মুখে।

দুলালের মন এক মুহূর্তে এক নতুন উপলব্ধির আস্বাদে আপ্লুত হয়ে উঠল। তা হলে তার মধ্যে এমন ক্ষমতা রয়েছে যাতে মণির মত মানুষের মুখেও প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে সে। আসন্ন যৌবনের সেই বোধ হয় তার প্রথম আশ্চর্য উপলব্ধি!

এর পর মুহূর্তেই গোকুল বাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আজ থাক। আবার কাল হবে। তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন ঘর থেকে।

তিনি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মণি এক মুহূর্ত দুলালের মুখের দিকে পরক্ষণেই আপনার গোটানো বিছানার উপর মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল। দুলালের বুকের ভিতর যে অভ্রভেদী কঠিন গাম্ভীর্য ও একাকিত্ব পর্বতশিখর-লগ্ন চির তুষারের মত তাকে অন্য সকলের সঙ্গে পৃথক করে রাখে সেই একাকিত্বের তুষার যেন কোন অজ্ঞাত অগ্নিপিণ্ডের উত্তাপে গলতে লাগল। গলে গলে সেই জল তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। সে মণির কাছে সরে গিয়ে তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সারা রাত তার ঘুম এল না। পাশের বিছানায় মশারীর মধ্যে মণি গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। তার গাঢ় ও দীর্ঘ নিশ্বাস উঠছে পড়ছে পরিমিত ছন্দে। এ বিছানায় দুলাল অসহ্য আনন্দে আর বেদনায় জেগে বসে রয়েছে যেন অন্ধকার ঝিল্লীঝঙ্কৃত রাত্রির মর্মবেদনার কেন্দ্রস্থলে। তার হৃদয়ের মধ্যে এ কোন্ আশ্চর্য মমতার প্রস্রবণ আজ অকস্মাৎ জন্মলাভ করল। এর ভার সে বহন করবে কি করে?

সকাল বেলা পড়াতে পড়াতে গোকুল বাবু অকস্মাৎ ডাকলেন—দুলো!

—আজ্ঞে।

—তুই ঐ মণির সঙ্গে মিশে মিথ্যা কথা বলতে শিখেছিস? তুই আর ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকবি না। তুই আজ বিকেলে তোর বই বিছানা পত্র চৌকী নিয়ে আমার ঘরে আয়। আজ থেকে তুই এখানে থাকবি।

অকস্মাৎ তার চোখে জল এল। সে মুখ নামিয়ে নিলে। কাল রাত থেকে তার কি যে হয়েছে। অকারণে কাঁদতে তার ভাল লাগছে কেন এমন!

গোকুল বাবু তার মুখটা আপনার হাত দিয়ে তুলে ধরে বললেন—তুই কাঁদছিস কেন রে? দূর বোকা! আচ্ছা ঐ ঘরেই থাক তুই। তবে মণির সঙ্গে বেশী মিশবি না। খবরদার।

মণির জন্যে অকারণ মমতায় আবার তার চোখে জল এল।

পল্লীগ্রামের নিস্তরঙ্গ ঘটনার প্রবাহহীন জীবন। সেখানে কোন দিন আপনার মধ্যে থেকে আলোড়ন ওঠে না। স্থির জলে আকাশের স্থির ছায়ার মত এখানকার জীবন যেন অনন্তকাল ধরে কার জন্যে ধ্যানযোগে আত্মস্থ। বহুকালের মধ্যে সেই স্থির জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছেন আনন্দচন্দ্র। তাঁর আবির্ভাবে ছোট গ্রামটির জীবন যেন দিন দিন নব নব ঘটনার ঘটনে মন্থিত সাগরের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আনন্দচন্দ্রের দিকেই নিবদ্ধ। ঈশ্বর-প্রেরিত, মহাশক্তিশালী পুরুষ বলেই শুধু তাঁর সম্মান। নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের ভিত্তিমূলে আছে যে অর্থ ও সম্পদ, যার ফলে গ্রামের মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগছে, যার কণিকায় গ্রামের মানুষ কোন না কোন দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছে, সেই অর্থ ও সম্পদের শক্তির জন্যেই মানুষ আরও বেশী করে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। তিনি ছাড়া গ্রামে আর যে ক'টি বিচিত্র মানুষ তাদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে রেখেছে তাদের কথা তারা কিন্তু ভুলেই থাকে, মনে রাখে না। মনে রাখার প্রয়োজনও হয় না তাদের। কারণ তাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে তাদের কোন স্পর্শ লাগে না। লোকনাথ এই জাতের মানুষ। এই অদ্ভুত মানুষটির যখন প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল গ্রামের জীবনে তখন একবার মানুষ কুতূহলী দৃষ্টি নিয়ে মানুষটিকে লক্ষ্য করেছিল। তারপর তাকে অদ্ভুত কিন্তু অকেজো মানুষ বলে চিহ্নিত করে ভুলে গিয়েছে।

সেই মানুষ একদা নিশীথ রাত্রিতে পল্লীর জীবনে নূতন করে আলোড়ন তুললে।

পল্লীগ্রামের জীবনে এক প্রহর রাত্রি মানে নিশুব্ধ নিশুতি। সকলেই গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে যায় তার অনেক আগেই। পথচারী কুকুরগুলো শুদ্ধ তাদের

একদফা পাহারা শেষ করে বিশ্রামের আশ্রয় খুঁজে নিয়ে শুয়ে পড়ে। কেবল কেরোসিনের একটা বাতি জ্বলে আনন্দচন্দ্রের বাড়ীর দেউড়ীতে। আর আলো জ্বলে তাঁর শোবার ঘরের পাশের ঘরে; আনন্দচন্দ্র কলিয়ারীর জমিদারীর জমিজমার হিসাব, কাগজ দেখেন, এখানকার দৈনন্দিন জমাখরচের খাতা দেখেন। আর আলো জ্বলে সুধাকান্তের শোবার ঘরে, রেড়ির তেলের আলোয় তিনি নিবিষ্ট মনে শ্রীমদ্‌ভাগবত কি কোন পুরাণ চৈতন্য চরিতামৃতের পাতা ওলটান। আর আলো জ্বলে বোর্ডিংয়ে দুলালের ঘরে সে পড়াশুনো করে—পাঠ্য অপাঠ্য যাই হোক কিছু সে পড়ে। আর হয়তো জেগে থাকে খগেন আর মালতী আপনাদের গন্ধমন্থর পুষ্প-মালঞ্চের মধ্যে। আর গ্রাম হতে গ্রামান্তরে নাইট স্কুলের কাজ শেষ করে লোকনাথ দীর্ঘ ভীম পদক্ষেপে এই সময় বাড়ী ফেরে গুন গুন করে গান করতে করতে।

বৃদ্ধ নরনাথবাবু প্রথম প্রথম বিছানাতেই চুপ করে জেগে বসে থাকতেন। উদ্‌ভ্রান্ত পুত্রের জন্য! রাত্রির পর রাত্রি এমনি ভাবে জেগে বসে থেকে অপেক্ষা করতেন কখন তাঁর বৈঠকখানার বারান্দায় কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠবে। কুকুরগুলো এক যোগে ডেকে উঠলেই বুঝবেন—সেই পাগল আসছে। প্রত্যাশায় কান খাড়া করে বিছানায় উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকতেন। পর মুহূর্তেই বাইরের দরজায় একটা কি দুটো ধাক্কা পড়ত। নরনাথবাবু আপনার লণ্ঠনটি বাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসে, চাকর উঠে দরজা খুলবার আগেই সন্তর্পিত পদে এসে দরজা খুলে দিতেন।

কোন কোন দিন লোকনাথ কোন কথাবার্তা না বলে একেবারে হাত পা ধুয়ে খেতে বসে যেত। কোন কোন দিন সে হয় সঙ্কুচিত নয় বিরক্ত হয়ে বলত—আপনি কেন অনর্থক জেগে থাকেন?

কোন দিন নরনাথবাবু জবাব না দিয়ে ঠুক ঠুক করে আপনার ঘরে চলে যেতেন, কোনদিন বা বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার মত ছেলে পেয়েছি, অশেষ সৌভাগ্য আমার। সেই সৌভাগ্যের খেসারত আমি দেব না তো কে দেবে!

ইদানিং নরনাথ বাবুর সঙ্গে লোকনাথের দূরত্ব আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। বিয়ে করতে অস্বীকার করার পর নরনাথ বাবু অভিমানে, ক্ষোভে

লোকনাথের কাছ থেকে নিজেকে আরও খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি আর বিছানা থেকে ওঠেন না। ইদানিং ঘুমিয়ে পড়েন ইচ্ছা করেই। লোকনাথ বাড়ী ঢুকে একদিন এক বার প্রত্যাশা করে বাবা এখনি উঠে আসবেন। কিন্তু তার আশা ব্যর্থ হয়। বাবার ঘরের দিক থেকে আলোর ছটা কিম্বা পায়ের শব্দ কোনটাই আসে না। লোকনাথ খেতে খেতে আশাভঙ্গের একটা নিশ্বাস ফেলে, ভাল করে খাওয়াও হয় না, পাতে ভাত অর্দ্ধেকের উপর পরে থাকে। সে উঠে পড়ে। উঠানে অন্ধকারের মধ্যে ভিক্ষাপ্রত্যাশী কুকুরের জলন্ত চোখ দুটো নজরে পডলে পাতের ভাত গুলো তুলে সস্নেহে তার কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে—খা। কুকুরটা অন্ধকারের মধ্যে চক চক করে খেতে খেতে লেজ নাড়ে।

এই তার প্রতি রাত্রির নিত্য নিয়মিত কর্ম।

কিন্তু একদা তার পদক্ষেপে গ্রামের জনহীন পথে আর শব্দ উঠল না। তার পরিবর্তে দুটি তরুণের সবল সাগ্রহ কণ্ঠের আহ্বানে গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। নিশীথ রাত্রিতে সুধাকান্তের বাডীর দরজায় বার বার ডাক উঠল—ভট্টচাজ মশাই! ভট্টচাজ মশাই।

সুধাকান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার লীলারসে গদগদচিত্ত হয়ে পুঁথির পাতার পর পাতা ওলটাচ্ছিলেন। ডাক শুনে শশব্যস্ত হয়ে পুঁথি বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন আলো হাতে।

কি ব্যাপার? তিনি খানিকটা শঙ্কিত হয়েই বেড়িয়ে এসেছেন।

একটি প্রায় অপরিচিত তরুণের মুখে আলো পড়ল। ছেলেটি প্রণাম করে তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিলে।

সুধাকান্ত আবার আপনার প্রশ্নের পুনরুক্তি করে চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন—কি ব্যাপার বলতো হে!

চিঠি পড়তে লাগলেন তিনি। লোকনাথ লিখেছে। সামান্য দু ছত্র চিঠি। সে প্রণাম জানিয়ে লিখেছে—সে মহামুস্কিলে পরেছে, সুধাকান্ত যেন পত্রপাঠ এই লোকের সঙ্গেই চলে আসেন। এ বিষয়ে তার বাবাকে জানাবার কোন দরকার নেই।

ছেলেটিকে সুধাকান্ত আবার প্রশ্ন করলেন—লোকনাথ কি মুস্কিলে পড়ল এই রাত্রে?

ছেলেটি বললে—তা তো জানি না আজ্ঞে। তবে তিনি মুখে বলে দিলেন যেন আপনি তাড়াতাড়ি যান, দেরী না করেন।

তিনি এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা তুমি দাঁড়াও। আমি জামাটা গায় দিয়ে আসি।

জামার উপরে চাদরটা জড়াতে জড়াতে তিনি রাস্তায় নেমে এলেন। বললেন—চল।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ। অনেকক্ষণ লাগল পৌঁছুতে। মাথার উপর সপ্তর্ষি তখন পাক খেতে আরম্ভ করেছে। বৃশ্চিক ও প্রায় অস্ত গেল।

নিস্তব্ধ গ্রাম। অন্ধকার। কেবল একটি বাড়ীতে অনেকগুলি আলো জ্বলছে। সঙ্গে অনেক মানুষের চাপা কোলাহল। তিনি পৌঁছুতেই ইস্কুলের মাস্টার গোকুলবাবু ছুটে এলেন তাঁর কাছে।

তিনি বললেন—আমিও আপনার মত চিঠি পেয়ে আসছি। দেখুন পাগলা কি কাণ্ড করে বসে আছে। আপনার জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছে।

গোকুলবাবু বললেন—পাগলা বিয়ে করবে। এখনই। সে এক কাণ্ড! বুড়ো পাত্র এসেছিল, তাকে ওর চেলাচামুণ্ডারা সন্ধ্যে বেলাতেই খেদিয়ে দিয়েছে। পাত্র তো তাড়ালে, কিন্তু পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে তাড়াবার সময় সে খেয়াল কেউ করেনি। এদিকে লগ্নভ্রষ্ট হয়! কন্যার বাপ তো কাঁদছেন আর ছেলেদের শাপশাপান্ত করছেন। কন্যার মা কাঁদছেন, কন্যা মরার মত হয়ে গিয়েছে। গ্রামের যে সব ছেলেরা বুড়ো পাত্রকে তাড়িয়েছিল তারাই নিজেদের মধ্যে উদ্যোগ করে একজনকে পাত্র হিসেবে খাড়া করেছিল। পাত্রের বাপ-মা দুজনেই অগত্যা রাজী হয়েছিল, কিন্তু কন্যা বেঁকে বসল, বললে—আমার প্রাণ থাকতে ঐ গেঁয়ো মুখ্যুকে বিয়ে করব না। তার চেয়ে আমার সেই বুড়ো পাত্রই এনে দাও। লোকনাথ গোলমাল শুনে হাজির! লোকনাথেরই পালটি ঘর। ছেলেরা লোকনাথকে চেপে ধরেছে। কন্যার মত চাওয়া হয়েছিল। তা না কি হেসে বলেছে—আমি কি জানি! তোমরা যা হয় কর! তোমরা কি আর আমার ক্ষতি করে দেবে! লোকনাথও নিমরাজী হয়েছে। আমিই বা কি বলি! মত দিয়েছি! আপনার মতের অপেক্ষা!

—কিন্তু এ আপনারা মহা অন্যায় করেছেন। ওর বাবা নরনাথবাবুকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল! সুধাকান্ত বললেন।

—কিন্তু পাগলাই বুদ্ধি করে নিষেধ করেছে। পাগলার বুদ্ধি তো!

সুধাকান্ত হাসলেন। বললেন, পাছে বাবা অমত করেন সেই জন্তে তাঁকে চিঠি লিখতে দেয়নি লোকনাথ? কেমন না? তা হলে ওর মত আছে বুঝতে পারছি। চলুন দেখি।

তারপর কিছুক্ষণ সুধাকান্ত কন্যার পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন সংগোপনে। তারপরই হুকুম দিলেন—এইবার বিবাহ আরম্ভ হোক। লগ্ন বয়ে যাবে তা না হলে।

তারপর হুকুম মাত্র আবার নূতন করে আলো জ্বালা হল। আনন্দ-কোলাহলে বিয়ে বাড়ীর বিষণ্ণ আবহাওয়া আবার উৎসব মুখর হয়ে উঠল গভীর রাত্রে। লোকনাথের চওড়া রুক্ষ কপাল চন্দনে চর্চিত হল, গায়ে খাটো পিরানের বদলে গরদের চাদর উঠল। কপালের উপর টাক-পড়া প্রকাণ্ড মাথায় টোপরটা ঢুকল না, কোন ক্রমে সেটা মাথায় চাপানো হল মাত্র।

বর এসে বসল পিঁড়ির উপর।

উলুধ্বনিতে শাঁখের শব্দে, হাস্যমুখ মানুষের কোলাহলে বিবাহ-বাসর উল্লসিত হয়ে উঠল। চেলিতে ঢাকা কন্যা এল, কন্যার পিতা উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে, চোখের কোলে কোলে আনন্দের অশ্রু মেখে কন্যা-সম্প্রদান করলেন। বোকার মত হাসি মুখে নিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে চেলিতে-ঢাকা কন্যার একখানি গয়না-পরা সুডোল কোমল, শ্যামবর্ণ একখানি হাত আলতো ভাবে বিবেচনা-হীনের মত গ্রহণ করলে।

কন্যা-সম্প্রদান শেষ হলে সুধাকান্ত আর গোকুলবাবু সেই রাত্রেই আবার ফিরে এলেন।

সারা রাস্তা দুজনে নিস্তব্ধ হয়ে পাশাপাশি হেঁটে এলেন সম্পূর্ণ দু' কথা ভাবতে ভাবতে। গ্রামের ভিতর ঢুকে পথ ভাঙবার মুখে গোকুলবাবু সুধাকান্তকে নমস্কার জানিয়ে বললেন—তা হলে আসি। কিন্তু পাগল এ কি করলে কিছু ঠিক পাচ্ছি-না ভেবে। কোন দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, আর হবে কিনা কে জানে।

সুধাকান্ত একটু হেসে বললেন—অত ভাবছেন কেন? ভগবানের অভিপ্রায়, তিনিই যা হয় করবেন।

তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলা পড়তে পড়তে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁর আজ সারাক্ষণ মনে হচ্ছে ঈশ্বর তাঁকে সত্য সত্যই তাঁর লীলা-রস আজ মানুষের মধ্য দিয়ে পান করালেন। কন্যাটির মুখের মুগ্ধ হাসি তিনি দেখেছেন, তার আন্তরিক ইচ্ছার কথাও জানতে পেরেছেন তিনি। অন্যদিকে রুদ্র রুক্ষ লোকনাথের মুখে যে আনন্দের আলো প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে করে একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব অপরূপ মধুর রসের আস্বাদনের তৃপ্তিতে সারা মন একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ আবেশে আবিষ্ট হয়ে আছে। সর্বোপরি একে তিনি ভগবানের অভিপ্রায় বলেই মেনে নিয়েছেন। তিনি হেসেই প্রতি নমস্কার করে বাড়ীর পথ ধরলেন।

পর দিন একটু বেলা হতে না হতে সারা গ্রাম এই বিবাহের সংবাদে মুখর হয়ে উঠল। নরনাথ বাবুর বাড়ীর চাকর সংবাদটা শুনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে নরনাথ বাবুকে সংবাদটা দিলে আনন্দচন্দ্রের কাছারী থেকে ফিরবার পর। বললে—বাবু, কি সব শুনছি?

নরনাথ বাবুর মেজাজ সকাল বেলাকার কাজকর্মের পর বোধ হয় ভালই ছিল, তিনি কৌতুক ক'রে বললেন—কি শুনছ?

চাকরটা সাহস পেয়ে গম্ভীর ভাবে বললে—শুনলাম আমাদের দাদাবাবু নাকি কাল রাত্রে বিয়ে করেছেন। আকস্মিক সংবাদ পেয়ে নরনাথবাবু আগুনের মত জ্বলে উঠলেন। হাতের লাঠিটা তুলে চাকরটাকে তাড়া করে মারতে গেলেন। চাকরটা পালিয়ে বাঁচল।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে, কাল রাত্রে লোকা এসেছিল ফিরে? খেয়েছে সে?

চাকরটাও নিরাপদ দূরত্ব থেকে রেগে জবাব দিলে—ফিরেছে কি না তার আমি কি জানি? রাত্রের খাবার এখনও যেমনকার তেমনি ঢাকা পড়ে আছে; দেখুন গিয়ে।

নরনাথ বাবু বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। লোকনাথ তা হ'লে রাত্রে ফেরেনি কাল? এমন তো কখনও হয় না! তা হলে চাকরটা যা বললে তাই কি সত্যি?

তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন মনে মনে। একবার চাকরটাকে ডেকে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হল তাঁর। কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানে

লাগল। ঠিক এই সময়েই সুধাকান্ত এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। সুধাকান্তকে দেখেই বহুদর্শী প্রবীণ মানুষটি বুঝলেন—যে রটনা তিনি শুনেছেন তা ভুল নয়, ঠিকই।

সুধাকান্ত বললে—সকালে আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি তখন বেরিয়ে গিয়েছেন।

নরনাথ বাবু বললেন—এস বাবা এস। তা কি ব্যাপার ?

ব্যাপারটা বলতেই এসেছেন সুধাকান্ত। ঘটনার আকস্মিকতাটা বুঝিয়ে বলে নরনাথ বাবুর ক্রোধ শান্ত করে লোকনাথের সস্ত্রীক এখানে আসার পথটা সুগম করবার জন্যেই এসেছেন সুধাকান্ত। তবু ঘটনাটা নরনাথ বাবুকে বলতে তিনি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে নরনাথ বাবুই তার বলার পথটা সুগম করে দিলেন—তা হ'লে লোকার সম্বন্ধে যা শুনলাম সব সত্যিই ? তুমিই তা হ'লে কাল রাত্রে আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছ ?

সুধাকান্ত বলবার সুযোগ পেলেন। ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বললেন নরনাথ বাবুকে। সব শুনে নরনাথ বাবু রাগ করলেন না। একবার বললেন—আমাকে খবরটা দিলে কি ক্ষতি হত ? যাক ও বিয়ে করেছে এই আমার ভাগ্যি।

ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে এটা সুধাকান্ত অনুমান করতে পারেননি। তিনি বিশেষ খুশী হয়ে পরিপূর্ণ মনে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনি তা হলে ওদের বরণ করে ঘরে তুলবার একটা ব্যবস্থা করুন।

উৎসাহিত হয়ে বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—নিশ্চয়। নিশ্চয়। ও বিয়ে করেছে এই আমার ভাগ্যি ! তার ওপর নিজের পালটি ঘরে বিয়ে করেছে, ধর্ম আইন কোনটাকেই লঙ্ঘন করেনি। তবে বাপু, এ বিয়ে কেমন হল জান ? এ প্রায় শিবের বিয়ের মত হল। না জ্বলল আলো, না হল উৎসব, ছেলে আমার বিয়ে করে বসল। তা যেমন আমার ছেলে, তেমনিই বিয়ে হয়েছে। ও মানুষের অমন করে জোর করে বিয়ে না দিলে বিয়েও হত না কোন দিন !

সুধাকান্ত বেরিয়ে যেতেই বৃদ্ধের দেহে মনে যেন যৌবন ফিরে এল। তিনি এক মুহূর্তে বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত কল্পনা করে নিলেন। নূতন করে আলো

জ্বলে উঠে—নবীন আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবে। এই বাড়ীর খিলানে খিলানে আবার নূতন করে খিল খিল হাসি বেজে উঠবে। বহুদিন বহু বহুদিন এ বাড়ীতে কেউ হাসেনি। তারপর আবার নবজাতকের কান্নায় এই বাড়ীর পুরানো দাঁত-বের-করা দেওয়ালগুলো শুদ্ধ নতুন করে হেসে উঠবে। তার পায়ের ছোঁওয়া পড়ে এই বাড়ীর মেঝেগুলো আবার আনন্দে শিউরে শিউরে উঠবে তাঁর বুড়ো পাঁজরগুলোর মত।

কিন্তু এখন থেকে তিনি ভাবতে আরম্ভ করলেন কেন? এখন কাজ, অনেক কাজ করতে হবে তাঁকে! তিনি চিৎকার করে চাকরকে আর ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন। তিনি আনন্দচন্দ্রকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন পত্রপাঠ তাঁর জুড়ীগাড়ীখানি এখনি লোকনাথের শ্বশুরবাড়ীতে বরবধূকে নিয়ে আসবার জন্যে পাঠিয়ে দেন।

তারপর ছুটোছুটি করে নূতন বধূর ভাল করে খাবার ব্যবস্থা করলেন। পুরনো ঘর ঝেড়ে পরিষ্কার করিয়ে খাট বিছানা পেতে তাদের শয্যার ব্যবস্থা করলেন। তারপর বরণ করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন সস্ত্রীক সুধাকান্তকে।

সব ব্যবস্থা করে আবার বিকেলবেলা স্নান করলেন বৃদ্ধ। জীর্ণ শান্তিপুরে ধুতি পরিপাটী করে পরে গায়ে গরদের চাদর জড়িয়ে বরকন্যার জন্যে অধীর-ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎ মনে পড়ল দরজায় মঙ্গলঘট আর আমের পল্লব টাঙানো হয়নি। তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

সুধাকান্ত দুটো মঙ্গলঘট জোগাড় করে দরজার দুপাশে বসিয়ে দিলেন। আমের পল্লব দড়ির মধ্যে বেঁধে নরনাথবাবু নিজে একটা টুলের উপর উঠে দরজার বাজুর সঙ্গে বাঁধতে লাগলেন। এমন সময় বরবধূকে বহন করে জুড়িখানা এসে দাঁড়াল। তিনি ছুটে টুলের উপর থেকে নেমে প্রায় পড়তে পড়তে ছুটে এলেন। লোকনাথ বধূকে নিয়ে নামতেই তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। প্রণাম সাঙ্গ করে বধূ মুখ তুলতেই তিনি তার চিবুকখানি তুলে ধরলেন। কিছুই ভাল করে দেখতে পেলেন না। চোখের জলের মধ্য দিয়ে কেবল অস্পষ্ট ঝাপসা দেখলেন একখানি সুশ্রী কচি, লজ্জানম্র চন্দনচর্চিত মুখ।

ঠাকুরবাড়ীর পিছনে যে বিস্তৃত জায়গায় আনন্দচন্দ্র বৃহৎ পুকুর কাটিয়েছেন তারই দুই পাশে একদিকে মস্ত বড় ফলের বাগান, অন্য দিকে তার চেয়েও বেশী জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান লাগিয়েছেন। এরই মধ্যে অজস্র ফুলে বাগান ভর্তি হয়ে আছে। সেই ফুলের বাগানের মাঝখানে বাঁধানো বেদীর উপর বিকেল বেলায় আনন্দচন্দ্র আর সুধাকান্ত বসে বসে গল্প করছিলেন। আনন্দচন্দ্র শুনেছেন লোকনাথের বিবাহের কথা। তবে সুধাকান্ত যেমনটি বলতে পারবেন তেমনটি আর অন্য কেউ পারে না। তা ছাড়া সুধাকান্ত নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনছিলেন।

সব শুনে বললেন—বল কি হে সুধাকান্ত! সেই অত্যন্ত বিপন্ন মুহূর্তেও মেয়েটির পছন্দ-অপছন্দ জ্ঞান ছিল? বর অপছন্দও করেছে নিজে, আবার পছন্দও জানিয়েছে নিজে? বাহাদুর মেয়ে তো! আর আমাদের লোকনাথও রাজী হয়ে গেল এক কথায়? আরে ভাই, নরনাথবাবুর হয়ে আমি লোকনাথকে অনুরোধ করেছি, তা হেসে উড়িয়ে দিলে আমার কথা, বললে—আপনি পাগল! ওর বাবার, আমার অনুরোধে যা হয়নি, একটি মেয়ের এক মুহূর্তের মুখের হাসিতে তাই হয়ে গেল! তবে অবাকই বা হই কেন! অল্প বয়সের দোষই ওই! রাজার চোখ রাঙানিতে যা না হয়, একটি ভিখিরীর মেয়ের এতটুকু হাসিতে তাই হয়! আনন্দচন্দ্র কথাটা একবার আবৃত্তি করেন আর একটু করে হাসেন। যেন এই মধুস্বাদী স্মৃতি তিনি বার বার রোমন্থন করছেন আপন মনে।

পরের দিন নবদম্পতিকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। বিদ্যুতকে দিয়ে এক ছড়া সোনার হার বধূকে দিয়ে আশীর্বাদও করালেন। আনন্দচন্দ্র লোকনাথকে একলা পেতেই বললেন—কি হে লোকনাথবাবু, কে বড় পাগল সেটা বোঝা গেল না কি?

লোকনাথ কোন জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল লজ্জিতভাবে। লোকনাথের মুখে সলজ্জ হাসিটি কি সুন্দর মানিয়েছে! আনন্দচন্দ্রের বড় ভাল লাগল।

তিনি তাকে বসিয়ে আপ্যায়ন করে ভিতরে গেলেন বধূটিকে দেখবার জন্যে। বধূটি সহজ হয়ে বসে বিদ্যুতের সঙ্গে গল্প করছিল। তিনি যেতেই সসব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

আনন্দচন্দ্র বললেন—বস, বস মা। অমন ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

কালো কোমল শালপ্রাংশু মহাভুজ মানুষ, মাথায় একমাথা সাদা চুল, এই বিশাল ঐশ্বর্য আর কীর্তির অধীশ্বর আনন্দচন্দ্র আজ এ অঞ্চলের মানুষের কাছে রূপকথার মানুষৈ হয়ে উঠেছেন। তাঁর সম্পর্কে সত্য, অর্ধসত্য, মিথ্যা, নানান কাহিনী আজ এ অঞ্চলের মানুষকে মশগুল করে রেখেছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আজকাল মানুষ আসে তাঁর কীর্তি দেখতে, তার চেয়েও বেশী করে আসে তাঁকে দেখতে। সেই মানুষ আজ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পল্লীগ্রামের সামান্য মেয়েটির সসব্যস্ত না হয়ে উপায় আছে!

মেয়েটি উঠে তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলে।

এই সশ্রদ্ধ প্রণামে আনন্দচন্দ্রের মনের ভিতরটা আরও খানিকটা নরম হয়ে গেল। মেয়েটির প্রণাম শেষ হলে তিনি তার চিবুকটি সস্নেহে তুলে ধরে বললেন—কি নাম মা তোমার?

অসঙ্কোচ হাসি হেসে মেয়েটি বললে—হাসি। হাসি দেবী।

—বাঃ খাসা নাম। যেমন হাসি হাসি মুখখানি তেমনি নাম। নামে স্বভাবে তো বড় মিল তোমার!

মেয়েটি মুখ নামিয়ে হাসল।

আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। খবর পেয়েছি বুড়ো পাত্র, মুখ্যু পাত্র কোনটাই তোমার পছন্দ হয়নি! তা এবার যে পাত্র পেয়েছ সে শক্ত জোয়ান, লেখাপড়াও অনেক শিখেছে। এবার বর পছন্দ হয়েছে তো তোমার?

মেয়েটি একেবারে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

আনন্দচন্দ্রও হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

সেইদিন বিকেল বেলা অন্য দিনের মত বাগানে বসে তামাক খাচ্ছেন। আজকাল তাঁর মনের সহজ স্বাভাবিক আনন্দটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে এসে প্রথম নানান কর্ম সমারোহের উত্তেজনায় সে কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। এখন কর্ম-সমারোহ কমে গিয়ে জীবন একটা ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট রাস্তা নিয়েছে। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। মনের এ অবসাদ কেন এল, কোথা থেকে এল, তার মূল আপনার মনে অনেক করে খুঁজেছেন। বের করতে বিশেষ কিছু পারেন নি। জীবনে

কোথায় যেন কোন্ অতৃপ্তি কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে আত্মগোপন করে থেকে তাঁকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে। যেন কিছুই ভাল লাগছে না! একবার মনে হয়েছে—একমাত্র ছেলে মণির সম্বন্ধে যে আশা পোষণ করেছিলেন সে আশা পূর্ণ হবে না এই বোধটা থেকে এই অবসাদ জন্ম নিয়েছে। আর একবার মনে হয়েছে—বিদ্যুতের আত্মমগ্ন, তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ ব্যবহারই এর কারণ! তিনি চেয়েছিলেন—এই আকাশস্পর্শী অর্থ ও কীর্তির বিনিময়ে বিদ্যুৎ প্রতি মুহূর্তের আনন্দচন্দ্রকে প্রতিমুহূর্তে বুঝবার জন্যে সূর্যমুখী ফুল যেমন অহরহ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনি করে তাকিয়ে থাকুক। সেই চিরদিনের প্রত্যহের পোষিত আশা তাঁর পূরণ হয়নি। কিন্তু ভেবে দেখেছেন—এ গুলোও যেন আসল কারণ নয়। এখন মনে হচ্ছে, যে বিশ্রামের প্রত্যাশায় এখানে এসেছিলেন দেহে এবং মনে সেই ঈপ্সিত বিশ্রাম তিনি এখানে পান নি। তিনি কাজের মানুষ। কাজের মধ্যে ভাল থাকেন। এখানে এসে কাজ না করে সেই সহজ আনন্দটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সেই আনন্দ পাবার জন্যে আজকাল কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আজ লোকনাথ আর ঐ হাসি মেয়েটিকে দেখে তাঁর বড় ভাল লেগেছে। ওদের কথাই ভাবছিলেন এতক্ষণ ধরে।

তিনি বাগানে বসে আছেন। মালীরা তাঁকে কাজ দেখাবার জন্যে দ্রুত পায়ে ভারে ভারে জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালছে নিঃশব্দে। সমস্ত বাগানটা থেকে গরম তাপের সঙ্গে ভিজে মাটির ভুরভুরে গন্ধ আসছে। তামাকের গন্ধের সঙ্গে ভিজে মাটির আর নানান ফুলের গন্ধ মিশে মাথার ভিতরটা একটা কোমল আবেশে আবিষ্ট হয়ে আসছে যেন।

ও দিকে মালীদের কাজের তদারক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে খগেনবাবু। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, ডাকলেন,—খগেনবাবু, ওহে ও খগেনবাবু!

খগেন অত্যন্ত মুখচোরা মানুষ। যে দিন চাকরী দেন তাকে সেই এক দিন তাঁর সঙ্গে দু চারটে কথা হয়েছিল। তারপর এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাকে এদিকে ওদিকে বাগানে ঘুরতে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু কথা আর হয়নি। লোকটা তাঁকে যেন অত্যধিক ভয় করে। অথচ লোকটা যে সুপ্রচুর কাজ করে তার প্রমাণ তিনি অনবরতই পান। গোবিন্দের ঘরে পুজোর থালায় ফুলের প্রাচুর্যে তাঁর

বিস্ময় লাগে। তাঁর বাড়ীতে তাঁর শোবার ঘরে, বসবার ঘরে, মণির ঘরে ফুলদানীতে অহরহ টাটকা ফুলের গন্ধে মন বার বার আবিষ্ট হয়ে আসে। তিনি শুনেছেন—খগেন কাউকে বাগানের ফুল তুলতে দেয় না, নিজের হাতে তোলে, ফুলের ডাঁটি প্রতিটি নিজের হাতে কাঁচি দিয়ে কাটে।

তাঁর ডাক শুনেই খগেন যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। পরক্ষণেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল তাঁর কাছে। সে বললে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ ডাকছি, বস।

খগেন আরও ভয় পেয়ে গেল। তাকে আনন্দচন্দ্র ডাকলেন কেন? আর যদি বা ডাকলেন তবে বসতে বলছেন কেন? সে বসবে কি না ঠিক করতে পারছে না।

আনন্দচন্দ্র হাত দিয়ে তাঁর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আবার বললেন—বস।

খগেন বসল আলতো ভাবে।

আনন্দচন্দ্র তার ভয়টা কাটাবার জন্য বললেন—তোমার হাতে ওটা কি ফুল হে? রজনীগন্ধা?

এইবার খগেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাঁর হাতে রজনীগন্ধার ডাঁটিটি বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার হাত থেকে ফুলের ডাঁটিটি হাতে নিয়ে দেখে আনন্দচন্দ্র অকৃত্রিম মুগ্ধ বিস্ময়ে বললেন—বা, বা, এতো ভারী চমৎকার হে! এমন রজনীগন্ধা তো আগে দেখিনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ার্ত মানুষটির মধ্য থেকে একটি সানন্দ পুলকিত অভিজ্ঞ পুষ্পরসিক বেরিয়ে এল। এক মুখ হাসি নিয়ে সে আনন্দচন্দ্রের মুখের অত্যন্ত কাছাকাছি আপনার মাথা নিয়ে এসে ফুলের ডাঁটিটির ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এ সাধারণ রজনীগন্ধা নয়। আর এদিকে কোথাও পাওয়াও যায় না। আমি আনিয়েছি। সাধারণ রজনীগন্ধা থেকে এর তফাৎ কত দেখুন।

কথা বলতে বলতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আনন্দচন্দ্রের হাত থেকে সে রজনীগন্ধার ডাঁটিটি আপনার হাতে টেনে নিলে, তারপর অনভিজ্ঞ ছাত্রকে বোঝাবার মত সে বলতে লাগল—এই দেখুন, এর একটা ফুল ভাল

করে দেখুন। এ ফুলগুলো সাধারণ রজনীগন্ধা থেকে আকারে মোটা আর লম্বা। সাধারণ রজনীগন্ধার এক দফা পাপড়ি, এর পাপড়ি দু'দফা। সাধারণ রজনীগন্ধা একেবারে সাদা, এগুলোর মুখে লালচে আভা। এইবার গোটা ডাঁটিটি দেখুন। কুঁড়ির সংখ্যা এতে বেশী আর ঘন। গন্ধ প্রায় এক রকম। কিন্তু গড়নে রঙে গন্ধে সাধারণ রজনীগন্ধা আমার কাছে বেশী ভাল লাগে। এগুলোতে কেমন পুরুষালি ভাব আছে, সাধারণ রজনীগন্ধা এর তুলনায় যেন অনেক মেয়েলি, অনেক অসহায়।

আনন্দচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ফুলকে কি ভালবাসে মানুষটা! তিনি শুনেছেন কলেজে আজকাল গাছপালা ফুল সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অভিজ্ঞ পণ্ডিতরা সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেন। কিন্তু ফুল সম্পর্কে কি কারও এমন ভালবাসা সম্ভব! আনন্দচন্দ্র আপনার মুগ্ধতাও প্রকাশ করলেন—বাঃ, ফুল সম্পর্কে তো তোমার ভালবাসার অন্ত নাই দেখছি! তোমার ভালবাসারও তো অন্ত নাই শুনেছি। এমন ভালবাসার ক্ষমতাও সুদুর্লভ হে!

এতক্ষণ খগেন অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রগাঢ় ক্ষমতার সঙ্গে আপনার কথাগুলি বলছিল! এবার সে লজ্জা পেয়ে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হল। একটু লাজুক হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে অত্যন্ত সবিনয়ে বললে—আপনি আমার কি উপকার করেছেন কি বলব! আমি দরিদ্র মানুষ। আমাকে চাকরী দিয়ে আমার দারিদ্র অনেকখানি ঘুচিয়েছেন। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনার লক্ষ কাজ। এই কাজে হাজার মানুষ করে খাচ্ছে। সে কথা নয়। আপনি আমাকে আমার পছন্দসই কাজ দিয়েছেন। ছ সাতটা এত বড় বাগান তৈরী করে সব আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমার জীবনের বাগানের আর ফুলের সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন আপনি। আর আমার চাই না কিছু।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন। এই এক ধরনের পাগল। পাগল আর কাকে বলে! সুধাকান্ত এক বিন্দু মিথ্যা বলেনি। পাগল একবার তার জীবিকার সংস্থান হওয়ায় ধন্যবাদ দেয় না। ধন্যবাদ দেয় তার ফুল গাছের শখ মেটানোর জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা একটা কথা বল দেখি। তোমার এত ফুলের সখ কি করে হল? কি করে এই আজগুবি সখ হল তোমার?

খগেন একটু হাসল। সে যেন কেমন এক ধরণের অভয় পেয়ে গিয়েছে আনন্দচন্দ্রের কাছে। তার খুব ভাল লাগছে আনন্দচন্দ্রকে। অথচ আগে এই মানুষটিকে দূর থেকে তার কি ভয়ই লাগত! তার মনে হত ভদ্রলোক কেবল টাকা পয়সা, কয়লা ইট, বাড়ী ঘর নিয়ে কারবার করেন, তিনি বড় লোকের সখের জিনিষ যেমন রাখতে হয় তেমনি ভাবেই এই পাঁচ সাতটা বাগান তৈরী করিয়েছেন। গাছের দিকে কি ফুলের দিকে তাঁর চাইবার সময়ও নেই। আজ সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—এই এত বড় মস্ত লোকটার মধ্যে একটি অতি সহজ সাধারণ মানুষ লুকিয়ে আছে, যার ফুল ভাল লাগে, ফুলের কথা ভাল লাগে, সাধারণ মানুষের কথাও যে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে ভালবাসে। সে বেশ সহজ ভাবে বললে—তা আজগুবি সখ বলতে পারেন! গরীবের ছেলের পক্ষে এ প্রায় ঘোড়া রোগ—এ আমি এই বিশ বছর ধরে বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝছি! আমিও মাঝে মাঝে ভাবি আমার এই আজগুবি সখ কি করে হল! ভাবি আর অবাক হই। অথচ—

বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে গেল। আনন্দচন্দ্র দেখলেন কি একটা আকস্মিক চিন্তার আলো হঠাৎ খগেনের চোখে জ্বলে উঠতে তাকে থামিয়ে দিলে। আনন্দচন্দ্র হেসে সহজভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন—কি হে; অথচ বলে যে হঠাৎ থেমে গেল? কি ব্যাপার?

খগেনের মুখ চোখ হঠাৎ কৌতুকে হেসে উঠল। একটু সকৌতুক হাসি হেসে নিয়ে বললে—না, এই বলছিলাম বিয়ের আগে আমার এসব সখ ছিল না। তখন সখ ছিল গান-বাজনা করার আর মাছ ধরার। সকালে গলা সাধতাম, দুপুরে খেয়েদেয়ে মাছ ধরতাম, আবার সন্ধ্যে বেলায় গান-বাজনা করতাম। বিয়ে হল, বিয়ের পর দেখলাম আমার স্ত্রী গান-বাজনা আর মাছ-ধরা দুটোর কোনটাই পছন্দ করে না। তখন আস্তে আস্তে দুটোই ছাড়তে হল। আমি দেখতাম—আমার স্ত্রীর গাছপালার ওপর খুব মমতা। গাছ পোঁতে, জল দেয়, বেড়া দেয়, ফুল ফুটলে ফুল তুলে কখনও ভটচাজ মশায়ের ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেয়, দুটো চারটে ফুল খোঁপায় পরে। দেখি আর বেশ লাগে। ধীরে ধীরে স্ত্রীর সঙ্গে লেগে গেলাম মাছধরা আর গান করা ছেড়ে গাছের সেবা করতে। সেই নেশাই শেষে প্রায় পাগল করে দিয়েছে আমাকে।

আনন্দচন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে ওকে ভাল করে দেখছিলেন। কতই বা বয়স হবে খগেনের! তাঁর চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোটই হবে বোধ হয়! ওর এমন পাকানো শুকনো চেহারা যে ওকে দেখে ওর বয়স কিছু অনুমান করা যায় না। তবু ওর মুখখানি বড় কোমল, বড় সুকুমার! এই গ্রামে অনেক মানুষই তো তিনি দেখলেন, কিন্তু লোকনাথের চেহারায় যেমন একটা রুক্ষতা আর কাঠিন্য দেখবামাত্র নজরে পড়ে, তেমনি নজড়ে পড়ে এই লোকটির অবয়বের আর মুখের সুকুমারত্ব। টানা টানা বড় বড় চোখের দৃষ্টিটি ভারি মিষ্টি, পাতলা পাতলা ঠোঁটের হাসিটিও তেমনি মিষ্টি। নাকটি চিবুকটি এমন কি হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলিও কি চমৎকার! লোকটি কথা বলছে আর সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখটি যেন ওর হাসছে। স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে যেন লোকটির সারা মুখখানি ফুলের মত ফুটে উঠছে!

হঠাৎ আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ হে খগেন, স্ত্রীকে তুমি বোধ হয় খুব ভালবাস, নয়?

তাঁর এই প্রশ্নে খগেন প্রায় কেমন হকচকিয়ে গেল। অনেকক্ষণ সে আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকল আনন্দচন্দ্রের প্রশ্নের অর্থটা আবিস্কার করবার জন্যে। অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে চোখ নামিয়ে নিলে। আনন্দচন্দ্র দেখতে পেলেন তার মুখে কেমন একটি লাজুক হাসি ফুটে উঠেছে। সে ধীরে ধীরে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সংসারে তো আর কেউ নেই। আছে ঐ মালতী। আমি ওকে ছেড়ে স্বর্গে যেতেও রাজি নই। এমন কি ওর জন্যে আমি বোধ হয় ফুলের সখও ছাড়তে পারি। তবে ফুল আর মালতী আমার কাছে এক হয়ে গিয়েছে।

ওর কথা শুনতে শুনতে অত্যন্ত অকারণে একটা আবেগের পিণ্ড যেন গলা দিয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে বলে মনে হল আনন্দচন্দ্রের। তিনি অকস্মাৎ আপনার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। খগেন এক মুহূর্ত কেমন ভয় পেয়ে থমকে গেল। আনন্দচন্দ্র হঠাৎ তার দিকে ফিরে পায়চারী করতে লাগলেন। খগেন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সসঙ্কোচে সরে গেল।

আনন্দচন্দ্র পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পূর্ব দিগন্তে প্রায় পূর্ণ তিথির চাঁদ রাঙা হয়ে দীঘির জল থেকেই যেন উঠে আসছে।

আবছা আলো-অন্ধকারে নিস্তব্ধতার মধ্যে একা পূর্ব দিগন্তে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন। প্রায়ান্ধকারে আবৃত সমস্ত পরিপার্শ্বটা অকস্মাৎ তাঁর কাছে অত্যন্ত অর্থহীন মনে হতে লাগল। তাঁর মনে হল—এত দিনের এই অপরিমেয় সম্পদ উপার্জন ক'রে কি পেয়েছেন তিনি? কিছু না, কিছু না। সব মিথ্যা হয়েছে। শুধু রাশিকৃত শুষ্ক সম্পদই সঞ্চয় করেছেন, তার পরিবর্তে জীবনে পরম বাঞ্ছিত প্রেমের কি আনন্দের এক কণাও তিনি পাননি। কি হবে তাঁর এই সম্পদ নিয়ে?

তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই থাকলেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল, ঝিল্লীর ডাক মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফুটতর হয়ে উঠতে লাগল। চাঁদের পরিপূর্ণ নিটোল ছবি জলে ফুটে উঠল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বাগানের কচি কচি ডালে ঝর ঝর সর সর শব্দ উঠল, দীঘির স্থির জল কাঁপতে লাগল, চাঁদের ছায়া ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে জলের মধ্যে এলিয়ে গেল। জীবনের আনন্দ তাঁর এমনি হাজার টুকরো হয়েই ভেঙে চুরে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। তিনি কিছু একটা ভেবে স্থির করেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন।

আর ভাল লাগছে না তাঁর। তিনি আর এখানে থাকবেন না। যে প্রত্যাশায় এখানে নিশ্চিন্ততার মধ্যে বিদ্যুৎকে নিয়ে বাস করতে এসেছিলেন তা হ'ল না। ভেবেছিলেন বিদ্যুৎ কাছে আসবে—অনেক কাছে আসবে।

তিনি সারা সন্ধ্যা চুপ করে আরাম-কেদারায় শুয়ে থাকলেন। সামনের টেবিলের উপরে সেড-দেওয়া আলোটা জ্বলতে লাগল। মাঝে মাঝে অকারণে তিনি কান পাতলেন পায়ের শব্দ শুনবার জন্যে। কিন্তু তিনি শুয়েই থাকলেন, কেউ এল না।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে তিনি উঠলেন। গেলেন অন্দরের মধ্যে। ডাকলেন—বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ এসে দাঁড়ালেন ঘরের মধ্যে, জিজ্ঞাসা করলেন—ডাকছ কেন?

হঠাৎ চটে গেলেন আনন্দচন্দ্র, বললেন—কেন, কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

স্বামীর এই আকস্মিক ক্রোধে বিদ্যুৎ হতভম্ব হয়ে গেলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। মুহূর্তে নরম হয়ে গিয়ে আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—কি, করছিলে কি?

—কিছু না। এমনি গল্প করছিলাম।

—হুঁ। শোন, যে জন্য তোমাকে ডাকলাম শোন।

—কি বলছ বল। আমার কাজ আছে।

আনন্দচন্দ্রের মনে হল বিদ্যুৎ যেন এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচেন। অকস্মাৎ তাঁর মনটা অত্যন্ত আতুর হয়ে উঠল। অত্যন্ত করুণ স্বরে আনন্দচন্দ্র বললেন—আমার কাছে একটু বসই না কেন বিদ্যুৎ! কি তোমার এমন কাজ আছে?

বিদ্যুৎ তীব্রভাবে নিম্নকণ্ঠে হেসে উঠলেন, বললেন—তুমি কি ক্ষেপে গেলে না কি? আমি এই সময়ে কবে বসি তোমার কাছে যে আজ বসব!

আনন্দচন্দ্র শেষ চেষ্টা করলেন। সকরুণ মিনতি করে বললেন—কোন দিন বসনি বলে আজ বসবে না এ কেমন কথা! আর সেই জন্যেই তো বসতে বলছি। একটুক্ষণ বস। বলে তিনি হাত বাড়িয়ে বিদ্যুতের একখানা হাত ধরে ফেললেন।

বিরক্ত বিব্রত হয়ে বিদ্যুৎ এক ঝটকায় তাঁর হাত থেকে আপনার হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে স্বামীর দিকে আর ফিরে না তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আনন্দচন্দ্রের মনে বহুকাল পূর্বে যে উন্মাদ আপনার পরিবেশের সমস্ত গণ্ডীকে ভেঙ্গে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত সে-ই যেন আজ বহুকাল পরে আবার তাঁর মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে। তিনি বজ্রগর্ভ কণ্ঠে ডাকলেন—শোন।

বিদ্যুৎ চমকে ফিরে তাকালেন। স্বামীর থমথমে মুখের চেহারা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন দরজার কাছে। চলে যেতে পারলেন না।

আনন্দচন্দ্র বললেন—আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। আমি কাল দুপুরে কোলিয়ারীতে ফিরে যাব। তুমি তৈরী হয়ে নাও। মণি এখানে বোর্ডিংয়ে থাকবে। তুমি আর রাধা যাবে আমার সঙ্গে।

স্বামীর এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত শুনে বিদ্যুৎ অনেকক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ঠোঁটে তাঁর বহুদিনের লালিত ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠল। তিনি শান্তভাবে কেটে কেটে বললেন—মণিকে ছেড়ে, রাধা গোবিন্দকে ছেড়ে আমি তো এখান থেকে যেতে পারব না। যেতে হয় তুমি একলা যাও। আমার যাওয়া হবে না।

কথার জবাব দিয়েই তিনি আপনার স্বভাব অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেলেন। সর্বস্বান্ত আশাহতের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্র তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন শূন্য দৃষ্টিতে। পরক্ষণেই তিনি ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন। নিস্তব্ধ রাত্রি। জনহীন ঘুমন্ত পৃথিবী চাঁদের দুগ্ধবরণ আলোয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি দ্রুতপদে উদ্‌ভ্রান্তের মত অকারণ চলতে লাগলেন। দিনের আলোর মত পরিস্কার জ্যোৎস্না। চলতে চলতে তিনি অন্ধকার দেখে একটা গাছের তলায় আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলের গন্ধ আসতে লাগল। বকুলের আর মালতীর গন্ধ। তাঁর মনে হল তিনি যেন কতকগুলো ফুল মাড়িয়ে তারই উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

অকস্মাৎ অনন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে থেকে খিল খিল করে হাসির শব্দ উঠল। নারী কণ্ঠের হাসি। তিনি এক মুহূর্তে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। এ তিনি কোথায় এসেছেন! এ কি! এ যে খগেনের বাড়ীর পাশে মালতী-বকুলের তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন!

মালতী হাসছে! তিনি একটু এগিয়ে গেলেন খগেনের বাড়ীর দিকে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলেন বাগানের মাঝখানে খগেনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে মালতী হাসছে খিল খিল করে!

তিনি চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেক্ষণ সেই যুগল মূর্তির দিকে চেয়ে।

মালতী হাসছে, হাসছে, হেসেই চলেছে খিল খিল করে।

কি কথা বলেছে; কি আনন্দ দিয়েছে খগেন মালতীকে এই মুহূর্তে? একবার জানতে ইচ্ছা হল আনন্দচন্দ্রের।

হঠাৎ মালতীর হাসি থেমে গেল। সে বোধ হয় বললে—দেখ কে সাদা কাপড়-পড়া দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে!

তারপর বললে—কে আবার হবে? ভূত হবে। ভূত। বলে আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল খগেনের উপর। তারপর খিল খিল করে হাসতে লাগল।

প্রেত! সত্যই তিনি প্রেত! তিনি আরও গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সরে এসে আত্মগোপন করলেন। তাঁর তালু থেকে বুক পর্যন্ত অসীম ক্লেশকর তৃষ্ণায় শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হাত লাগল সব ফেলে একদিন যেমন পালিয়ে গিয়েছিলেন আজ আবার তেমনি করে পালিয়ে যান !

কিন্তু সে শক্তি আর নেই। নিজের বাঁধনে নিজেই তিনি বাঁধা পড়েছেন। নিজের কাছ থেকে তিনি পালাবেন কি ক'রে।

তবু—তবু আর একবার তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। কালই একা চলে যাবেন এখান থেকে।

পাঁচ

বেশ কয়েক মাস পরে আবার ফিরে এলেন আনন্দচন্দ্র আপনার কোলিয়ারী থেকে।

ফিরে এলেন একটা উপলক্ষ্য করেই।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়েছে দুলাল। পাঁচটি ছেলেকে স্কুল থেকে পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষা দিতে। সকলেই পাশ করেছে। এও একটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। মণিও পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে।

সংবাদটা পেয়ে আনন্দচন্দ্র সর্বপ্রথম আপনার সেই দামী কাগজে নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখেছিলেন মণিকে আশীর্বাদ জানিয়ে।

তারপর একখানা চিঠি লিখেছেন সুধাকান্তকে, আর একখানা দুলালকে। সুধাকান্তকে পুত্রভাগ্যের অভিনন্দন জানিয়েছেন, অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলেকে তাঁর নূতন স্কুল থেকে পাশ করার সুযোগ দেবার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতেও তিনি ভোলেননি। দুলালকে পৃথকভাবে আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

স্কুলে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন হেডমাষ্টার মশায়কে। সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে দুলালের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের এই বিশেষ সম্মানে যেন একটি বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়, স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের জন্য যেন ভুরিভোজের ব্যবস্থা হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে সেই বিশেষ

উৎসবে হেডমাষ্টার মশায় যেন ঘোষণা করেন যে বৃত্তি পাওয়ার জন্য স্কুল থেকে দুলালকে আগামী দু বৎসর কুড়ি টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। এবং এরপর থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা করা হল।

আর চিঠি লিখেছেন তিনি গোকুলবাবুকে। তাঁর স্কুলে এসে কর্মগ্রহণ করে এই ফল দেখানোর জন্য, দুলালের প্রথম হওয়ার জন্য এবং মণির শিক্ষক হিসাবে মণির পরীক্ষায় ভাল করে পাশ করার জন্য। তিনি গোকুলবাবুকে এই বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করবার জন্যেও অনুরোধ জানিয়েছেন। লিখেছেন—বাইরের মানুষ এক সুধাকান্ত ছাড়া আর কেউ থাকবেন না সে অনুষ্ঠানে। সেটি বিশেষভাবে স্কুলেরই আনন্দ অনুষ্ঠান হবে। এ বিষয়ে রসিকবাবুকেও বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পত্র দিয়েছেন—গোকুলবাবুও হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দিন স্থির করতে এবং ভোজের ব্যবস্থা করতে।

আনন্দচন্দ্র নির্দিষ্ট দিনে এলেন দুখানা জুড়িতে করে। আরও একখানা নূতন জুড়ি কিনেছেন তিনি। একখানায় নিজে এলেন, আর একখানায় এল এক কর্মচারী রাশিকৃত জিনিষপত্র নিয়ে। পাকা আমের খুসবয়ে সমস্ত জায়গাটা গাড়ী দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভুর ভুর করে উঠল।

দীর্ঘদিন পরে এলেন আনন্দচন্দ্র। এবারও অনেক লোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল ঠাকুর বাড়ীর মুখে। এবারও সুধাকান্ত দাঁড়িয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন নরনাথবাবু। দুলাল জানে, সে শুনেছে—আনন্দচন্দ্র এবার বিশেষভাবে এসেছেন তার জন্যেই। সেও তাই বিনয়-নম্রভাবে হাসিমুখে মণির পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আনন্দচন্দ্র গাড়ী থেকে নামলেন। তাঁর চেহারায় একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। সে পরিবর্তন উপস্থিত প্রায় সবারই চোখে ধরা পড়ল। তাঁর এক মাথা সাদা পাকা চুলের নীচে শ্যামবর্ণ মুখখানিতে যে কোমলতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকত, সেই কোমলতা যেন হারিয়ে গিয়েছে। সমস্ত শরীর কেমন একটু রোগা হয়েছে, মুখেও সেই শীর্ণতার ছাপ পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাকে কেমন কৃশ ও কঠিন দেখাচ্ছে। কপালে মুখে যেন জীর্ণতার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে। আগে তাঁর মুখখানি পাকা ফলের মত টসটসে ছিল

তিনি নেমে কারও দিকে তাকালেন না, ভ্রূক্ষেপও করলেন না কাউকে। সোজা উঠে গিয়ে সুধাকান্তের কাঁধটা ধরে সস্নেহে একটা ঝাঁকি দিলেন; নরনাথবাবুকে প্রণাম করলেন। হঠাৎ তার নজর পড়ল দুলালের উপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আগ্রহে তাকে একেবারে কোলে তুলে নিলেন। হেসে বললেন—কি রে ব্যাটা, সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিস? এইবার আমি অপেক্ষা করে থাকলাম—কবে আমাকে হারিয়ে দিবি দেখব! তারপর তার পাশেই নজর পড়ল মণির উপর। মণির দিকে সস্নেহে চেয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে তিনি ঠাকুর বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন। বাবার স্নেহস্পর্শের জন্যে মণি এতক্ষণ লালায়িত হয়ে ছিল। কাঁধের উপর বাবার হাতের চাপের মধ্যে সেই ঈপ্সিত বস্তুটি সে খুঁজে পেলে।

মহাসমারোহের সঙ্গে উৎসব হয়ে গেল। উৎসবে বাইরের মানুষের মধ্যে নিমন্ত্রিত ছিলেন একমাত্র সুধাকান্ত। কিন্তু সুধাকান্ত আসেননি। আনন্দচন্দ্র ছেলেদের উদ্দেশ করে বললেন—আমি নিজে লেখাপড়া জানি না। তাই বেশী করে লেখাপড়া ভালবাসি! তোমাদের মধ্যেই আজ একজন সমস্ত দেশের মধ্যে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, তারই জন্যে বিশেষভাবে এই ভোজের ব্যবস্থা করেছি। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে আবার কেউ বৃহৎ বৃত্তি পেয়ে তার নিজের, সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলের সুনাম বাড়ালেই আমি আবার ভোজ দেব। তোমাদের মধ্যে যারা এবার পাশ করেছ তাদের সকলকে আমি আশীর্বাদ করছি—তোমরা যেন জীবনে প্রতিদিন এমনি সার্থকতা লাভ করতে পার।

আনন্দচন্দ্র সামান্য কটি কথা বললেন, কিন্তু বললেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। তাঁর বলা শেষ হবার পরই ছাত্ররা সব চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা সভা সমিতি কখনও দেখেওনি, তার উপর সভা-সমিতির চেয়ে খাওয়া-দাওয়ার দিকেই ওদের নজর বেশী। ওদিকে বোর্ডিংয়ের রান্নাঘর থেকে নানারকম সুখাদ্যের গন্ধ ভেসে আসছে। তারা সব অস্থির হয়ে উঠেছে।

ছেলেরা গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে মণি হঠাৎ উঠে চলে গেল—আনন্দচন্দ্র সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন। সে সভার মধ্যে দুলালের পাশেই বসেছিল।

এই সময়েই গোকুলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই ধমক

দিলেন—সব চুপ করে বস। গোলমাল কর না। আমাদের সামনে আমাদের অত্যন্ত মান্য অতিথি বসে আছেন, তিনি কি মনে করবেন!

আনন্দচন্দ্র এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মণিকে খুঁজছিলেন—কোথায় গেল মণি? সে উঠে গেল কেন?

এই সময়েই গোকুলবাবুর কথাগুলো তাঁর কানে আসতেই তিনি হাসতে লাগলেন।

গোকুলবাবু বললেন—আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সামান্য একটি কথা বলব।

তারপর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা শোন, তোমাদিকেই বিশেষভাবে বলছি। আমাদের এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই স্কুলের প্রাণ আজ তোমাদের সামনেই বসে আছেন। তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এতে উনি খুবই আনন্দিত হয়েছেন। সেইজন্যেই আজকের এই ভোজের কারণটা বলতে উনি একটু ভুল করেছেন। এবার প্রথম পাঁচজন ছাত্র এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে তাদের সকলেই পাশ করেছে। শুধু তাই নয়, একজন সকলকে টপকে একেবারে প্রথম হয়েছে। সকলের পাশ করার সম্মানের সঙ্গে একজনের প্রথম হওয়ার সম্মানটাও আমরা পেয়েছি। তাই আমাদের কাজে খুসী হয়ে তিনি আমাদের খাইয়ে দিলেন।

তাঁর কথা শুনে আনন্দচন্দ্র বার বার সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন। তাঁর আবার মনে পড়ল মণির কথা। মণি কোথায় গেল? আহা সেও তো পাশ করেছে ভাল করে। তার কথা তিনি একবার বলবার সুযোগ পাননি। এই তো তার কথাও বললেন গোকুলবাবু। সে কি তাহলে খেতেই উঠে গেল আগে?

আনন্দচন্দ্র বললেন—আচ্ছা এইবার তোমরা গিয়ে খেতে বসে পড়।

ছেলেরা হুকুম পাবামাত্র হুড়মুড় করে খাবার জায়গার দিকে ছুটল। তাঁরাও এসে খাবারের কাছে দাঁড়ালেন।

ছেলেরা খেতে বসে চঞ্চল হয়ে কলরব করছে। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে আনন্দচন্দ্র ছেলেদের খাবার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে তাদের সানন্দ ও সাগ্রহ আহারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে

ছেলেদের সারির মধ্যে বার বার তাঁর দৃষ্টি খুঁজে বেড়াতে লাগল মণিকে। কিন্তু সারি সারি ছেলের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলেন না তাকে।

তবু বড় আনন্দে কাটল সমস্ত সন্ধ্যাটা। মণির অনুপস্থিতির কথাটা তাঁকে বার বার মনে মনে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু মুখে তিনি একবারও তা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নি। কারণ তা হলে আর রক্ষা থাকত না। চারিদিকে হৈ চৈ আর খোঁজাখুঁজি পড়ে যেত। তাতে তার অনুপস্থিতিটা আরও প্রকট ও কদর্য হয়ে উঠত। ঐ তো দুলাল নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। সে বোধ হয় জানে মণির অনুপস্থিতির কারণ। তাকেও গোপনে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই।

সমস্ত উৎসব শেষ করে, শিক্ষকদের অনুরোধে খাওয়া-দাওয়া করে যখন তিনি বাড়ী পৌঁছলেন তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। বাড়ী ফিরে শোবার জন্যে জামা-কাপড় ছাড়ছেন এমন সময় বিদ্যুৎ ঘরে এলেন। আনন্দচন্দ্র তাঁকে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মণির কথা! তিনি বিদ্যুৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—মণি কোথায়?

বিদ্যুৎ বললেন—সে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

আনন্দচন্দ্রের মাথার ভিতর আগুন জ্বলে গেল, বললেন—সে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে মানে? তার আজ নিমন্ত্রণ ছিল না?

বিদ্যুৎ সহজভাবেই বললেন—তাতে কি! আমিও ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম নেমন্তন্নের কথা। তাতে বললে—আমার আর নেমন্তন্ন খেতে যেতে ভাল লাগছে না। আমি আর যাব না।

আনন্দচন্দ্র একটু বক্র তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বললেন—না কি? তা একবার ডেকে দাও তো তাকে।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বললেন—সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, আর আমি তাকে ডাকব কি! কাল সকালে ডেকে যা বলবার ব'লো।

আনন্দচন্দ্র চাপা গলায় গর্জন করে বললেন—যা বলছি তাই কর। মণিকে ডেকে দাও এখুনি।

বিদ্যুৎ আনন্দচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে কি শুনলেন তিনিই জানেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই চোখ মুছতে মুছতে ঘুম থেকে উঠে এসে বাবার সামনে মণি দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে ডাকছিলে বাবা!

আপনার ক্রোধ সংবরণ করে কণ্ঠস্বর সংহত করে আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—ইস্কুলে তোমার নেমন্তন্ন ছিল, তুমি খেতে যাও নি?

চোখ কচলাতে কচলাতে হাই তুলে সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—নাঃ, শরীরটা ভাল লাগছিল না। সেই জন্য চলে এলাম।

ছেলের কথা বলার ভঙ্গি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই নিদারুণ স্পর্ধা সে পাচ্ছে কোথা থেকে? বিদ্যুতের কাছ থেকে বোধ হয়! তিনি তখনও মনের ক্রোধ যথাসাধ্য সংবরণ করে বললেন—তোমাদের ক'জনকে উপলক্ষ্য করে নিমন্ত্রণ, আর তুমি গেলে না?

মণির উত্তরও যেন তৈরী ছিল, সে বললে—আমাদের সকলকে উপলক্ষ্য করে তো আপনি নিমন্ত্রণ করেন নি। করেছেন কেবল দুলালের জন্যে। দুলাল তো বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ছিল।

তিনি ছেলের উত্তর শুনে হতবাক হ'য়ে গেলেন। পর মুহূর্তে ক্রোধে ফেটে পড়লেন—কি বললে তুমি! আমি আজ থেকে নয়, বরাবর লক্ষ্য করে আসছি দুলালের ঈর্ষ্যায় তুমি জর্জর হয়ে থাক। কেন? তোমার এ স্পর্ধা কেন হল? তাকে ঈর্ষ্যা করবার তোমার কোন্ যোগ্যতা আছে? তুমি বড় লোকের ছেলে? তাই! তুমি যদি আজ ছোট থাকতে তা হ'লে আজ চাবুকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দিতাম আমি!

আনন্দচন্দ্রের ক্রোধের চিৎকার শুনে বিদ্যুৎ এসে ঘরে ঢুকেছেন তাঁর কথার মধ্যেই। আনন্দচন্দ্রের কথা শেষ হতেই তিনি মণির হাত ধরে বললেন—অনেক বলেছ। আর কেন? তোমার স্ত্রী হয়ে টাকা পেয়েছি অনেক, তোমাকে পাইনি। তোমার ছেলের ভাগ্যেও তাই হল। সে তোমার টাকাই পেলে, তোমাকে পেলে না, পাবেও না কোন দিন।

এমন সময় দরজার কাছে চাকর এসে দাঁড়িয়ে বললে—দাদাবাবুর মাস্টার মশাই এসেছেন। ডাকছেন তাঁকে।

এই হৃদয়হীনা মেয়েটির কাছ থেকে উপস্থিত নিষ্কৃতি পাবার জন্যই আনন্দচন্দ্র নীচে নেমে গেলেন।

নীচে অপেক্ষা করছেন গোকুলবাবু। মণি খেতে যায়নি, তাই তিনি তাকে ডাকতে এসেছেন।

আনন্দচন্দ্র তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে উপরে উঠে এসে ডাকলেন—মণি,

যাও, নীচে গোকুলবাবু তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি গিয়ে খেয়ে এস।

বিদ্যুৎ ছেলের হাত ধরেই ছিলেন। তিনি সস্নেহে বললেন—যা বাবা, যা পারিস গিয়ে খেয়ে আয়।

মণি মায়ের কথায় লক্ষ্মী ছেলের মত কোন কথা না বলে নেমে চলে গেল।

আনন্দচন্দ্র স্পষ্ট দেখতে পেলেন ওদের মাতা-পুত্রের মধ্যে কেমন একটা গভীর সহানুভূতির ও বোধের সম্পর্ক রচিত হয়েছে। সেই পারস্পরিক সহানুভূতির গণ্ডী দিয়ে নিজেদের ঘিরে তাঁর সঙ্গে থেকেও ওরা পৃথক হয়ে গিয়েছে। অথচ বিদ্যুতের সঙ্গে এমনি একটি সহানুভূতি আর বোধের বৃত্ত রচনা করবার কত দিন কত প্রয়াস করেছেন তিনি! একটি নিবিড় বোধ পরস্পরের মধ্যে রচনা করবার তপস্যায় দিন দিন প্রতি মুহূর্তে ওঁর মন কেঁদেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তাঁর অস্ফুট আন্তরিক সকাতর সকল প্রার্থনা বিদ্যুতের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। আর তাঁর নিজের মনও শুকিয়ে গেল দিনে দিনে। এইবার আর চাইবার তাঁর কিছু নেই। আজ আর কিছু চানও না তিনি।

মণি চলে যেতেই বিদ্যুৎ এসে আনন্দচন্দ্রের সামনে দাঁড়ালেন, বললেন—মণির কি ব্যবস্থা করবে?

আনন্দচন্দ্র বললেন—মণির ব্যবস্থা? ও, মণির লেখাপড়ার? মণি কলকাতায় পড়বে।

বিদ্যুৎ বললেন—কিন্তু মণি যে আর পড়তে চায় না। বলছে—বাবা আর কত পরিশ্রম করবেন? আমি তাঁকে এইবার কাজে সাহায্য করব।

আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যুতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ কি শুনলেন তিনি? মণি আর পড়বে না? অনেক ভেবে দেখলেন আনন্দচন্দ্র। হবে না, আর কিছু হবে না ওর। সেই ভাল, তিনিও হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবেন না! ওর সংসারী হওয়াই ভাল। তিনি একটু হেসে বললেন—তাই হবে।

স্বামী এত সহজে রাজী হয়ে গেলেন দেখে বিদ্যুৎ অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্র আপন মনে হাসতে হাসতেই ভাবতে লাগলেন। নেই আর কোন প্রত্যাশা, কোন আবেদন নেই তাঁর কারও কাছে। বিদ্যুতের কাছেও নেই, মণির কাছেও নেই। বহুদিনকার পাতা অঞ্জলি আজও শূন্যই আছে। সেই দীর্ঘদিনের শূন্য অঞ্জলি তিনি ব্যর্থকাম হয়ে গুটিয়ে নিলেন আজ থেকে।

আনন্দচন্দ্রের স্বভাবে তাঁর কর্মজীবনের সার্থকতার ফলে একটি রহস্যবোধ এসেছিল। জীবনে প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাশার বস্তু হাতে পেয়েছেন, প্রত্যাশার পূরণ হয়েছে। এমনও বার বার ঘটেছে—প্রত্যাশা না করেও নানান প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু ও ভালবাসা জীবনে পেয়েছেন। একবার নয়, বার বার পেয়েছেন। এই নব নব প্রাপ্তির ফলে জীবন ও জীবনের প্রকাশ দিন দিন সরস থেকে সরসতর হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বাসনার বস্তু চাইতে কি না চইতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বাসনা প্রতিদিন তাঁকে অনন্ত তৃষ্ণায় তৃষিত রেখেছে। প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিদিন নব নব সার্থকতার পর অন্দর মহলে স্নান, আহার, বিশ্রাম আর বিশ্রম্ভালাপের জন্যে প্রবেশ করবার সময় কল্পনা করেছেন—বিদ্যুতের মুখে তাঁর এই সার্থকতায় স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠে তাঁর সার্থকতাকে সুন্দর করে তুলবে, চোখে অতি ইঙ্গিতময় দ্যুতি ফুটে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে, সে ইঙ্গিত তিনি আর বিদ্যুত ছাড়া আর কেউ বুঝবে না! খাওয়ার সময় অধিকতর মমতায় বিদ্যুতের হাতের পাখা দুলবে, খাওয়ার পর বিদ্যুতের হাসিতে তাঁর তন্দ্রা বার বার ছুটে যাবে। আনন্দচন্দ্র জীবনের সহজ হিসাবটা হারান নি কোনদিন। তাঁর মনে বরাবরই এ ভাবনা ও বোধ স্পষ্ট হয়ে আছে যে, যে অর্থ বা যে সম্পদ তিনি দিনে দিনে অর্জন করেছেন তার সবটাই করেছেন নিজেকে, বিদ্যুতকে আর সন্তানদের অধিকতর সুখী করবার জন্যে। কিন্তু বিদ্যুতের কাছে নিজের সার্থকতার জন্যে কোনদিন বিশেষ সমাদর তিনি পান নি। বিদ্যুত তার সব সার্থকতাকেই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। সংসারে সব জায়গায় না চাইতে পেয়েছেন আর বিদ্যুতের কাছে অতি সামান্য সামান্য, তুচ্ছ তুচ্ছ স্নেহ, সেবা, হাসির জন্যে মনে মনে লালায়িত হয়েছেন, কিন্তু কোন দিন পান নি। মনে মনে চেয়ে চেয়ে যতই বার বার ব্যর্থ হয়েছেন পাওয়ার বাসনা ততই প্রবল হয়েছে দিনে দিনে। তাতে তৃষ্ণাই বেড়েছে

কেবল, তৃষ্ণার পানীয় এক বিন্দুও পান নি কোন দিন। আজ আশ্চর্য হয়ে আনন্দচন্দ্র ভাবেন—এই বিদ্যুতকে তিনি কি করে সহ্য করে এসেছেন এই দীর্ঘ কালের প্রতিটি মুহূর্তে। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপন মনেই হাসেন তিনি। সহ্য না করে কি কোন উপায় ছিল? হিলু-বৌকে মনেও পড়ে না আর! হিলুই শিখিয়েছিল তাঁকে এমনি প্রত্যাশা করতে; প্রত্যাশা করতে না করতে সে প্রত্যাশা সে পুরণ করেছে। এমনি করে জীবনকে আস্বাদ করতে সে-ই শিখিয়েছিল। শিখিয়ে, জীবনের নব নব ভোজ্য আস্বাদনের অভ্যাস করিয়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করবার জন্মেই যেন সে অন্তর্ধান করলে! তারপর যাকে পেলেন সে জানে না, সে তাঁর এ তৃষ্ণার কোন সন্ধানও রাখে না। তবু তিনি প্রত্যাশা করেছেন। প্রতিদিন প্রত্যাশা করেছেন। প্রত্যাশা ক'রে ক'রে বার বার আশা ভঙ্গ হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত একেবারে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস আর ক্লান্ত হয়ে আশা করা, বিদ্যুতের কাছ থেকে সামান্যতম সহানুভূতি পাবার প্রত্যাশাও এবার পরিত্যাগ করেছেন। স্থির বুঝেছেন—এ জীবনে আর তা পাবার নয়।

কিন্তু তাঁর তৃষিত মন দু চোখ দিয়ে আশপাশের প্রতিটি মানুষের চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, মুখের কথা লক্ষ্য করেছে যা চেয়ে তিনি পান নি তারই সন্ধানে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মনে পড়েছে হিলুর কথা। ছিল তো, তার তো ছিল। তিনি যা চেয়েছেন তা তো তার পর্বতপ্রমাণ ছিল; তিনি আজ যত সম্পদ উপার্জন করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী মমতা আর সহানুভূতি একা তারই মনে ছিল যে! তা ছাড়াও তিনি আশপাশের মানুষের মধ্যে দেখেছেন, তাদের চোখ কত কত বার মমতায় মেদুর হয়ে উঠেছে, মমতা কতবার তরল হয়ে বর্ষার বৃষ্টিধারার মত চোখ থেকে গলে গলে পড়েছে; পরস্পরের দৃষ্টি তৃতীয় ব্যক্তিকে আড়াল ক'রে কতবার পরস্পরকে বোঝার গূঢ় উপলব্ধিতে ইঙ্গিত-চঞ্চল হয়ে উঠেছে; একজনের বুকের সঞ্চিত স্নেহের পাথারে অন্যজন সাঁতার দিয়ে কূল পায়নি। মানুষের বুকে বুকে কত ভালবাসা! বিদ্যুতের বুকেও তো তার ঘাটতি নেই। তিনিও তো বার বার তা দেখেছিলেন অন্যের বেলায়। তাই দেখেই তো তিনিও বিদ্যুতের মমতার সাগরে ডুবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেলেন কৈ? সে পাথারের ঘাটেই বিদ্যুত কোন দিন তাঁকে দাঁড়াতে দিলে না।

না দিক। আর প্রয়োজন নেই তাঁর! তিনি সে দিক থেকে আপনার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যা পেয়েছেন তাই অনেক, তাই বা কে পায়? যা পাননি তার জন্তে আর দুঃখ করে কি হবে?

দুঃখ আর তিনি করেন না। কিন্তু এই বাসনা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের সহজ সরসতা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনটা যেন শূন্ত হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কাজ করে যান কাজ করতে হয় বলে। যন্ত্রের মত। কিন্তু কাজ করতে ভাল লাগে না তাঁর। মাঝে মাঝে মনে হয়—অনেক তো হয়েছে। আর উপার্জন করে কি হবে? দরকার নেই আর!

কথাটা মনে হতেই অত্যন্ত দুঃখের হাসি হাসেন তিনি। যা কাজ তা না ক'রে কি কোন উপায় আছে? যে তীর ছুঁড়েছেন বাধাহীন ভাবে বাতাসের মধ্য দিয়ে সে অনবরত স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটে চলেছে। প্রতিদিন তাতে গতিবেগ দিতেই হবে। তাকে বন্ধ করার তো কোন পথ নেই।

প্রতিদিন কাজকর্ম সেরে তিনি বাড়ীর পিছনে বাগানে এসে বসেন। চাকর আরাম-কেদারা পেতে রাখে, পাশে ছোট নীচু টুলের উপর গড়গড়া রেখে যায়। তিনি তামাক টানতে টানতে চুপচাপ পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সূর্য অস্ত যায় পশ্চিম আকাশকে নানান বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করে, মেঘের গায়ে গায়ে নানান রঙের ক্ষণস্থায়ী স্পর্শ লাগে। ধীরে ধীরে সে রঙ মুছে যায়। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। আকাশে তারা ফুটে ওঠে। আনন্দচন্দ্র শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আর তামাক টানেন। কেউ সাহস করে আসতে পারেনা এ সময় তাঁর কাছে। অন্ধকার হয়ে এলে আস্তে আস্তে উঠে চলে যান। যেতে যেতে অনুভব করেন মনের শূন্যতার উপরে কেমন করে স্নিগ্ধতার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে। মনটা অকারণেই স্নিগ্ধ লাগছে।

কোন কোন দিন খেয়াল হলে খগেনকে ডেকে তার সঙ্গে দুচারটে কথা বলেন। এই ভাবে খগেনের সঙ্গে তাঁর একটা সহজ আলাপ হয়ে গিয়েছে। তিনি দুটো একটা কথা বলে খগেনকে কথা বলতে ধরিয়ে দেন। খগেন কথা বলে চলে। কখনও ফুলের গল্প, গাছের গল্প করে, কখনও বা করে নিজের গল্প। আনন্দচন্দ্র বসে বসে শোনেন অথবা শোনেন না। অন্ধকারের মধ্যে খগেন কথা বলে, অন্ধকারের মধ্যে আনন্দচন্দ্রের মুখ সে দেখতে পায়

না। হঠাৎ সে কথার মাঝে সময় সময় এক একটা প্রশ্ন করে বসে। আনন্দচন্দ্র অন্যমনস্ক থাকলে সে জবাব পায় না। জবাব না পেলে সে অনুযোগ করে বলে—আমি বকেই মরছি অনর্থক, আপনি কিছুই শুনছেন না।

আনন্দচন্দ্র অপ্রতিভ হয়ে বলেন কোন দিন—না হে, বড় ভুলে গিয়েছিলাম। বল, বল, কি বলছিলে বল।

কোন কোন দিন আপনার অন্যমনস্কতা গোপন করে বলেন—শুনছি হে শুনছি। বল, বল। তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে বলত? প্রশ্নটা জেনে নিয়ে বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো তুমি জিজ্ঞেস করছিলে আমাকে?

এই অবুঝ, ছোট ছেলের মত সরল মানুষটিকে বড় ভাল লাগে তাঁর।

একদিন দুপুর বেলা তখনও স্নানাহারের সময় হয়নি, কিন্তু বেলা হয়েছে অনেকখানি। কাজ করতে করতে আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিলেন। রসিকবাবুকে খানিকটা বকাবকি করে তিনি উঠে বাগানে বেরিয়ে এলেন। নরনাথ বাবুর পিতামহ কতকগুলো আম গাছ লাগিয়েছিলেন। জায়গাটা কিনলেও রসিকবাবু আম গাছ গুলো কাটান নি। চড়া রৌদ্র, কেবল আমগাছ ক'টার তলায় ছায়া। মালীরা কেউ নেই। আনন্দ বেরিয়ে এসে দেখলেন খগেন আমগাছের ছায়ায় বসে আছে। আনন্দচন্দ্রকে একবার সে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু সে উঠল না বা তার মুখে প্রতিদিনকার মত স্মিত হাসিও ফুটে উঠল না।

আনন্দচন্দ্রের কেমন মায়া লাগল তাকে দেখে। আহা, বোধহয় রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে গাছ-পাগল মানুষটা ছায়ায় বসেছে। গাছপালার জন্যে মানুষটা কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করে। অথচ বিনিময়ে ক'টাই বা টাকা পায়! তিনিও রৌদ্র থেকে সরে এসে খগেনের পাশে ছায়ায় দাঁড়ালেন। তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সস্নেহ হাসি হেসে আনন্দচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে খগেন বাবু তোমার মুখ অমন ভার কেন? তোমার কোন গাছপালার অসুখ করেছে না কি যে অমন করে বসে আছ?

তাঁর রসিকতা শুনে খগেন মুখ তুলে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল। কিন্তু কোন জবাব দিলে না।

আনন্দচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন—কি, হল কি হে তোমার, বলই না শুনি।

খগেন এইবার উঠে দাঁড়াল। সে ছোট্ট জবাব দিলে, বললে—না, বিশেষ কিছু হয়নি।

আনন্দচন্দ্রের মনটা কেমন টন টন করে উঠল, অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মুখ দেখে যে বুঝতে পারছি হে একটা কিছু হয়েছে। তোমার মুখ বলছে, চোখ বলছে, একটা কি হয়েছে। বল কি হয়েছে। শেষের দিকে তিনি প্রায় ধমক দিলেন সস্নেহ ভাবে।

খগেন এতক্ষণে পরিপূর্ণভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তারপরই নিঃশব্দ ধারায় চোখের জল পড়তে লাগল।

আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—একি হল, কাঁদছ কেন হে? কি ব্যাপার? তিনি সরে এসে খগেনের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তাকে শান্ত করবার জন্যে। তাঁর মনে হল—এমনি করে কখনও কোন মানুষের মাথায় হাত দিয়ে বোধ হয় সান্ত্বনা জানাননি। আহা, কোথাও বড় দুঃখ পেয়েছে মানুষটা! বড় দুঃখী না হলে কি একজন প্রবীণ মানুষ আর একজন প্রবীণ মানুষের কাছে এমনি করে কাঁদে! আর তিনি নিজেই কি কম দুঃখী! তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—চুপ কর, চুপ কর। কেঁদ না। কি হ'ল বল আমাকে।

অনেক কষ্টে খগেন চুপ করলে। তারপর বললে—তার স্ত্রীর দীর্ঘদিন থেকে অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে। সে জ্বর সে প্রথম প্রথম তার কাছে গোপন করত। তারপর খগেন যখন জানতে পারলে তখনও বার বার বলা সত্ত্বেও মালতী তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। আর খগেন তাকে মুখেই সাবধান হতে বলেছে, কাজে কর্মে সাবধানতা দেখাতে পারেনি। তার টাকা নেই। ওষুধের ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। এই বার মালতী গতকাল থেকে বিছানা নিয়েছে। আর এ বিছানা থেকে উঠবে কি না কে জানে? তার যে চিকিৎসা করাবে সে সে-ক্ষমতাই বা তার কোথায়?

আনন্দচন্দ্রের বড় দুঃখ হল। আহা সংসারে তো ওদের দুজনের নিজের বলতে আর কেউ নেই! ওদের বাড়ীর পাশের বকুল গাছটাকে মালতী-লতার পাকে পাকে জড়িয়ে ধরার মত ওরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে

ধরেছে। কিন্তু এবার গাছের গোড়ায় জলের অভাবে মরে যাবার মত অবস্থা হয়েছে এদের। কিন্তু জলপাত্র তো তাঁর নিজের হাতেই আছে। যদি দরকার হয় তিনি তো আছেন। আনন্দচন্দ্র হাল্কা হাসি হেসে বললেন—কি হে, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে টাকা চাই তোমার! এ আর এমন কি কথা? আমার কাছে কাজ করছ, এতো আমারই খানিকটা দেখবার কথা হে! কত টাকা চাই তোমার? বল। আমি দেব!

খগেন আবার আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে চাইলে। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে—আপনি দেবেন? আপনি—

আনন্দচন্দ্র হেসে বললেন—দোব। আমি দোব। বল কত টাকা চাই তোমার।

খগেন বললে—দেড়শো দুশো টাকা হলেই হবে।

আনন্দচন্দ্র বললেন—মোটে? এরই জন্যে তুমি আকাশ-পাতাল ভেবে কাঁদছিলে?

খগেন বিষণ্ণ হয়ে বললে—ঐ যে আমার কাছে অনেক! কিন্তু আমাকে টাকাটা কি ভাবে দেবেন?

আনন্দচন্দ্র খগেনের কথা ঠিক বুঝলেন না, বললেন—কি ভাবে মানে?

খগেন বললে, মানে টাকাটা তো আমি ধার নেব। তা হলে একটা তো লিখে দিতে হয়!

আনন্দচন্দ্র একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তিনি বুঝলেন একেবারে দান হিসেবে নিতে ওর মর্যাদায় লাগছে। এ লাগার বোধহয় আরও একটা কারণ আছে। অতি গূঢ় কারণ। এই মালতীর সঙ্গে তাঁর একবার বিবাহের কথা হয়েছিল। যাক, ওর মর্যাদায় যখন লাগছে ও টাকাটা ঋণ হিসেবেই নেবে। তিনি সহজ ভাবে কথাটার পিঠেই বললেন—হ্যাঁ, লিখে দিতে হবে বৈ কি একটা! তবে তোমার যখন সুবিধা হবে তখন দেবে! দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি কিছু নেই! এস, টাকাটা নিয়ে যাবে এস!

খগেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের খাস কামরায় ঢুকলেন। একটা খত তৈরী হল। টাকায় মাসিক একপয়সা হার সুদে দুইশত টাকা ঋণ পাইয়া এই খত লিখিয়া দিলাম। টাকা নিয়ে খগেন বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় প্রণাম করে গেল তাঁকে। প্রণাম করবার সময় দু ফোঁটা চোখের জলও সে তাঁর পায়ে দিয়ে গেল।

আনন্দচন্দ্র আর একবারও তার স্ত্রীর অসুখের কথাটা উচ্চারণ করলেন না। বলতে কেমন সঙ্কোচ হল তাঁর। বললে খগেন আবার কি ভাববে কে জানে? যদি সে ভাবে তার স্ত্রীর প্রতি কোন এক সংগোপন সহানুভূতির জন্যে এই টাকাটা হয়তো তাকে দিচ্ছেন তিনি। দরকার কি! তিনি কেবল বললেন—টাকাটা বেঁধে নাও। কাউকে দেখিও না। এটা কেবল তোমার আর আমার মধ্যেই গোপন থাকল বুঝেছ?

এই ভাবে টাকা দিয়ে আনন্দচন্দ্রের বড় ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাবও এল। গোপন রাখবার কথাটা খগেনকে না বললেই বোধ হয় ভাল হত।

চাকর বাইরে থেকে পর্দা সরিয়ে বললে—হুজুর, স্নানের সময় হয়েছে!

তিনি হেসে বললেন—যাই বাবা। চল।

চাকরটা অবাক হয়ে গেল। মনিবকে সে ইদানীং এত খুসী হতে দেখেনি কোন দিন।

আনন্দচন্দ্রের আর কোথাও ভাল লাগছে না এক নাগাড়ে বেশী দিন থাকতে। কোলিয়ারীতে গিয়েও অজস্র কাজের মধ্যে যখন ডুবে থাকেন তখন বেশ থাকেন। কাজের মাতনের মধ্যে মন আপনার শূন্যতা নিয়ে হাহাকার করবার সুযোগ পায় না। কিন্তু যেমনি কাজ কমে আসে অমনি সামান্য কাজ করতেও মন হাঁপিয়ে ওঠে, স্থানান্তরে চলে যেতে ইচ্ছা হয়। কয়েকদিন যেতে না যেতে কাজকর্ম যা থাকে তা ফেলে রেখে অকস্মাৎ একদিন আবার শান্তির প্রত্যাশায় গ্রামে ফিরে আসেন।

গ্রামে এসেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। বরং আরও তাড়াতাড়ি ঘটে। কিছুতেই বেশীদিন থাকতে পারেন না এখানে। এসে থেকেই মন ছটফট করে চলে যাবার জন্য। এবারও মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে আবার। এবার অবশ্য চলে যাবার একটা উপলক্ষ্যও পেয়েছেন আনন্দচন্দ্র। মণি এবার আবার ফিরে যাবে তাঁর সঙ্গে। একটা দুঃখ তাঁর থেকে গেল মনে মনে। মণি আর লেখাপড়া করলে না। মনে মনে অনেক কল্পনা

করে রেখে ছিলেন। মণি অনেক লেখা-পড়া শিখবে, একটার পর একটা পাশ করে যাবে মণি লেখাপড়ার নেশায়। তিনি বৃদ্ধ হয়ে কাজের জালে জড়িয়েই থাকবেন। মাঝে মাঝে সেই জালবদ্ধ অবস্থায় ছেলেকে মিনতি করবেন—ওরে মণি, তুই তো অনেক পড়লি; এইবার আয়, এসে এই বুড়োকে কাজের জাল থেকে মুক্তি দে, বিষয়ের জাল থেকে মুক্ত কর, তুই সব ভার নে। উত্তরে মণি স্বপ্নাচ্ছন্ন বৈরাগীর মত হাসি হাসবে, কথার জবাব না দিয়ে।

কিন্তু তা তো কই হল না। এ বৈরাগ্য কি সহজ কথা! পার্থিব ঐশ্বর্য্য থেকে মুখ ফিরিয়ে পুঁথির আর বইয়ের পাতায় মানসযাত্রা কি সহজ সাধনার কথা! তা না করে মণি যদি কয়লার খনি সংক্রান্ত লেখা পড়াই করত তা হলেও কম খুসী হতেন না তিনি। তিনি নিজে যা শিখেছেন সব শিখেছেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যে উন্মাদ আগ্রহ নিয়ে অসীম পরিশ্রম সহকারে তিনি শিখেছেন সে উন্মাদনাও নেই, সে পরিশ্রম করবার ক্ষমতাও নেই মণির মধ্যে। সে বড় লোকের ছেলে, তিনি তো বড় লোকের ছেলে ছিলেন না।

যাক্, দুঃখ করে লাভ কি! তিনি দুঃখ করবেন না, ক্ষোভ করবেন না বার বার মনে করেন। কিন্তু এই সব ভাবলেই বৈশাখী আকাশের ধূ ধূ করা রিক্ততার মত শূন্য মনে অকস্মাৎ ক্ষোভের ঝড় ওঠে মধ্যে মধ্যে, বেদনার মেঘে মনের আকাশ ছেয়ে। আবার ধীরে ধীরে হতাশ্বাসের নিশ্বাসে সে মেঘ আপনিই কেটে যায়, নূতন দাহ নিয়ে মনের শূন্যতা তখন অবিরাম হায় হায় করতে থাকে। মনকে সান্ত্বনা দেন—আরে পাগল, এ কি পাগলামী তোমার! ছোট অবুঝ আদুরে শিশুর মত তুমি সব চাও? তাই কি পাওয়া যায়? যায় না। যা পেয়েছ তুমি তাই বা ক'জন পায়! মনে তখন সান্ত্বনা আসে।

আজ কাল আর বিদ্যুতের কথা ভেবে মন আগের মত উতলা হয় না। বিদ্যুত সম্পর্কে তাঁর নিজের আগ্রহ মরে এসেছে। আজকাল তবু কিছু ভাবনা চিন্তা করেন মণির জন্যে। মণি লেখাপড়া করতে চাচ্ছে না। এতবড় সম্পত্তি রক্ষণা:বেক্ষণের জন্যেও তো কম যোগ্যতার প্রয়োজন নয়। অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করতে যে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়।

হঠাৎ চাকরকে ডাকলেন—ওরে দাদাবাবুকে ডাক তো!

মণি আজকাল কেমন একেবারে সুবোধ বালক হয়ে গিয়েছে। সে শান্ত ছেলেটির মত এসে দাঁড়াল। ছেলের দিকে একবার তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখলেন আনন্দচন্দ্র। আজ ছেলেকে দেখে তাঁর ভালই লাগল। একটি শান্ত বিনয়ে ওর মুখখানি কেমন বিনম্র দেখাচ্ছে। আজ আর ওকে দেখে তাঁর মন হায় হায় করে উঠল না, বরং ওর ভবিষ্যত ভেবে খানিকটা ভয় লাগল। ক্রোধী, জেদী ছেলে, এক-রোখা বুদ্ধি, ও কি করে এই বিশাল সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করবে! তবু ওর শান্ত নম্রতায় মনে নূতন করে ভরসা এল। শেখাবেন, ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে, কর্মের দীক্ষা দিয়ে ওকে নূতন করে তৈরী করে দেবেন। ছেলেকে হেসে বললেন—এইবার তো আমাদের যেতে হবে মণিবাবু!

বাবার এই সস্নেহ ব্যবহারে মণির মুখচোখে নূতন দীপ্তি ফুটে উঠল, বললে—কোথায়? কোলিয়ারীতে? কবে যাবেন সেখানে?

—দিন দেখাই। তোমাকে নিয়ে যাব, একটা দিন না দেখে কি যাওয়া ঠিক হবে মণিবাবু, না তোমার মা যেতে দেবে? একটা কাজ আছে আজ। আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার সুধাকান্তের বাড়ী যাব। দুলালও দু একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাবে কলেজে ভর্তি হতে। কিশোরও এসেছে শুনেছি!

—আজ্ঞে যাব।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন, বললেন—মণি আমার এখন বড় সুবোধ বালক।

সন্ধ্যা বেলায় মণির হাত ধরে সুধাকান্তের বাড়ীর দরজায় গিয়ে তিনি ডাকলেন—ওহে সুধাকান্ত, আছ নাকি?

সুধাকান্ত ছুটে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মনে পড়ল, বাল্যকালে এমনি করে ডাকত আনন্দ। তিনি এমনি করে এক ডাকে ছুটে আসতেন। আজ তেমনি এসে সহাস্যে সম্বর্দ্ধনা করে বললেন—এস ভাই, এস। আরে মণিবাবুও এসেছ দেখছি। এস বাবা এস।

বাড়ীর ভিতরে বসে আনন্দচন্দ্র বললেন—কিহে তোমার কিশোরও এসেছে শুনছি! সেই কি দুলালকে নিয়ে যাবে নাকি? কৈ, তাদের ডাক।

আনন্দচন্দ্রের গলা শুনে কিশোর আর দুলাল দুজনেই বেরিয়ে এল। কিন্তু একি! আনন্দচন্দ্র দুলালকে দেখেছেন, কিন্তু কিশোরকে দেখে তিনি অবাক

হয়ে গেলেন। একেবারে স্পষ্টভাবে একটা ভিন্ন সংস্কৃতি ও শিক্ষার ছাপ ওর গায়ে পড়েছে। কিশোর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তার পোষাকে দেহে বাহ্যতঃ একেবারে তার ছাপ লাগিয়ে যেন জয়ধ্বনি দিয়ে কিশোর ধ্বজা উড়িয়েছে এই জানাবার জন্যে যে সে কি সংস্কৃতির মানুষ! আনন্দচন্দ্রকে সে প্রণাম করতেই আনন্দচন্দ্র বললেন—তোমাকে তো আগে দেখিনি বাবা! কিন্তু আজ দেখে যে আমার অবাক লাগছে! তোমর মোটা কাপড় কোঁচা করে কোমরে গোঁজা, খালি গা, গায়ে চাদর। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড মোটা শিখা! তুমি যে একেবারে ভট্চাজ-পণ্ডিত দেখছি হে!

দুলাল আনন্দচন্দ্রের কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল। ওর গলার তারুণ্যের গাম্ভীর্য এখনও স্পর্শ করে নি, কণ্ঠস্বর এখনও মেয়েদের মতই কোমল একস্বরা। তার হাসির সঙ্গে মণিও যোগ দিলে। মণির প্রথম থেকেই ওকে দেখে হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। তাদের হাসিতে কিশোরের মুখখানা একবার আরক্তিম হয়ে উঠল। পরক্ষণেই একটি সহনশীল মৃদু মধুর হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দুলাল দাদাকে লক্ষ্য করেছিল। ওর মুখের হাসি দেখে সে থমকে থেমে গেল। সুধাকান্ত সবটা মানিয়ে নেবার জন্যে বললেন—আমরা ভট্চাজ পণ্ডিতের বংশ। আমাদের ছেলে ভটচাজ-পণ্ডিত হবে এইটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কিশোর আমার একটু বেশী পরিমাণে এটাকে গ্রহণ করেছে। বুঝতে পারছি ও শেষকালে একেবারে টুলো পণ্ডিত হবে।

আনন্দচন্দ্র কথা পরিবর্তন করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—দুলাল তো কলকাতাতেই পড়বে?

এইবার দুলালের কথা বললে। গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকাই ওর স্বভাব। তবে অল্প পরিচয় সত্ত্বেও আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে দুলালের একটি সূক্ষ্ম হৃদ্যতা আছে। সে কথার গায়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বললে—আমি কলকাতাতেই পড়ব। তবে আমি দাদার ঐ সংস্কৃত কলেজে পড়ব না। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ব।

আনন্দচন্দ্র হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন—বুঝলাম হে, তোমার

কথা বুঝলাম। তুমি তোমার দাদার মত টুলো পণ্ডিত হবে না। তুমি সাহেব হবে—কেমন তো?

দুলাল একটু হেসে বললে—আমি পণ্ডিতও হব না, সাহেবও হব না। আমি 'আমি' হব।

আনন্দচন্দ্র হেসে বললেন—সুধা, তোমার এই ব্যাটাটা অতি পাজী হবে! ওকে সামলানো খুব কঠিন হবে বুঝতে পারছি।

আনন্দচন্দ্রের লঘু বাক্‌ভঙ্গিতে সকলেই হাসতে লাগল। আনন্দচন্দ্র বললেন—সুধা, এরা কবে কলকাতা যাচ্ছে?

—পরশু।

—আরে আমিও যে যাব মণিকে নিয়ে কোলিয়ারীতে।

—কবে যাবে? খুব ভাল কথা।

—সেই জন্যেই তো এলাম। একটা দিন দেখে দাও। এক কাজ করো। যাবার দিনে ওরা যেন আমার জুড়িটা নিয়ে যায়!

সুধাকান্ত মণির ও আনন্দচন্দ্রের যাত্রার দিন দেখতে লাগলেন। আনন্দচন্দ্র বললেন—এক কাজ তো করতে পারি, ঐ একদিনেই তো যেতে পারি পরশু।

সুধাকান্ত বললেন—বাঃ, চমৎকার বলেছ তুমি। তাই যাবে হে। এ বেশ খাসা হবে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। এক সঙ্গে যাত্রা কিন্তু উদ্দেশ্য কত আলাদা, একেবারে উল্টো। আমি মণিকে নিয়ে যাব অর্থ আর সম্পদ উপার্জনের দীক্ষা দিতে আর তোমার ছেলেরা যাবে বিদ্যা অর্জন করতে।

দুলালের চোখ দুটো সকলের অগোচরে জ্বলে উঠল। মনের নিভানো প্রদীপে আনন্দচন্দ্রের কথাগুলো যেন আগুন ধরিয়ে দিতেই সব আলো হয়ে উঠল। মনে হল কবে বহুকাল আগে ভাগীরথীর জলে, কাটোয়া, পাটুলী, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম হয়ে কোন বনিকনন্দনের সপ্ত ডিঙা মধুকর ভেসে ভেসে বঙ্গোপসাগরের নীল বিপদ-সঙ্কুল জল পার হয়ে মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সিংহলের তীরভূমি ছুঁয়ে কোচিন রাজ্যের ধার ঘেঁসে অনেক অনেক রত্ন, মসলা, অস্ত্র ও সুগন্ধি নিয়ে ফিরে আসছে গলায় সিংহলী মুক্তোর হার পরে। আর অন্যদিকে কৌপীনের উপর গৈরিক চাপিয়ে, মুণ্ডিত মস্তকে, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করে চলেছেন ব্যাকরণের পণ্ডিত—শিক্ষা, সংসার ও জ্ঞানকে অতিক্রম করে। তিনি চলেছেন ভারতবর্ষের পথে পথে তীর্থ পরিক্রমা করে।

আনন্দচন্দ্রের কথার বাতাসে তার মনের কল্পনার শিখা আবার নিভে গেল। আনন্দচন্দ্র বলছেন—এমন আলাদা করে দেখলে হবে কেন? আমাদের দেশ এমনি আলাদা করে বরাবর দেখেছে বলেই না অমনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে মানুষের জীবন।

সুধাকান্ত হাসলেন, বুঝলেন—আনন্দচন্দ্রের কোথায় লাগছে! কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—এ কথা অবশ্য ঠিক। ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই জীবনে সমান প্রয়োজন—কথাটা আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে। তবে পালন করবার সময় ধর্ম আর মোক্ষের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করতে গিয়েই জীবন একপেশে হয়ে উঠেছে। চারটিই পরম প্রার্থিত বস্তু। প্রতিটির জন্যেই তো তপস্যা করতে হয়।

আনন্দচন্দ্র বললেন—তা হলে আমি উঠি। ঐ কথাই থাকল। পরশু সকলে মিলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

পথে মণির হাতখানাকে শক্ত করে ধরে যেতে তিনি ভাবলেন—মণিকে তিনি ধন অর্জন ও বর্জন দুয়েরই শিক্ষা দেবেন। দুই-ই সমান কঠিন। অগাধ ঐশ্বর্য অর্জন করার শক্তি ক'জনের থাকে? অগাধ জ্ঞান অর্জন করা কঠিন, অগাধ ঐশ্বর্য অর্জন করা তার চেয়ে বেশী কঠিন! ঐশ্বর্যের সঙ্গে যেদিন জ্ঞানের সংঘাত লাগে সেদিন জ্ঞান যদি শুদ্ধ জ্ঞান না হয় তবে ঐশ্বর্যের কাছে ঈর্ষ্যায় সঙ্কুচিত হয়ে জ্ঞান সেদিন পরাজিত হয় এ তিনি বার বার দেখছেন। কত বড় বড় শিক্ষিত মানুষ দূর দূরান্তর থেকে তাঁর কাছে এসে সামান্য জীবিকার জন্যে তোষামদ করে। যে জীবিকার ব্যবস্থা তিনি তাদের জন্য করে দেন তা তাদের কাছে অসামান্য হলেও তাঁর কছে অতি তুচ্ছ। আর সম্পদ হচ্ছে শক্তির মূলাধার। সেই প্রচণ্ড শক্তি তিনি অগাধ পরিমাণে আপনার মুঠোর মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন। রেখেছেন তা মণির জন্যেই। সেই শক্তি যথাযথ ব্যবহারের শিক্ষায় তিনি পুত্রকে পটু করে দিয়ে যাবেন যাতে সে কিশোর কি দুলালের চেয়ে খারাপ মানুষ না হয়। আবার নূতন করে আর একবার জীবন আরম্ভ কররেন আনন্দচন্দ্র।

মণির হাতে নতুন করে চাপ দিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—মণি, কাজ কিন্তু খুব যত্ন করে শিখতে হবে। এমন করে কাজ শিখতে হবে, এমন মানুষ

হতে হবে যাতে করে কেউ যেন কোন দিন বলতে না পারে আনন্দচন্দ্রের ছেলে সুধাকান্তের ছেলে কিশোর-দুলালের চেয়ে কোন অংশে ছোট।

মণি অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে চাইলে রাস্তায় যেতে যেতেই। এমন আন্তরিক সস্নেহ সমাদর সে বাবার কাছ থেকে কোনদিন পায়নি বড় হয়ে। সে জবাব না দিয়ে তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইল।

তার নীরব দৃষ্টির মধ্যেই আনন্দচন্দ্র বললেন—বাবা, মানুষ যে পথেই চলুক, জ্ঞানের পথেই চলুক আর ধনের পথেই চলুক, তার সমস্ত প্রকাশ আপনার কর্মে, আপনার মনুষ্যত্বে। এই কথাটি কোন দিন ভুলো না বাবা!

কিছুদিন পর আনন্দ চন্দ্র আবার ফিরে এলেন। মণিকে কোলিয়ারীতে রলিন্স সাহেবের হেপাজতে রেখে এসেছেন। আবার একটা নূতন জীবনের জোয়ার এসেছে তাঁর মধ্যে। এ জোয়ার এসেছে মণিকে অবলম্বন করে। মণিকে নিজের চেয়ে বড় ক'রে মানুষ ক'রে তুলবার তপস্যায় আবার ঢেলে দিয়েছেন নিজেকে। গ্রামে ফিরে এসেছেন এখানকার সুবিস্তৃত সম্পত্তির একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্যে। এই কয়েক বৎসরে প্রচুর জমিদারী ও জমি, বাগান ও পুকুর কিনেছেন আনন্দচন্দ্র সুধাকান্ত এবং প্রধানতঃ নরনাথবাবুর সহায়তায়। নরনাথবাবু ধীরে ধীরে তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ আনন্দচন্দ্র। তিনি এই দীর্ঘদিন ধরে আপনার পারিপার্শ্বিক ও আশপাশের মানুষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর রসিকবাবুর ওপর।

নরনাথবাবুকে আনন্দচন্দ্র ইচ্ছা করেই এই কর্ম-সমারোহের মধ্যে টেনে এনেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল দু'টো। প্রথমতঃ নরনাথবাবু এ বিষয়ে এ-অঞ্চলের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মানুষ। তাঁর সাহায্য পেলে এ কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হবে এটা তিনি বুঝেছিলেন। তা ছাড়া আগে থেকে তাঁর সাহায্য পেলে তাঁকে বিরোধিতা থেকে দূরে রাখা হবে। তিনি এই বিত্তহীন, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, দম্ভী গ্রাম্য জমিদারগুলিকে খুব ভাল চেনেন্। এদের অহঙ্কারে আঘাত লাগলে এরা নিজের সর্বস্ব পণ করে, নিজের প্রাণ

পর্যন্ত পণ ক'রে বিরোধিতা করতে এরা সঙ্কুচিত হয় না। সর্বোপরি নরনাথবাবুকে তিনি ভাল ক'রে বোঝেন। অহঙ্কারী, অভিমানী, বৃহৎ কাঠামোর মানুষ। তাঁকে বিশ্বাস ক'রে ভার দিলে তিনি তাঁকে বঞ্চনা করতে পারবেন না এটা তিনি জানেন। আর নরনাথবাবুকে না পেলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে এখানকার সম্পত্তির কর্তৃত্ব গিয়ে পড়ত রসিকবাবুর হাতে।

অথচ রসিকবাবুকে তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা রসিকবাবু সমস্ত কিছুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পেলে পুকুর চুরি করতে পারতেন এবং সমস্ত কিছু নিজের খেয়াল খুশীমত আপনার সুবিধা প্রয়োজনে পরিচালনা করতেন। সেই জন্যেই তাঁকে কর্তৃত্বহীন করে রাখার উদ্দেশ্যে নরনাথবাবুর মত বিষয়ী ভারী মানুষের প্রয়োজন ছিল। সেদিকে তিনি সম্পূর্ণ সার্থকও হয়েছেন। রসিকবাবু তাঁর কৌশলে ম্যানেজার থেকে একেবারে বাজার-সরকারে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে রসিকবাবুর অসহায় অবস্থাটা লক্ষ্য করেছেন।

এতবড় জমিদারী একটার পর একটা কেনা হ'ল। সেই সব সমারোহ রসিকবাবু দূর থেকে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলেন এই বিশাল ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নাসিকাগ্র প্রবেশ করিয়ে ক্রমে ক্রমে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবার। কিন্তু নরনাথবাবুর অধিকতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কুশলী হাতের কৌশলে তাঁকে শুধু ব্যর্থই নয়, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সরে আসতে হয়েছে। সে আঘাত ও অপমান তিনি আপনার মধ্যে গোপন রেখে ধীরে ধীরে হজম করে নিয়েছেন। এ দিক দিয়ে তিনি নিরুপায়। একবার আনন্দচন্দ্রের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে এর প্রতিকার করবার চেষ্টাও করেছিলেন। একটা সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে তিনি একদিন আনন্দচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—হুজুর, আমি অনেকদিন আপনার কাজ করছি। অনেক নুন আপনার খেয়েছি। তাই অনাচার দেখলে, টাকা অযথা অপব্যয় দেখলে মনে বড় লাগে।

তিনি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন রসিকবাবু কি বলবেন। তিনি মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন। সেই দিনই তিনি শুনেছেন—নরনাথবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে রসিকবাবুর কথা-কথান্তর

হয়েছে। এবং নরনাথবাবু তাঁকে কটু কথাও বলেছেন কিছু। তিনি মনের কৌতুক মনের মধ্যেই সংগোপন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন—কি ব্যাপার রসিক! তোমার কথা শুনে ভয় লাগছে যে হে!

রসিকবাবু যেন খানিকটা অভয় পেলেন। বললেন—হুজুর, সকাল বেলা একটা সম্পত্তির দর করছিলেন নরনাথবাবু। দরটা যেখানে দশগুণ হলে চলতো, ওপক্ষ রাজী হয়ে যেত, সেখানে নরনাথবাবু বারগুণ পণ মূল্য স্থির করলেন। এর কি প্রয়োজন ছিল?

আনন্দচন্দ্র বললেন—সত্যি কথাই তো। খোঁজ করতে হবে দেখছি।

উৎসাহিত হয়ে রসিকবাবু বললেন—সত্যিই আপনার নিজের দেখা উচিত বাবু! এই টাকাটা সবটা হয়তো বিক্রেতা নাও পেতে পারে!

আনন্দচন্দ্র বললেল—দেখ রসিক, ভার তো একজনকে দিতে হবেই। সেই ভার দিয়ে তার উপর নজর রাখা উচিত। কিন্তু কত নজর দেব?

বেশ কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে গেলেন রসিকবাবু। আনন্দচন্দ্রের উত্তর শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—হুজুর আপনি যা বললেন কথাটা ঠিক। তবে আপনার রাশীকৃত টাকার সামান্য এতটুকুও অপব্যয় হলে গায়ে লাগে।

নিরুৎসাহিত ভঙ্গ-আশা রসিকবাবুকে উৎসাহিত করবার জন্যে আনন্দচন্দ্র বলেছিলেন—তবে তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি রসিক। অনেকদিন আছ আমার কাছে। আমার টাকা অপব্যয় হচ্ছে মনে হলেই তোমার মনে লাগবে বৈ কি! তুমি একটা কাজ ক'রো। তুমি নিজে একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখো নরনাথবাবুর কাজকর্মের উপর। আর তোমার সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে আমি অবশ্যই নরনাথবাবুকে বলব। আজই বলব।

আনন্দচন্দ্র নরনাথবাবুকে কি বলেছিলেন তা তিনিই জানেন, তবে এর পর নরনাথবাবু রসিকবাবুকে আর কখনও কটু কাটব্য করেননি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে রসিকবাবুও আর কখনও আনন্দচন্দ্রকে জমিদারী কেনা-বেচা সম্পর্কে অথবা নরনাথবাবু সম্পর্কে কোন কথা বলেননি।

এর পর থেকে রসিকবাবু কাছারী থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়ে নিয়েছেন। আনন্দচন্দ্রের জমিদারী কেনার আগে তিনি আনন্দচন্দ্রের ব্যবসাতে দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে কাজকর্ম সম্পর্কে আনন্দচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে

আনন্দচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়েছেন! তারও আগে তিনি নাকি জমিদারী সেরেস্তায় কাজকর্ম করতেন। জমিদারী সেরেস্তায় কাজকর্মের নেশা কোলীয়ারীর বৃহৎ কর্ম-সমারোহের মধ্যে থেকেও তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই আনন্দচন্দ্রকে বলতেন—হুজুর, আপনার দেশে একবার চলুন। সেখানে একবার আপনার পায়ের সোনার ছাপ পড়ুক। সেখানে গিয়ে কিছু জমিদারী কিনুন। তবে তো হবে। হুজুর, এ হ'ল ব্যবসা, আর সে হল রাজত্ব। দুয়ের মধ্যে সম্মানের অনেক তফাৎ।

আনন্দচন্দ্র শুনে কেবল হাসতেন, কোন উত্তর দিতেন না। কিন্তু আপনার অজ্ঞাতে তাঁর মনের কোন কোণে রসিকবাবুর কথাগুলি শিকড় গেড়েছিল তা এই গ্রামে এসে বসবাস করবার পূর্বে পর্যন্ত তিনি জানতে পারেন নি। জমিদারী কেনার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একথা তাঁর মনে হয়েছিল যে আর যাই হোক রসিকবাবুকে এই কর্মভারের কেন্দ্রস্থলে বসানো চলবে না। রসিকবাবুর চরিত্রের অতি-বিনয় এবং অতি-সম্ভ্রম প্রকাশকেই আনন্দচন্দ্র খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁকে এই কারণেই সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন না এবং বিশ্বাস করেন না। মনে হয়, মানুষটা বিনয় আর সম্ভ্রমের বর্ম দিয়ে নিজের চরিত্রের সন্দেহজনক কিছুকে মানুষের, বিশেষ করে তাঁর চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। আর এই কারণেই মনে হয় তাকে সব কিছুর ভার দিলে সে এমন কিছু করতে পারবে যা তিনি কোন দিন ধরতে পারবেন না। সেই সমস্ত কর্মকে সে আপনার বিনয় আর সম্ভ্রম দিয়ে আড়াল ক'রে রাখতে পারবে। এ কাজে সে কাজে দু পাঁচটা দশটা টাকা রসিক বাবু নেন, সে আনন্দচন্দ্র জানেন। তার জন্যে কিছু মনে করেন না তিনি।

শুধু কি তাই! মনুষটা আপনার পরিচয় গোপন করে রেখেছে যেন! রসিকবাবুকে তাঁর বিগতকালের সংবাদ একাধিকবার চেয়েও আনন্দ কোন স্থির জবাব পাননি। যতটুকু জেনেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে রসিকবাবুর তিনকুলে কেউ নেই। সেই কারণেই মানুষটা কখনও বাড়ী যায় না। কার কাছে যাবেন? মাঝে মাঝে কোন এক পিসীকে, বাপের এক দূর সম্পর্কের বোন, তাকে টাকা পাঠান রসিকবাবু। সে মানিঅর্ডারের কুপনও এক আধবার দেখেছেন আনন্দচন্দ্র। ভাঙা ভাঙা অক্ষরে কে এক হৈমবতী সে টাকা নিয়ে সই করছে দেখেছেন।

মানুষটার উপর সেই কারণেই এক এক সময় অত্যন্ত মায়া হয় তাঁর। কাজ কর্মে তিনি অত্যন্ত পটু। তা সত্ত্বেও তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারার জন্যে এক এক সময় মনে মনে দুঃখবোধ করেন আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্র এটাও বোঝেন যে তাঁর এই আংশিক অবিশ্বাসের কথা রসিকবাবুও ভাল করে জানেন। তাই এক এক সময় রসিকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতি অকারণ মায়ায় তাঁর সমস্ত মন অত্যন্ত আকুল হয়ে ওঠে। সেই অকারণ মমতার মুহূর্তের দু একটিকে স্থায়ী চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন আনন্দচন্দ্র। এই রকম সময়েই তিনি একাধিকবার রসিকবাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। রসিকবাবুকে চাইতে হয়নি কোনদিন, না চাইতেই পেয়ে গিয়েছেন রসিকবাবু।

আনন্দচন্দ্র জানেন তাঁর সম্বন্ধে রসিকবাবুর মনোভাব কি! রসিকবাবুকে অবিশ্বাস করেন তিনি, এ সংবাদটা যেমন জানেন রসিকবাবু, এ সংবাদও জানেন যে আনন্দচন্দ্র তাকে ভালো বাসেন তার চেয়ে বেশী। এ কথা আনন্দচন্দ্র বোঝেন। তা না হলে রসিকবাবু এতদিন এখানে থাকতেন না এও আনন্দচন্দ্র খুব ভাল করে জানেন। বিনিময়ে তাঁকে ভালবাসেন রসিকবাবু। কিন্তু রসিকবাবু সবচেয়ে ভালবাসেন মণিকে। তিনি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছেন মণিকে রসিকবাবুর ভালবাসার মধ্যে এমন গাঢ়তা এবং অন্তরিকতা আছে যা সন্দেহের অতীত। কিন্তু রসিকবাবুর চরিত্রে সমস্ত রাগ এবং অনুরাগের প্রকাশ এত নরম এবং ফিকে যে বিশেষ অভ্যস্ত চোখ ছাড়া আর কারও চোখে তার প্রকাশই ধরা পড়ে না।

ইদানীং সমস্ত মুস্কিলটা হয়েছে রসিকবাবুর মণিকে ভালবাসা নিয়েই। মণি তাঁর কাছে সেই সাত আট বছর বয়সে যাওয়ার সময় থেকেই কাজকর্ম ছাড়াও মণিকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। মণির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাও অসাধারণ। সেই কারণেই মণির ছোট্ট হৃদয় এবং অপরিণত বুদ্ধির উপর রসিক বাবুর প্রভাবও অনেক। মণির হৃদয় এবং বুদ্ধির উপর রসিক বাবুর এই সুপ্রচুর প্রভাবই আনন্দচন্দ্রের কাছে সব চেয়ে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বেশ ভাল করে লক্ষ্য করেছেন রসিক বাবু এই প্রভাবের সুযোগে মণিকে ধীরে ধীরে আপনার আয়ত্তে এনে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ মানুষ সম্পর্কে তার মনোভাব একেবারে চিরদিনের জন্যে বিরূপ করে দেবার চেষ্টা করছিলেন।

রসিক বাবু এই গ্রামে তাঁর কাজ নিয়ে এসে যাঁদের সঙ্গে অধিকার নিয়ে তাঁর বিরোধ হয়েছে এবং আনন্দচন্দ্রের ইঙ্গিতে যেখানে যেখানে সে অধিকারে বৃহৎ অংশ পাননি সেইখানেই সেই সেই মানুষগুলির সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব হয়ে গিয়েছে। নরনাথবাবু আর সুধাকান্ত সম্পর্কে রসিক বাবুর বিরূপতার অন্ত নেই। মুখে বা ব্যবহারে তা প্রকাশ না করলেও আনন্দচন্দ্রের তা বুঝতে বাকী নাই। রসিকবাবুর বিরূপতা শুধু ঐ দুজন সম্পর্কেই নয়। লোকনাথ, দুলাল এদের সম্পর্কেও রসিক বাবুর মনোভাব ভাল নয়; এদের তিনি বুঝতেও পারেন না কি ধরণের মানুষ এরা। রসিকবাবু আপনার বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে আপনার ভালবাসার প্রভাবের সুযোগে মণির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন। অথচ আনন্দচন্দ্র যখন আর বিশ বছর পরের ছবি আপনার মনে দেখতে পান তখন দেখেন গ্রামে দুটি মানুষ অন্য সকলের উপরে মাথা উঁচু করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজন তাঁর ছেলে মণি, আর একজন দুলাল। লোকনাথও থাকবে সেদিন পর্যন্ত। তবে তার এত ক্ষমতা হয়তো থাকবে না সেদিন। এসব মানুষ শরত কালের সন্ধ্যার রঙীন মেঘের মত। হয় তো ততদিন বাঁচবেই না লোকনাথ।

তাই আগামী কালে যে সব মানুষের সঙ্গে একই জায়গায় বসবাস করতে হবে সেই সব মানুষ সম্পর্কে যদি আজ থেকেই মণির মন বিরূপ হয়ে যায় তবে তার পক্ষে এখানে বাস করা অত্যন্ত ক্লেশকর হয়ে উঠবে। শুধু তার পক্ষেই নয়। তার চেয়ে বেশী ক্লেশ হবে এখানকার মানুষদের। মণির হাতে যে শক্তি আছে সে অস্ত্র যদি সে এখানকার নিরীহ বিত্তহীন মানুষের উপর প্রয়োগ করে তা হলে তা হবে বজ্র দিয়ে আঘাতের মতই। সে তিনি হতে দেবেন না কিছুতেই। এমনিই তো পাশাপাশি বাস করতে গিয়ে এদের চেয়ে বহু বহু গুণ অর্থ, সম্পদ ও শক্তি নিয়ে মণির পক্ষে এদের সহ্য করা কঠিন হবে। সে তো সহজে এখানকার কাউকে তার সমকক্ষ বলে মনে করবে না। যদি কেউ তার সমান হতে চায় তা হলে তার উঁচু মাথাটা সে এমনিই লুটিয়ে দিতে চাইবে। তার উপরে আবার যদি এখন থেকেই তার মনে তাদেরই সম্পর্কে বিরাগ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে এই শান্তি-স্নিগ্ধ মনুষ্য-বাসভূমিতে আগুন জ্বলে যাবে। তিনি

পরিস্কার জানেন, এই যে সেদিন মণি ইস্কুল থেকে না খেয়ে চলে এসেছিল তার মূলে ছিল রসিক বাবুর প্ররোচনা। দুলালের বিরুদ্ধে এমন করে সেদিন নিশ্চয়ই রসিকবাবু তার মনকে বিষিয়ে দিয়েছিল যে তাঁর অভিমানী ছেলে তাঁকে যমের মত ভয় করা সত্ত্বেও সে ভয়কে উপেক্ষা করে চলে আসতে পেরেছিল।

তাই অনেক চিন্তা করে তিনি রসিকবাবুর কাছ থেকে মণিকে পৃথক করাই স্থির করেছিলেন। এবং এতদিনে পৃথক করে রেখে এসে তিনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এইবার তিনি ছেলেকে নূতন করে মানুষ করবেন নিজের হাতে।

আনন্দচন্দ্র সেই ধাতের মানুষ যাদের ছোট শিশুর মত জীবনের কাছ থেকে প্রত্যাশার অন্ত নাই। বার বার ব্যর্থ হলেও তাঁর প্রত্যাশা ফুরোয় না। সেই কারণেই মনের আশা তাঁর চিরজীবী। অল্পেতে খুশী হবার ক্ষমতা এখনও তাঁর অব্যাহত। তিনি সমস্ত কিছুর একটা মনোমত ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাই খুশী মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাগানে। হঠাৎ নজর পড়ল খগেনের উপর। তিনি এখানে ফেরার পর খগেনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। নজর পড়তেই তিনি চীৎকার করে ডাকলেন—ওহে ও খগেন বাবু! শোন! শোন!

ডাক শুনে ছুটে এসে দাঁড়াল খগেন। মুখখানি তার হাসিতে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে।

আনন্দচন্দ্র বললেন—কি হে! তোমার যে দেখাই নেই। কি খবর?

আনন্দচন্দ্র ঠিক কি খবর জিজ্ঞাসা করছেন না বুঝতে পেরে সে কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখের হাসিটি কেবল আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল।

আনন্দচন্দ্র হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?

খগেন এইবার আনন্দচন্দ্রের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে—ভাল আছে। আপনার দয়ায় অসুখ সেরে গিয়েছে। কিন্তু শরীর সারছে না।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন, বললেন—আমার দয়া অসীম হে! অসুখ সেরেছে যদি তবে সারতে পারছেন না কেন? তুমি এক কাজ কর। মানভূমে আমার তো অনেকগুলো কলিয়ারী রয়েছে। তারই একটাতে গিয়ে

তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিন থেকে এস। বায়ু-পরিবর্তন হয়ে যাবে। শরীরও সারবে।

খগেন অভিভূত হয়ে এক গোছা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। তার দু'চোখ ছল ছল করছে। আনন্দচন্দ্র বললেন, হেসেই বললেন—তুমি তো আবার মহামানী লোক। দেখ আবার তোমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগবে কি না!

খগেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললে—আপনার কাছে আবার আমার আত্মসম্মান! আমি যাব! কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি হে?

—আপনার কাছে যে টাকা নিয়েছিলাম, চিকিৎসা করতেই তো তার সব খরচ হয়ে গিয়েছে।

সহজভাবে আনন্দচন্দ্র বললেন—তাতে কি হয়েছে? তুমি আর একশো টাকা নিয়ে নূতন করে একটা লিখে দেবে। লিখে না দিলে তো আবার তোমার মন খুঁৎ খুঁৎ করবে। তা হলে তাই করো বুঝলে? আমি বরং আজকেই কোন্ কলিয়ারীতে যাবে ঠিক করে সেখানকার ম্যানেজারকে লিখে দিচ্ছি। বুঝলে?

আনন্দচন্দ্র চলে গেলেন। খগেন অভিভূত হয়ে এক গোছা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। সে ফুলগুলি আনন্দচন্দ্রকেই দেবার জন্যে এনেছিল কিন্তু তার আর দেওয়া হল না।

শুধু আপনার সংসারেই নয়, আপনার চারিপাশে পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে দেখেন আনন্দচন্দ্র আর একটি স্নিগ্ধতায় তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাঁর আশপাশের পরিবেশে একটি গাঢ় শান্তি যেন বাসা বেঁধে আছে। এদিক দিয়ে আনন্দচন্দ্র একটি আশ্চর্য উদারতা লাভ করেছেন আপনার মধ্যে। জীবনে অধিকাংশ মানুষের চেয়ে বেশী দেখেছেন, আরও বেশী বুঝেছেন বহু বিচিত্র অবস্থান্তর ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাত্রা ক'রে কেমন ক'রে যে এই উদারতার মধ্যে উপনীত হয়েছেন তিনি, তা নিজেই সঠিক জানেন না তবু বুঝতে পারেন ইদানীং কেমন করে যেন এমনি একটি উদারতা তিনি আপনার মধ্যে লাভ করেছেন।

নিজের সংসারের আভ্যন্তরীন শান্তি অবশ্য এর জন্যে প্রধানত দায়ী ত

আনন্দচন্দ্র নিজে ভাল করেই বোঝেন। তিনি এমনি নিরুদ্বিগ্ন শান্তি আপনার সংসারে বিদ্যুতের সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বরাবর কামনা করে এসেছেন। আর আগে সেই কারণেই সর্বদা সন্তর্পণে থাকতেন কখন বিদ্যুৎ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে। জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের তুচ্ছ প্রত্যাশাগুলি বাসাভাঙা পাখীর মত আবার অনন্ত আকাশের অসীম শূন্যে অন্তর্ধান করেছে আর তারই সঙ্গে গাঢ় শান্তিটুকু কচি পাতার টুকরোর মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

তারপর আবার তপস্যা করেছেন সেই উড়ে-যাওয়া পাখীদের জন্যে। কিন্তু তারা আর হয়তো ফিরে আসেনি। কিন্তু যে ডিমগুলি ভাঙা বাসায় তারা রেখে গিয়েছিল তারই থেকে আবার নূতন নূতন তুচ্ছ প্রত্যাশার শাবকগুলি জন্ম নিয়েছে, নূতন বাসা গড়ে উঠেছে। ছেঁড়া ঝরা পাতার জায়গায় অবার নূতন শান্তির কচি পাতাগুলি গজিয়ে উঠে নূতন সমারোহের সৃষ্টি করেছে।

আজ আনন্দচন্দ্র বিদ্যুতের দিক থেকে আপনার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছেন যে বিদ্যুৎ বলে বিশেষ কেউ আছে তাঁর জীবনে। আজ মুখ ফিরিয়েছেন ছেলের দিকে। সংসার আবার নূতন করে সুন্দর হয়ে উঠেছে, স্নিগ্ধশ্যাম হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

কিন্তু সেইখানেই মন তাঁর স্থির থাকে নি। আপনার সংসার ছাড়িয়ে পরের ঘরের দিকে মন ছুটে চলেছে পরের বাড়ীর শান্তির প্রত্যাশায়। খগেনের সম্পর্কে তাঁর মনে একটি গাঢ় মমতা আছে। সেই কারণে তার ক্লেশ দূর করবার জন্যে নিজে আগ্রহ করে টাকা ধার দিয়েছেন; তাকে সস্ত্রীক নিজের কলিয়ারীতে বায়ুপরিবর্তনের জন্যে পাঠিয়েছেন। ওদিকে সুধাকান্তের সংসার। তাঁর সংসারে আজও পুরুষানুক্রমিকভাবে একটি শান্তি স্থির দীপ্তিতে অহরহ বিরাজমান। আনন্দচন্দ্রের মনে হয়েছে বংশানু-ক্রমিকভাবে সুধাকান্তরা সপরিবারে স্থির দৃষ্টিতে সেই আলোটির দিকে চেয়ে আছে, তারই তপস্যা করছে প্রতিমুহূর্তে। তাঁর সোনার চাঁদের মত দুই ছেলে তাঁর সংসারের আনন্দ ও স্নিগ্ধতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে দিনে দিনে।

আর এ দিকে নরনাথবাবু আর তাঁর সংসার। প্রথম যেদিন আনন্দচন্দ্র এখানে এসে নরনাথবাবুর অন্ধকার জনহীন বাড়ীতে সাক্ষাৎ করে এক বৃদ্ধ

অন্ধকারবাসী, ভগ্নহৃদয়, ভরসাহীন বৃদ্ধকে বাইরে নূতন কাজের জন্যে ডাক দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে আজকের নরনাথবাবুর আকাশ-পাতাল তফাৎ।

প্রথম প্রথম যে জীর্ণ গম্ভীর বিষণ্ণ বৃদ্ধ মানুষটি আনন্দচন্দ্রের কাছারীতে তাঁর উপকারের জন্যে আসতেন সে মানুষটি কোথায় পালিয়ে গিয়েছে যেন। এখনকার মানুষটি যেন আগের চেয়ে অনেক খানি সোজা হয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটেন। আগেকার প্রায়-নির্বাক মানুষটি এখন অহরহ কথা বলার ছল খোঁজেন। কথা না বলে চুপ করেও যখন থাকেন তিনি, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, খুশীতে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেখান থেকে খুশী এখনি হাসি আর কথা হয়ে উপছে পড়বে যেন। আগে কাজ করতে করতে স্নানাহারের সময় প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে যেত। কোন কোন দিন আনন্দচন্দ্র নিজে এসে তাগাদা দিতেন উঠবার জন্যে। গম্ভীর নরনাথ বাবু বিষণ্ণ হাসি বলতেন—এই যে উঠি। আজকাল সব উল্টে গিয়েছে। বৃদ্ধ স্নানের সময় উঠবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। বারোটা বাজলেই কাজের মধ্যপথেই কলম থামিয়ে তিনি উঠে পড়েন। আনন্দচন্দ্র কোনও প্রশ্ন করলে নরনাথবাবু বলেন—উঠলাম গো! আর থাকতে পারছি না। বাড়ী যাবার জন্যে আমার মন কেমন করছে। কথা বলে তিনি আর অপেক্ষা করেন না। কাছারী থেকে বেরিয়ে যাবার পথ ধরেন। আনন্দচন্দ্র সকৌতুকে হাসেন।

নরনাথ বাবুর এই নবজীবনের আসল কারণ তাঁর এক বছরের নাতনী, লোকনাথের মেয়ে। দীর্ঘকাল একা অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে আজ আবার নূতন করে নরনাথবাবু সংসার আরম্ভ করেছেন লোকনাথ, তার স্ত্রী হাসি আর তার কন্যাকে নিয়ে। আনন্দচন্দ্র তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখে এসেছেন। নূতন করে বাড়ী মেরামত করিয়েছেন, বাড়ীতে চুনকাম করিয়ে রঙ দিইয়েছেন বাড়ীতে নরনাথবাবু। সেই পুরানো নোনাধরা, হাড়-বের করা বাড়ীটা যেন নরনাথবাবুর মতই নূতন করে ছোকরা সেজে হাসিখুশীতে ঝলমল করছে। সেই আগের জনশূন্য বাড়ী এখন লোকজনের হাঁক-ডাকে ছোট ছেলের হাসি কান্নায়, নূতন বৌমার কথায় হাসিতে অহরহ মুখর হয়ে আছে। বিশ্রামের সময় আপনার ঘরে বসে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে এই ধ্বনির সঙ্গীতের

দিকে কান পেতে থাকেন। বৌমার কথা হাসি কানে আসে, তিনি শোনেন। নাতনীর হাসি শুনতে পেলে এ ঘর থেকে হেসে নরনাথবাবু সাড়া দেন। নাতনী কাঁদলে তিনি বিশ্রাম ছেড়ে ছুটে যান তাকে কোলে করে নিয়ে আসবার জন্যে।

নরনাথবাবুর খুশীর শেষ নেই। নূতন নূতন খুশী নাতনীর মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করেন তিনি। তার জন্যে আর কারো কাছে ছুটবার দরকার হয় না তাঁর।

একদিন এই নিয়ে কথা বলছিলেন নরনাথবাবু আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে।

আনন্দচন্দ্রই প্রশ্ন করেছিলেন হাসতে হাসতে—কি ব্যাপার আপনার? কাছারী শেষ হতে না হতে ছুটে পালাচ্ছেন নাতনীর জন্যে!

নরনাথবাবু অপ্রস্তুত হয়ে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দচন্দ্রের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন ধরা-পড়া চোরের মত।

আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—তারপর? বুড়ো বয়সে সংসারে নতুন করে চিনির সন্ধান পেয়েছেন দেখছি। সকৃতজ্ঞভাবে নরনাথবাবু বললেন—তা পেয়েছি। বুড়ো বয়সে আবার সব পেলাম এক এক করে। তবে পেলাম তো তোমারই জন্যে। তুমিই তো আমার চিন্তামণি গো!

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—ছি, ছি, কি বলছেন! চিন্তামণি কি মানুষ হতে পারে! ছেড়ে দিন ও কথা। আপনার সংসারের কথা বলুন।

—সংসারে তো বেশ সুখেই আছি। শেষ বয়সে সবই পেলাম। কিন্তু দুঃখ এই যে আমার ছেলের মুখের সেই পাগল-পাগল ভাব কোথায় চলে গেল বিয়ের পর থেকে। সব সময়েই মুখ থম থম করছে। কেন তা বুঝি না। ভার-বোঝা ছিল না ওর। এখন বোধ হয় ওর কাঁধে ভার-বোঝা চাপিয়ে ওর মনের সুখ নষ্ট করে দিলাম।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন। বললেন—তাতে কি হয়েছে? ও কি দুঃখ জানেন? উপার্জন না করার দুঃখ। আমি তো ওকে চাকরীর কথা বলেছিলাম। ও করবে চাকরী? করে যদি তো বলবেন আমাকে।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের মনে হল মণির কথা। মণির সঙ্গে এক জায়গায় লোকনাথকে রাখলে যদি ওদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য

উপস্থিত হয়? দুই-ই অত্যন্ত চড়া সুরের মানুষ! তবে তার সম্ভাবনা থাকবে না। তাঁর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখলেই চলবে।

নরনাথবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—তোমার কাছে তো কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই আনন্দ! তোমাকে কি বলব! আমি বলব লোকনাথকে। আর তোমার কাছে কৃতজ্ঞার কি আমার শেষ আছে? তুমি না থাকলে আমার ঐ মা-মরা ভাগনী মালতী হয়তো মরে যেত! তুমি ওদের সরে যাবার ব্যবস্থা না করলে মেয়েটা হয়তো বাঁচত না।

মালতীর নাম শুনে বুকটা একবার দুলে উঠল। তিনি বললেন—আমি তো কালই আবার যাচ্ছি। মণিকে একা রেখে এসেছি। খগেনরা যেখানে আছে সে খাদেও একবার যাব।

বলতে বলতেই আনন্দচন্দ্রের মনে হল—সেখানে হয়তো মালতীর সঙ্গে দেখা হবে। মালতীকে ভাল করে দেখেননি তিনি কোনদিন।

কথাটা মনে হতেই অন্ধকার কয়লার খাদের ভিতর কেজটা নামবার সময় নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে যেমন শব্দ হয় তেমনি ধ্বনিতে বুকের ভিতরের অন্ধকার অজানা প্রদেশ যেন একবার শব্দিত হয়ে উঠল।

মাসখানেক পরে আবার ফিরে এলেন আনন্দচন্দ্র মণিকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি আসবেন এ খবর আগেই জানিয়ে লিখেছিলেন যেন দুখানা জুড়িই স্টেশনে হাজির থাকে। একখানাতে এলেন তিনি আর মণি আর একখানা বাড়ীর দরজায় লাগল না। স্বামী আর ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে বিদ্যুৎ দোতালার জানালাতেই দাঁড়িয়েছিলেন। নামবার সময় আনন্দচন্দ্রও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সময়ে একবার স্ত্রীর চোখে চোখে পড়েছিল তার।

স্বামীকে ছেলেকে হাত মুখ ধোবার পর জল খেতে দিয়ে বিদ্যুৎ এমনই জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কৈ আর একখানা গাড়ী কোথায় গেল? দুখানা গাড়ীই তো স্টেশনে গিয়েছিল?

আনন্দচন্দ্র খেতে খেতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন কেবল, কোন জবাব দিলেন না।

মণি জবাব দিলে মায়ের প্রশ্নের, বললে—আর একখানায় খগেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী এলেন। আমাদের সঙ্গেই তো এলেন ওঁরা। খগেনবাবুর স্ত্রী বড় ভাল মানুষ মা। যতদিন ওঁদের কাছে ছিলাম ততদিন কি আদর-যত্ন আমাকে করেছে কি বলব! আমি তো ওঁর সঙ্গে মাসীমা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছি।

আনন্দচন্দ্র কোন জবাবই দিলেন না। একবার তাকালেনও না ছেলের দিকে। মুখ নীচু করে খেয়েই চললেন।

বিদ্যুৎ খুসীই হলেন। ছেলেকে বললেন—তাকে আমাদের এখানে আসতে বলিস নি?

মণি হাসল, বললে—না, তুমি বলবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি! বলেছি বৈ কি! আবার বলে আসব।

বিদ্যুৎ একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হল এই মাসখানেকের মধ্যে স্বামীর শরীর যেন একটু ভাল হয়েছে। কিছুদিন আগে যেন মুখখানা কেমন শুকনো ভাঙা ভাঙা লাগত, সেই শুকনো ভাবটা গিয়ে মুখখানি আবার আগের মত টসটসে হয়েছে!

আনন্দচন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে বাগানে গিয়ে বসলেন। চাকর তামাক দিয়ে গিয়েছে, গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে তিনি পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। খগেনরা যে কলিয়ারীতে ছিল সেইখানেই শেষের মাসখানেক ছেলেকে নিয়ে কাটিয়ে এসেছেন আনন্দচন্দ্র। এই এক মাস তাঁর বড় আনন্দে কেটেছে। মণির সঙ্গে নূতন করে পরিচয়টা গাঢ় হয়েছে। তার উপর খগেনের সরস সঙ্গে মনের গ্লানি যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব কেটে গিয়েছে। বিকেল বেলা খাদ থেকে ফিরেই দেখতেন আরাম-কেদারা পেতে টুলের উপর গড়গড়া তৈরী করে খগেন একটি চেয়ারে বসে আছে। পাশেই চকচকে গাড়ুতে জল ভর্তি, মাথায় পাট-করা শুকনো গামছা। এমন সযত্ন পরিপাটী কে করেছে তা দেখবামাত্রই আনন্দচন্দ্র বুঝতে পারতেন। জল খেয়ে তামাক টানতে টানতে তিনি খগেনের সঙ্গে গল্প করতেন। সামনের রুক্ষ টিলার ওপাশে সূর্য অস্ত যেত; ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসে চারিদিক মুছে যেত। এখানে ওখানে কাছে দূরে সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি একটি লালচে চঞ্চল আলোকপিণ্ড ফুটে উঠত; বয়লারের মাথা থেকে আগুন

উপরের দিকে রক্তিম স্রোতে উঠে যেত। এই সব অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে, আর খগেনের সঙ্গে মৃদুস্বরে দুটো চারটে কথা বলতে বলতে আনন্দচন্দ্র আর একটি অবগুণ্ঠিত বাক্যহীনা মহিলার প্রচ্ছন্ন অথচ সর্ব-পরিবেশব্যাপী স্নিগ্ধ উপস্থিতি অনুভব করতেন। সমস্ত পরিচিত দৃশ্য নূতন মূল্যে মূল্যবান মনে হত। প্রতি মুহূর্তের সেবায় তাঁর সতর্ক সানুকম্প দৃষ্টির স্পর্শ সর্বক্ষণ অনুভব করেছেন তিনি। অথচ তাঁকে তিনি এই একমাসের মধ্যে প্রায় দেখেন নি বললেই চলে। মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছেন সাদা ছায়া একটা সরে গেল। এক আধবার দেখেছেন সুগঠিত দুখানি পায়ের পাতা অথবা একখানি অনাবৃত বাহু। তিনি তাঁর সঙ্গে কোনদিন কথা বলবার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। প্রথম দিকে প্রতি মুহূর্তের সতর্ক ও সুনিপুণ সেবায় বিব্রত হয়ে আনন্দচন্দ্র একদিন বলেছিলেন—ওহে খগেন, তোমার স্ত্রীকে এমন করে পরিশ্রম করতে নিষেধ করো। ঠাকুর চাকর সবই তো রয়েছে। তবে তিনি পরিশ্রম করেন কেন? আর অকারণ এমন করে পরিশ্রম করলে বায়ু-পরিবর্তনে কোনো লাভ হবে না।

তাঁর কথার কোন জবাব আসেনি। খগেনের মারফৎও কোন পরোক্ষ জবাব আসেনি।

তিনি সাতদিন থাকবার জায়গায় একমাস থেকে গিয়েছিলেন। মণির থাকবার প্রবল ইচ্ছাকে অবলম্বন করে তিনিও সানন্দে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এইখানে থাকতে থাকতেই এই সেবা ও যত্ন পেয়ে মাঝে মাঝে হিলু-বৌকে তাঁর মনে পড়েছে। হিলু-বৌ, মালতী, মণি, খগেন, শান্ত নির্জন অরণ্যভূমি, সব মিলে মনে একটা জাগ্রত দিবাস্বপ্নের ঘোর সব সময় লেগে থাকত।

খগেনের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা হত। খগেন আপনার স্বভাবের জন্যে দুঃখ করত তাঁর কাছে। বলত—দেখুন না, আমার এমন স্বভাব যে সামান্য উপার্জন করে আমার সংসারের একটা মাত্র মানুষ আমার স্ত্রী, তাকে সুখে শান্তিতে রাখব তাও আমার দ্বারা হল না।

সন্ধ্যার সব-মুছে-দেওয়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আনন্দচন্দ্র বলেছিলেন—তার জন্যে দুঃখ কিসের হে! সব সুখ কি সবারই হয়! আমি যা পেয়েছি তা তুমি যেমন পাওনি তেমনি তোমার যা আছে তাই কি আমি পেয়েছি?

খগেন অবাক হয়ে বলেছিল—আমার এমন কি আছে যা আপনার নেই?

তেমনি ভাবেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভহীন কণ্ঠে আনন্দচন্দ্র বলেছিলেন—আছে বৈ কি হে! ভগবানের দান এ কি পেয়ে বোঝা যায় পেয়েছি? না পেলে তার দুঃখ থাকে। আমারও দুঃখ আছে হে, অনেক দুঃখ! সে তুমি বুঝবে না। সে দুঃখ যে তোমার নেই।

খগেন চুপ করে গিয়েছিল তাঁর উত্তর শুনে। বোধহয় যে সম্পদ তার আছে, অথচ আনন্দচন্দ্রের মত কৃতী সার্থক মানুষের নেই তারই সন্ধান করতে লাগল সে আপন মনে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আনন্দচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

আপনার শোবার ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়তে লাগলেন। পাশের ঘর থেকে কার কলকণ্ঠ ভেসে আসছে। নারীকণ্ঠ! বিদ্যুৎ কারো সঙ্গে কথা কইছে। কার সঙ্গে কথা কইছে। কার সঙ্গে কথা কইছে বিদ্যুৎ? তিনি বুঝতে পারলেন না। গত কিছুকালের কাজ-কর্ম দেখা হয় নি। তিনি বাকী-পড়া কাজ দেখবার জন্যে উঠে চলে গেলেন।

রাত্রে শোবার সময় বিদ্যুৎ তাঁকে বললে—আজ খগেনবাবুর স্ত্রী মালতী এসেছিল। বেশ মেয়ে!

আনন্দচন্দ্র কোন কথা বললেন না, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন একবার।

তাঁর মনে পড়ল—সন্ধ্যাবেলা যে অপরিচিত নারীকণ্ঠ শুনেছিলেন সে কণ্ঠ তা হ'লে মালতীর।

আজকাল দিনগুলোর অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাটা আনন্দচন্দ্রের এক বিচিত্র লীলায় আর কৌতুকে কেটে যাচ্ছে। বিদ্যুতের সম্পর্কে তাঁর মনের সূক্ষ্ম সহানুভূতি আর মমতার দিকটা যেন মরে গিয়েছে একেবারে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে হৃদয়ের সেই সদা-চঞ্চল কৌতূহল আর নেই তাঁর। জীবনের ব্যবহারিক দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিদ্যুৎকে যতটুকু লাগে ততটুকু বিদ্যুৎ আছেন তাঁর জীবনে। তবু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়। বিদ্যুৎ কেমন যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে গত বছর খানেকের মধ্যে। ইদানীং

আনন্দচন্দ্রের মনে হয় বিদ্যুৎ যেন শুধু শান্তই হয়ে যায় নি, তার ভিতরের সেই দাহকর জ্বালাও যেন কোন্ মন্ত্রবলে নিভে গিয়েছে। আনন্দচন্দ্র অবাক হয়ে মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করেন এমন হল কি ক'রে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। বিদ্যুৎকে আর তিনি বুঝতে পারেন না, বুঝবার কোন বাসনাও নেই তাঁর। আজ তাঁর জীবনের ধারা বিদ্যুৎকে পার হয়ে ভগীরথ-রূপী মণির পদচিহ্নের পিছু পিছু যাত্রা করেছে।

আর এক নূতন খেলা এসেছে তাঁর জীবনে। খেলা, হ্যাঁ, খেলা বৈ কি! বিকেল বেলা বাগানে বসে বসে খগেনের সঙ্গে গল্প করেন কিছুক্ষণ। নানান অর্থহীন তুচ্ছ কথার আদান-প্রদান হয়। সামান্য সামান্য কথায় প্রাণ খুলে হাসেন আনন্দচন্দ্র। তারপর বাড়ীর ভেতর উঠে যান। বাড়ীর ভেতর ঢুকবার মুখে অন্ধকারের মধ্যে বিচিত্র প্রত্যাশায় মুখে অস্ফুট হাসি ফুটে ওটে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই শুনতে পান প্রত্যাশিত কল কণ্ঠের হাসি, কিম্বা অবাধ জলস্রোতের মত কলকণ্ঠের কথা—মালতী হাসে অথবা কথা বলে।

তিনি জানেন, কোন আশ্চর্য কৌশলে কে জানে,—তিনি যেমন প্রত্যাশা ক'রে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকেন এই কথা আর হাসি শুনবার জন্যে তেমনি যে হাসে আর কথা বলে সেও বোধহয় তাঁর প্রত্যাশাতেই কথা বলে আর হাসে। তা না হলে সিঁড়িতে যে হাসি আর কল কথা তিনি শুনতে পান, সকলের অগোচরে নরম চটি পায়ে দিয়ে আলতো ভাবে উপরে আপনার ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে ঢুকলেই সে কথা বন্ধ হয়ে যায় কি ক'রে! সে যেন কেমন করে জানতে পারে! তিনি পাশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন কথা কিম্বা হাসি কোনদিন শুনতে পান নি।

ইদানীং এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে একটা আশ্চর্য্য ও সংগোপন কৌতুকের মত হয়েছে যেন। এ কথাটা বিদ্যুৎও বললেন একদিন তাঁকে। বললেন—জান, এই তোমার খগেনবাবুর মালতী রোজ রোজ সন্ধ্যের সময় আসে। আমার বাপু আর ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম বেশ লাগত। আর একটা কি জান? ক' দিনই আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্যর করছি। ক'দিনই দেখছি বেশ হাসছে, কল কল করে' কথা বলছে হঠাৎ এক সময় চুপ করে গেল। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। জিজ্ঞাসা করলে, এমন স্বভাব, কোন জবাব দেয় না,

মুখ টিপে হাসে। আজ বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। কথা বন্ধ করতেই আজ হঠাৎ এই ঘরে তোমার চটির অস্পষ্ট শব্দ পেলাম সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম রোজ কেন হঠাৎ চুপ করে যায়। তুমি কখন আসবে ও যেন সেই সময়টা লক্ষ্য করে বসে থাকে। ও যেন সেই জন্যেই খালি আসে। ও কি স্বভাব মেয়েমানুষের ?

আনন্দচন্দ্র অবাক হলেন না। তবু ভাবলেন—ও কি এই জন্যেই শুধু আসে ? কেন আসে ? অনন্দচন্দ্র অনেক ভাবলেন কিন্তু কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

তার পরের দিন।

সন্ধ্যার সময় সিঁড়িতে উঠবার মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশিত হাসি আর কলরব শুনতে পেলেন না আনান্দচন্দ্র। একটু আশ্চর্যও হলেন, হতাশও হলেন তিনি। অকস্মাৎ তাঁর মনে হল যেন ক্লান্ত হয়েছেন তিনি। ভারী ভারী পা ফেলে আপনার ঘরে এসে ঢুকে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

পাশের ঘরে আর কেউ নেই। এমনকি বিদ্যুতের গলাও শুনতে পেলেন না আনন্দচন্দ্র। ঘরের মধ্যে রঙীন শেড-দেওয়া আলোটা স্নিগ্ধ বিষণ্ণতায় সমস্ত ঘর ভরিয়ে রেখেছে যেন। তিনি চুপ করে শুয়ে থাকলেন।

হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা সজোরে খুলে গেল। আনন্দচন্দ্র চমকে বিছানার উপর উঠে বসলেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ তাঁরই দিকে চেয়ে! কিন্তু ওকি, বিদ্যুৎ অমন করে তাকিয়ে রয়েছে কেন তাঁর দিকে? এক মুহূর্ত পরেই বিদ্যুৎ ছুটে এসে তাঁর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আনন্দচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর কাছে বিদ্যুৎ কি কোন দিন কেঁদেছে? তাঁর মনে পড়ে না। যে বিদ্যুৎ তাঁর জীবন থেকে সরে গিয়েছে ভেবেছিলেন তিনি, জীবনের সমস্ত কুতুহলী আনন্দ যার সরে যাওয়ায় ভাঁটার টানে কোথায় চলে গিয়েছিল, আজ সে যখন আবার বুকের মধ্যে ফিরে এসেছে, তখন তারই ছোঁয়ায় বুকের মধ্যে কোন এক উত্তাল জোয়ার দুরন্ত আবেগে হৃদয়ের এত কালের শুষ্ক দুই তীরভূমিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আনন্দচন্দ্রেরও দুই ঠোঁট আবেগে কেঁপে উঠতে লাগল। তিনি কেবল ধীরে ধীরে বিদ্যুতের মাথায় আর পিঠে

হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বিদ্যুতেরও দু এক গাছা পাকা চুল তাঁর নজরে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর বিদ্যুৎ কান্না থামিয়ে মুখ তুললেন। আনন্দচন্দ্র তাঁকে আপনার সামনে বসিয়ে দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরলেন। বিদ্যুতের সমস্ত মুখ কান্নায় ভিজে গিয়েছে। বিদ্যুৎ যেন তাঁর দিকে চোখ তুলতে পারছেন না, লজ্জায় চোখ নববধূর মত বার বার বন্ধ হয়ে আসছে। আনন্দচন্দ্রের চোখে অকস্মাৎ জল ঝরতে লাগল। তিনি অনুভব করছেন যুক্ত অশ্রুধারায় দুজনে যেন এক হয়ে গেলেন।

আজ নাকি মালতী এসে বিদ্যুতকে অপমান করে গিয়েছে।

আনন্দচন্দ্রের দুই চোখ জ্বলে উঠল—তোমাকে অপমান করে গিয়েছে?

বিদ্যুৎ বললেন—শুধু আমাকে নয়, তোমাকেও।

আজ বিকেলে মালতী এলে বিদ্যুৎ তাকে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা, তুমি হঠাৎ হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে এক সময় চুপ করে যাও কেন?

মালতী হেসে জবাব দিয়েছিল—কেন আবার, এমনই।

বিদ্যুৎ রেগে বলেছিলেন—তুমি মিথ্যে কথা বলছ! তুমি কেন এমন কর জানি।

মালতীর রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তবু সামলে নিয়ে সে বলেছিল—কেন বলুন তো?

বিদ্যুৎ বলেছিলেন—কেন? আমার স্বামী আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন ক'রে তুমি বুঝতে পার উনি এসেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি থেমে যাও। কেন বলতো?

মালতীর রাঙা মুখ এক মুহূর্তে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সে হেসে উঠল খিল খিল করে। বললে—কেন জানেন না বুঝি? কিন্তু জেনে কি করবেন? শুনতে কি ভাল লাগবে? তা শুনুন। আপনার কর্তা যে আমাকে ভালবাসেন।

এবার বিদ্যুতের অবাক হবার পালা। বললেন—কি বললে তুমি? এত বড়—

তাঁর কথা হাত নেড়ে থামিয়ে হেসে মালতী বললে—আপনি তো আর

তাঁর মনের দুঃখ ঘোচাতে পারলেন না! তাই উনি আমার শরণ নিয়েছেন। সেই জন্যেই তো আসি।

বিদ্যুৎ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, বললেন—তুমি যাও, আর এসো না কোন দিন।

মালতী হেসে উঠল খিল খিল করে। ঘাড় নেড়ে বললে—না, আর আসব না। কিন্তু দেখবেন আবার যেন কোন দিন আমাকে সেধে না ডাকতে হয়। আমি না এলে অপনার কর্তা যেন আবার আমার ও দিকে না যান আমার খোঁজে। আপনার কর্তাকে একটু সামলে রাখবেন, সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

কথা বলেই মালতী আর অপেক্ষা না করে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। চলে যেতে যেতে সে যে হাসি হেসে গেল তারই ধ্বনিতে গোটা বাড়ীটা শিউরে শিউরে উঠল বার বার।

সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করতে করতে বিদ্যুৎ আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠে স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে সজোরে বুকে চেপে ধরে আনন্দচন্দ্র চুপ করে বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দুটো স্ফটিক পিণ্ডের মত জ্বলে উঠেছে। বুকের মধ্যে একটা নিদারুণ জ্বালা আর ক্ষোভ তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সেই পুরাতন কালের যে অসম্ভব-প্রয়াসী তাঁর মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল সে এতকাল পরে নিদারুণ আঘাতে আবার ঘুম ভেঙে কুম্ভকর্ণের মত উঠে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুতের কাঁধে একটা সস্নেহ আঘাত করে আনন্দচন্দ্র কেমন অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা চাপা গলায় বললেন—তুমি কিছু ভেব না বিদ্যুৎ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

॥ ছয় ॥

একদিনের মধ্যে আনন্দচন্দ্রের চোখে পৃথিবীর চেহারাটা পালটে গেল যেন।

সকাল বেলা যেমন কাছারীতে গিয়ে বসেন তেমনি বসেছেন তিনি। এক রাত্রিতে তাঁর মুখের চেহারা একেবারে পাল্টে গিয়েছে—এটা যতই সূক্ষ্ম হোক, দৃশ্যটা আশপাশের সকলেরই নজরে পড়েছে। কোমল রেখাহীন মুখে যেন কয়েকটা রেখা এক রাত্রিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; নরম, স্বভাব-স্নিগ্ধ চোখ দুটি তীক্ষ্ণ প্রখর হয়ে জ্বল জ্বল করছে। মাথার পাকা চুলগুলো পর্যন্ত অবিন্যস্ত। অন্যদিন কাছারীতে এসে কর্মচারীদের সঙ্গে কারণে অকারণে হেসে কথা বলেন, একটা-আধটা রহস্যও করেন। আজ সকাল থেকে এসে কারো সঙ্গে একটাও কথা বলেন নি। কেবল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে-ছেন এর ওর মুখের দিকে, একান্ত অকারণেই। যেন প্রত্যেকটি মানুষকে যাচাই করে দেখছেন। সে দৃষ্টিতে সকলেই কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছে। কেউ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে ভরসা পায় নি।

কেবল একবার একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—একবার দেখে আসুন তো খগেন এসেছে কি না! যদি এখানে বাড়ীর বাগানে থাকে তবে তাকে একবার ডেকে আনবেন।

কর্মচারীটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে তখনি ফিরে এসে বলেছিল—আজ্ঞে খগেনবাবু আজ আসেই নি একেবারে।

আনন্দচন্দ্র আর কোন জবাব দেন নি। মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে কিছু দেখতে আরম্ভ করেছেন তখন তিনি।

এই সময় নরনাথবাবু এসে পৌঁছুলেন কাছারীতে। তিনি আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হতেই প্রতিদিনের মত একটু হেসে বললেন—এরই মধ্যে এসে গিয়েছ।

অন্যদিন আনন্দচন্দ্র নরনাথবাবুর চেয়ে বেশী হাসেন, নরনাথবাবু একটা

কথা বলতে বলতে আনন্দচন্দ্র অন্যদিন দশটা কথা বলেন। আজ নরনাথবাবুর স্নেহসিক্ত কথার তিনি উত্তরও দিলেন না।

তাঁর উত্তর না পেয়ে নরনাথবাবু বললেন—তোমার কি হল বাবা আনন্দ? এ কি, তোমার মুখ-চোখের এমন চেহারা কেন? কাল রাত্রিতে কি তোমার ঘুম হয়নি?

আনন্দচন্দ্র অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন—আপনাদের মত প্রবীণ শুভার্থী থাকতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে কেন? ঘুম আমার ঠিকই হয়েছিল।

কথা বলেই আনন্দচন্দ্র নরনাথকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না, দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। সারাদিন তিনি কারো সঙ্গে কথা কইলেন না, দেখা করলেন না পর্যন্ত। বিকেল বেলা যেমন অন্যদিন বাগানে বসেন তেমনি আরাম-চেয়ারে বসে আপন মনে তামাক খেতে লাগলেন।

আজ বাগানে খগেন নেই। মালীরা নিঃশব্দে গাছে জল দিচ্ছে। তারাও কেমন করে জেনে গিয়েছে আজ কোন কারণে মালিকের মন ভাল নেই।

গ্রীষ্মের দিনের সূর্য এইমাত্র অস্ত গেল। জল-দেওয়া গাছের গোড়া থেকে আতপ্ত, স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসছে। আকাশ এখনও রাঙা মেঘে রঞ্জিত কাপালিকের রক্তচন্দনলিপ্ত ললাটের মত। আনন্দচন্দ্র দেখলেন খগেন অত্যন্ত দ্রুত পায়ে তাঁর দিকেই আসছে। তিনি গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে আরাম-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

খগেন তাঁর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। আনন্দচন্দ্র সারা দিন বোধ হয় এই সাক্ষাতের কামনাতেই অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, মুখের সমস্ত রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, উজ্জ্বল চোখ দুটোতে অস্ত-আকাশের রক্তাভার ছোঁয়াচ লাগল যেন। তিনি চাপা ভয়াল গলায় দাঁতে দাঁত টিপে অস্পষ্ট ভাবে বললেন—এই যে এস। তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।

খগেনের টানা টানা দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, নাকের পেটি দুটো গাঢ় নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে। চাপা উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে যেন। সে আনন্দচন্দ্রের ভয়াল ক্রোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললে—আমি আর

আসতাম না এখানে। তবে একবার এলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে!

চাপা ব্যঙ্গ হাসিতে আনন্দচন্দ্রের সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—বল বল শুনি। তোমার কথার জবাব দেবার জন্যেই তো এখানে বসে আছি।

খগেন বুঝতে পারলে ক্রোধের যে প্রান্তসীমায় পৌঁছলে মানুষ হাসে সেইখানে পৌঁছেছেন আনন্দচন্দ্র! তবু সে ভ্রূক্ষেপ করলে না, বললে—আপনি কি মনে করেন ধন-দৌলত থাকলেই মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে বড় হয়ে যায়।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন, প্রায়ান্ধকারে তাঁর সাজানো দাঁতগুলি শাণিত অস্ত্রের মত ঝকঝক করে উঠল। তিনি নিম্ন কণ্ঠে একটু হেসে বললেন—সেটা তুমিই বল। আমি আর কি বলব! আমার তো অনেকই ধন-দৌলত আছে।

খগেন বললে—যাক। আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রীকে অপমান করে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেছেন শুনলাম। কেন এ কাজটা করলেন বলবেন আমাকে?

আবার হাসলেন আনন্দচন্দ্র, বললেন—তার জন্যে কি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি? না তোমার কাছে মাপ চাইতে হবে?

জোর গলায় ঝোঁক দিয়ে খগেন বললে—দুটোই করা উচিত। তবে আপনি বড় লোক আমি গরীব এই যা!

ব্যাপারটাকে যেন অবহেলা করে উড়িয়ে দেবার জন্যে সহজ হাসি হেসে আনন্দচন্দ্র বললেন—দুটোর কোনটাই তো পারব না। তোমার স্ত্রী আমার স্ত্রীকে আর আমাকে যা বলে গিয়েছেন তার কৈফিয়ৎটা আমার পাওনা আছে। সেটা আমি চাইব না হে তোমার কাছে। কেবল একটা কথা বলবার জন্যে এইখানে বসে আছি। তুমি আর কাল থেকে এসো না। তোমাকে দরকার নেই আমার।

সমান ঝাঁঝের সঙ্গে খগেন জবাব দিল—আমিও আর কাল থেকে আসব না এই কথাটাও বলতে এসেছিলাম। তা আপনিই আগে বলে দিয়ে ভাল করলেন। যাবার আগে কেবল একটা কথা বলে যাই। আপনি বাগানগুলো কেটে ফেলবেন। আপনাদের মত যারা তাদের কয়লার কালিই ভাল। ফুলের গাছে তাদের দরকার কি।

বলে সে পিছন ফিরে অন্ধকারের মধ্যেই চঞ্চল পদক্ষেপে মিলিয়ে গেল।

আনন্দচন্দ্রের মোটা মোটা হাত দুটো ততক্ষণে মুঠো হয়ে গিয়েছে। তিনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ সামান্য মানুষটার উপরে। অকস্মাৎ চীৎকার করে বললেন—শোন, শুনে যাও—তোমার ঐ বকুল-মালতীতে প্রেমের যে জয়ধ্বজা উড়িয়েছ তাকে আমি মাটিতে লুটিয়ে দেব, তবে আমার নাম আনন্দচন্দ্র।

তিনি বাড়ীর ভিতব ফিরে এলেন। তাঁর পায়ের শব্দে গোটা বাড়ীটা যেন শব্দিত হয়ে উঠল। আগে থেকেই সমস্ত বাড়ীটা নিদারুণ ভয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছে। আনন্দচন্দ্রের এ মূর্তি এ বাড়ীর কেউ এর আগে দেখে নি। তিনি বিদ্যুতের কাছে নিজে থেকেই গিয়ে বললেন—কই বিদ্যুৎ খেতে দাও দেখি। রাগ করে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুৎ স্বামীর অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন। তিনি খাবার তৈরী করেই বসেছিলেন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

এতকাল ধরে আনন্দচন্দ্র এই নৈকট্যই প্রত্যাশা করেছিলেন বিদ্যুতের কাছ থেকে। প্রত্যাশা করে করে, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে বিদ্যুতের কাছ থেকে কিছু আশা করা ছেড়েই দিয়েছিলেন। আজ বিদ্যুৎকে দেখে মনে হচ্ছে এতকাল আকর্ষণ করেও যে বিদ্যুৎ তাঁর কাছে আসেনি, তাঁকে বোঝেনি, আজ নিজের ইচ্ছাতেই সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছে।

তিনি খেতে খেতে একটা চাকরকে বললেন—ওরে, রসিককে একবার ডাক্ তো।

রসিকবাবু আসতেই আনন্দচন্দ্র বললেন—এই যে রসিক, এসেছ? এইবার তোমার সাহায্য চাই আমার।

রসিকবাবুর মুখে কৃতার্থের হাসি ফুটে উঠল। তিনি হাত কচলাতে লাগলেন।

পাশের ঘরে গিয়ে আনন্দচন্দ্র রসিকবাবুকে বলিলেন—রসিক সব শুনেছ নিশ্চয়ই। আমি আজকেই খগেনকে জবাব দিয়েছি। এতেও ওর শিক্ষা হবে না। ওকে কেমন করে শায়েস্তা করা যায় বল তো?

রসিকবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—আপনার

কাছে খগেনের বোধ হয় দু'খানা খত আছে। সেই খত দু'খানায় নালিশ করে দেন।

আনন্দচন্দ্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—তুমি, তুমি কি করে জানলে? এতো কেউ জানে না! তোমাকে খগেন বলেছে বুঝি?

রসিকবাবু সে প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিয়ে বিনীতভাবে বললেন—হুজুর, জমিদারী সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা-পাটোয়ারদের নিয়মই এই। সব খবর না জানলে এ কাজ করা যায় না।

আনন্দচন্দ্র বিরক্ত হলেন না, বললেন—তুমি ধুরন্ধর লোক তা আমি আগে থেকেই জানি। তবে তুমি যে কি ব্যাক্তি আজ বুঝলাম ভাল করে! তুমি পারবে! তা হলে খত দুটোতে নালিশ করে দাও।

রসিকবাবুর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—ঠিক আছে হুজুর, কেমন করে বেয়াড়া বজ্জাৎ লোককে ঠাণ্ডা করতে হয় আপনার কৃপায় তা ভাল করেই জানি।

আনন্দচন্দ্র হাসতে লাগলেন, বললেন——এই খগেনকে ঠাণ্ডা কর দেখি। তা হলেই আমার কৃপা কতখানি তা দেখতে পাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ঋণের দায়ে খগেনের নামে আদালতে নালিশের সংবাদটা সমস্ত গ্রামেই ছড়িয়ে পড়ল। লোকে আশ্চর্য হয়ে গেল সংবাদ শুনে। গ্রামের লোকে লক্ষ্য করেছে আনন্দচন্দ্রের খগেনের প্রতি অহেতুক আসক্তি। দেখে অবার আজ খগেনের উপর তাঁর অহেতুক বিরাগেও লোকে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং আড়ালে আনন্দচন্দ্রকে ছি ছি করতে লাগল। আহা, অমন শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ; সংসারের ভালতে নাই মন্দতে নাই, আপনার মনে ফুল-গাছ-পাতা নিয়ে থাকে, দেখা হলে মানুষের সঙ্গে হেসে ছাড়া কোনদিন যে কথা বলে না, সেই মানুষের উপর নাকি এমনি অত্যাচার করে। টাকা হলে কি এমনি অত্যাচারই করে মানুষ!

বাগানে আনন্দচন্দ্র বসে ছিলেন বিকেলবেলা। সুধাকান্ত এলেন। সুধাকান্ত আজকাল কমই আসেন। আনন্দচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে থাকেন মাঝে মাঝে থাকেন না। তাই সুধাকান্তের নিয়মিত আসাও হয় না। দু জনেরই যেন দু জনসম্পর্কে ঔৎসুক্য কমে গিয়েছে। আনন্দচন্দ্র সুধাকান্তকে

দেখে সহজভাবে সম্বোধন করলেন—এস। কেমন আছ? ছেলেরা ভাল আছে।

—হ্যাঁ সব ভাল আছে। তোমার কাছে একবার এলাম। বলে সুধাকান্ত বসলেন।

আনন্দচন্দ্র হেসে বললেন—একবার কেন, হাজারবার এস। তারপর কি খবর বল। আনন্দচন্দ্র সুধাকান্তের আসার কারণটা সঠিক বুঝতে পেরেছেন। তবু তাঁর মুখ থেকেই কথাটা শুনবার জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুধাকান্ত কোন অছিলা না করেই বললেন—তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি ভাই।

আনন্দচন্দ্র এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—বল।

—ঐ সামান্য একটা নিরীহ মানুষকে বধ করবার জন্যে কি তোমার মত লোকের অস্ত্র ধারণ করা উচিত? তুমি ধনে শক্তিতে ইন্দ্রতুল্য মানুষ। তোমার কি ওই সামান্য মানুষটার সঙ্গে লড়াই করা সাজে! তার ওপর কি জান, মানুষটা বড় ভাল, বড সৎ, বড় নিরীহ নিরহঙ্কার মানুষ!

—নিরহঙ্কার! প্রতিবাদটা যেন আনন্দচন্দ্রের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তলদেশ থেকে বেরিয়ে এল; বললেন—তুমি ওকে নিরহঙ্কার বল? ওর অহঙ্কার আমার ওপর দিয়ে যায় হে! ও আর ওর স্ত্রী আমাকে বিদ্যুৎকে কি অপমান করে গিয়েছে জান?

—জানি না। জানলাম। কিন্তু তবু বলব তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার সঙ্গে তো আর পাঁচজন মানুষের তুলনা চলে না ভাই। তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত মানুষ। তোমার জীবনের রীতি-পদ্ধতি তো সাধারণ মানুষের মত হবার কথা নয়। তোমার ওপর দিয়ে যাবার শক্তি এখানে কারো নেই তোমার মাথা এখানে সব মানুষের ওপরে। তুমি ওকে ক্ষমা কর, সেটা তোমারই উপযুক্ত হবে।

আনন্দচন্দ্র হাসলেন। বললেন—তুমি বরাবরই ভাল কথা বলে এসেছ ভাই সুধাকান্ত। সে বরাবরই তোমার উপযুক্ত হয়েছে। আর আমি তোমার কথা মত কখনও চলতে পেরেছি, কখনও পারি নি—সেও আমারই

উপযুক্ত হয়েছে। এবারেও তোমার অনুরোধ রাখতে পারব না—সে জন্যে তুমি আমাকে মাপ করো ভাই।

আনন্দচন্দ্রের কথার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গে সুধাকান্তের মুখখানা একবার লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই একটু হেসে সুধাকান্ত বললেন—মাপ করলাম বৈ কি! তুমি অত্যন্ত মর্মজ্বালা ভোগ করছ তা তোমার কথা থেকে বুঝতে পারছি। সেই কারণেই আমার কথা শুনবার মত তোমার মনের অবস্থা নেই। তবু বলে যাই—এটা থেকে নিবৃত্ত হলেই তুমি ভাল করতে।

আনন্দচন্দ্র সুধাকান্তের কথার জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন। সুধাকান্ত বললেন—আমি তা হলে আসি।

আনন্দচন্দ্র বললেন—কি হল? রাগ করে এরই মধ্যে চললে?

সুধাকান্ত এবার অকপট ভাবে হেসে বললেন—না রাগ করি নি। দুঃখ খানিকটা হয়েছে। সন্ধ্যে করার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যেই উঠলাম।

সুধাকান্ত চলে গেলেন।

তার পরের দিন।

বিকেলবেলা কাছারী যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন আনন্দচন্দ্র এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে নরনাথবাবুর ছেলে লোকনাথবাবু এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

আনন্দচন্দ্র নীচে দেখা করবার জন্যে উপর থেকে নামতে নামতেই ভাবলেন—নরনাথবাবুকে সেদিন লোকনাথের চাকরীর কথা বলেছিলেন এবং একবার সেজন্যে তিনি লোকনাথকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। তাঁর মনে হল সেই জন্যেই লোকনাথ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু অস্ফুট হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল। সেই শূন্যলোকচারী, আকাশবিহারী লোকনাথ বাধ্য হয়েছে মাটিতে নামতে। সে শুধু মাটিতেই নামেনি সর্বাঙ্গ তার ধূলিধূসর হয়ে উঠছে দিনে দিনে। মনের সমস্ত আনন্দ তার কোথায় গিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে বেচারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই আনন্দচন্দ্র বললেন—এই যে লোকনাথবাবু, কি খবর?

লোকনাথ কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল।

আনন্দচন্দ্র বসলেন। বললেন—বস বস। উঠে দাঁড়ালে কেন?

আষাঢ় মাসের মেঘের মত মুখ ভার করে লোকনাথ বললে—না আর বসব না, আপনাকে ক'টা কথা বলেই চলে যাব।

সহজ ভাবে হেসে আনন্দচন্দ্র বললেন—তা না হয় যাবে। তবে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ বস।

লোকনাথ বসল আনন্দচন্দ্রের সামনেই। কিছুক্ষণ তির্যক দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বললে—আপনি, আপনার মত মানুষ খগেনদার এই সর্বনাশ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন শেষ পর্যন্ত!

আনন্দচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি তার কথার কোন জবাব দিলেন না।

লোকনাথ বললে—জানেন, আপনার মত মানুষ খগেনদার মত নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করছেন এটা আমি কিছুতেই প্রথমটায় বিশ্বাস করতেই পারিনি। তারপর আদালতের সমন দেখালে যখন তখন বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করলাম।

আনন্দচন্দ্র গম্ভীর মুখে নিঃশ্বাস রোধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে তিনি আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসটা ছাড়লেন।

এবার আনন্দচন্দ্রকে প্রায় মিনতি করলে লোকনাথ—আপনি, আপনার মত মানুষ কেন এমন অকাজ করলেন? আপনি ওর নামে যে মামলাটা করেছেন সেটা তুলে নিন।

আনন্দচন্দ্র শান্ত কঠিন কণ্ঠে শুধু বললেন—না।

সঙ্গে সঙ্গে আপনার আসন পরিত্যাগ করে লোকনাথ যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। আসন্ন-বর্ষণ থমথমে মেঘের মত তার মুখের মধ্যে দুই চোখে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—মানে?

আনন্দচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে বজ্রগর্ভ মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল, তিনি বললেন— বেশী মানে জিজ্ঞাসা করো না। তোমার খগেনদা আমার মাথার ওপর পা দিয়ে গিয়েছে, তার পা দুখানা ভেঙে না দিলে আমার শান্তি নেই।

লোকনাথ সক্ষোভে বলল—আপনাকে আজ আমার চেনা শেষ হল। আমার ভুল হয়েছিল আপনাকে চিনতে। আপনার অগাধ ঐশ্বর্য দেখে ভেবেছিলাম আপনি ভাগ্যবান। সারি সারি আপনার কীর্তি দেখে আপনাকে ভেবেছিলাম আপনি কীর্তিমান। সব মিলিয়ে আপনাকে দেবতা মনে হয়েছিল। কিন্তু দেখছি আপনি আর পাঁচটা মানুষের মতই নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ মানুষ। যার হৃদয় এমন দম্ভে ভরা, যে এমন প্রতিহিংসা-পরায়ণ সে তো রিক্ত, তার আবার ঐশ্বর্য কোথায়? আর তার আবার কীর্তি কিসের?

আনন্দচন্দ্র রূঢ় কণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—থাম হে তুমি থাম। আর বেশী মাতব্বরি করো না।

—যতটা পারেন চেষ্টা করুন খগেনদার ক্ষতি করতে। আমি ওকে বাঁচাব।

আনন্দচন্দ্র অট্টহাস্য করে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন—ভাল হে ভাল, আমি দেখব তুমি কি করে ওকে বাঁচাও। শুধু ওকে নয়, নিজেকে বাঁচাবার জন্যেও তৈরী হয়ে থেক।

লোকনাথ বললে—থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। বলে সে বেরিয়ে চলে গেল।

সে বেরিয়ে গেলে আনন্দচন্দ্র আপন মনেই যেন বললেন—ইডিয়ট কোথাকার!

এরা ভাবে কি? তিনি এদের সঙ্গে, এই সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে সহজভাবে তাদেরই একজন হয়ে মিশেছিলেন বলেই না তারা আজ তাঁকে তাঁর বৈষয়িক বিষয়ে, তাঁর পারিবারিক সম্মান-সম্ভ্রমের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে আসে? অথচ কিসের হৃদ্যতা তাঁর এই গ্রামের যারা তাঁকে পরামর্শ দিতে আসে তাদের সঙ্গে? একদা তিনি এই গ্রামে তাদের সঙ্গে একসময় বাস করেছিলেন—এর বেশী কিছু নয়! এই সামান্য গ্রাম্য মানুষগুলি তাঁকে তাদেরই মত একজন মনে করে বলবার সাহস করে! কি অসীম স্পর্ধা এদের! কি অসীম ঔদ্ধত্য! তিনি যে তাদেরই মত একজন নন, তাঁকে যে আর পাঁচ জনের মত কথা বলা যায় না সে কথা ওদের বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। এইবার ওদের সব বুঝিয়ে দেবেন আনন্দচন্দ্র, বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

আনন্দচন্দ্র মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। অধীর ক্রোধের তাড়নায় নিজেকেই তাঁর নিজের ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাছারীতে আপনার ঘরে বসে ভাবতে ভাবতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে দরজার কাছে বেয়ারা বসেছিল, তাকে ডেকে বললেন—ওরে রসিক বাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

বেয়ারাটা ফিরে এসে কাঁচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, রসিক বাবুকে দেখতে পেলাম না।

আনন্দচন্দ্র একমুহূর্তে বারুদের মত জ্বলে উটলেন—দেখতে পেলে না মানে? যাও যেখান থেকে পাও তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। উল্লুক কোথাকার! দেখতে পেলাম না। যাও।

বেয়ারাটা পালিয়ে বাঁচল।

এমন সময় দরজার কাছে ঠুক ঠুক করে লাঠির শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল জুতোর লঘু শব্দ। পর্দার ওপাশ থেকে একবার গলা ঝাড়ার শব্দও উঠল।

আনন্দচন্দ্র বুঝতে পারলেন নরনাথবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তবু তিনি কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। থাকুন, নরনাথবাবু কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে থাকুন। একটু বুঝুন যে ইচ্ছামাত্র আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা যায় না।

আর কিছুক্ষণ গেল। এইবার বাইরে থেকে নরনাথবাবু বললেন—আনন্দ, বাবা, আছ না কি? একবার যাব?

বলতে বলতে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকলেন। আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বললেন—আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। আপনি বরং পরে দেখা করবেন আমার সঙ্গে।

নরনাথবাবু অত্যন্ত সবিনয়ে মিষ্টি করে বললেন—আমার বেশী সময় লাগবে না বাবা। অল্প দু পাঁচটা কথা বলে আমি চলে যাব। সামান্য দু দণ্ড লাগবে।

বিরস মুখে আনন্দচন্দ্র বললেন—বলুন, যা বলবেন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমার অন্য কাজ আছে।

অত্যন্ত আনন্দিত ভাবে নরনাথবাবু বললেন—ঠিক আছে বাবা, দেরী

লাগবে না আমার। আমি বলছিলাম—বলে কথাটা পালটে নিয়ে বললেন—কাল তোমার সঙ্গে লোকনাথ দেখা করেছিল? তোমার সঙ্গে দেখা করে করে তোমাকে যা তা বলে অপমান করে গিয়েছে শুনলাম? এ সব তাহলে সত্যি? সে খগেনের হয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়েছে?

বিচিত্র দৃষ্টিতে নরনাথবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—সবই তো জানেন দেখছি, তবে আবার প্রশ্ন করে কি জানতে চাচ্ছেন?

নরনাথবাবু হাসলেন, বললেন—বুঝতে পারছি কথা যা শুনেছি সবই সত্য; আরও বুঝতে পারছি তুমি এই সব কারণে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আছ। লোকনাথ আমার ছেলে, একমাত্র সন্তান হলে কি হবে? তাকে আমি ভাল করে জানি। সে অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তার ঔদ্ধত্যের পরিমাণ যে এতখানি হতে পারে তা কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। তোমার মত মানুষকে অপমান করার স্পর্দ্ধা উন্মাদ না হলে কি হয়? আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি সে পাগল হয়ে গিয়েছে। সে খগেনকে আর মালতীকে এত ভালবাসে বলেই এমন ব্যবহার করে গিয়েছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু মনে করো না বাবা আনন্দ। আমি তার বাপ, আমি তার হয়ে তোমার কাছে মাপ চাইছি।

আনন্দচন্দ্রের মনে হল যেন নরনাথবাবু ছেলের অপরাধ স্বীকার করেও কৌশলে তার কাজের সাফাই গাইছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—এ সমস্ত কথা কেন আমাকে বলছেন? আপনি নিজেই ভাল করে জানেন—লোকনাথের আমাকে অপমান করা যতখানি অপরাধ, 'আপনাকে ক্ষমা করলাম' এ কথা আমার পক্ষে আপনাকে বলাও ঠিক ততখানি দোষের। আর তা ছাড়া একজন অপরাধ করেছে, আর একজন তার হয়ে মার্জনা চাইলে কি অন্যজনকে মার্জনা করা যায়? যায় না।

নরনাথবাবু একটু কঠিন হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—শোন আনন্দ, তুমি এ অঞ্চলের সব চেয়ে মানী ব্যক্তি। ধনে মানে, প্রতিষ্ঠায়, কীর্তিতে তোমার সমকক্ষ কেউ নাই। তুমি এ অঞ্চলে হিমাচল-তুল্য ব্যক্তি। তোমার কাছে এখানকার মানুষ বরাবর উদার ব্যবহার পেয়ে এসেছে, তাই আজ তোমার কাছ থেকে যদি কোন নিরীহ মানুষের উপর অকারণ নির্যাতন আসে তা হলে লোকের প্রাণে তো তা দ্বিগুণ হয়ে

লাগবেই। আর যার থেকেই হোক তোমার কাছ থেকে কেউ এ প্রত্যাশা করে নি।

আনন্দচন্দ্রের মুখ সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—নাকি? শুনে বিশেষ বাধিত হলাম। কিন্তু দুটো কথাতে আমার আপত্তি আছে। আপনার খগেনবাবু নিরীহও নন, আর আমার অত্যাচার-নির্যাতন যাই বলুন তা অকারণও নয়। আপনারা অবশ্য যা খুশী মনে করতে পারেন। আমি তা মনে করি না।

নরনাথবাবু একবার গলা ঝাড়া দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বললেন—যাক তর্কাতর্কি করে ফল হবে না বুঝতে পারছি। তুমি যা করছ তা করতে তুমি বদ্ধপরিকর! আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছি বলে যাই।

আগের মতই ব্যঙ্গ হাসি হেসে আনন্দচন্দ্র বললেন—বলুন শুনি। গত দু'দিনে তো অনেকের অনেক কথাই শুনলাম। বলুন।

নরনাথবাবু একটু ব্যথিত হাসি হেসে বললেন—আনন্দ, আজ তুমি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে আছ। তাই কি করতে চলেছ বুঝতে পারছ না। তুমি খগেনের বিরুদ্ধে এই মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ করলে। সে অত্যন্ত নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক। তা ছাড়া সে আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ। সে আর তার স্ত্রী মালতী আমার কাছে লোকনাথের চেয়ে কম নয়। আজ তার উপর যখন তোমার নির্যাতনের হাত উঠেছে তখন আর তোমার এখানে কি করে কাজ করি? সত্য বটে যে তোমার এখানে কাজ করার জন্যেই শেষ বয়সে নতুন করে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, নতুন করে আবার জীবনের আস্বাদ পেয়েছি। তাই ভেবেছিলাম শেষ কদিন তোমার সঙ্গে থেকেই নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজব। কিন্তু দেখছি ভগবানের তা অভিপ্রায় নয়। শেষ বয়সটায় আবার নতুন করে দুঃখ পাব বুঝতে পারছি। তা আর কি করব। ভগবানের নীতির, মানুষের স্নেহের অমর্যাদা এই বুড়ো বয়সে আর করতে পারব না। বলে তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—আমি আর কাল থেকে আসব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

আনন্দচন্দ্রের মুখের ব্যঙ্গ হাসিটা তখন মিলিয়ে গিয়েছে। তাঁর মুখ

তখন গাম্ভীর্যে থমথম করছে। নরনাথবাবু কথা শেষ করলেন কিন্তু তিনি আর কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে থাকলেন।

এই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকলেন রসিকবাবু। তিনি উৎসাহিতভাবে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—আমাকে ডাকছিলেন আপনি? নরনাথ-বাবুকে সামনে দেখেই তিনি খানিকটা থমকে গেলেন।

আনন্দচন্দ্র তাঁকে গম্ভীরভাবে বললেন—বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। আর দেখ নরনাথবাবু কাল থেকে আসবেন না। কাগজপত্র সব বুঝে নিও ওঁর কাছ থেকে।

নরনাথবাবু বললেন—আপনি আসুন রসিকবাবু। আপনাকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে যাই। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্র যেন তাঁর যাওয়াটা লক্ষ্যই করলেন না। রসিকবাবুকে বললেন—ওহে রসিক, এই লোকগুলোকে একেবারে শায়েস্তা করে দিতে হবে, বুঝলে?

রসিকবাবু কোন উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত কৃতার্থ হৃষ্ট হাসি হাসলেন।

আনন্দচন্দ্র বললেন—তুমি শুনে রাখ রসিক, এ গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ, যারা ঘাড় সোজা করে চলবার চেষ্টা করে তাদের ঘাড়গুলো দুমকে মুচড়ে নামিয়ে দাও, বুঝলে? কেবল একজনের গায়ে হাত দেবে না। সে সুধাকান্ত। সে ভাল মানুষ, তার ওপর তার কাছে আমার ঋণ অনেক। বুঝলে?

রসিকবাবু আবার হৃষ্ট মুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন! তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে আনন্দচন্দ্রের মনে হল রসিকবাবু এতকাল ধরে যেন এরই কামনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

তারপর ন' দশটা বছর।

আনন্দচন্দ্রের রোষবহ্নিতে গোটা গ্রামটা দিনে দিনে পুড়ে গেল।

আরম্ভ হয়েছিল খগেনের সঙ্গে কলহ সেই দুখানা খত নিয়ে। মামলা করে আনন্দচন্দ্র ভেবেছিলেন হয় টাকাটা খগেন দিতে পারবে না, তাকে টাকা দেবার জন্যে যে ক' বিঘে জমি আছে তাই বিক্রী করতে হবে; না হয় টাকাটা দিতে না পেরে খগেন এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তাই আগ্রহের সঙ্গে দুটোর একটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে দুটোর কোন কোনটাই ঘটল না। নির্দিষ্ট দিনে আদালতে দেনার টাকা খগেন যথাযথ দাখিল করেছে সুদ সমেত, অথচ খগেনকে তার জমি বিক্রী করতে হয় নি এই সংবাদ পৌঁছুল তাঁর কাছে। খবর শুনে ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রসিকবাবুকে ডেকে প্রচণ্ড তিরস্কারও করলেন। রসিকবাবু মালিকের তিরস্কার শুনলেন হাসি মুখে মাথা নীচু করে। শেষে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—হুজুর, একজনকে জব্দ করতে প্রথমবারই পারি নাই তাতে কি হয়েছে! আপনি দেখুন, আমাকে খানিকটা সময় দিন সব ঠাণ্ডা করে দেব দেখবেন।

আনন্দচন্দ্রের রাগ তখনও শান্ত হয় নি। বললেন—কিন্তু, ঐ যে ভিখিরী খগেন, ও টাকা পেলে কোথা থেকে খবর রেখেছে?

রসিকবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আনন্দচন্দ্র বললেন—কোথা থেকে পেলে?

—সে অনেক কথা। তবে শেষ পর্যন্ত নরনাথবাবুই দিয়েছেন সমস্ত টাকা। তারপর টাকা পাওয়ার বিস্তারিত সংবাদ রসিকবাবু দিলেন মালিককে। খগেনের সঙ্গে তাঁর এই মামলাটা গ্রামের লোকে একটা নিরীহ লোকের উপর নির্যাতন বলেই ধরে নিয়েছে। এখানকার মানুষের হৃদয়ের সহজ সহানুভূতির তারে ঘা লেগেছে এই ঘটনায়। প্রথম না কি খবর পেয়ে কলকাতা থেকে দুলাল একশো টাকা পাঠায় নিজের বাপের কাছে খামে বন্ধ করে।

বিস্মিত আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—দুলাল? দুলাল টাকা পাবে কোথায়? তা হলে আমার ভয়ে সুধাকান্তই দুলালের নামে দিয়েছে টাকাটা।

—আজ্ঞে না। সে আমি ভাল করে খবর নিয়েছি। দুলাল আপনার বৃত্তির টাকা পাঠিয়েছিল। সুধাকান্তবাবুও কিছু জানতেন না। দুলাল লোকমারফৎ খগেনবাবুর নামে একখানা বন্ধ চিঠির সঙ্গে একখানা চিঠি লেখে—এই চিঠিখানা আপনি দয়া করে নিজে খগেনবাবুকে দিয়ে দেবেন। তিনি দিয়েও আসেন। তাঁরই সামনে চিঠিখানা খুলে চিঠির সঙ্গে একশো টাকা পায়। দুলাল তো আবার বিদ্বান লোক, সে না কি অনেক ভাল ভাল কথা লিখে জানিয়েছে খগেনকে—আপনার উপরে ধনের দম্ভে মোহমত্ত মানুষ যে অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে যেমন করিয়া হোক বন্ধ করিয়া আপনাকে অত্যাচার হইতে বাঁচিতে হইবে এবং দম্ভীর দম্ভ ও মোহ যে

একান্ত শক্তিহীন তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই সব ভাল ভাল কথা লিখেছে।

তাঁকে আনন্দচন্দ্র থামিয়ে দিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মনে হল রসিক তাঁকে প্রকারান্তরে বিরক্ত করবার জন্যেই এত উৎসাহ সহকারে সব জানাচ্ছে। তিনি ঈষৎ বক্রভাবে বললেন—তুমি কি চিঠিখানা নকল করে নিয়ে মুখস্ত করেছ না কি?

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আনন্দচন্দ্রের সম্মুখে ধরে বললেন—এই যে হুজুর চিঠিখানা পড়ুন।

অবাক হয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—তুমি পেলে কি করে?

রসিকবাবু জবাবে রহস্যময় বিনীত হাসি হাসলেন কেবল। বললেন—পেলাম। তারপর শুনুন। দুলালের চিঠি পড়ে সবারই বুকের প্রেম উথলে উঠল। নরনাথবাবু দুলালের টাকাটা খগেনের কাছে রেখে নিজেই সব টাকাটা দিয়েছেন।

আনন্দচন্দ্র গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর আরম্ভ হল একের পর এক মামলা, একের পর এক নানা কৌশলে নির্যাতন। ধীরে ধীরে তিনি খগেনকে সর্বস্বান্ত করে এনেছেন। নরনাথবাবুকেও সপরিবারে প্রায় শেষ করে এনেছেন। এই ক' বছরে এইই কেবল তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে আছে। ওদের সঙ্গে বিবাদ করবার জন্যে তিনি ছুতো খুঁজে বেড়িয়েছেন। যেখানে তার সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই তা পাবার জন্যে যত টাকা ব্যয় করতে হয় তাতে কুণ্ঠা করেন নি। খগেন আপনার জমি বন্ধক দিয়েছিল গোপনে অন্য লোকের কাছে। রসিকবাবুর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে লোভ ও ভয় দেখিয়ে সে বন্ধকী খত তিনি হস্তগত করে জমি নীলাম করিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। নরনাথবাবুকে জব্দ করবার জন্যে যেখানে যে মহালে নরনাথবাবুর সামান্যও অংশ আছে তা হস্তগত করেছেন বহুগুণ মূল্যে।

তারপর আর আপনার অংশের খাজনা দেন নি। এক অংশের অনাদায়ে সমস্ত সম্পত্তিটা নীলাম হয়েছে, তিনি নীলামে কিনেছেন। যেখানে সম্পত্তি রক্ষার জন্য নরনাথবাবু সমস্ত টাকা দিয়েছেন, সেখানে তিনি আর আনন্দচন্দ্রের কাছ থেকে সে টাকা ফেরৎ পান নি। ফেরৎ পান নি ঠিক নয়,

নিজের ঘর থেকে আনন্দচন্দ্রের অংশের টাকা দিয়ে পরে মামলা করে সে টাকা আদায় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দচন্দ্র আর তাঁর চর রসিকবাবু সদাসর্বদা সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছেন—কোথায়, কেমন করে, নূতন কোন্ পথে মানুষগুলিকে বিব্রত করা যায়। নূতন কোন সন্ধান পাবা মাত্র তাঁরা সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে লক্ষ্য বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনি ভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে খগেনের বসতবাড়ী আর তার পাশে খানিকটা জমি—যে জমির উপর সেই বকুল আর মালতী গাছটা আছে—সেইটুকু ছাড়া তার সব সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। অবশ্য খগেনকে গ্রাস করা তাঁর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় নি। কষ্ট হয়েছে নরনাথবাবুকে সর্বস্বান্ত করতে। নরনাথবাবুর গ্রামের বসতবাড়ী আর গ্রামের জমিদারীর অংশ ছাড়া আর সবটাই তিনি ধীরে ধীরে গ্রাস করেছেন। এইবার দুজনের যেটুকু বাকী আছে সেটুকু গ্রাস করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি।

অবশেষে গ্রামের অর্ধেকের উপর যাঁর অংশ সেই হরসুন্দরবাবুর কাছে তিনি রসিকবাবুকে পাঠালেন। রসিকবাবু ফিরে আসা পর্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। রসিকবাবু জুড়ি থেকে নামবামাত্র তাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আনন্দচন্দ্র—কি রসিক, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে ?

এক মুখ হাসি হেসে রসিকবাবু বললেন—আজ্ঞে হুজুর, আপনার আশীর্বাদে সব হয়ে গিয়েছে। যা আশা করি নাই তাও হয়েছে। তবে একটা কথা আছে হুজুর। ঘরে চলুন বলি।

আনন্দচন্দ্র যথেষ্ট জমিদারী কিনেছেন। কিন্তু তাঁর জমিদারী মর্যাদা সম্পূর্ণ হয়নি। এই গ্রামে তাঁর সামান্য এক পয়সাও জমিদারী অংশ নেই। তাই রসিকবাবু যখন যান তখন রসিকবাবুকে বলে দিয়েছিলেন যে কোন মূল্যে এই সম্পত্তির সামান্য এক পয়সা অংশও সংগ্রহ করতে।

ঘরের ভিতর গিয়ে রসিকবাবু একটু আপাত-সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—একটা বেফাঁস কাজ করছি হুজুর। ওদিকে তো নানা রকম করে বুঝিয়ে, নানান লোভ দেখিয়ে, খানিকটা ভয় দেখিয়ে, কাজ হাসিল করলাম। কিন্তু বুড়ো হরসুন্দরবাবু ঝানু লোক। তিনি বললেন—তোমার কথা তো ঠিক বুঝলাম হে! আমার অসুবিধা হবে, আমার এটা হবে, ওটা হবে,

আমি এত দাম পাবো, এ সব কথা আমাকে বলছ কেন? তোমাদের কি সুবিধাটা হবে খুলে বল দেখি। তখন বুঝলেন, খুলে সব বলতে হল। ভদ্রলোক বললেন, বুঝলাম, তোমার কথা বুঝলাম, তোমরা দুজনে অবাধ্য লোককে শাসন করতে পারছ না; এই জমিদারী পেলে সেটা পারবে, কেমন? কিন্তু বাপু আমার টাকারও অভাব নাই, সম্পত্তি বিক্রী করবার বাসনাও নাই। অথচ তোমাদের যে বিশেষ প্রয়োজন তাও বুঝতে পারছি। তা একটা কাজ কর না কেন! আমার নাতনীকে তোমরা নাও। তোমার মনিবের ছেলেটির সঙ্গে আমার নাতনীর বিয়ে দাও না কেন? তোমার মনিব মস্ত লোক, তা আমরাও তো সামান্য লোক নই হে। তা হুজুর ভদ্রলোকের কথায় মত দিয়েও এসেছি। এখন আপনি যদি মত দেন।

আনন্দচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মণি বড় হয়েছে, নানান জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধও এসে তাঁকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করছে। তিনি ছেলের বিয়ে দিই দিই করছেন। তা হরসুন্দরবাবুরাও বনেদী জমিদার। চার পাঁচ পুরুষের নাম। কন্যাটির খবরও তিনি জানেন, মেয়েটি সুন্দরী। এ ভালই হবে। তিনি মনস্থির করে ফেললেন। এ গ্রামের জমিদারী তাঁর চাই-ই। তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, বললেন—তা অমত করবার কিছু নেই হে! হোক, মণির বিয়ে এইখানেই হোক।

রসিকবাবু সোল্লাসে দাঁড়িয়ে বললেন—ব্যস। আর চিন্তার কিছু নাই। এবার কেল্লা মেরে দেব।

এই সময়েই চাকর এসে ঘরে ঢুকল, বললে—হুজুর, ইস্কুলের মাস্টাবাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে করতে চাইছেন। দাদাবাবুকে যে মাস্টারবাবু পড়াতেন।

আনন্দচন্দ্র একটু বিরক্ত হলেন। একবার ইচ্ছা হল বলেন অন্য সময় দেখা করতে। কিন্তু এই কালো শীর্ণ কঠিন ও স্পষ্ট প্রকৃতির মানুষটির সম্বন্ধে তাঁর কিছু দুর্বলতা আছে। তিনি চাকরকে বললেন—আচ্ছা ডাক, এইখানেই ডেকে আন।

গোকুলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। সপ্রতিভ সহজ ভাবে নমস্কার করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

আনন্দচন্দ্র একটু হেসে বললেন—আসুন মাস্টার মশায়। বড় ভাল

সময়ে এসেছেন আপনি। এখনি মণির বিয়ে দেবার সম্বন্ধে পাকাপাকি চিন্তা শেষ করলাম। মেয়েটি বড় সদ্‌বংশের মেয়ে।

গোকুলবাবু বললেন অত্যন্ত স্নিগ্ধভাবে—মণি ভাল ছেলে। আমি জানি সে সুখী হবে। শান্তি পাবে জীবনে। একটু চুপ করে থেকে বললেন—মণিকে ভালবাসি। জীবনে যেখানেই থাকি ওর মঙ্গল কামনা করব। আপনার কাছে আমার একটু আর্জি আছে।

—বলুন।

—আমাকে এবার আপনি ছেড়ে দিন। আপনি ডেকেছিলেন আগ্রহ করে, তাই এসেছিলাম। তাই আপনাকে না বলে যেতে পারি না। অন্য ক্ষেত্র হলে রেজিগনেশন লেটার দিয়ে চলে যেতাম।

আনন্দচন্দ্র আহত ও বিস্মিত হলেন, বললেন—আপনি চলে যাবেন? কেন যাবেন?

গোকুলবাবু বললেন—এখানে আর ভাল লাগছে না। শরীর মন দুই-ই আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

আনন্দচন্দ্র যেন রেগে উঠেছেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। গুম হয়ে বসে থাকলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন—বেশ, তাই যাবেন।

—আচ্ছা। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বলেই উঠে দাঁড়ালেন গোকুলবাবু।

আনন্দচন্দ্রের মনটা হায় হায় করে উঠল। মনে হল—একটা দামী জিনিষ যেন এক মুহূর্তে হাত ছাড়া হয়ে গেল। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে বললেন—আপনি না গেলেই পারতেন গোকুলবাবু! আমি যতটা পারতাম টাকা দিয়ে আপনার অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করতাম।

গোকুলবাবু যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—দেখুন, কিছু বলব না ভেবেছিলাম যাবার সময়, কিন্তু না বলে পারছি না। আপনার ভুল কোথায় জানেন? আপনি ভাবেন সব কিছু টাকা দিয়ে হয়। তা হয় না। আর আমার প্রয়োজন সামান্য, কাজেই বেশী টাকার দরকার তো আমার নাই। আর, আপনি এই ভুল করেছেন বলেই গোটা গ্রাম জুড়ে শান্তির লেশ নাই। লোকের মুখের হাসি আপনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এই শুকনো মুখ, ক্লিষ্ট চেহারার মানুষের মধ্যে আর থাকতে ইচ্ছা হয় না। তাই চলে যাচ্ছি।

বলেই গোকুলবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন। রাগে আনন্দচন্দ্রের মনের ভিতরটা ফেনিয়ে উঠল। একবার ইচ্ছা হল চীৎকার করে এই স্পর্দ্ধিত লোকটাকে শাসন করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও হল। মানুষটিকে তিনি চেনেন। ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ। একটা আঘাত করলে উলটো আঘাত দিয়ে ঝন করে বেজে উঠবে। তিনি চুপ করে কান পেতে গোকুলবাবুর মিলিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে লাগলেন।

রসিকবাবু এতক্ষণে কথা বললেন—ছেড়ে দেন হুজুর। ঐ রকম বাউণ্ডুলে পাগল মানুষগুলোকে বাগে আনবার কোন উপায় নাই। ও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আনন্দচন্দ্র রসিকবাবুর কথা শুনে তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের শূন্য দৃষ্টিতে যেন একটা নিদারুণ পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উটেছে।

সেটা লক্ষ্য করে মনিবের মন ভিন্নমুখী করবার জন্যে বললেন—তা হলে একবার মায়ের মত নিয়ে হরসুন্দরবাবুকে চিঠি লিখতে হয়।

আনন্দচন্দ্র সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে বললেন—চল, এখনই চল বিন্দুাতের কাছে। কথাবার্তা বলা যাক।

উঠে বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে তিনি রসিকবাবুকে বললেন—জান রসিক, রণের শেষ আর ঋণের শেষ রাখতে নেই। তা হলে কষ্ট পেতে হয় পরিণামে। আমি ও নটে গাছ মুড়িয়ে দেব। আর বাকী রাখব না।

অন্ধকারের মধ্যে রসিকবাবু হাসলেন। তিনি তো এই-ই চান।

মহা সমারোহে ছেলের বিবাহ দিলেন আনন্দচন্দ্র। তাঁর যেন আর তর সইছিল না। ধীরে ধীরে আনন্দচন্দ্রের মধ্যে অধীরতা আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই অধীরতায় তিনি অল্পকালের মধ্যে ছেলের বিবাহ দিলেন তাড়াহুড়ো করে। বাজনায়, আলোয়, রঙে, কোলাহলে সমস্ত গ্রামখানার শান্ত জীবন তিনি মন্থন করে দিলেন। দশ দিন ধরে দু বেলা সমস্ত গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ, কোন দিন যাত্রা, কোন দিন তরজা, কোন দিন কবি, কোন দিন রায়বেঁশে,—সপ্তাহব্যাপী উৎসব। আনন্দচন্দ্র যে কত ধনশালী তা তিনি ছেলের বিয়েতে দেখিয়ে দিলেন।

এই আলো, উৎসব ও সমারোহের অন্তরালে দুটি পরিবারে যেন বিষণ্ণতা ও অবসাদের ছায়া নেমেছে গাঢ়তর হয়ে। সুধাকান্ত সক্রিয় ভাবে মণির

বিবাহে অংশ গ্রহণ করেছেন, বিপুল কোলাহলে আপনার কণ্ঠ মিশিয়েছেন, সমারোহের মধ্যে আনন্দ করেছেন। কিন্তু তবু তিনি যেন মনে মনে কেমন নির্লিপ্ত হয়েই সব করেছেন। কর্তব্য বলেই সব করেছেন। আনন্দচন্দ্র দুঃখ পাবেন বলেই সব কিছুতে আপনার অংশ নিয়েছেন। কিন্তু তবু সমস্ত গ্রামের সামগ্রিক ছবিখানা তাঁর মনে ছিল।

বিবাহের উৎসবের শেষ দিনে যাত্রার আসর থেকে যাত্রা শেষ হলে ভোর বেলা এসে শুয়েছিলেন। উঠতে সেই কারণেই খানিকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। প্রাতকৃত্য, স্নান, পুজা সেরে উঠতেই স্ত্রী তাঁকে বললেন—ওগো নরনাথবাবুর বাড়ী থেকে তোমাকে ডাকতে এসেছিল। তুমি একবার যাও। নরনাথবাবুর নাকি শরীর বড় খারাপ।

কর্তব্য বোধেই সুধাকান্ত মণির বিবাহের সব কিছুতেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবু এই সংবাদটা শুনে তাঁর মনে হল যেন এই আনন্দে অংশ নিয়ে তিনি অপরাধ করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

নরনাথবাবুর বাড়ীর সামনে এসে তাঁর পা কেঁপে গেল যেন। বর্ষার দিনের বৃষ্টিতে আর আলোতে ধোওয়া সকাল বেলা। তবু সমস্ত পরিবেশটা কি নিশ্চুপ আর নির্জন! যেন মৃত্যু তার অশরীরী পক্ষ বিস্তার করে ধীরে ধীরে সমস্তটাকে কবলিত করতে চলেছে। চার পাশ অত্যন্ত জরাজীর্ণ। বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজাটা পর্যন্ত ভাঙা। তিনি নাম ধরে বার বার ডাকলেন—লোকনাথ, লোকনাথ।

কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পর ঘোমটা-টানা একটি মেয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। শীর্ণ শরীর, কালো রঙ, অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া শাড়ী পরণে। ঘোমটার আড়াল থেকে তাঁকে দেখে মেয়েটি ঘোমটা সরালে মুখ থেকে। সুধাকান্ত অবশ্য তাকে চিনতে পেরেছিলেন অনুমানে। লোকনাথের স্ত্রী হাসি।

তাকে দেখে তাঁর সমস্ত হৃদয় বেদনায় মথিত হয়ে উঠল। এই সেই সেদিনের হাস্যমুখ সবলা মেয়েটি—তার এমন অবস্থা হয়েছে!

হাসি তাঁকে দেখে একটু হেসে বললে—আসুন। বাবা আপনাকে খুঁজছেন সকাল থেকে।

ব্যথিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে সুধাকান্ত বললেন—তুমি এমন হয়ে গিয়েছ মা?

হাসি খিল খিল করে হেসে উঠল, মুখে আপনার জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন কাপড় চাপা দিয়ে বললে—কেমন হয়ে গিয়েছি?

সুধাকান্ত হাসলেন, বললেন—তোমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে মা। তবু তোমার মুখের হাসি ঠিক আছে তো!

হাসি একটু হেসে কথাটা এড়িয়ে গেল, বললে—আসুন। বাবা ঐ কোণের ঘরে আছেন। আমি রান্না করতে করতে উঠে এসেছি। আমার রান্না পুড়ে যাবে।

—লোকনাথ কোথায়?

হাসির শীর্ণ শ্যামল মুখে একটু রক্তাভার আভাস ফুটে উঠল। সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন লোকনাথের সম্পর্কে প্রকাশ্য আলোচনায় আজও লজ্জা পায় হাসি। ভাল, বড় ভাল! এই অনন্ত দীনতার মধ্যেও ঐটুকু যেন অমর হয়ে আমরণ বেঁচে থাকে! বার বার মনে মনে তাই কামনা করলেন সুধাকান্ত।

সলজ্জ হাসি হেসে হাসি বললে—কোথায় কার যেন অসুখ করেছে তাই দেখতে গিয়েছে। এখনি আসবে। আপনি আসবেন সে জানে।

হাসি চলে গেল রান্নাঘরে। সুধাকান্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সমস্ত বাড়ীটা ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে। ছাদ থেকে বর্ষার জল চুঁইয়ে পড়ছে। ঘরগুলো বিবর্ণ ঝুলে আর মাকড়সার জালে ভর্তি। সমস্ত বাড়ীটা যেন আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। হাসির রান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের আনুনাসিক ও অবিচ্ছিন্ন কান্নার শব্দ আসছে। সমস্ত পরিবেশটা আশ্চর্য রকম বিষণ্ণ লাগল তাঁর কাছে। সমস্ত পরিবেশে যেন মৃত্যুর স্পর্শ লেগেছে।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়ে নরনাথবাবুর ঘরে ঢুকলেন।

নরনাথবাবু বিছানায় শুয়েছিলেন, শুয়েই বললেন—এস। তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছি। এস, এই বিছানার পাশে আমার মাথার কাছে বস।

সুধাকান্ত মাথার কাছে বসতেই নরনাথবাবু বললেন—বস, একটু কষ্ট করে বস। আমি আর উঠতে পারছি না। উঠে বসলে বড় কষ্ট হয়।

সুধাকান্ত তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—না, না, আমার কোন

অসুবিধা নাই। আপনাকে উঠতে হবে না। আপনি শুয়ে থাকুন, শুয়ে থাকুন। আপনার কি অসুখ হল, কবে থেকে হল, কৈ কিছুই জানতে পারি নি তো!

নরনাথবাবু হাসলেন ক্লিষ্ট হাসি। তাঁকে দেখে সুধাকান্তের মনে হল কোন অতীত কালের একটা অতি বৃহৎ প্রস্তর মূর্তি যেন এক প্রচণ্ড বাত্যায় ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। সেই অতীত দিনের ভাস্কর মূর্তিটির মুখে যে হাসি ফুটিয়ে গিয়েছিল সে হাসিও যেন জলে বাতাসে রৌদ্রে ম্লান হয়ে গিয়ে শীত রাত্রের শেষ চন্দ্রকলার মত এখনও অতি অস্পষ্ট ভাবে লেগে রয়েছে। সেই পাথরের মূর্তি যদি কথা বলতে পারতো তা হলে বোধ হয় এমনি করেই কথা বলত। নরনাথবাবু বললেন—অসুখ? অসুখ তো সবটাই। এখন আমার জীবন, আমার শেষ বয়সের সংসার সবটাই তো আমার অসুখ। তারপর গলা নামিয়ে বললেন—আসল অসুখ কি জান বাবা সুধাকান্ত? আসল অসুখ হল দারিদ্র আর অপমান। সাংসারিক কষ্ট এইবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। সব গিয়েছে আর কিছু নাই। শুধু বাড়ীর ভিতর বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি সপরিবারে। জান, একবার ভগবানের নামও মনে আসে না।

কি বলবেন সুধাকান্ত! তিনি চুপ করে থাকলেন। নরনাথবাবুও চুপ করলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—জান আমার এখন কেমন অবস্থা হয়েছে? আমি যেন রাজা দুর্যোধনের মত আমার এই ঘরের মধ্যে দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করে আছি। অথচ সুধাকান্ত, তুমি তো দেখেছ আমার কি প্রতাপ ছিল। অনেকই তো ছিল, তার মধ্যে অনেক গিয়েও যা ছিল তাতেই আমার শেষদিন পর্যন্ত চলে গিয়েও আমার ঐ পাগল ছেলেটার জন্যেও কিছু কিছু থাকত। কিন্তু লোভ, মোহ বড় খারাপ জিনিয সুধাকান্ত। কত খারাপ তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আবার নতুন করে সুখের আশায় ঘর হতে বের হলাম। যখন আমার ভগবানের নাম করে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কথা, তখন আমি আবার বিষয় ঘাঁটতে গেলাম। সংসার-সুখের প্রত্যাশায় ছেলের বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠলাম। ভগবান তেমনি শাস্তি দিয়েছেন আমাকে। এ তো পাওনা শাস্তি সুধাকান্ত। আমার বৃদ্ধ বয়সের লোভ আর মোহের

পুণ্যফল। এর জন্যে দুঃখ করি না। তবে দুঃখ কি জান? আমার লোভ আর মোহের শাস্তিটা ভগবান বড় অন্যায় উপলক্ষ্য করে দিলেন। যার হাত দিয়ে ভগবান আমার এই শাস্তি বিধান করলেন সে আমার চেয়েও মোহবদ্ধ, বহুগুণে অন্ধ। সম্পদ আর অর্থের দম্ভ মানুষকে এমনি করেই মত্ত করে তোলে। আমার সামান্য সম্পদ নিয়ে নিজের যৌবনের মত্ততাও তো দেখেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—সত্যি। তাতেও দুঃখ বিশেষ ছিল না। দুঃখ আমার বৌমা আর ওর দুটো ছেলে মেয়ের জন্যে। ওদের কষ্ট আমি বেঁচে থেকে দু চোখ দিয়ে দেখি কি করে বলত। আর এই অপমানের পর আমি যে ঘর থেকেও আর বের হতে পারি না। এ মুখ আমি লোকসমাজে বের করব কি করে?

আবার থেমে গেলেন নরনাথবাবু। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। নিজের চোখের জল চাদরের খুঁট দিয়ে মুছে একটু হেসে বললেন—তবে আমার সান্ত্বনাও ভগবান আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। আমার সান্ত্বনা আমার লোকনাথ। আমি এটা ঠিক বুঝেছি—আনন্দচন্দ্র কেন, ভগবানের মার খেয়েও সে হার মানবে না। হার মানার মানুষ সে নয়। তার ওপর যত আঘাত পড়বে, আমি বেশ ভাল করে জানি, ওর শোভা ওর তেজ তত বেশী করে খুলবে। আমার বেঁচে থাকার আজ সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আমি লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তিতে মরতে পারব। তবে আমি হেরেছি, কিন্তু আমার নিজের অমর্যাদা কোন দিন করি নাই।

সুধাকান্ত এতক্ষণ চুপ করে নরনাথবাবুর কথা শুনছিলেন। এইবার বললেন—আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

নরনাথবাবু হেসে বললেন—কেন ডেকেছি! প্রথমতঃ মনের এই কষ্ট জানাবার লোক এ গ্রামে তো একমাত্র তুমি, তাই ডেকেছি। আর তা ছাড়া আর একটা কথা। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার আর বেশী দিন নাই। আমার যাবার সময় হয়েছে। ঐ লক্ষ্মীর মত মেয়ে আমার বৌমা থাকল, ছেলে দুটো থাকল। তুমি দেখো ওরা যেন ভেসে না যায়। লোকনাথের চেয়ে আমি ওদের জন্যে তোমার ওপর বেশী ভরসা করে যাব।

সুধাকান্তের চোখে জল এল। বললেন—দেখব, নিশ্চয়ই দেখব।

নরনাথবাবু বললেন—আর তোমাকে আটকে রাখব না। তুমি যাও। আমি এখন শুয়ে শুয়ে যে ক'দিন মরণ না আসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি।

সুধাকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন হাসি একহাতে একটি মাজা ঝকঝকে কাঁসার রেকাবীতে দুটি বাতাসা আর একটি সন্দেশ আর একহাতে জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুধাকান্ত বাক্যব্যয় না করে তার হাত থেকে রেকাবীটি নিলেন। খেতে খেতে বললেন—সন্দেশ কি বিয়ে বাড়ীর না কি মা?

হাসির হাসি-মুখখানি এক মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল। সে বললে—ওবাড়ীর মিষ্টি তো আমরা খাই না। এ আমি বাড়ীতে তৈরী করেছি।

সুধাকান্ত এক মুহূর্তে বুঝলেন সহস্র কষ্ট ও দীনতার মধ্যে মেয়েটি আজও স্বামী আর শ্বশুরের জন্যে অম্লান শ্রদ্ধা আর প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে রেখে দুজনকে দেবতার মত প্রতিমুহূর্তে আরতি করতে ভুলে যায় নি। তা না হলে যে সংসারে শুধুমাত্র প্রাণ ধারণের অন্নের অভাব সেখানেও মিষ্টি তৈরী করতে পারে মেয়েটি কোন্ শক্তিতে?

তিনি জল খেয়ে গ্লাসটি নামিয়ে হাত ধুয়ে বের হবেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে ঢুকল লোকনাথ। তার গম্ভীর কঠিন মুখখানায় ইদানীং কালের ক্লেশে ও কৃচ্ছ্রতায় অনেক সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন পড়েছে। তার সেই ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত মুখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে। সুধাকান্তকে দেখেও সে দেখলে না। সে জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, বাবা কোথায়? ঘরে আছেন?

সুধাকান্ত তার হাতটা চেপে ধরলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি, হল কি, হে লোকনাথ?

লোকনাথ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হয়েছে জানেন? আপনার বন্ধুর জন্যে সব গেল। আপনারা কাল বিকেলে যখন বিবাহ-উৎসবে মত্ত সেই সময় ঢোল-সহরৎ করে খগেনদা'র বাড়ীর পাশে যেখানে বকুল-মালতীর গাছটা আছে, জমিদার হিসেবে আনন্দচন্দ্র কাল জায়গাটার দখল নিয়েছেন। আর আর আজ সকালে তিনি কি করেছেন জানেন?

বলতে বলতে লোকনাথের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল, চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে উঠল। সে বললে—সকাল বেলাতেই জমিদার বকুল-

মালতীর গাছটা কাটতে লোক লাগিয়েছেন। আমি ভোরবেলা গ্রামের বাইরে একটু বেরিয়েছিলাম। খবর পেয়ে ছুটে এলাম, এসে দেখলাম কাটা গাছটা মাটিতে লতটাকে নিয়ে পড়ে আছে।

সুধাকান্তের বুকের ভিতরটা অশুভ চিন্তায় এক মুহূর্তে আতুর হয়ে উঠল। তিনি লোকনাথের হাতটা চেপে ধরে নিম্নকণ্ঠে বললেন—তোমার বাবাকে আর খবরটা দিও না। তিনি অত্যন্ত আঘাত পাবেন।

হঠাৎ হাসি ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল—এই, এই, বাবা! বাবা!

সকলেই অকস্মাৎ পিছন ফিরল, দেখলে—নরনাথবাবু টলতে টলতে বিছানা থেকে উঠে এছে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলছে। তিনি স্খলিত কণ্ঠে বললেন—কেটে দিয়েছে? সেই বকুল-মালতীর গাছটা কেটে দিয়েছে? ওটুকুও বাকী রাখলে না!

তিনি কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছেই বসে পড়লেন।

অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে সুধাকান্ত নরনাথবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন খগেনের বাড়ীর দিকে। অত্যন্ত নিরীহ, অপরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন, আপনার কাজে পাগল এই মানুষটিকে সমস্ত গ্রামের লোক যতখানি অকেজোই ভাবুক, তাকে অত্যন্ত গভীর সহানুভূতি ও অনুকম্পার চোখে দেখে। তার সঙ্গে ঐ মালতী-লতা জড়ানো বকুলগাছটি সম্পর্কেও গ্রামের লোকের এক ধরণের গোপন সমাদর ছিল। একটি লঘু রহস্যের সঙ্গে সমাদর মেশানো দৃষ্টিতে লোকে দেখত গাছটিকে। গরু বাছুরে কি ছাগলে গাছের পাতা খেলে যেই দেখুক সেই তাড়িয়ে দিত, বলত—যা যা ভাগ, অন্য জায়গায় যাও গিয়ে খাও বাবা! এ আমাদের খগেনের প্রেমের ধ্বজা!

সুধাকান্ত গিয়ে জায়গাটায় দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড অতিকায় গাছটা আপনার পত্র-পল্লব-ভারাক্রান্ত বিশাল দেহ নিয়ে আকাশলোকে যতখানি জায়গা দখল করে তাঁর জন্মের বহু আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটা কেমন ধু ধু করছে, অদ্ভুত রকমে শূন্য মনে হচ্ছে। তার অতিকায় দেহটা দেখে মনে হয় যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ পড়ে আছে আপনার পুষ্পশোভার অঙ্গদ কুণ্ডল পরে। গাছটার গায়ে-গায়ে জড়ানো মালতী

লতাটা ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। এই তো তার ফুল ফোটার সময়। মালতী লতার পাতাগুলো এরই মধ্যে এলিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।

চারপাশে গ্রামেরই নানান বয়সের মানুষ শুষ্ক মুখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই মুখে চোখে ব্যথিত বেদনার সঙ্গে একটা অশুভ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ছাপ লেগেছে—দেখতে পেলেন সুধাকান্ত। তিনিও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যেই ক'টা গরু আর ছাগল পাতার লোভে এসে জড়ো হয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে চতুষ্পদগুলি অগ্রসর হবামাত্র তাড়িয়ে দিচ্ছে—গাছে লাগতে দিচ্ছে না।

সুধাকান্তের মনে হল যেন কোন অতিবৃদ্ধ পিতামহের মৃত দেহের চারিপাশে তার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্ররা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টিতে।

দূরে খগেন দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, একেবারে পাথরের মূর্তির মত।

সুধাকান্ত আর সেখানে দাঁড়ালেন না, বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। একবার মনে হল—আনন্দচন্দ্রকে এর জন্য তিরস্কার করে আসেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। যেতে যেতে তাঁর মনে হল—মালতী কি করেছে কে জানে? সেও কি খগেনের মত শুষ্ক দৃষ্টিতে মাটির দিকে চেয়ে বসে বসে আছে সমস্ত উদ্গত ক্ষোভকে বুকে ধারণ করে, না সে অসহায়ের মত উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে চোখের জলে মেঝের মাটি ভিজিয়ে ফেলছে?

আশ্চর্য কথা এই যে এরপর ভূতের উপদ্রবের মত আনন্দচন্দ্রের উৎপাত শান্ত হয়ে গেল। কতক লোক স্তব্ধ হল আনন্দচন্দ্রের এই স্তব্ধতায়। কতক লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে—আনন্দচন্দ্রের এ ক্ষান্তি সাময়িক; তিনি নূতন কলহের সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন। আর বাকী যারা, তারা বললে—আর কি নিয়ে ঝগড়া করবেন আনন্দচন্দ্র? তিনি তো আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি।

নরনাথবাবু মারা গেছেন, মরে বেঁচেছেন তিনি। মালতীও নাকি মরণাপন্ন, সেও আর বাঁচবে না। কেবল সুধাকান্তের ঘরে আনন্দের দীপটি প্রদীপ্ত হয়ে

জলছে। কিশোর সংস্কৃতে এম, এ, পাশ করেছে প্রথম হয়ে। সে কলকাতায় অধ্যাপনা করে। দুলাল এ বছর এম, এ, পাশ করেছে ইংরেজীতে প্রথম হয়ে। মাঝখানে দু বছর সে পরীক্ষা দেয় নি। সে খেয়ালী মানুষ। দু বছর তার কি খেয়াল হয়েছিল সেই জানে। সুধাকান্তও তাকে নিষেধ করেন নি। সে ইতিমধ্যেই লেখক হিসাবেও নাকি খ্যাতি অর্জন করেছে।

দু ভায়েই ক'দিন আগে বাড়ী এসেছে। কিশোরের বিবাহও চুকে গিয়েছে। এই সময় অকস্মাৎ আনন্দচন্দ্র একদিন সুধাকান্তকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুধাকান্ত একটু আশ্চর্যই হলেন নিমন্ত্রণ পেয়ে। কারণ ইদানীং আর দু'জনের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না; স্বাভাবিক ভাবেই হয় না। দুজনে দুই ভিন্ন পথের পথিক। আপনার আপনার পথে চলতে গিয়ে যদি পরস্পর পরস্পরকে প্রায় ভুলে গিয়েই থাকেন তাতে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মহাসমারোহ করে খাওয়ালেন আনন্দচন্দ্র। রূপোর থালা বাটি গেলাস, নানান আয়োজন। যত সমারোহ তত সমাদর। ঠাকুরের বদলে পরিবেশন করলেন আনন্দচন্দ্রের গৃহিণী বিদ্যুৎ নিজে। তাঁকে সাহায্য করলে তাঁর মেয়ে রাধা।

রাধারাণীকে দেখে সুধাকান্তের চোখ জুড়িয়ে গেল। বোধ হয় ষোল সতের বছর বয়স হয়েছে। কালো রঙ, বড় বড় শান্ত চোখ, মুখে চোখে সর্বাঙ্গে একটি অতি নম্র মধুর লাবণ্য। চলাফেরাগুলি পর্যন্ত অতি ধীর, দু চারটি কথা বলে—তাও অত্যন্ত শান্তভাবে, ধীরে ধীরে। ধীরতা আর শান্তির প্রতিমূর্তি যেন। সুধাকান্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন—বড় ভাল মেয়ে হয়েছে তো রাধারাণী। বড় সুন্দর, দেখলে দু চোখ জুড়িয়ে যায়।

তাঁর কথা শুনে রাধারাণী সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নামালে। আনন্দচন্দ্র হেসে বিদ্যুতের দিকে ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকালেন। বিদ্যুতের চোখেও স্বামীর হাসির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল। সুধাকান্ত ইঙ্গিতটির অর্থ বুঝতে পারলেন না।

তবে ইঙ্গিতটির অর্থ বুঝতে তাঁর বাকী থাকল না খাওয়ার পর। খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খেতে খেতে আনন্দচন্দ্র বললেন—ভাই সুধাকান্ত, খেতে খেতে আমার মেয়ের তো খুব প্রশংসা করলে। শুধু শুধু প্রশংসা করে শেষ

করলেই চলবে না। আমার মেয়েটিকে তোমাকে নিতে হবে। তোমার দুলালের সঙ্গে বিয়ে দাও ওর।

বিদ্যুৎও স্বামীর কথার পুনরুক্তি করলেন, বললেন—ওঁর চেয়ে আপনার ওপর আমার জোর বেশী। দুলাল আমার ছেলের মত। দুলালকে আমাকে দিন আপনি!

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গেলেন প্রস্তাব শুনে। কোটিপতি আনন্দচন্দ্র, সামান্য অবস্থার মানুষ তিনি, তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চান! তবে দুলালের মত ছেলে কোটি টাকার বিনিময়েও পাওয়া যায় না। তিনি খুসীই হলেন। তবু যথাসম্ভব সংযতভাবে বললেন—আমার নিজের কোন অমত নেই, বরং এ বিয়ে হলে খুসীই হব। তবে দুলালের মাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর মত নিই। আর সবচেয়ে বড় কথা—দুলাল বড় হয়েছে, তার ওপর সে অত্যন্ত খেয়ালী—তারও একটা মত নিতে হবে তো। আমি ওদের সকলের মত নিয়ে তোমাকে আজ সন্ধ্যে বেলাতেই জানাব।

বাড়ী ফিরে কমলাকে আর দুলালকে ডাকলেন তিনি। কিশোর নেই, সে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। সুধাকান্ত আনন্দচন্দ্রের প্রস্তাব ওদের দুজনের কাছে প্রকাশ করে বললেন—এ বিয়ে যদি হয়, আমি নিজে অত্যন্ত সুখী হব। আনন্দচন্দ্র ধনী ক্রোড়পতি বলে আমার আগ্রহ নয়; আমাদের এই বিশেষ আগ্রহের কারণ মেয়েটি। মেয়েটি বড় ভাল, লক্ষের মধ্যে এমন মেয়ে পাওয়া যায় না। আনন্দ সত্যিই এদিক থেকে আমারই মত ভাগ্যবান। তবে আমার একার মতে হবে না। তোমাদের মত বল।

কমলা বললেন—এ তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু অত বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে ঠিক খাপ খাবে?

সুধাকান্ত বললেন—মেয়েটিকে যা দেখলাম তাতে গরমিল কিছু হবে না। আর তা ছাড়া সে আমার দুলালের মত মানুষের স্ত্রী হবে। তুমি এদিক দিয়ে কোন চিন্তা করো না। এখন দুলাল, তোমারও অমত হবে না নিশ্চয়ই।

দুলাল গম্ভীর মুখে এতক্ষণ সব শুনছিল, সে একটিও কথা বলে নি। সে তার স্বভাবও নয়। এবার প্রশ্ন করায় সে বাপের মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে—আমার পক্ষে ওখানে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

সুধাকান্ত ও কমলা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুধাকান্ত কখনও

ছেলেকে তিরস্কার করেন নি, কখনও বিরক্তও হন নি। আজও এত ব্যথিত বিস্ময় সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত হলেন না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বাবা, কি আপত্তি তোমার বল।

তেমনি শান্ত গলায় দুলাল উত্তর দিলে—আমার পক্ষে ওখানে বিয়ে করা বা কেন করব না তা বলা দুটোই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলে সে আর অপেক্ষা করলে না, চলে গেল।

সুধাকান্ত মর্মান্তিক দুঃখ পেলেন, তবু ছেলেকে আর কোন কথা বললেন না। প্রতিশ্রুতি মত সন্ধ্যার সময় বিবাহে অক্ষমতা জানিয়ে একখানি চিঠি লিখে আনন্দচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আনন্দচন্দ্রের কাছ থেকে তারপর আর কোন সংবাদ পান নি সুধাকান্ত। সুধাকান্ত বুঝতে পারলেন অভিমানী আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ এ জীবনের মত সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

* * * *

সুধাকান্ত ভুল করেছিলেন। জীবিত কালেই আবাব ডাক এল আনন্দচন্দ্রের কাছ থেকে। কিছুদিন থেকেই তিনি শুনছিলেন আনন্দচন্দ্র অসুস্থ। তাঁর অসুখের সংবাদ শুনে সুধাকান্তের বুকের মধ্যে একটা আকুলতা ঠেলে উঠেছে বার বার। বার বার ইচ্ছা হয়েছে এখনি গিয়ে রুগ্ন আনন্দচন্দ্রকে একবার দেখে আসেন। কিন্তু কেমন সঙ্কোচ হয়েছে—যদি গেলে আনন্দচন্দ্র দেখা না করেন, যদি দেখা করেও মুখ ফিরিয়ে থাকেন।

সেদিন রসিকবাবু এসে তাঁকে সবিনয়ে জানালেন—কর্তা একবার স্মরণ করেছেন আপনাকে। আপনি যদি যান তিনি খুব খুসী হবেন।

আমন্ত্রণ পেয়ে সুধাকান্ত কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তখনি রসিকবাবুর সঙ্গেই যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে শুনলেন আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ। এ যাত্রা হয়তো আর উঠবেন না—এই রকম অবস্থা।

দক্ষিণ দিকের ঘরে দুটো প্রকাণ্ড মেহগিনির খাট জুড়ে নরম বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে আছেন আনন্দচন্দ্র। বিদ্যুৎ তাঁকে বাতাস করছিলেন। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে ঘোমটা টেনে বিদ্যুত উঠে চলে গেলেন। সুধাকান্ত বুঝলেন প্রত্যাখ্যানের অপমানটা আনন্দচন্দ্র ভুললেও বিদ্যুৎ তোলেন নি। আনন্দচন্দ্র তাঁকে দেখে ক্লিষ্ট হাসি হেসে মৃদু স্বরে সম্ভাষণ জানালেন—এস।

সুধাকান্ত গিয়ে তাঁর মাথার কাছে বসলেন। আস্তে আস্তে রুগ্ন বন্ধুর একখানা হাত আপনার হাতে তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আনন্দচন্দ্র তাঁর মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল আছ? যাক এসেছ।

সুধাকান্ত কথার কোন জবাব দিলেন না, কেবল অত্যন্ত নিবিড় স্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আনন্দচন্দ্র একটু হেসে বললেন—যাবার আগে একবার শেষ দেখার জন্যে ডেকেছিলাম। তা দেখা হল।

তিনি থেমে গেলেন। আপনার ক্লান্ত শূন্য দৃষ্টি মেলে দিলেন আকাশের দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুধাকান্তও তাকালেন আকাশের দিকে।

শেষ শরতের মধ্যাহ্ন। নীল মসৃণ আকাশের উপর সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে চলেছে উন্মনা হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আকাশে যেন কোন্ ঔদাস্যের স্পর্শ লেগেছে।

আস্তে আস্তে সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আনন্দচন্দ্র বললেন—জীবনে তোমার কাছে অনেক পেয়েছি, কিন্তু দিয়েছি সামান্যই। কিছু মনে রেখ না; ভুলে যেয়ো। কত মানুষকে কত দুঃখ দিয়েছি, আজ সে সব মনে হলে নিজের বুকেই দ্বিগুণ করে বাজছে। তাই ভুলতে চাইছি সব। সব মিছে, জান সুধাকান্ত, টাকা পেয়ে টাকা নাড়াচাড়া করে বুঝলাম, ও বাজে। ও খালি মোহই দেয়, মত্ততাই আনে, আর কোন কাজের না। তুমি তো জান, জীবনে আমি বার বার নতুন করে আরম্ভ করেছি। আজ আবার মনে হচ্ছে সব ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করি। কিন্তু আর তো সময় নেই।

তিনি কথা বলতে হাঁপাচ্ছিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি থেমে গেলেন।

আবার বললেন—পেলাম তো অনেক। মানুষের কাছে ভালবাসা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি, স্ত্রী ছেলে মেয়ের অকপট স্নেহ পেয়েছি, ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছি। ভেবেছিলাম তার বদলে আমিও দিয়েছি অনেক। কিন্তু আজ সব লাভক্ষতির পারে এসে দেখছি—আমি দিয়েছি কম। তাই আজ

আবার দিতে ইচ্ছে করছে, নতুন করে আবার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আর তো সময় নেই!

আকাশের আলো মিলিয়ে আসছে, ঘরে অন্ধকার নেমে আসছে। আর পরস্পরের মুখ দেখা যায় না। আবছা অন্ধকারে দুই প্রাচীন বন্ধু শুধুমাত্র মনে মনে সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের অস্তিত্ব অনুভব করলেন।

অনেকক্ষণ পর আনন্দচন্দ্র বললেন—আজ যাও। তোমার সন্ধ্যের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। যে ক'দিন আছি এসো।

সুধাকান্ত উঠলেন।

তারপর এক রাত্রে রসিকবাবু সুধাকান্তকে ডাকলেন—ভট্‌চাজ মশায়!

সুধাকান্ত ছুটে বেরিয়ে এলেন।

রসিক বাবু বললেন—কর্তা মশায় গত হলেন। শেষ সময়েও আপনার নাম করছিলেন।

সুধাকান্ত গ্রামের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। গ্রামের একটা বৃহৎ অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেল। আনন্দচন্দ্র গেলেন। নরনাথবাবু আগেই গিয়েছেন।

মালতীও গিয়েছে। বকুল-মালতীর অনুগামিনী হয়েছে সে। খগেনের মালঞ্চ শূন্য, শুকিয়ে গিয়েছে সব। যে ক'টা অযত্নেও মরেনি, গরুছাগল খেয়েও শেষ করতে পারে নি সেই অনাদৃত গাছ ক'টাই আজও কৃতজ্ঞ সুহৃদের মত তার মালঞ্চে ফুল ফোটাচ্ছে।

সেদিন বর্ষণ-মুখর অপরাহ্ন। খগেন চুপ করে আপনার শ্রীহীন বাড়ীর দাওয়ায় একা বসে বসে বর্ষণের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকলে—পিসেমশাই, অ পিসেমশাই।

খগেন চমকে উঠল। সামনে তাকিয়ে দেখলে বাগানের দরজার ও পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দুলাল।

তার বুকটা অকস্মাৎ কান্নায় উথলে উঠল। একটি অতি দুঃখের ও অপমানের দিনের স্মৃতির সঙ্গে দুলালের সঙ্গে পরিচয়ের মধুর স্মৃতি জড়ানো। সে ছুটে বর্ষণের মধ্যেই নেমে গেল দুলালের কাছে।

দুলালের হাতে ক'টা গাছ। সে এক মুখ হেসে সেগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিলে, বললে—পুঁতুন এখুনি।

...গাছ ?

এ কি ! মালতী, বকুল আর অশোক !

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খগেনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। চোখের জল মিশে গেল বর্ষার জলের সঙ্গে।

খগেন গাছগুলো নিয়ে বললে—আবার পুঁতব এগুলো ? তুমি বলছ ?

জোরে ঘাড় নেড়ে হেসে দুলাল বললে—নিশ্চয় ! আবার গাছ হবে, আবার ফুল ফুটবে ! আপনি থাকবেন না, আমি থাকব না, সে দিনও গাছে ফুল ফুটবে, ফুল ঝরবে। চারিদিক শোভায় আর গন্ধে সুন্দর হয়ে উঠবে। আসুন।

বৃষ্টির মধ্যেই আবার নূতন করে দুজনের বৃক্ষরোপণ আরম্ভ হল।

তৃতীয় পর্ব্ব

এক

সুধাকান্তের মাথার সমস্ত চুল একেবারে বরফের মত সাদা হয়ে গেল এই ক'বছরে। ধীরে ধীরে জীবনের সব রঙ ওর যেন একে একে মুছে আসছে। মুছে আসতে আসতে সমস্ত সংসারটা সব-বর্ণহরা শুভ্রতায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। শরীরও যেন খানিকটা শীর্ণ, খানিকটা দুর্বল ও জীর্ণ হয়ে এসেছে। বার্ধক্যের স্পর্শ এসেছে এবার জীবনে।

মাঝে মাঝে জীবনের সব কিছু মিলিয়ে একটা সহজ হিসাব ও অনুমানের মধ্যে সবটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন সুধাকান্ত। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু জড়িয়ে সবটা যেন কিছুতেই একটা সহজ হিসাবের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। হিসেব করতে গেলেই সবটা যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়। কেবল একটা ছবি মনে আসে বারে বারে। অন্তহীন তমসার মধ্যে গাঢ় উজ্জ্বল দীপ্তিমান রক্তবর্ণ জীবন তার অপূর্ব সমারোহে নিত্য ভাস্বর; দুই দিকে জন্ম আর মৃত্যুর দুই যতিচিহ্ন দিয়ে সীমাঙ্কিত। তারই মাঝখানে সেই গাঢ় রক্তবর্ণ নিত্য নব প্রভায় দ্যুতিমান হয়ে নব নব বর্ণে রঞ্জিত হয়ে চলে। কালো আর সাদা দুই রঙে জীবনের সেই রক্তবর্ণ ভূমি অহরহ রঞ্জিত হয়ে হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার রূপ পরিবর্তন করে চলেছে। ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রোধ মোহ মত্ততার কালো রঙের সঙ্গে প্রেম প্রীতি স্নেহ সহানুভূতি ও অনুকম্পার শুভ্রতা মিশে জীবন যেন বার বার বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কিন্তু দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সতর্ক দৃষ্টিরও অগোচরে জীবনের মূল বর্ণ যে গাঢ় রক্তাভা তা ধীরে ধীরে দিনে দিনে বিবর্ণ আর ফিকে হয়ে আসে। তারপর সেই রক্তাভা আবার সেই অন্তহীন তমসায় কেমন করে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনন্ত তমসার পটভূমিতে সেই অনুরাগ-বিরাগের সাদা-কালোর অর্থহীন রেখাগুলো কেবল স্বপ্নের মত ভেসে থাকে কিছুদিন মানুষের স্মৃতিলোকে। শেষে তাও নিঃশেষে সেই অন্তহীন তমসায় বিলুপ্ত হয়।

তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর জীবনের রঙও যেন দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছে। অথচ এই কিছু দিন আগেও সে রঙ কি গাঢ়ই না ছিল। নিজের জীবনের ঐশ্বর্য্য ও উচ্ছলতা দেখে নিজেই মাঝে মাঝে ভয় পেতেন। এত ঐশ্বর্য, এ কি তাঁর ভাগ্যে সহ্য হবে দীর্ঘদিন? পূজার সময় দেবতার কাছে বার বার আর্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন—অমৃতপাত্রে অমৃত আজ এত গাঢ় করে তুলেছ যে পান করতে আজ ভয় হচ্ছে; এই মধুর আস্বাদ এত গাঢ় এত মিষ্ট যে মুখ আমার মিষ্টস্বাদে প্রায় বিস্বাদ হবার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। এই চরম মুহূর্তে তুমি আমাকে সরিয়ে নাও। আমার পূর্ণ পানপাত্র পানীয় সমেত অটুট থাকুক। আমাকে তোমার অন্তহীন মহাশান্তিময় অন্ধকার মহাঘুমে আবৃত করে তোমার কোলে তুলে নাও।

তিনি তাঁর প্রার্থনা অবশ্যই শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছেন অন্যভাবে। বোধহয় নিজের বিচিত্র ইচ্ছামত পন্থায় তা পূরণ করেছেন। মধুস্বাদী পানপাত্রে তাঁর অগোচরে খানিকটা বিষ মিশিয়ে তার আস্বাদকে বিচিত্র করে তুলেছেন।

নিজের পরিপূর্ণ আনন্দিত সংসারের দিকে তিনি তাকাতেন আর ভয়ে তাঁর বুক দুর দুর করত। বাড়ীতে পুজার ঘরে আজ বহুপুরুষের পুরুষানুক্রমে পূজিত বিগ্রহ বিরাজ করছেন। বাইরে গোলায় গোলাভর্তি সোনার বর্ণ ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী, ঘরে কিছু সঞ্চিত অর্থ। ওদিকে রান্নাশালায় সোনার শাঁখা হাতে, হাসি মুখে বাড়ীর গৃহিনী তাঁর পত্নী কমলা। এ দিকে পণ্ডিত, বিনয়ী, শান্ত সুশীল পুত্র কিশোর মাথায় শিখা নিয়ে পুরানো কালের পিতৃপুরুষের মত সংস্কৃত পঠন ও রচনায় ব্যস্ত। এ দিকে শরৎ-সন্ধ্যার বর্ণোজ্জ্বল খেয়ালী মেঘের মত খেয়ালী, যশস্বী, অমিত প্রতিভাশালী দুলাল আপনার খেয়ালে মগ্ন। ওদিকে কমলার কাছে সাহায্য কামনায় ব্যস্ত কিশোরের ফর্সা ছোটখাটো শান্ত মেয়েটি—তাঁর পুত্রবধূ পারুল। আর পরম কৃপণ মহাজনের সমস্ত আসলের সঞ্চিত সুদের মত পৌত্র, কিশোরের ছেলে অশোক। দেখতে অবিকল দুলালের মত। দুলাল আপনার খেয়ালে আছে তাকে নিয়েই। তার সঙ্গে অবিরাম খেলা করছে।

ঐ পৌত্রের অন্নপ্রাশনেই সকলে একত্রিত হয়েছিল বাড়ীতে। দুলাল পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী কলেজে অধ্যাপনা পেয়েছে। তাকে

সাধাসাধি করেছেন তার শিক্ষকরা, তবে সে চাকরী নিয়েছে। আসল কাজ তার লেখা। সে লেখক হিসাবে না কি এরই মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

মহাসমারোহে সুধাকান্তের প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। সুধাকান্তের জীবনের সেই শীর্ষ মুহূর্ত। তারপরই ভাঙন ধরল জীবনে। সমারোহের শেষে উৎসবের অমৃত পাত্রে কেমন বিষ ফেনিয়ে উঠল। কলেরায় দুদিনের মধ্যে সংসারের সুখের আলো নিভিয়ে চলে গেল স্ত্রী কমলা, আর বড় ছেলে কিশোর। দু জনে মুখের অম্লান হাসি নিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলে। তাদের জীবনের গাঢ় রক্তবর্ণ কেমন আশ্চর্য কৌশলে এক মুহূর্তে অন্তহীন কালোর মধ্যে মিলিয়ে গেল। আভাস নেই, ইঙ্গিত নেই, অকস্মাৎ তারা দু জনে কোন্ যাদুতে যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

এই আঘাতে সুধাকান্ত ভেঙে পড়েছিলেন একেবারে। অষ্টাদশী তরুণী পুত্রবধূ। তার দিকে তিনি তাকাবেন কি করে? তারপর তাকালেন অনেক কষ্টে। দুই চোখ ভরে জল নিয়ে তাকালেন নিরাভরণা, সাদা থানপরা পুত্রবধূর দিকে। নাতিকে বুকে তুলে নিলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছলেন। তার হাসি দেখে আবার হাসতে আরম্ভ করলেন।

দুলাল আপনার ঘরে বসে বসে দূর থেকে নির্লিপ্তের মত সব দেখলে। তারপর একদিন আপনার জিনিস পত্র গুছিয়ে সুধাকান্তকে প্রণাম করে বললে—আমি আর চাকরী করব না। আপনার কাছে এসেই থাকব। জবাবটা দিয়ে আসি।

সুধাকান্ত বুঝলেন—এই শোকে তাঁর বুকের যে পাঁজরাখানা খসে গিয়েছে সেই ক্ষতে আপনার সঙ্গের প্রলেপ দেবার জন্যে সে ফিরে এসে তাঁর কাছে থাকতে চায়। তাঁর চোখে জল এল। তিনি সে জল সামলাবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

দুলাল বেশী কথা কোন দিনই বলে না। বাপের চোখের জল দেখে বললে—আমার নিজের চাকরী ভালও লাগে না। লিখতেও যে খুব ভাল লাগে তাও নয়। তবে যখন লিখতে ইচ্ছে হয় তখন লিখি। লিখি। তখন লিখতে ভাল লাগে। এখন আপনার কাছে এসে থাকি আর একটু করে

লিখি। তা হলেই আমার হয়ে যাবে। আমার টাকারও বিশেষ দরকার নেই।

আজ দুলালের অকারণে অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলা দেখে সুধাকান্ত আশ্চর্য হলেন খানিকটা। সুধাকান্ত গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন— তা হলে ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। আর পৌঁছে একখানা চিঠি দিও।

—তা হলে আমি আসি বাবা?

—প্রণাম করেছ শ্রীগোবিন্দকে?

দুলাল একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

এমন সময় মাথায় একটু ঘোমটা টেনে থান-কাপড়-পরা পুত্রবধূ পারুল ছেলেকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াল শ্বশুরের পাশে। তা'র চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তার এই দেবরটি তার বন্ধু, সুহৃদ।

দুলাল চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে, বৌদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বড় বড় চোখ চক চক করতে লাগল। সে তার কোল থেকে ভাইপোকে টেনে বুকে তুলে নিলে।

তাকে সন্তর্পণে কপালে চুমো খেয়ে বাপের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—আমি তাড়াতাড়ি আসব। দেরী করব না।

কিন্তু সেই যে সে গেল তার আর ফেরবার নাম নেই। কলকাতায় পৌঁছে সে পৌঁছানো সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল, তাতেও লিখেছিল— যেতে আমি দেরী করব না। তবে সামান্য কয়েকটা দিন দেরী হচ্ছে এদিককার কাজকর্ম মেটাতে।

তারপর আর তার কোন সংবাদ নেই। সুধাকান্ত দেখেন বাড়ীটা একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। আগে যে বাড়ী ভর্তি ছিল, আনন্দ-কোলাহলে মুখর ছিল সেই বাড়ীতে আর মানুষ নেই যেন। একটি সদ্যোজাত শিশু আর একটি সদ্যবিধবা তরুণী। কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। অথচ এই দূরত্বের অসীম সমুদ্র ভেলা বেঁধে পরস্পরের কাছে যাতায়াতের দায়িত্ব তো তাঁরই। অশোক সবে হামা দিয়ে বেড়াতে শিখেছে। তাকে নিয়েই দিন কাটে তাঁর। মাঝে মাঝে পুত্রবধূর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন,

গল্প করেন। তিনি পারুলকে বলেছিলেন—মা, এই সময় তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসো। তোমার মন এখানকার চেয়ে শান্তিতে থাকবে।

পারুল প্রথম দিন কোন উত্তর দেয় নি। দ্বিতীয় দিন সুধাকান্ত আবার তাঁকে ঐ কথা বললে সে বলেছিল—আমার তো বাপ-মা আছে আমি নয়তো তাদের কাছে যাব। কিন্তু আপনি কার কাছে থাকবেন? আপনাকে, আপনার গোবিন্দকে কে দেখবে?

সুধাকান্ত হেসে বলেছিলেন—আমার জন্যে ভেবো না মা। ভট্টাচার্য-বামুনের ছেলে রান্না করতেও জানি, পূজো করতেও জানি। কাজেই তুমি কিছু ভেবো না।

পারুল একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিল—আপনি তো ভাবতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু ভগবান যে আমার ঘাড়ে রাজ্যের ভাবনা চাপিয়ে দিলেন তার থেকে এড়ান পাবো কি করে?

সুধাকান্ত আর কোনদিন তাকে কিছু বলেন নি। সেই থেকে আবার গোবিন্দকে প্রণাম করে পারুলকে আর তার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নতুন করে সংসার বেঁধেছেন। দুলালের আর কোন সংবাদ নেই। সুধাকান্ত জানেন দুলাল এমনিই। সে সন্ধ্যার রক্তমেঘের মত নিঃসঙ্গ হয়ে আছে আপনার খেয়ালে। কোন দিন হয়তো তার থেকে দু ফোঁটা জল মাটিতে পড়েছে বলে অবিশ্রান্ত বর্ষণে সে তাঁর সংসার ভিজিয়ে দেবে এ কল্পনাই ভুল। পাছে বাঁধা পড়তে হয় বলে সে বিয়েই করলে না।

যাক, সে নিয়ে দুঃখ করে কি হবে! সে নিয়ে দুঃখও তিনি করেন না।

তাঁর চোখের দৃষ্টিও পালটেছে, গ্রামখানাও পালটে গিয়েছে যেন। নিজের বাল্যকালে যে গ্রাম যে মানুষকে দেখেছেন, প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তাঁর স্মৃতির অনুসরণ করে গ্রামকে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন। বড় বড় মানুষগুলো মাপে ছোট হয়ে গিয়ে তাঁর চোখের আর মনের রঙ ধুয়ে দিয়েছিল। অকস্মাৎ প্রৌঢ় বয়সে দেখলেন গ্রামের অঙ্গন আবার বড় মাপের মানুষে ভরে উঠেছে আনন্দচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাবে। আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আপনার গৃহকোণের অন্ধকার গর্ভবাস পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন নরনাথবাবু নব কলেবরে। তারই সঙ্গে এসেছিলেন গোকুলবাবু;

বসন্ত বাতাসের মত আকস্মিকভাবে এসে আবার অন্তর্ধান করেছেন। গ্রামের সামান্য মানুষ সাধারণ মানুষ যে খগেন, সেও সঙ্গ গুণে অকস্মাৎ মানুষের কল্পনায় সবারই মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ তাদের খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার সব ভাল মন্দ, মমতা-বিদ্বেষ-অহঙ্কার নিয়ে চলে গিয়েছে খেলা শেষ করে। অঙ্গন শূন্য পড়ে আছে নূতন খেলুড়ের অপেক্ষায়।

থাকবার মধ্যে আছে খগেন। সে আবার গাছপালা নিয়ে মেতেছে। মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছে তাকে দুলাল। দুলালের সঙ্গে তার বয়সের কত তফাৎ। অথচ সে দুলালের সঙ্গে কি বিচিত্র এক সখ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। এই অসম বন্ধুত্বের টানেই সে মাঝে মাঝে আসে সুধাকান্তের কাছে। কিছুক্ষণ করে বসে থাকে, গল্প করে, আবার চলে যায়। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন ওর মনের চেহারা কেমন একমুখী। যে প্রসঙ্গ-আলোচনাই আরম্ভ হোক খগেন তাকে টেনে নিয়ে যাবে তার দুলাল সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ফুলগাছের দিকে। তার হাসিও লাগে মমতাও হয়।

এ ছাড়া আর আছে লোকনাথ। সুধাকান্তের মনে হয় ব্যক্তিত্বে সে কোন দিক দিয়েই আনন্দচন্দ্রের চেয়ে খাটো নয়। আনন্দচন্দ্রের পরিণত বয়স আর অগাধ ঐশ্বর্য এই দুইয়ে মিলে তাঁর ব্যক্তিত্বের চারিপাশে যে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছিল তা লোকনাথের চরিত্রে নেই। কিন্তু এমন এক তেজস্বিতায় সে সর্বক্ষণ প্রদীপ্ত যে তার সেই মহিমা গ্রামের সব চেয়ে স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষের চোখেও ধরা পড়েছে। আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিনের সংগ্রামে সে যত আঘাত পেয়েছে, প্রতিদিন সে যত নূতন ক্ষততে লাঞ্ছিত হয়েছে, ততই যেন তার তেজ, তার মহিমা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সম্পত্তির মধ্যে আর তার কিছু নেই, আছে বোধহয় সামান্য বিঘে দশেক ধানের জমি, ভাঙাভগ্ন বাড়ীটা। নরনাথবাবু আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে হতমান, ভগ্নজানু হয়ে দুর্যোধনের মত আবার অন্ধকার গৃহকোণ আশ্রয় করে মৃত্যুর মধ্যে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে পরিত্রাণ পেয়েছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের মামলায় ধীরে ধীরে তাঁর পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির কবচকুণ্ডল একে একে কেটে কেটে ফেলে তাঁকে হীনবল করার সংগ্রাম চলেছিল প্রতিদিন। দারিদ্র্যের নাগপাশের পেষণে হাসি হাসিমুখেই হরাশায়িনী হয়েছে। তার বড় মেয়েও

মায়ের পাশে শুয়েছে। এখনও রথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত একমাত্র ছেলের হাত ধরে কেবল মাত্র আপনার বীর্যের রথচক্র ধারণ করে অমিত মহিমায় সে দাঁড়িয়ে আছে। বিপক্ষ বহুদিন যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সরে গিয়েছে রণক্ষেত্র থেকে। কিন্তু আজও দুই চোখে জ্বালা নিয়ে সে সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে তৈরী।

তাঁর সঙ্গে লোকনাথের প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়। একমাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার চোখের প্রদীপ্ত দৃষ্টি একটুখানি নরম কোমল হয়ে আসে। দুটো চারটে কুশল-প্রশ্নের মধ্য দিয়েই পরস্পরের হৃদয়ের গূঢ় ও আন্তরিক স্পর্শ পেতে অসুবিধা হয় না কারও। দুটো চারটে কুশল-প্রশ্ন বিনিময় করেই আলাপ প্রতিদিন সমাপ্ত হয়।

এখন তার সংসারের সমস্ত বন্ধন কেটে গিয়েছে এক ছেলে ছাড়া। ছেলেকে নিয়েই তার বিপদ হয়েছে। ছেলেকে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ীর কাছে রেখে এসেছে সে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নাতিকে বুকে তুলে নিয়ে তিনি নাকি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—বাবা, আমার হাসির কপাল যত ভাল তত মন্দ। ওর কপাল যদি ভালই না হবে তো শিবের মত স্বামী পাবে কেন? আর ওর কপাল যদি মন্দই না হবে তো এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছেড়ে সংসারের সমস্ত সুখ ফেলে ওকে যেতে হবে কেন?

উত্তরে অত্যন্ত তিক্ত হাসি হেসে লোকনাথ নাকি বলেছিল—আপনি ঠিকই বলেছেন মা। সংসারে সে শিবের মত স্বামীও পেয়েছিল, আর অনেক সুখও পেয়েছিল। তবে কি না ওর কপালে শিব দেখা দিয়েছিলেন রুদ্র হয়ে, আর ওর সব সুখটা কোন্ মায়াতে দুঃখ হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে শ্বাশুড়ীর কাছে রেখে এসেই সে আবার সেই পুরানো দিনের লোকনাথ হয়ে উঠেছিল। মুখের সেই মেঘ কেটে গিয়ে সেই আগেকার দিনের দায়িত্বহীন হাসি আবার তার মুখে ফুটে উঠেছিল নতুন করে। তাকে সে সম্বন্ধে একদিন সুধাকান্ত প্রশ্নও করেছিলেন—কি হে এত হাসি খুসী কেন?

উত্তরে হেসেই সে বলেছিল—কি জানেন, ভগবানের দয়া। যে বন্ধন সহ্য করতে পারে না ভগবান তার সব ভার বন্ধন দূর করে দেন। বলে সে হা হা করে হেসেছিল

সুধাকান্ত তাকে আর কোন প্রশ্ন করেন নি। লোকনাথের সেই অট্টহাস্য তাঁর কাছে হাহাকারের মতই মনে হয়েছিল।

এ সব অনেক দিনের কথা।

লোকনাথের কথা মনে হতেই সুধাকান্তের মনে পড়ল ক'দিনই লোকনাথের সঙ্গে দেখা হয় নি।

তাঁর বাড়ীর সামনে জুড়ি এসে দাঁড়াল। জুড়ি থেকে নামল মণি। আজকাল মণিই সব দেখাশোনো করছে। সে অধিকাংশ সময়ই থাকে কলিয়ারীতে, এখানে তার অবর্তমানে দেখাশোনা করেন রসিকবাবু। মণিও বাবার পাটটি পুরোপুরি বজায় রেখেছে। গ্রামের লোকের সঙ্গে সামান্য তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ্য করে মামলা মোকদ্দমা, ঝগড়া-ঝাঁটি করতে তার বাধে না। আনন্দচন্দ্রের চেয়ে তার আগ্রহ এ দিক দিয়ে যেন অনেক বেশী। তার আগ্রহ যদি বা কোন মুহূর্তে শিথিল হয়ে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার শিথিল আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে রসিক বাবু আছেন।

কিশোরের মৃত্যুর সময় মণি গ্রামেই ছিল। সে এসেছিল সেই পরম বিপদ আর বেদনার মুহূর্তে। প্রায় সারারাত্রি সে এখানে ছিল। তার পর মধ্যে মধ্যে দু একদিন অন্তর সে এসেছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বসে গল্প করে গিয়েছে। মণিকে সুধাকান্তের তার নানান দোষ সত্ত্বেও বেশ লাগে। এই পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সে এক বিশাল ঐশ্বর্যের অধিকার আর এত বৃহৎ দায়িত্ব পেয়ে বয়সের চেয়ে অনেক বেশী গাম্ভীর্যের ভান করে। অথচ তার স্বভাব আসলে গম্ভীর নয়। তাই তাঁর মনে হয় মণি যেন সর্বদা একটা গাম্ভীর্যের খোলস পরে থাকে।

মণি আসতেই সুধাকান্ত বললেন—এস, মণি এস বাবা।

—হ্যাঁ এই একবার এলাম কাকামশায়! সামাজিকতায় মণি আশ্চর্য রকম পারঙ্গম। আনন্দচন্দ্রের এ গুণ ছিলনা। তবে নিজের ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি মানুষকে কাছে টানতে পারতেন।

পরম সমাদর করে সুধাকান্ত বললেন—বস বাবা, বস!

মণি নিজের কথায় পঞ্চমুখ। সে বলতে লাগল—অনেক আগেই আপনার কাছে আসব ভেবেছিলাম। তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে গেলেন হঠাৎ। তাঁকে বিদায় করতেই দেরী হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব

বললেন—দেখ মণি বাবু, তোমাদিগে সরকার বিশেষ বিশ্বাসই শুধু করে না, তোমাদের মত লোকের ওপর সরকার নির্ভর করে। তোমরা দেশের স্তম্ভ। তোমার কাছে আজকে আসার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

—সায়েবের কথা শুনে তো চিন্তা হল। ভাবলাম কি আবার হল। তা সায়েব বললে—দেখ দেশের অত্যন্ত দুর্দিন আসছে। গান্ধী বলে একজন ব্যারিস্টার সাউথ আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় এসে বৃটিশ সরকারকে তাড়াবার মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে। সে ননকো-অপারেশন মুভমেণ্ট করবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। দেশের লোককে সে তাতাবার মিথ্যে চেষ্টা করছে। অবশ্য আমরা জানি ইণ্ডিয়ার লোক অত্যন্ত রাজভক্ত। তারা কিছুতেই গান্ধীর ডাকে সাড়া দেবে না। কিন্তু তবু আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তোমার গ্রাম এবং এই অঞ্চলকে ঠাণ্ডা রাখবার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। এই কথা বলবার জন্যেই আমি এসেছি। ইংরেজ সরকার রাজভক্ত প্রজাদের সব সময়ই মনে রাখে। তোমার এই কাজের বিনিময়ে গভর্ণমেণ্ট তোমাকে খেতাব দিয়ে সম্মান করবে। তারপর আরও অনেক কথা হল।

সুধাকান্তও শুনেছেন বটে কথাগুলো। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত গুরুতর তা তিনি বোঝেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরকে যখন আগে থেকে সাবধান করবার জন্যে ছুটে আসতে হয়েছে তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। তিনি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে মণির কথাগুলি শুনলেন।

মণি অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললে—আচ্ছা কাকামশায়, দুলালের খবর পেয়েছেন? কেমন আছে সে? সে যে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী আসবে--আপনি সেদিন বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসব বলেই তো গিয়েছিল। কিন্তু আর কৈ আসবার নাম দেখি না। কোন চিঠিপত্রও পাই নি।

—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওর কথাও জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সুধাকান্তের বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল। পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করলেন--ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব কি বলছিলেন?

মণি একটু ঢোক গিলে একটু হেসে বললে—জিজ্ঞাসা করছিলেন—

তোমাদের এখানে কে একজন ভটচাজ কলকাতায় প্রফেসারী করত, সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে এসেছে? আর কিছু না।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গেলেন। দুলাল যে কথা মাত্র তাঁর সামনে বলে গিয়েছে সে খবরটুকুও ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কানে পৌঁছে গিয়েছে! একেই বলে শাসনের বেড়াজাল। কিন্তু তার চাকরী ছাড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কি যায় আসে! তিনি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দুলালের কোন ভয়ের ব্যাপার কিছু নেই তো!

মণি ছোট ছেলেকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে উচ্চহাস্য করে বললে—এই দেখুন, আপনি পাগল হলেন দেখছি! না, না, ভয়ের কিছু নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ভয়ের কিছু থাকলে আমি আপনাকে সব খুলে বলতাম না?

মণির কথায় সুধাকান্ত নিশ্চিন্ত হলেন।

মণি উঠল, বললে—আমি উঠি কাকামশায়। আবার আসব।

—এসো বাবা! বলে সুধাকান্ত তাকে বিদায় দিলেন।

মণির জুড়িখানা চলে যেতেই তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল লোকনাথ আপনার ছেলের হাত ধরে। দাওয়ার উপর থেকে সুধাকান্ত তাকে সাগ্রহ সম্বর্ধনা জানালেন—এস, এস লোকনাথ এস। এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? ক' দিনই দেখা হয় নি তোমার সঙ্গে।

লোকনাথ সুধাকান্তের কথার কোন জবাব দিলে না। সে ছেলের হাত ধরে অপসৃয়মান জুড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হবে উঠল, চোয়াল শক্ত হয়ে মুখের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

সুধাকান্ত ওর মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি আবার ডাকলেন—ওহে লোকনাথ, ওখানে দাঁড়িয়ে গেলে কেন? এসো, উঠে এসো।

লোকনাথ যেন সম্বিত ফিরে পেলে। সে যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল, চমকে উঠে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে যাই। আয়রে খোকা! আয় উঠে আয়!

ছেলেকে নিয়ে সে সুধাকান্তের দাওয়ায় উঠে এল। ছেলেকে প্রথমেই বললে—বস্‌রে খোকা।

অকস্মাৎ সুধাকান্তের দিকে ফিরে লোকনাথ বললে—তা জমিদার-মশাই এসেছিলেন কেন? কি উদ্দেশ্য ওঁর? তারপর অনেকটা আত্মগত ভাবে সে বললে—নিশ্চয়ই এসেছিল কোন কাজ হাঁসিল করবার জন্তে। ফিকির ছাড়া তো ঘোরে না ওরা। যাক মরুক গিয়ে। তারপর সুধাকান্তের দিকে ফিরে সে বললে—আপনার কাছে একবার এলাম ছেলেকে নিয়ে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, একশো বার আসবে। এসো বাবা! তারপর খবর কি বল?

লোকনাথ হাসল। বললে—একটা কাজ নিয়েই এসেছি আপনার কাছে।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে সুধাকান্ত বললেন—বল, বল।

লোকনাথ কিন্তু তখনই কিছু বলতে পারলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল—কি জানেন, আমার তো বন্ধনের মধ্যে এই এক বন্ধন—আমার ছেলে! দেশব্যাপী একটা বৃহৎ আন্দোলন দিন দিন আসন্ন হয়ে উঠছে। এই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে আমাকে। যোগ দিলেই অপমানিত হব, মার খাব, হয়তো জেলও হবে। আমি যে লড়াইয়ে নামব তো আমার ছেলেকে আমি রেখে যাব কার কাছে? আর আমার মনে হচ্ছে আমি জেলে গেলে জেল থেকে আর ফিরব না। আমার শরীর খুব ভাল নয়। ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছি—সেটা প্রায়ই বুঝতে পারি। সেই জন্তেই ছেলেটার একটা ব্যবস্থা না করে গেলে মরেও আমি শান্তি পাব না। সেই জন্তেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

লোকনাথকে তিনি সর্বদাই যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি বিশেষ সাহায্য সে চাচ্ছে তা সঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলেন।

লোকনাথ চিরদিনকার উন্মাদ। নিজের দিকটায় সম্ভব-অসম্ভব কোন দিন বিচার করে নি। চিরকাল সে অসম্ভবের তপস্যা করে এল। সে বললে—আমি কি বলছি আপনি এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি দেখতে পাচ্ছি। আমি এখান থেকে চলে যাব। হয় তো আমার এই যাওয়া শেষ যাওয়াই হবে। তাই আমার ছেলেকে আমি আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই। এই আমার তিন বছরের মাতৃহীন শিশু, একে আমি কার কাছে দিয়ে যাব আপনি ছাড়া?

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গেলেন। এই পাগল বলে কি! তিনি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকনাথ বললে—আমি যদি ফিরে আসি আবার ওকে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব। আর যদি না আসি ওকে আপনি কিশোরের কি দুলালের ছেলে বলেই মানুষ করবেন। আপনি তা করবেন জেনেই ওকে আপনার হাতে দিয়ে চল্লাম। আমার ওকে দিয়ে যাবার মত কিছুই নেই। বিঘে দশেক জমি আর আছে। সেইটা আপনি নিয়ে নেবেন।

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—আমার ছেলেকে আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনি মানুষ করবেন। ও যেন শান্ত, সুস্থ আর সুখী হয়। আপনার বংশে যে একটি স্নিগ্ধ শান্তি আছে নিজের তপস্যায় ও যেন তার অংশ পায়। আমার মত আপনার আগুনে যেন আপনি না পুড়ে যায়। ও যেন সুখী হয়।

কথা শেষ করে বলতে বলতে লোকনাথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুধাকান্তের মনে হল—একটা অগ্নিস্রাবী আগ্নেয় গিরি ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়ে তার ভিতর থেকে উষ্ণ জলধারা বেরিয়ে এসে যেন তার অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘোষণা করছে।

সুধাকান্তের চোখ থেকেও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আপনার চোখের জল নিয়েই তিনি লোকনাথের কাছে উঠে এলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন—আমি মানুষ করব তোমার ছেলেকে। আমার অশোকের মতই ওকেও বুকে করে রাখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আর এ কথাই বা ভাবছ কেন যে তুমি ফিরে আসবে না! তুমি ফিরে এস, তুমি আমার পুত্রতুল্য, আমি তোমাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলব। অনেক রৌদ্র, অনেক দাহ তুমি ভোগ করেছ। ফিরে এসে আমার কাছে তুমি বিশ্রাম নেবে।

লোকনাথ একটু হাসল মাত্র।

তারপর নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে বললে—আমি যাই। ও থাকল।

ছেলেটি দাওয়ার ওপরে বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে ওদের দিকে তাকিয়ে। মাজা মাজা রঙ, মুখের গড়নটি লোকনাথের মত, কিন্তু মুখে মায়ের লাবণ্য, এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গায়ে একটি পিরান, পরনে একটি

খাটো ফরাসডাঙার ধুতি। সে কথাটিও বলে নি, হাসেও নি। সে কেবল চুপ করে তাকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে ওদের দেখছে।

লোকনাথ উঠে এসে একবার ছেলেকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে। তারপর ক'টা চুমো খেলে তার মুখে, মাথায়। তারপর আবার তুলে দিলে সুধাকান্তের কোলে। ছেলেটি কোন কথা বললে না, সুধাকান্তের কোল থেকে অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে একটি অর্থহীন হাসি ফুটে উঠল।

লোকনাথ অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্না থামলে সুধাকান্ত বললে—ওকে আমার কাছে দিয়ে তো যাচ্ছ, ওর চার্জটা বুঝিয়ে দাও।

চোখের জল মুছে লোকনাথ সুধাকান্তের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর প্রশ্নটার অর্থ সঠিক বুঝে সে হেসে ফেললে। বুঝলে সুধাকান্ত তার মনটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করছেন। সে হেসে বললে—আমি আর আমার ছেলে একেবারে শিবাজীর শিলদার সৈন্য। আমাদের নিজের নিজের গায়ের জামা কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। আমার শাশুড়ীর কাছ থেকে আজ আনবার সময় তিনি ওকে কটা পিরান আর কাপড় দিচ্ছিলেন। আমি নিই নি। ঋণ সংসারে আপনার কাছেই থাকল। আর দোসরা লোকের কাছে ঋণ রেখে লাভ কি! ওকে নিয়ে আসায় শাশুড়ী কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু আমি নিয়ে এলাম। ওখানে থাকলে মমতা পেত, শিক্ষা পেত না। এখানে দুই-ই পাবে ও।

তারপর অকস্মাৎ একেবারে টান হয়ে দাঁড়িয়ে সে একটু হাসলে। তারপর হেঁট হয়ে সুধাকান্তকে প্রণাম করে বললে—এইবার আমি আসি।

সুধাকান্তের বুকের ভিতরটা একবার হায় হায় করে উঠল। চলে যাবে, ও এখনি চলে যাবে? থাকুক, ও আরও কিছুক্ষণ থাকুক। সুধাকান্ত সাগ্রহে বললেন—বাবা লোকনাথ, তুমি খেয়ে যাও রাত্রে। লক্ষ্মী বাবা আমার!

লোকনাথ থমকে গেল যেন। সুধাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে তার দুই চোখ চকচক করে উঠল। সে এগিয়ে আবার চৌকির ওপর বসে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন লোকনাথ প্রণাম করে বিদায় নিলে তখন অনেকখানি রাত্রি হয়েছে। পল্লীগ্রামের এক প্রহর রাত্রি। প্রায়

নিশুতি হয়ে গিয়েছে। সুধাকান্ত আলো ধরে দাওয়া থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ালেন লোকনাথকে আলো দেখাবার জন্যে।

ঘর থেকে যখন তাঁরা বেরিয়ে এলেন তখন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁরা ঘর থেকে বেরুবামাত্র তাঁদের চোখের সামনে দিয়েই পারুল ঘুমন্ত ছেলেটিকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল।

যাবার সময় লোকনাথের মুখে একটি অস্পষ্ট হাসি লক্ষ্য করলেন সুধাকান্ত। বুঝলেন পুত্রের প্রতি যে স্নেহ ও সমাদর প্রত্যাশা করে লোকনাথ এসেছিল তা তার পূরণ হয়েছে। সে অতি নিশ্চিন্ত মনেই যেতে পারবে।

অকস্মাৎ মণির বিকেলের কথাটা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি তাকে বললেন—খুব সাবধানে যা করবার ক'রো বাবা। মণি বাধা দেবে। আজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে মণিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে গিয়েছেন।

ঘৃণায় লোকনাথ আপনার দুই ঠোঁট কুঞ্চিত করে বললে—মণি জমিদার-নন্দন হলে কি হবে, মানুষের উপর আধিপত্য ওর কতটুকু! আমি যখন ডাক দোব তখন এ অঞ্চলটা উথলে উঠবে। আর সাবধানে থাকার কথা বললেন না! যে কাজে নামলাম সে তো সাবধানে করবার কাজ নয়। সে যে প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে লড়াই! যা হোক আপনি ভাববেন না কিছু। আমি আবার ফিরে আসব আপনার কাছে।

সুধাকান্ত আলোটা তুলে ধরলেন। অগাধ অন্ধকারের মধ্যে যে স্বল্প পরিসর একটু জায়গা তার আলোয় আলোকিত হল তারই মধ্য থেকে লোকনাথের নিঃসঙ্গ যাত্রা আরম্ভ হল। ভারী পদক্ষেপে অতি নিশ্চিন্ত দ্রুত পদক্ষেপে লোকনাথ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সুধাকান্ত আলোটি হাতে করে একবার অসংখ্য নক্ষত্রঝলমল আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন যেন লোকনাথের বিপদ ও ভয় যথাসম্ভব কম হয়; সে যেন আবার সুস্থ দেহে ফিরে আসে।

তার ক'দিন পরেই লোকনাথকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল শোভাযাত্রা পরিচালনা করবার অপরাধে। বিচারে তার ছ' মাস জেল হল।

লোকনাথের জেলের খবর আসবার পরদিন তিনি একখানা চিঠি পেলেন কলকাতা থেকে। দুলালের এক ছাত্রই হবে বোধ হয়। সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

আপনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দুলালবাবুর পিতা ; সেই কারণে আপনি আমার প্রণাম লইবেন।

অত্যন্ত আনন্দ ও অহঙ্কারের সঙ্গে জানাইতেছি যে আপনার পুত্র, আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দুলাল বাবু ইতিপূর্বেই কলেজের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এবং আজ কয়েকদিন হইল অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিশাল এক জনসভায় বক্তৃতা করায় দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করিবার অপরাধে তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের ও আপনার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি জেলে যাইবার পূর্বে আমাকে জানাইবার জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসোমনাথ রায়।

চিঠিখানা পড়ে তিনি মর্মাহত হলেন। দুলাল চাকরী ছেড়ে জেলে গিয়েছে? যাক, যা খুশী করুক! তিনি কোন দিন কিছু বলেন নি, আজও বলবেন না। তিনি চিঠিখানা আবার পড়লেন। পরে তিক্ত হাসি হাসলেন। "দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মোচন"! "গৌরব অর্জন"! ভাল! খুব ভাল! যা খুশী করুক! জেল থেকে বেরিয়ে আর হয়তো সে ফিরবেই না!

দুলাল সেই যে গেল আর কৈ এলই না!

দুলালের জন্যে দিন গুনে গুনে প্রত্যাশা করে সুধাকান্তের চোখ ক্লান্ত হয়ে গেল, মন অবসন্ন হয়ে এল।

সেই দুলাল একদিন ফিরে এল।

আসবার আগে কাউকে সে কোন খবর দেয় নি। জেল থেকে খালাস পেয়ে সে সোজা গিয়েছিল পুরী বেড়াতে। সেখান থেকে ফিরে আপনার প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে, দু চার জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে সে বাড়ী চলে এল।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ অন্দোলনে যোগ দিয়ে সে ভেবেছিল সমস্ত জীবনটা ধরে চলবার রাজপথ বোধহয় সে পেয়ে গেল এবার। কিন্তু জেলে গিয়েই আস্তে আস্তে তার ভুল ভেঙে গেল। অনেক গোলমাল,

অনেক কাজ, অনেক আলোচনার আয়োজন এ পথে। তা ছাড়া এ পথ সমবায়ের পথ, একার পথ নয়। তার উপর আদর্শবাদে আর প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্মে এখানে প্রতি মুহূর্তে সাংঘাত ঘটে। আদর্শের আলোকস্তম্ভকে ধারণ করবার জন্যে বহুতর সংগুপ্ত কর্মের ও সংগঠনের প্রয়োজন হয় এখানে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারলে এ পথ তার নয়। সে সকলের সঙ্গে চলার মানুষ নয়, সে যোগ্যতা বা প্রবণতা কোনটাই তার নেই। সে একাকী নিশ্চিন্ত ধ্যানের মানুষ। আর সে এমন বস্তুর ধ্যান করে যার বাস্তবমূল্য এক কানা কড়িও নয়, যার কথা প্রকাশ্যে বললে এই কঠিন পরিশ্রমী অন্নবস্ত্রবাসস্থান সমস্যার সমাধানে নিরত বন্ধুদের কাছে উপহসিত হবার সম্ভাবনা আছে। জেলে এসে সে ভাল করেই বুঝেছে তার পথ কি—যে পথে একলা নিঃসঙ্গ হয়ে আপন খেয়ালে চলতে চলতে কখনও সে ছুটেছে, কখনও দাঁড়িয়ে গিয়েছে অকারণে, কখনও পথেই বসেছে, যে পথে কারও হুকুম কি নির্দেশ মানতে হয়নি, যে পথের কোন লক্ষ্য নেই, গন্তব্য নেই, যাত্রাতেই যার আনন্দ, যে পথরেখা একা তারই, যে পথে আর হয়তো কেউ কোন দিন যাবে না—সেই-ই তার পথ। সে তো এ রাজপথের মানুষ নয়। জেলে গিয়ে সে চিনতে পেরেছে নিজেকে সঠিক ভাবে। এবার থেকে সে আবার আপনার পুরানো পথেই চলবে। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে।

সে ভোর বেলায় স্টেশনে নামল। বাড়ী এখান থেকে মাইল ছয় সাত দূর। এ ভাবনাটা সে ভাবে নি। বাড়ীতে খবর দেওয়া নেই যে গাড়ী আসবে। এখন গাড়ীই বা কোথায়? সে নিজে হয়তো হেঁটে যেতে পারবে। কিন্তু এই যে একটা সুটকেশ আর বিছানা সঙ্গে—এতেই তার মুস্কিল হয়েছে।

কিন্তু মুস্কিল আসান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। স্টেশন থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে ছেলেটির চোখমুখ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে তাকে প্রণাম করে বললে—স্যার, এই ট্রেনে নামলেন? বাড়ী যাবেন?

দুলাল বুঝলে—তার ছাত্র। ঠিক চিনতে পারলে না সে। সে হেসে বললে—যাক্ তোমার দেখা পেয়ে ভালই হল। তুমি আমার একটু উপকার কর দেখি। আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও, দেখি তুমি কেমন বাহাদুর!

ছেলেটি দুলালকে কলেজে দেখেছে। তার ছাত্র হিসেবে অসাধারণ

খ্যাতির কথা শুনেছে। উদীয়মান লেখক হিসাবে দুলালের রচনার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তার উপর অধ্যাপক হিসাবে তার কাছে পড়েছে। তার অসাধারণ কৃতিত্ব আর তার চরিত্রের গাম্ভীর্যের ফলে যে দূরত্ব ছিল ছাত্রদের সঙ্গে—এই দুইয়ের জন্য তাকে দূর থেকেই দেখেছে ছেলেটি; আর তার চারি পাশে এক অসাধারণত্বের জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছে আপন মনে। তারপর চাকরী ছেড়ে জেলে যাওয়ায় সে জ্যোতির্মণ্ডলের দীপ্তি যেন বেড়েই গিয়েছে। সেই অতি দূরের অসাধারণ মানুষের সঙ্গ লাভ করে ছেলেটি যেন কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেল। তার মুখের অনুরোধে বিগলিত হয়ে ছেলেটি বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে হাত পা ধুয়ে একটু চা-জলখাবার খাবেন না? জোর করে অনুরোধ করতে ছেলেটির সাহসে কুলোচ্ছে না যেন।

দুলাল হাসল। আন্তরিক স্নেহে তার কাঁধের উপর একটা হাতের সস্নেহ চাপ দিয়ে বললে—না হে, এখন আর খাব না। আবার একদিন ফেরবার পথে চেয়ে খেয়ে যাব। খাওয়া আমার পাওনা থাকল। আজ বাড়ীর জন্যে বড় মন কেমন করছে। এখন বাড়ী যাব। আমি বরং হেঁটে চলে যাই। তুমি একটা লোক দিয়ে আমার জিনিষগুলো আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিও, কেমন?

দুলালের সস্নেহ বাক্যে ও স্পর্শে ছেলেটির চোখে জল এল। সে চোখের জল লুকোবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

দুলাল ছেলেটির মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে সস্নেহে একটু হেসে তার কাঁধে আবার একটু মৃদু আঘাত করে বললে—আমি আজ যাই, কেমন?

সে পথে পা বাড়ালে। সে চলতে চলতে ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারলে ছেলেটি সাগ্রহ সজল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে দ্রুতপদে চলতে লাগল।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের গেরুয়া কাঁকরের পাকা রাস্তা উঁচু-নীচু টিলার উপর দিয়ে কখনও উঠে কখন নেমে সোজা চলে গিয়েছে। ফাল্গুনের শেষ, চৈত্রের প্রথম। রাস্তার দু ধারে নানান রকমের গাছ। কোন গাছ এরই মধ্যে কচি পাতায় ভরে গিয়েছে, কোন গাছের মাথায় দুটি চারটি কচি পাতায় বসন্তের মাত্র আভাসটুকু ধরা পড়েছে। কোনোও গাছ একেবারে একান্ত

রিক্ত হয়ে হাড় বের করা বৃদ্ধের মত পত্রোদ্গমের তপস্যায় আকাশমুখী হয়ে আছে যেন।

সূর্যোদয় হয় নি এখনও। পাখীরা একবার ডেকে থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। বাতাসও যেন থমকে আছে, বাতাসের লেশ মাত্র নেই। সে জনশূন্য রাস্তার দু পাশে আপন মনে তাকাতে তাকাতে পথ চলেছে। দু চোখ ভরে বুভুক্ষুর মত দেখতে দেখতে চলেছে সে।

রাস্তার ঢাল থেকে উপরে উঠতেই তার পূর্বদিগন্তের দিকে নজর পড়ল। দিক্‌প্রান্তে আবছা আবছা মেঘলার মধ্য থেকে রক্তিম অগ্নিপিণ্ডের মত যেন একেবারে মৃত্তিকাগর্ভ থেকে সূর্য উঠে আসছে। হঠাৎ এই সময়েই এক ঝলক দমকা বাতাস উঠল। গাছের কচি পাতা ঘুমভাঙা ছোট ছেলের মত নেচে উঠল। পত্রহীন গাছের উপরের পাতলা ডালগুলো দুলতে লাগল। পাতার আড়াল থেকে পাখীরা ডাকতে ডাকতে আকশে ছুটে গেল। দুলালের মনে হল অকস্মাৎ যেন একটা মহোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত। তার সমস্ত দেহমন যেন টান করে বাঁধা বীণার তারের মত সেই আশ্চর্য প্রাণ-চঞ্চল মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে আবার সব থেমে এল। উড়ে যাওয়া পাখীরা গান সাঙ্গ করে আবার গাছের ডালে এসে বসল; বাতাস থেমে গেল, গাছের পাতার কাঁপন কমে এল। পাতাগুলি খেলা শেষ করে আবার যেন ঘুমে এলিয়ে পড়ল। তার মনে হল যেন কারা অতি গোপনে এক প্রাণ-চঞ্চল উল্লাসে আত্মহারা হয়ে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি করতে নেমে এসেছিল সকলের অগোচরে। কিন্তু একজন অবাঞ্ছিত মানুষ যেন সব দেখে ধরে ফেলেছে বলে সেই উতলা অপ্সররা ছুটে আবার আকস্মিক অন্তর্ধান করলে। সে বাইরের মানুষ, বাইরেই রয়ে গেল। কিন্তু যে কয়েকটি মুহূর্ত সে তাদের সঙ্গী হতে পেরেছিল তারই আস্বাদনে তার সারা মন ভরপুর হয়ে আছে। সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে পূর্বদিগন্তে তাকালে, দেখলে সূর্য সেখান থেকে আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে।

সে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল। ওঃ, রৌদ্র উঠে গেল! কখন পৌঁছবে বাড়ীতে!

অনেকক্ষণ হেঁটে পথ ভাঙলে। তার গ্রাম দেখা যাচ্ছে। উঁচু রাস্তার

উপর থেকে সমস্ত গ্রামখানা দেখা যাচ্ছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে গ্রামের দিকে চেয়ে দেখলে। গাছপালার ভিতর দিয়েও চাপ বাঁধা সবুজের মাথা ছাড়িয়ে সর্বপ্রথমে নজরে পড়ছে আনন্দচন্দ্রের কীর্তিশ্রেণী। একের পর এক নানা আকারের পাকা ইমারত। সবচেয়ে উঁচুতে দেখা যায় আনন্দচন্দ্রের বাড়ী। আরও উঁচুতে দেখা যায় আনন্দচন্দ্রের গোবিন্দ মন্দিরের চূড়ার কলস সকালের আলোয় ঝকমক করছে। তারই নীচে, অনেক নীচে, সবুজ বনশোভার কোলে কোলে ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় খড়ে-ছাওয়া বিনম্র গৃহস্থ বাড়ীগুলি। দেখতে দেখতে তার দুই চোখ জলে ভরে এল। ঐখানে অতি সাধারণ মানুষগুলি, তারই পরমাত্মীয়রা, অতি সহজ সাধারণ নম্র নিঃশব্দ জীবনযাত্রা অতিবাহন করে চলেছে।

কেমন এক ধরণের অহঙ্কারে উল্লাসে তার সারা মন অধীর হয়ে উঠল। সে যেন কোন দূর দূরান্তর থেকে এই তীর্থে পৌঁছবার জন্যে পায়ে হেঁটে আজ তীর্থ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দেবতারা ঐ তো সামান্য দূরে, অতি নম্র নিঃশব্দভাবে তাদের অতি সাধারণ অথচ আশ্চর্য জীবন যাপন করে চলেছে। সে যে এখনই তাদের ঐ জীবনধারায় আপনার জীবন মিশিয়ে দেবে এ কথা ভাবতেও তার মন এক অলৌকিক অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠল।

অল্পক্ষণ পরেই সে এসে দাঁড়াল আপনাদের বাড়ীর দরজায়। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করে সে ডাকল—বাবা, বাবা!

ডাক শুনে সুধাকান্ত দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন এই ভাবে দুলালকে দেখে।

সুধাকান্তের মনে হল প্রণাম করে উঠলেই তিনি দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু পারলেন না। আজীবনের সংযমের শিক্ষা তাঁকে বাধা দিলে। তিনি ছেলের হাত ধরে বললেন—আয় বাবা, আয়। এমনি করেই কি দেরী করে আসতে হয়!

বাড়ীতে ঢুকে সংসারের আর দুজনের প্রত্যাশায় বাড়ীতে চারিদিকে তাকাতে লাগল সে। কৈ, তারা কৈ? ঐ যে রান্নাঘরের দাওয়ায় থানকাপড়-পরা মূর্তিমতী শুভ্র বিষণ্ণতার মত দাঁড়িয়ে আছে পারুল বৌদি।

রান্নাঘরের চালা থেকে তার প্রতি অভিমানাহত বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দুলাল বুঝলে—সে রান্নাঘরের চালা থেকে নামবে না। কিন্তু ও কি। তার দু পাশে দুটি কচি কচি মুখ উঁকি দিচ্ছে। ছোটটা তো অশোক। ও বুঝি হাঁটতে শিখেছে। দুষ্টুটা তা হলে বড় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ বড়টি কে? ঐ যে ভীতু ভীতু চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে বৌদিদির পিছনে দাঁড়িয়ে। তার ভারি ভাল লাগল।

সে উঠল। সুধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করলে—ও ছেলেটি কে বাবা?

—ও আমাদের গণনাথ। লোকনাথের ছেলে। লোকনাথ তো জেলে। আমাকে দিয়ে গিয়েছে যাবার সময়। সুধাকান্ত লোকনাথের প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

বাবার কথা শুনতে শুনতে সে রান্নাঘরের চালার কাছে গিয়ে জুতা খুলে প্রণাম করলে, বললে—পায়ে আর হাত দিলাম না। তুমি তো এখন ঠাকুর হয়ে আছ। আমি যদি ছুঁই তোমার জাত যাবে এখন।

পারুল বৌদি কোন কথা বললে না। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

দুলাল ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে বললে—আয়, আমার কাছে আয়।

বড় ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে পারুলের পিছনে লুকিয়ে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি ছোট অশোকও মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দুলাল হাসতে লাগল হা হা করে। সে রহস্য করে দুই হাত প্রসারিত করে করে বললে—আমি তাড়কা রাক্ষুসী। ধরব তোদের! কিন্তু খাব কি করে? এ যে মন্ত্রপূত গণ্ডী দিয়ে ঘেরা যায়গায় তোরা দাঁড়িয়ে আছিস। আয় বেরিয়ে আয়, তোদের ধরে বুকে তুলে নিই।

সুধাকান্ত অবাক হয়ে গেলেন। সেই গম্ভীর মিতভাষী দুলাল এমনি করে হাসছে, রহস্য করছে! এ কেমন করে সম্ভব হল? কিন্তু হাসিতে আর রহস্যে কি সুন্দর লাগছে ওকে!

বিকেল বেলা সে বেড়াতে বেরুল একাই। সুধাকান্তের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যান। দুলাল কৌশলে ওঁকে নিরস্ত করলে। সে গিয়ে পৌঁছুল খগেনের বাড়ীতে।

সে যেমন প্রত্যাশা করেছিল ঠিক তেমনিটিই দেখলে গিয়ে। বাগানে নূতন

করে বেড়া পড়েছে, বাড়ীটি আবার ঝকঝক করছে! খগেন বাগানের মধ্যে হেঁট হয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ছে।

সে বাগানের বাইরে থেকে সবটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে। কি আশ্চর্য আশা আর বিশ্বাসে ভরা মন ঐ মানুষটার! ঈর্ষ্যা করবার মত। সে ডাকলে—পিসেমশায়।

খগেন প্রথমটা শুনতেই পেলে না। সে তখন গাছের নীচে একটা পাথর কি ইটের টুকরোর সন্ধান পেয়েছে। আপন মনে সেই পাথরের টুকরোটাকে সম্বোধন করে বিড় বিড় করে বকছে—উপায় নেই বাবা, কোন উপায় নেই। উঠে এস মাণিক আমার। ওখানে লুকিয়ে থাকা তো চলবে না। তুমি যে গোপনে ভেতরে লুকিয়ে থেকে আমার গাছটিকে মারবে সেটি চলবে না। তোমাকে আমি তুলবই। কষ্ট আমার হবে। তা তো হবেই। তবু তুমি বেরিয়ে এস অন্ধকার থেকে।

দুলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে লাগল। অকস্মাৎ তার মনে হল মনের মৃত্তিকার তলদেশে যে সব কাঠিন্য আর অবিশ্বাসের কঠিন স্তর রয়েছে সেই খানেই আত্মার অন্ধকার খনন করে চলেছে খগেন।

মাটির ভিতর থেকে পাথরটা বের করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে খগেন। ও বাবা, তোমাকে যত ছোট ভেবেছিলাম তাতো নও, তুমি এত বড়! কত জায়গা নিয়ে বসেছিলে বাবা।

এইবার দুলাল ডাকলে—ও পিসেমশায়।

খগেন চমকে পিছন ফিরে তাকে দেখে ছুটে এল। ধুলো মাখা হাতেই তাকে জড়িয়ে ধরলে—বাবা আমার, এসেছ? এতদিনে এলে?—আসবার সময় হল? আর চলে যাবে না তো?

দুলাল হেসে বললে—না, এইবার থাকবার জন্যেই এলাম। কিন্তু আমি যে অনেক নতুন নতুন গাছের বীজ নিয়ে এসেছি।

—কই কই, দাও। খগেন হাত বাড়িয়ে দিলে।

—সব কিন্তু বিলেতি ফুল। মরসুমী ফুল। কেবল রঙের বাহার।

—ভালই তো। দেশী তো অনেক করলাম, গন্ধও অনেক দেখলাম। এবার বিলেতি রঙ-বাহারের চাষ করি।

—কিন্তু আমার সেই তারা কোথায়? মালতী, বকুল আর অশোক।

—এস। এই দেখ। সেই কতটুকুটি দিয়ে গিয়েছিলে, আর কেমন কত বড় হয়েছে দেখ সেই অশোক—এ যেন বছর আষ্টেকের ছুলাল ছেলে। রাতে মরে, দিনে বাঁচে। ওকে বড় যত্ন করতে হয়। এই তোমার সেই বকুল। দেখ কেমন শক্ত-পোক্ত চোদ্দ-পনর বছরের ছেলের মত হয়ে উঠেছে।

দুলাল বকুল গাছটার দিকে তাকালে। কালো কালো শক্ত পরিষ্কার পাতায় সরল ডালগুলি সব ভর্তি। বাতাসে দুলছে।

খগেন বললে—কিন্তু এইবার তোমার সেই মালতীকে দেখ। ঐ দেখ কেমন বেড়েছে। আমার চালাটা ভর্তি করে ফেলেছে রাক্ষুসী। কি বাড়াই বেড়েছে। এবার ফুলও দিয়েছে। মেয়ে কি না, তাই বাড়-বাড়ন্তটা একটু বেশী আর বড তাড়াতাড়ি।

দুলাল হাসলে, বললে—তাহলে পিসেমশায়, আমার কন্যা মালতী-লতার তো ঐ ছোকরা-বকুল গাছে আর জড়িয়ে ওঠা হবে না। ওর জন্য আর নতুন গাছই বা পাই কোথায় ? ও আপনার চালেই থাকুক।

তারপর একটু থেমে হেসে বললে—জানেন পিসেমশায়, আগেকার দিনে এক মহাকবি বনতোষিণী বলে এক লতার সঙ্গে সহকার তরুর বিবাহ দিয়েছিলেন। আমরা মহাকবি নই, কবিও নই ; তবু আমরা আমাদের বকুলের বিয়ে দোব। দু এক বছর যাক।

দুলালের কথা শুনে খগেনের মুখ চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকৌতুকে দুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখ হৃদ্য হাসিতে বিকশিত হয়ে উঠল। সে বললে—এটা তুমি আচ্ছা বলেছ। লেখক মানুষ কিনা। মাথায় কত রকম খেলে। তা হলে সত্যিই আমরা তাই করব। তা হলে এই বর্ষায় এই পাশে একটা মালতীর চারা পুঁতব কি বল।

দুলাল হেসে ঘাড় নাড়লে—তাই করবেন। কিন্তু একটা কথা, এ কথা কিন্তু কাউকে বলবেন না। তা হলে আমাদের দু জনকেই পাগল ভাববে লোকে।

খগেন হাতের বুড়ো আঙুল তুলে বললে—আমি লোককে যেন থোড়াই কেয়ার করি। আমার কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। নিজের খেয়ালে নিজেকে নিয়ে থাকি। আমি লোকের সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

দুলাল বললে—কেন থাকেন না? মানুষের মাঝখানে থাকেন, মানুষের সঙ্গে মিশবেন না—এ কেমন কথা?

—তুমি আমাকে মানুষের সঙ্গে মিশতে বলছ? একবার মানুষের সঙ্গে মিশে আমার হাডশুদ্ধ গুঁড়ো হবার জোগাড়। আনন্দচন্দ্র আমাকে প্রায় বস্তার ভেতর পুরে লাঠি মেরে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন। নেহাৎ আমার বরাৎ-জোর তাই বেঁচে গিয়েছি। আনন্দচন্দ্র কি করে গিয়েছেন গোটা গ্রামের মানুষের মনে কর তো? যার সংস্পর্শে এসেছেন, যার কথা মনে হয়েছে, তারই ঘাডটা জোর করে ধরে আপনার পায়ে নুইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই পেরেছেন কি পুরোপুরি? পারেন নি। মামলা-মোকদ্দমায় মানুষকে বিব্রত করে তুলেছেন, শেষ পর্যন্ত সবাইকে গিয়ে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়তে হয়েছে। তবে ছেড়েছেন। তাঁর মার খেয়ে আমার স্ত্রী ম'ল, আমার মামাশ্বশুর মরে খালাস পেলেন। কিন্তু পারলেন না তিনি দুটো মানুষকে। সর্বস্বান্ত হয়েও আমি আর লোকনাথ তাঁর পায়ে মাথা ছোঁয়াই নি। জান, আমি আন্দাজ করতে পারি—আমাদের দুজনের ঘাডটা নোয়াতে না পেরে তাঁর কি কষ্টই হয়েছে! তিনি আমাদের যত মেরেছেন ততই ভেবেছেন—এইবার লোক দুটো ভেঙে নুইয়ে পড়বে। কিন্তু যতবার সে আশা পূরণ হয়নি ততবারই তাঁর মনে হয়েছে—আমাদের দুজনের মাথা দুটো তাঁকেও ছাড়িয়ে আকাশে উঠেছে। যত সেকথা ভেবেছেন ততই কষ্ট হয়েছে তাঁর। তবে একটা কথা বাবা দুলাল, তুমি যদি না থাকতে, তুমি যদি আমাকে সেই একশো টাকা পাঠিয়ে সাহসের ছোঁয়াচ না দিতে তা হলে আমরা কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতাম না।

দুলাল এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে বিগতকালের বিরোধের কাহিনী শুনছিল। তার নিজের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সে সচেতন হয়ে নিশ্বাস ফেলে বললে—আমার কথা বাদ দিয়ে যে কথা বলছিলেন বলুন।

—আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা। এইতো তাঁর কথা। তাঁর ছেলেও ঠিক সেই রাস্তা ধরেছে। সমস্ত গ্রামের লোককে জ্বালিয়ে দিলে। আবার নতুন করে ফাঁদ পেতে ঝগড়া করছে গ্রামের লোকের সঙ্গে। গ্রামের লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আর মনে মনে রাগে গজরাচ্ছে।

দুলাল এতক্ষণে বললে—মণি তো এমন লোক নয়।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খগেন বললে—না, নয় আবার! তুমি সারা জীবনটা বাইরে বাইরে কাটালে বাবা, তুমি জানবে কি করে?

দুলাল জোর করে বললে—নাঃ, আপনাদের কোথায় ভুল হচ্ছে একটা! আচ্ছা দু চার দিনের মধ্যে মণির কাছে যাব আমি। দেখি, তার ধাতটা বুঝে আসি।

খগেন স্থির বিশ্বাসে বললে—তা ভাল, তুমি একবার দেখেই এস।

মাথার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই সে এসেছিল। একখানা আলাদা ঘর তার চাই। সাঁওতালদের বাড়ীর মত গড়নের এককামরা একতলা খড়ের ঘর। অমনি পরিপাটী, অমনি পরিচ্ছন্ন।

বাড়ীর ভিতর সুপ্রচুর জায়গা। খামারে আমগাছের আর ধানের গোলার পাশে ঘর পত্তন হল। এককামরা ঘর, তার সঙ্গে একটা স্নানের ঘর। সুধাকান্ত খুব খুশী হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন দুলাল সত্যিই এখানে থাকবার জন্যে এই সব আয়োজন করছে। তিনি খুশী হয়েই বাড়ী তৈরীর সমস্ত খরচটা দিতে চেয়েছিলেন। দুলাল তা নেয় নি, বলেছিল—তার বইয়ের টাকা থেকেই সব হয়ে যাবে। তাতেও যদি লাগে সে চেয়ে নেবে।

সে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে, বাড়ী থেকে না বেরিয়ে বাড়ীটা তৈরী করালে। সে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখত। আমের মুকুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা বুঁদ হয়ে থাকত। ধীরে ধীরে আমের মুকুল থেকে গুটি ধরল, আমগুলো গুটি থেকে বড়ও হল তার চোখের সামনে। সে বসে বসে কাজ দেখত আর অশোক-গণনাথের সঙ্গে খেলা করত। দেখতে দেখতে চোখের সামনে বাড়ীটা তৈরী হয়ে গেল। দেওয়াল-লেপা নতুন খড়ের চালের বাড়ীটাকে টোপর-পরা বিয়ের বরের মত মনে হতে লাগল। বাড়ীটা দুলালের একেবারে মনোমত হয়েছে। ঠিক যেন সাঁওতাল-পাড়া থেকে একখানি বাড়ী তুলে এনে কেউ বসিয়ে দিয়েছে এখানে। কেবল একটা জিনিষে ঘরখানাকে সে আধুনিক করে নিলে। মেঝে, দাওয়া সবটা সে বাঁধিয়ে নিলে বিলেতী মাটি দিয়ে।

সে বাড়ী করবার সময় মণির খোঁজ নিয়েছে। প্রথম একদিন গিয়ে ফিরেও এসেছে। মণি এখানে নেই, কালিম্পং গিয়েছে।

সুধাকান্ত আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহেই গৃহ-প্রবেশের দিনও ঠিক করে দিলেন।

খগেন এসে দাওয়ার নীচে চারিপাশে মরশুমি ফুলের বেড তৈরী করে ফুল লাগিয়ে দিয়ে গেল।

মণির সঙ্গে দেখা হতেই সে অবাক হয়ে গেল—তুমি! তুমি কবে এলে?

দুলাল একটু হেসে বললে—অনেক দিন। একদিন তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম, পাই নি। তুমি ছিলে না।

দুলালের আজকের আসায়, আর আরও একদিন সে এসেছিল—এই দুইয়ে মিলে মণি বিগলিত হয়ে গিয়েছে। দুলাল স্পষ্ট দেখতে পেলে তার মুখ চোখের চেহারা কেমন হয়ে গিয়েছে।

মণি হঠাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে কি বলবে ঠিক করতে পারলে না। কেবল বললে—তুমি—তুমি—

—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের কাছে থাকব বলেই তো এলাম। আর কিছু ভাল লাগল না। বই লিখেছি, চাকরী করেছি, চাকরী ছেড়েছি, জেল খেটেছি—অনেক করলাম ভাই। কিছু ভাল লাগল না। তাই তোমাদের কাছে থাকব, আর যদি ইচ্ছা হয় তো বই লিখব। বলে সে হাসতে লাগল।

মণিও হাসতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। একবার বললে—তুমি কত পাল্টে গিয়েছ দুলাল, তাই দেখছি।

দুলাল হাসতে লাগল। অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করলে—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? ছেলে-পুলে কি?

মণি বললে—ভাল আছেন। ছেলে-পিলে দুটি।

—রাধারাণী কেমন আছে? তার বিয়ে কোথায় হল?

প্রশ্নটা শুনেই মণির বুকের ভিতরে যেন একটা সুপ্ত ক্ষোভের মেঘ অকস্মাৎ ফেনিয়ে উঠল। সে একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললে—ভালই বিয়ে হয়েছে। তোমাকে বাবা অনুরোধ করলেন, তুমি তো সে অনুরোধ রাখলে না ভাই।

দুলাল অপ্রস্তুত হল না, হেসে বললে—ভাই রাজকন্যার কি রাখাল ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা সাজে?

এই সামান্য উত্তরের মধ্যেই দুলাল নিজের আর্থিক অবস্থাহীনতার যে স্বীকারোক্তি করলে তাতেই তার মনের ক্ষোভ কেটে গেল। সে বললে—, আমার ছেলেদের সঙ্গে কাল আলাপ করিয়ে দোব। কাল এসো। প্রতিদিন এসো। এখানের লোক বড় খরাপ ভাই। মিশবার ইচ্ছা থাকতেও আর মিশতে পারছি না। বড় একা লাগে।

—আসব, প্রতিদিন আসব। এখানকার মানুষ খারাপ নয় ভাই। ভয়ে, অভিমানে তোমার সঙ্গে মিশতে পারে না।

এইভাবে প্রতিদিন বিকেলটা তার কাটতে লাগল মণির সঙ্গে। সে না গেলে মণিই ছুটে আসে তার কাছে। বলে—জান, তোমাকে ছেড়ে বিকেল বেলা কিছুতেই থাকতে পারি না আর! ভালই লাগে না একেবারে তুমি না গেলে।

কোনদিন বলে—জান দুলাল, তোমার বাবা আর আমার বাবা এমনি বহুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছেন। আবার আমরাও কাটাচ্ছি।

একদিন বললে—আমার বড় ছেলের একটা নাম রেখে দাও দেখি ভাই! আমার নাম রেখেছিলেন তোমার দাদু। তুমি আমার ছেলের নাম রেখে দাও। কত বড় লেখক তুমি।

তার অনুরোধে সে মণির বড় ছেলের নাম রেখে দিয়েছে সত্যেন্দ্র চন্দ্র।

একদিন বিকেল বেলা অন্য দিনের মত বেড়াতে গিয়ে দেখলে—মণি অত্যন্ত বিব্রত চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে আছে।

সে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল বল তো?

অত্যন্ত বিরস ভয়ার্তমুখে মণি বললে— আর বল না ভাই। আজ ক'দিন থেকে রসিকবাবুর জ্বর হয়েছে। কাল সহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে দেখিয়েছি। তিনি বললেন—টাইফয়েড। এখন আমি যে কি বিপদে পড়েছি তোমাকে কি বলব ভাই। এদিকে রসিকবাবুর টাইফয়েড, আর ওদিকে আমার দু বছরের ছোট ছেলেটা ওর অত্যন্ত স্নাওটা। সে ছাড়া পেলেই বারে বারে ছুটে যাচ্ছে রসিকবাবুর কাছে। ধরলে কান্নাকাটি করছে।

দুলালের মনে পড়ল—এই ক'দিন মাত্র আগে তার সঙ্গে রসিকবাবুর দেখা হয়েছিল। তিনি কথা বলেন নি তার সঙ্গে। পূর্বের কথা স্মরণ করে রসিকবাবু মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

সেই মানুষটির অসুখের কথা মনে হতেই অকস্মাৎ তার মন মমতায় আতুর হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে—ওঁর বাড়ী কোথায়? বাড়ীতে কে কে আছেন?

বিরক্ত মুখে মণি বললে—সেই তো আর এক মুস্কিল। ওঁর তিনকূলে কি কেউ আছে? কেউ নেই। আর বাবার আমলের মানুষ। ফেলতেও পারি না, বাবা হাসপাতাল করে দিয়েছেন, সে হাসপাতালেও পাঠাতে পারি না। অথচ কে যে সেবা করে তার ঠিক নেই।

দুলাল উঠে দাঁড়াল। বললে—এস, একবার ভদ্রলোককে দেখে যাই।

মণি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। দুলাল বুঝলে মণি যেতে ভয় পাচ্ছে। সে বললে—তোমার বোধ হয় কাজকর্ম আছে। ঐ দেখ লোক দাঁড়িয়ে আছে। তোমার বোধহয় কাছারী যাবার সময়ও হয়েছে। তুমি কাছারী যাও, আমি একবার দেখে যাই ভদ্রলোককে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।

মণি বাঁচল যেন। হাঁফ ছেড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমিই বা গিয়ে কি করবে? কি দেখবে?

দুলাল একটু হেসে বললে—তবু যাই, একবার দেখে আসি।

রসিকবাবুর ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে সে দাঁড়াল।

প্রায়-অন্ধকার ঘর সন্ধ্যার মুখে একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘরের জানলা বন্ধ। সমস্ত ঘরে একটা ভাপসা গুমোট গন্ধ। অন্ধকারের মধ্যে দুলাল অনুভব করলে চৌকির উপর রসিকবাবু রোগের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

সে চৌকির পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই রসিকবাবু অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলেন—কে?

তারপরই চুপ করে গেলেন! তারপর রোগজর্জর কণ্ঠ যথাসম্ভব কোমল করে বললেন—কে বাবা মণি?

—না, আমি দুলাল।

রসিকবাবু চুপ করে গেলেন। দুলাল বুঝলে রসিকবাবু মনে মনে মণিকেই প্রত্যাশা করেছিলেন। আশাভঙ্গ হয়ে চুপ করে গেলেন।

এই সময় আলো নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকল।

দুলাল তাঁর মাথার কাছে বসল। বসে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তাঁর মাথায়।

রসিকবাবু ক্লান্ত জ্বরোত্তপ্ত রক্তাভ দুই চোখ মেলে একবার অত্যন্ত সবিস্ময়ে তাকালেন দুলালের দিকে। পরক্ষণেই আবেগে চোখ দুটি আবার মুদে এল। শুধু একান্ত নির্ভরতায় একটি কম্পিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। তাঁর একখানা জ্বরোত্তপ্ত হাত দুলালের হাতের উপর এসে পড়ল।

যে চাকরটা আলো দিতে এসেছিল সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাকে দুলাল বললে—একটা কাজ কর তো ভাই। আমার বাড়ী গিয়ে আমার বাবাকে কি বৌদিদিকে বলে এস যে আমি রাত্রে এখানেই থাকব।

রসিক বাবুর অসুখের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে। অসুখ কমবার তো কোন লক্ষণই নেই, বরং অসুখ বেড়েই চলছে। অসুখ যত বাড়ছে মণি তত বিব্রত বিরক্ত হচ্ছে। তার ছোট ছেলেটি প্রায় চাকরের পাহারা এড়িয়ে ছুটে রসিক বাবুর ঘরে চলে আসে। অচেতন রসিক বাবুকে ছোঁবার চেষ্টা করে।

দুলাল লেগে গিয়েছে রসিক বাবুর সেবায়।

সেদিন তার ছোট ছেলেকে ঠিক মত না আগলাবার অপরাধে মণি প্রচণ্ড তিরস্কার করে একটা চাকরকে জবাব দিয়ে দিলে। দুলাল তাকে শান্ত করে চাকরটাকে প্রহার থেকে বাঁচিয়ে আবার চাকরিতে বহাল করিয়ে দিলে।

দুলাল তাকে বললে—এক কাজ করি মণি। রসিক বাবু আজ বেশ সুস্থ আছেন, চেতন আছেন। আমার বাড়ী তো এই কাছেই, ওঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। তাতে করে খোকনেরও আসা বন্ধ হবে, আমারও সেবা করার সুবিধে হবে।

তার প্রস্তাব শুনে মণি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এ কি পাগল নাকি? অনাত্মীয়, পরের বাড়ীর মানুষের সেবা করছ রাত দিন সেই বেশ। তার ওপর আবার সেই রোগীর সঙ্গে ডেকে রোগকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়! নিয়ে গেলে অবশ্যই সে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু লোকে বলবে কি! আর সেটাই বা কেমন দেখাবে! সে মুখে বললে—তা কি ক'রে হয়! সেটা কি ঠিক হবে?

দুলাল বুঝলে—মণির আপত্তি নেই। কেবল লোকলজ্জার ভয়ে পারছে না, তার প্রস্তাবে সম্মতি দিতেও ওর সঙ্কোচ হচ্ছে, দ্বিধা হচ্ছে। দুলাল জোর ক'রে ওর সঙ্কোচ দূর করে দিলে, বললে—আমার সেবা করতে বড় অসুবিধে হচ্ছে মণি। আমার নিজের সুবিধে হয়।

আপনার নতুন ঘরে ভাল করে চৌকী বসিয়ে পরিষ্কার বিছানা পেতে জানলা খুলে দিয়ে সে বুকে করে রসিক বাবুকে নিয়ে এসে পরম আদরে মমতায় শুইয়ে দিলে।

সকলেই অবাক হয়ে গেল ওর এই ব্যবহারে। সুধাকান্ত সুপ্ত মৌখিক বিরক্তি প্রকাশ করলেন। সে আষাঢ় মাসের মেঘের ছায়ার আস্তরণ-পড়া আপনার নতুন ঘরে রসিক বাবুর বিছানার পাশে বসে থাকতে থাকতে বাইরে একবার বেরিয়ে এল।

বাইরের পৃথিবী তার প্রতি মুহূর্তের মাধুরী নিয়ে তার চোখ থেকে তার মন থেকে সরে গিয়েছে যেন। তার জায়গায় এই রুগ্ন মানুষটি সারা মন জুড়ে বসে আছে। সে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুনতে পেলে—এ যে কি রকমের কাজ তা আমি বুঝি না। নতুন ঘর, গৃহ প্রবেশ হয় নি। দিন নাই, ক্ষণ নাই, এক রোগীকে সেই ঘরে এনে তুললে। তুললে একেবারে আমার গোবিন্দ-বিগ্রহের মত।

সে শুনতে পেলে পারুল-বৌদি বলছে—ও পাগল বাবা, ওর কথা কেন ধরেন?

সুধাকান্ত বললেন—বলিনিও কোন দিন কিছু। আর বললেও শোনে না। দিন দিন পাগলামি যেন বাড়ছে। বিয়েও করলে না!

দুলাল তাদের অগোচরে দাঁড়িয়ে সব শুনে বুঝলে, বাবা রাগ করেন নি আসলে। কেবল তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে। আর তাঁর আসল আক্ষেপটা একেবারে অন্য জায়গায়।

সে ঘরের মধ্যে আবার রোগীর পাশে গিয়ে বসল। রসিক বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। বললেন—বাবা দুলাল, মণি বুঝি আমাকে আর বাড়িতে রাখলে না? তাই তুমি নিয়ে এলে?

দুলাল হাঁ হাঁ করে উঠল—না, না, সে কি কথা! আপনার সেবা

করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল বলে আপনাকে নিয়ে এলাম। মণি তো ছাড়তেই চায় না আপনাকে। সে তো প্রতিদিন ছেলেদের নিয়ে আসে সন্ধ্যের সময় আপনাকে দেখতে। আপনি তখন ঘুমোন।

মিথ্যা কথা বলে না দুলাল। তবু মিথ্যা কথার কত তৃপ্তি তা সে বুঝলে আজ। রসিক বাবু নিশ্চিন্ত সুখে পাশ ফিরে শুলেন।

এই ক'দিনে রসিক বাবু তার বুকের কাছে ছোট ছেলের মত দেহে মনে আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেক কথাই এ ক'দিনে তিনি বলেছেন দুলালকে মণির সম্পর্কে, তার ছেলেদের সম্পর্কে। তাঁর অগাধ ভালবাসার কথা, তাঁর আত্মীয়হীন অসহায়তার কথা, দুলালের সঙ্গে এই নব পরিচয়ের কথা সব বলেছেন। শেষে বলেছেন—তোমাকে বড় দেরীতে চিনলাম বাবা। তবে চিনলাম এই ত অনেক। এমন করে ভালবাসার, সেবার স্বাদ কখনও পাইনি বাবা জীবনে!

দুলাল শুধু দুই চোখ ভরে দেখেছিল। সেই কুটিল-পথচারী, এ গ্রামের মানুষকে বহু নির্যাতনে উৎসাহদাতা মানুষটি যে কেবলমাত্র আনন্দচন্দ্র আর মণির স্নেহের কাঙালপনায় সমস্ত অপকর্ম করে তাঁদের মন পেতে চেয়েছেন এ সত্য আর কেউ না বুঝুক, এমন কি মণিও না বুঝুক, সে বুঝতে পেরেছে।

অনেক সেবা, অনেক মমতাতেও দুলাল রসিক বাবুকে বাঁচাতে পারলে না। তেইশ দিন রোগ ভোগ করে তিনি বিদায় নিলেন সংসার থেকে। দুলালই মুখাগ্নি করে তাঁর সৎকার করলে।

নতুন ঘর আবার যেমনকার তেমনি নতুন। কেউ কোন দিন এ ঘরে তার জীবনের শেষ লীলা সমাপ্ত করে গিয়েছে—তার চিহ্ন মাত্রও দুলালের চোখে পড়ল না।

সেদিন বিকেল বেলা আবার আগেকার মত আমগাছতলায় অশোক আর গণনাথকে নিয়ে সে খেলা করছিল। মণি এল সঙ্গে আপনার দুই ছেলেকে নিয়ে। দুলালই তাদের নাম রেখেছে সত্যেন্দ্রচন্দ্র আর দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র।

দুলাল দুই হাত প্রসারিত করে তাদের ডাকলে—এস, এস।

মণি হাসল। বললে—হ্যাঁ এলাম। তা তোমার মত আদর কেউ করতে পারে না ভাই।

দুলাল আবার হাসলে।

মণি বললে—সেই জন্যেই তো ওদিকে নিয়ে এলাম তোমায় খেলার পাঠশালায় ভর্তি করে দিতে।

দুলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমাদের দল বাড়ল হে গণ বাবু।

মণি অকস্মাৎ বললে—আচ্ছা দুলাল, তুমি কি করবে গাঁয়ে বসে বসে?

দুলাল মিটি মিটি হাসল, কোন জবাব দিলে না।

মণি বললে—তার চেয়ে কিছু কাজের কাজ কর না কেন।

দুলাল এবার একটু জোরে হেসে বললে—না ভাই, ভগবান আমাকে খেলা করেই কাটাবার সনদ দিয়েছেন। তারপর একটু থেমে বললে, ভাই মণি, তুমি হাড়-জোড়ার পাতা দেখেছ? গরু বাছুর ছাগলের শরীরের কোন জায়গা ভাঙলে কি চোট লাগলে আমাদের ঘরে সেই হাড়জোড়ার পাতা দিয়ে বেঁধে দেয়! ভাঙা হাড় বেমালুম জুড়ে যায়। আমিও আমার মনে তেমনি মন-জোড়ার চারা লাগিয়ে তার চাষ করছি। এই খেলা আমার সেই চাষ। অনেক মন অনেকে অবুঝ ছোট ছেলের মত অকারণে না জেনে ভেঙেছে। তার যদি এক আধটাতেও জোড় লাগাতে পারি তা হলেই অনেক হবে।

মণি হাসল ম্লান হাসি। বললে—তোমার কথা তো ভাই চিরকালের হেঁয়ালী।

দুলাল তার চোখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—তুমি আমার কাছে কোন দিন হেঁয়ালী নও ভাই। আমি জানি তুমি আমাকে ছেলেবেলা থেকে কি ভালই বেসে আসছ। সেই ভালবাসা পেলাম ভাই নতুন করে। এ ছেড়ে কি যেতে পারি?

মণির দুই চোখ সজল হয়ে উঠল। দুলালও তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে হল এই ক'দিন আগে পর্যন্ত মরণাহত রসিক বাবু তার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ছোট ছেলের মত দুলছিলেন। এবার সেই শূন্য জায়গায় মণি এসে যেন তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুজনের দৃষ্টিকে অবলুপ্ত করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে।

দুই

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলালের একটি করে নতুন আনন্দের দিন আরম্ভ হয়।

সে ওঠে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই। সুধাকান্ত অবশ্য তার আগেই উঠেন। সে ঘুম ভাঙতেই শুনতে পায় সুধাকান্ত উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছেন। ভোরে ওঠা নিয়ে সুধাকান্তের সঙ্গে তার একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিন্তু কোন দিন সে সুধাকান্তকে হারাতে পারে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সুধাকান্তের স্তোত্র পাঠ শুনতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটে উঠে—পারলে না, সে প্রবীণ সুধাকান্তকে আজও হারাতে পারলে না।

বিছানা থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ে বেড়াতে। সে-ই বাড়ীর দরজা খোলে। দরজা খোলার শব্দ পেলেই সুধাকান্ত বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোন দিন এমনই ছেলের বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেন নিঃশব্দে। কোন দিন বলেন, সাবধানে যেও রাস্তা দেখে। এখনও অন্ধকার আছে। কোনদিন শুধু মাত্র বলেন, বেড়াতে চললে?

উত্তর দিয়ে দুলাল বেরিয়ে পড়ে। দ্রুত পায়ে গ্রাম ছাড়িয়ে কোন দিন পূবে, কোন দিন পশ্চিমে সে বহুদূর ঘুরে আসে। গ্রীষ্মের শেষ থেকে শীতের মধ্যকাল পর্যন্ত পথে সাক্ষাৎ হয় হাল-বলদ নিয়ে ক্ষেতের পথে যাত্রী মানুষের সঙ্গে। প্রথম প্রথম তাকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াত। তাকে ভাল করে না দেখলে, না চিনলেও তার সম্বন্ধে নানান বিচিত্র গল্প তাদের মধ্যে আলোচিত হয়। আজকাল তাদের সকলের সঙ্গে তার হৃদ্য পরিচয় হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখলেই তাদের প্রত্যেকটি মানুষ একগাল হেসে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে, বলে—ঠাকুর মশায়, বেড়াতে চললেন?

প্রথম প্রথম তার নিজের মনেই সন্দেহ ও সঙ্কোচ হত। ওদের সঙ্গে মিশবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও মনে হত—ওকে কি ওরা ঠিক মত আপনার

লোক বলে বিশ্বাস করবে? কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে আলাপ করতে গিয়ে দেখেছে—পরস্পরকে বুঝতে পরস্পরের কোন অসুবিধা হল না। অত্যন্ত সহজেই তাদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে।

ভোরে সে তাদের সঙ্গে বিশেষ গল্প করে না। তখন বেড়াবার জন্যে দ্রুত পদক্ষেপে সে প্রায় ছুটে চলে। গ্রামের বাইরে চারিদিকেই পছন্দমত সব জায়গা আছে তার। সেইখানে গিয়ে সে বসে। চুপ করে বসে বসে সূর্যোদয় দেখে। সমস্ত প্রভাতের মাধুর্যটিকে সে হৃদয়ে ধারণ করে নিয়ে আসে। গাছতলায় বসে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে সে অনুভব করবার চেষ্টা করে—এই প্রথম আলো, বাতাস, যে গাছটির নীচে সে বসে আছে সেই গাছ, আর সে নিজে—এই সব কিছুর মধ্যে যে একটি মিল আছে সেই একাত্মতাকে অনুভব করবার চেষ্টা করে। যে মন নিয়ে সে যায়, তার চেয়ে ভিন্ন মন নিয়ে সে ফেরে।

তার বাড়ী ফিরবার আগেই অন্য সকলে উঠে পড়ে। গোটা বাড়ী, উঠোন গোবর-মাটিতে নিকানো তার মধ্যেই হয়ে যায়। উনোনে আগুনও পড়ে যায়। এই সময় ভাইপোরা পরম আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে তার জন্যে—সে এলে তার সঙ্গে খেতে বসবে তারা। সে বাড়ী এলেই জল-খাওয়ার সমারোহ আরম্ভ হয়। সে নিজে বসে উনোনের পাশে। পারুলবৌদি চা চিনি দুধ সব ঠিক করে রেখে তার জন্যে অপেক্ষা করে। সে চা করে নিজে খায়, কখনও পারুলকে অনুরোধ করে খেতে। পারুল বিধবা, খাবে কি করে? এমন কি ইচ্ছা থাকলেও খেতে পারে না। শ্বশুর সামনে ওদিকের বারান্দায় বসে থাকেন বই নিয়ে। তাদের জীবনলীলার দিকেই তাকিয়ে দূর থেকে ওদের লীলা উপভোগ করেন বসে বসে।

দুলাল চা খায়, তার সঙ্গে বাটিতে করে মুড়ি চিনি, কলা দুধ একসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ মেখে অশোক আর গণনাথের সঙ্গে ভাগ করে খায়। তাদের সঙ্গে মুড়ির ভাগ নিয়ে কপট কলহও করে। পারুল হাসে, ওদিকে বারান্দায় বসে সুধাকান্তের মুখও কৌতুকে হাস্যস্ফুরিত হয়ে ওঠে।

জল খাওয়ার পর দুলাল একেবারে অন্য মানুষ। সে হাত মুখ ধুয়ে একেবারে আপনার ঘরে গিয়ে বসে লিখতে। সে কি লেখে সেই জানে। অশোক আর গণনাথ দুজনেই এই সময় এসে ওকে জ্বালাতন করবার ইচ্ছায় ঘুর ঘুর করে। কিন্তু পারুল ওদের আটকে আটকে রাখে।

ঘণ্টা দুই তিন লিখে গায়ে জামাটি চাপিয়ে চটি পরে সে এইবার বেরিয়ে গেল পোস্টাপিস। তার নামে মাসিকপত্র চিঠি প্যাকেট একটা কিছু না কিছু থাকেই প্রতিদিন। পোস্টাপিস থেকে ডাক সংগ্রহ করে সে বের হয় লৌকিকতা করতে। কোন দিন যায় ইস্কুল, কোন দিন মণির কাছে, কোন দিন খগেনের কাছে। পালা করে গ্রামের প্রায় সব বাড়ীতেই এক আধ বার করে ছুঁয়ে আসে। কোথায় কবে যাবে তার একটা হিসেব তার মনের মধ্যেই থাকে।

ফিরে আসতে দুপুর ছুঁয়ে যায়। এসে সুধাকান্তের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে তেল মাখতে মাখতে। তারপর স্নান করে আহার। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে আপনার ঘরে। তারপর উঠে আসে পারুলের কাছে। ছেলে দুটো হুটোপাটি করে আর ওরা দু জনে গল্প করে—প্রায় বিশ্রম্ভালাপ।

এই সময়ে প্রায়ই পারুল তাকে আগে অনুরোধ করত বিয়ে করবার। বলত—আর একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে ভাই ঠাকুরপো। আমি একলা মেয়ে মানুষ—আর একা থাকতে পারছি না ভাই। তোমাদের সংসারের খাটুনীও আর খাটতে পারছি না। তুমি এইবার বিয়ে কর ভাই। আমার সঙ্গী এনে দাও।

তার এই সকরুণ আবেদন দুলাল কোন দিন হেসে উড়িয়ে দেয় নি। সব সময়ে গম্ভীরভাবে বলেছে—না পারলে চলবে কেন বৌদি? তুমি বাবার, আমার, এই অশোক, গণনাথ, সবারই মা। তুমি না পারলে চলবে কেন?

পারুলের চোখে জল আসত, বলত—ভাই, যেদিন আমি থাকব না সেদিন কি হবে তোমাদের?

এইবার দুলাল একটু হাসত, বলত—এ অকারণ ভাবনা কেন ভাব? তুমি না থাকলে হয় বাবা, না হয় আমি—আমরাই সব করব।

পারুল রাগ করে বলত,—তুমি বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

দুলাল তার রাগ দেখে হাসত। কোন জবাব দিত না।

পরমুহূর্তেই পারুলের রাগ আর জোর পরিবর্তিত হত সকরুণ আবেদনে। করুণ মিনতি করে বলত—কেন বিয়ে করবে না ভাই? বল না।

দুলালের সেই হাসি।

তখন সকৌতুকে পারুল জিজ্ঞাসা করত—হ্যাঁ ভাই, কাউকে ভালবেসেছ, নয়? বল না সে কে? কোন্ ভাগ্যবতী? তা তাকেই বিয়ে কর না কেন? তাকেই বিয়ে কর, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

দুলাল এবার সশব্দে হেসে উঠত।

আবার মিনতি করে পারুল জিজ্ঞাসা করত—বল না ভাই সে কে? কেমন দেখতে? খুব সুন্দরী নয়?

দুলাল সকৌতুকে ঘাড় বাঁকিয়ে পারুল-বৌদির মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিত—খুব সুন্দরী। সত্যি খুব সুন্দরী!

পারুল-বৌদি বলত—আমরা তার কাছে ঝিয়ের মত, না?

দুলাল বলত—কৈ তা তো ভাবিনি এমন করে। তুমি মা, আর সে—

পারুল হেসে ভেঙে পড়েছিল—আর সে—? বল, বল, শিগ্গির বল। সে কি ভাই?

দুলাল অকস্মাৎ মনের রাশ টেনে সংযত হয়ে গিয়েছিল। গম্ভীর মুখে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—সে কিছুই নয় বৌদি! সে কেউ নয়। সে পরের বাড়ীর কুমারী মেয়ে। তার সঙ্গে আমার বিয়েও হবে না কোন দিন। তাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

পারুল অপ্রস্তুত হয়ে গেল; বললে—আর কোন দিন বলব না ভাই! কেবল শেষ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; সে তোমাকে চিঠিপত্র লেখে? তার খবর পাও?

দুলাল অবাক হয়ে গেল। বললে—চিঠি লিখবে কেন আমাকে? আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কিসের? তার খবরও পাইনা, নিইও না তার খবর। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি হয় নি তাও জানি না। কত দিন চলে এসেছি।

সে উঠে চলে গিয়েছিল। পারুলও এর পর তাকে আর কোন প্রশ্ন করে নি।

দুলাল নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। তার মনে এই এক বেদনা ছাড়া আর কোনও বেদনা নেই। যা অসম্ভব তার দিক থেকে সে আপনার মনের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তার জন্যে

তার মনে যে বেদনা ছিল তা ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গিয়েছে; নিত্য নূতন আনন্দের স্তর দিয়ে সে বেদনাকে সে চাপা দিতে চেয়েছে। যা একান্তভাবে তার নিজের তা নিয়ে সে অন্য কাউকে বিব্রত করতে চায় না। তার প্রবল আত্মসম্মানে আঘাতই লাগে সে কাউকে আপনার কোন কর্ম, চিন্তা বা বেদনা দিয়ে বিব্রত করছে এ কথা ভাবলে। সে তাই আর আপনার বেদনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। তবু পারুল-বৌদির কথায় তার অলস মধ্যাহ্ন বিধুর হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আপনার ঘরে চলে গেল।

ঘরে আপনার লেখার আসনে বসে মন শান্ত করবার চেষ্টায় অসময়ে লেখা নিয়ে বসল সে। কিন্তু মন বসল না। বার বার মনে কত বিচিত্র চিন্তা এসে লেখা ভুলিয়ে দিয়ে গেল। আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি সুন্দরীর হাসি হাসি মুখ মনে বার বার উঁকিঝুঁকি দিয়ে সব ভুলিয়ে দিলে তাকে। বাইরে অলস রৌদ্রে মরশুমি ফুলগুলো কতক ফুটছে পরিপূর্ণ হয়ে কতকগুলি নেতিয়ে পড়ছে শুকিয়ে ঝরবার জন্যে। আমগাছের ছায়া পড়েছে তেরছা হয়ে। সেইখানে কতকগুলো চড়াই আর শালিখ কিচ কিচ করে বেড়াচ্ছে, ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। মৃদু বাতাসে আমগাছের পাতাগুলো কাঁপতে লাগল, মরশুমি ফুলগুলো দুলতে লাগল। মনের মধ্যে সেই হাসি হাসি মুখ, এই বাতাস, এই পুষ্পশোভা সব একসঙ্গে মিলে মনকে কেমন এক বেদনায় আতুর করে তুললে। এ বেদনাকে লালন করে আর কাজ নেই। এর তো শেষ নেই! যতই এই বেদনাকে সমাদর করে মনের মধ্যে স্থান দেওয়া যাবে ততই সে বসবে সমস্ত বুকটা জুড়ে। তার চেয়ে একে বিদায় দেওয়াই ভাল।

সে উঠল। পারুল-বৌদির ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকলে, ওরে অশোক গণু আয়।

তারা দু জনে যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এল তারা।

তাদের আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রতিদিনের মত সম্ভব-অসম্ভব নানান গল্প সে আরম্ভ করলে।

বিকেল হতে না হতে প্রথমেই আসে খগেন, খুরপী হাতে করে। সে এলেই আর বিশ্রামের উপায় নেই দুলালের। তাকে উঠতেই হবে। এক

এক দিন সে আপনার মেজাজ অনুযায়ী চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। খগেন এসে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেলে আপন মনেই সরবে বলে—আহা, খুব ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমুক। তারপর একাই গাছের গোড়া খুঁড়তে লেগে যায়। এক এক দিন আবার খগেনের ডাকের জন্যে সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। খগেন ডাকবামাত্র উঠে এসে কাজে লেগে যায়। গাছের গোড়া খুঁড়ে, বাজে ঘাস-পাতা পরিষ্কার করে জলধারায় গাছগুলিকে স্নান করিয়ে মাটিকে সিক্ত করে দেয়। রৌদ্রদগ্ধ ভিজে মাটি থেকে অপরূপ সোঁদা গন্ধ সমস্ত জায়গাটাকে ভরিয়ে তোলে।

কোন কোন দিন খগেন বসে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প করে। কোন কোন দিন আবার চলে যায়। দুলাল লক্ষ্য করেছে মণি এলে খগেন আর থাকে না, চলে যায়। এইখানে দুলালের চণ্ডীমণ্ডপ বসা শুরু হয়ে আছে।

বেলা পড়লেই তার দাওয়ায় এক এক করে লোক আসতে আরম্ভ করে। এক আসে এক যায়। একের পর এক তামাকের কল্কে শেষ হয়, আবার নতুন কল্কে জ্বলে।

মণি ওর ছেলেদের নিয়ে আসে এক একদিন। আশ্চর্য কথা, সেদিন আর কেউ আসে না। এমন কি এলেও কেউ বসে না। মণি না এলে দাওয়া লোকে প্রায় ভর্তি হয়ে থাকে। নানান গল্প হয়। আনন্দচন্দ্র অথবা মণির প্রসঙ্গ উঠলেই সমবেত সকলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দুলাল তখন ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে আলোচনাটা অন্য খাতে বইয়ে দেয়। সঞ্চিত উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসে।

রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে আসর ভেঙে আসে। অধিকাংশ দিন আসর ভাঙলেই খাওয়া-দাওয়া করে সে শুয়ে পড়ে। আবার কোন কোন দিন খাওয়ার-দাওয়ার পর আলো বাড়িয়ে দিয়ে সে লেখাপড়া নিয়ে বসে। কিছুক্ষণ পড়ে লিখে আলো নিভিয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় এলিয়ে পড়ে।

সেদিন পোস্টাপিস থেকে আর কোথাও না গিয়ে সে সোজা বাড়ী ফিরে চলে এল। বাড়ী ফিরেই ডাকলে, গণু কোথায় রে, আয়। অশোক আয়।

তাদের দু জনকে সঙ্গে নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। একবার খাবার সময় গিয়ে তিনজনে খেয়ে আবার চলে এল নিজের ঘরে।

ঘরে এসে গণুকে কোলের কাছে শুইয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁরে গণু, তোর বাবাকে তোর মনে পড়ে?

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে গণু বললে—হ্যাঁ। এই লম্বা, মাথায় টুপি!

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে দুলাল বললে—ঠিক মনে আছে। ঠিক বলেছিস!

সন্ধ্যার সময় যেমন লোকজন আসে তেমনি এসে গালগল্প আরম্ভ হল।

দুলাল আজ চুপ করেই বসেছিল। খগেন বললে—কি গো দুলাল, আজ এমন চুপচাপ কেন?

দুলাল একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে গণুকে আরও কোলের কাছে টেনে নিলে। খগেন বললে—আজ আবার সন্ধ্যের সময় ছেলেরা তোমার ঘাড়ে চেপেছে দেখছি।

দুলাল আবার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—লোকনাথদা মারা গিয়েছেন জেলে। আজ জেল থেকে খবর দিয়েছে বাবাকে।

সকলেই স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পরে খগেন বলে উঠল—আ হা হা! পর মুহূর্তেই নূতন কথা এসে গেল নূতন সুরে। খগেন বললে—এই সর্বনাশের জন্যে কিন্তু দায়ী আনন্দচন্দ্র আর মণি।

দুলাল চমকে উঠল খগেনের কথা শুনে এবং কণ্ঠস্বরে পোষিত হিংসা অনুভব করে। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলে—না না, একি বলছেন আপনি পিসেমশায়?

খগেন অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে বললে—আমি ঠিক বলছি বাবা দুলাল। তুমি সবই জান তাই শুনতে তোমার লজ্জা লাগছে।

দুলাল হাসল। কোন প্রতিবাদ করলে না।

খগেন বললে—তুমি ওকে এমনি ভাবে শিক্ষা দাও বাবা যাতে বড় হয়ে ওর বাপ ঠাকুর্দার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে যেন তার শোধ নিতে পারে।

দুলালের চোখ দুটোতে একবার বজ্রলেখার মত আগুন জ্বলে উঠল। আবছা অন্ধকারে তা কেউ দেখতে পেলে না, তার দাহটা সে নিজেই বুঝলে কেবল। পরক্ষণে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে শান্ত গলায় সে বললে—না পিসেমশাই। সে শিক্ষা ওকে দেবও না। আর দিলেও ও নেবে না। আমি

ওকে বারেবারে বলে যাব এই গ্রামে থাকতে, এইখানে থেকে এইখানকার মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে ভালবাসতে। আর মণির ছেলেরা তো ওর বন্ধু।

কথা শেষ করে দুলাল ওকে নিয়ে উঠে চলে গেল। বললে, ওকে দিয়ে আসি। ওর খাবার সময় হয়েছে।

ওকে নিয়েই এত আলোচনা অনুমান করে কিন্তু আলোচনার কারণ কিছুই না বুঝতে পেরে গণু অবাক হয়ে কাকার মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

দুলাল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে এতদিন ধরে গ্রামের লোকের সঙ্গে মণির বিরোধটা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এতদিন, সেই আনন্দচন্দ্রের সময় থেকে, একটার পর একটা মোকদ্দমা করে, ঋণ দিয়ে সেই ঋণের সূত্র ধরে, ঝগড়া না থাকলে ঝগড়া কিনে, গ্রামের মানুষকে বিরক্ত, বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে আসছেন প্রথমে আনন্দচন্দ্র, তারপর মণি। আনন্দচন্দ্রের সময়ে এ কলহটা ছিল নূতন। তার ওপর আনন্দচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস করতে পারেনি। তাঁর আঘাত গ্রামের লোককে হজম করে যেতে হয়েছে।

এবারে মার খেয়ে খেয়ে প্রায় মরিয়া হয়ে গ্রামের সমস্ত লোক তলে তলে কি একটা ষড়যন্ত্র করছে যেন। এক একবার এও তার মনে হয়েছে যে তার বাবার মত মানুষও যেন এর মধ্যে আছেন। যদি তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে নাও থাকেন তা হলেও তিনি যেন একে অন্ততঃ সমর্থন করছেন।

সে যতই এ সম্বন্ধে ভাবছে ততই তার মনের মধ্যে একটা প্রবল শক্তি আলোড়িত হয়ে দিন দিন একটা বিশেষ ইচ্ছার আকারে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। সে উভয় পক্ষের এই বিদ্বেষের মূলোচ্ছেদ করবেই। যেমন করে হোক এই দুষ্ট বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করবেই।

এই সময় একদিন আকস্মিক এক ঘটনা।

সে পোস্টাফিস থেকে ফিরল বেলা করেই। বাড়ীতে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল।

শোবার ঘরের দাওয়ায় সতরঞ্চির উপর বসে একটি মেয়ে, আর একটি ছেলে। কাছেই বৌদি বসে আছে। তারা সদ্য এসেছে বুঝতে পারলে দুলাল।

বাড়ী ঢুকে তাদের চোখে চোখ পড়তেই তার বুকটা দুলে উঠল। এ কি! গোপা এসেছে সোমনাথকে নিয়ে? এখানে এতদিন পরে গোপা কি করে এল?

দরজার কাছেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাকে দেখে গোপাও যেন কেমন হয়ে গেল। তবু চেষ্টা করে একটু সামাজিক শিষ্টাচারের হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তাকে দেখবামাত্র সোমনাথ লাফিয়ে উঠল—আরে বাঃ, চিনতেও পারছেন না, না কি? কেমন আছেন?

এতক্ষণে সোমনাথের আন্তরিক উচ্ছ্বাসের স্পর্শে, তার গলার কাছে আটকানো হৃদ্‌পিণ্ডটা আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে সে সহজ হয়ে উঠল। সারা মুখ তার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—আরে বাঃ, চিনবার আর কি উপায় রেখেছ কিছু? তুমি তো ছেলেমানুষ থেকে একেবারে নও-জোয়ান হয়ে গিয়েছ। তোমার দিদি সঙ্গে না থাকলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না।

গোপার মুখ সস্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসিমুখে একবার দুলালের মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার পরই সহজভাবে তাকালে পারুল বৌদির দিকে।

পারুলের মনে হল—যেন ওদের অনেকদিন আগের পরিচয় এক মুহূর্তে পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এক বিচিত্র ইঙ্গিতময় রহস্যের মধ্যে যেখানে তার প্রবেশাধিকার নাই। আর এক মুহূর্তেই সে দুলালের সেই নিষিদ্ধ বন্যাকে চিনতে পারলে নির্ভুলভাবে।

হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠল সোমনাথ, বললে—শুনছ দিদি, শুনছ? এরই জন্যে এলাম বুঝি? তবে আপনি যে চিনেছেন, আমাকে যে পুরোপুরি মনে আছে তা বুঝলাম।

—বুঝেছ তা হলে? বলে দুলাল মুচকি হাসল।

ছেলেবেলায় কথা বলতে হলেই সোমনাথ কথা আরম্ভ করত 'আরে বাঃ' বলে। গম্ভীর স্বভাব দুলাল তখন তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেও কথা আরম্ভ করত 'আরে বাঃ' বলে। আজও সে তা ভোলেনি—সেই ইঙ্গিতই করছে সোমনাথ। সে কি ভুলতে পারে দুলাল?

সোমনাথ গম্ভীরভাবে বললে—শুধু বুঝেছি? বুঝেছি, খুশি হয়েছি। সুতরাং বরং বৃণু।

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বললে—বর দেবে মোরে?

কোন বর নাহি চাই, তোমার প্রসাদ শ্রেষ্ঠ বর।

তবু যদি বর দেবে দেব,

দীন-গৃহে দুই দিন করহ বসতি।

বক্তৃতা শেষ করে সে বললে—কেমন, হয়েছে তো? তোমাদের রবিঠাকুর এমন লিখতে পারবে? না, পেরেছে?

গোপা নীরব বিস্ময়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে দুলালের দিকে তাকিয়েছিল। সেই গম্ভীর স্বল্পভাষী দুলাল এমন প্রসন্ন মধুর রহস্যময় হয়েছে? এত পরিবর্তন হয়েছে তার? না আজ সে আকস্মিকভাবে এখানে আসায় তার এই উচ্ছ্বসিত লঘুতা?

পারুল বৌদিও অবাক হয়ে দেখছে দুলালকে। এমন লঘু, এমন প্রাণময় এমন প্রসন্ন সে কোন দিন দুলালকে দেখে নি। এ নিশ্চয়ই সেই মেয়ে যার চোখের দৃষ্টি পড়তেই দুলাল এমন হয়ে গেল।

অথচ পারুল লক্ষ্য করেছে দুলাল অথবা মেয়েটি কেউ কারো সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কথা বলে নি। দুলাল বাড়ীতে ঢুকে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

এইবার দুলাল এগিয়ে এল। সহজ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—ভাল আছ গোপা?

একটু সামান্য হাসি একবার খেলে গেল তার ঠোঁটে। সাজানো মুক্তার পাঁতির মত ঝকঝকে দাঁত একবার বেরিয়েই আবার বন্ধ হয়ে গেল। গৌরবর্ণ সুকুমার মুখ একবার রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠে যেন একেবারে সাদা হয়ে গিয়ে আবার সহজ হয়ে এল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি কথা—ভাল আছি! আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তর দিলে দুলাল।

পারুল লক্ষ্য করলে এই ক'টি কথাতেই ওদের কথা বলা যেন শেষ হয়ে গেল।

দুলাল একবার পারুল-বৌদিকে প্রশ্ন করলে—বাবার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে?

গোপা বললে—হ্যাঁ। দেখা হয়েছে। প্রণাম করেছি ওঁকে।

সোমনাথ উচ্চকণ্ঠে বললে—দেখা হয়েছে মশায়! প্রণাম করেই চিনিয়ে দিলাম নিজেকে। বললাম—আমি সেই সোমনাথ রায়, যে আপনাকে দুলালদার জেলের খবর দিয়ে চিঠি লিখেছিল। আমি বি, এ, পড়ি। আর এ আমার দিদি, কলকাতায়—কলেজে প্রফেসার। আমার বাবা দুলালদার অধ্যাপক ছিলেন। কেমন দুলালদা, দু'কথায় সব বলা হয়েছে তো? বুঝলেন, স্পোর্টসম্যান কি না! দু'কথাতে সব সহজ করে বলতে পারি।

—বুঝলাম। কিন্তু বাবাকে 'আরে বাঃ' বলনি তো?

এইবার খিল খিল করে হাসিতে গোপা ভেঙে পড়ল। পারুল দেখলে একদিকে গোপা হাসছে আর সেই হাসির তরঙ্গে দুলালের দুই চোখে যেন আলো জ্বলে উঠে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দুলাল বললে—বৌদি, বাবা কোথায় গেলেন?

পারুল এতক্ষণ অতি মধুর অনাস্বাদিত-পূর্ব জীবন-লীলার লীলারস পান করছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এই লীলায় সে অংশ-গ্রহণকারী কোন পাত্র-পাত্রী নয়, সে একান্ত দর্শক মাত্র। সে অভিভূত দর্শকের মতই দেখছিল এতক্ষণ। দুলালের প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠল। বললে—বাবা? বাবা যে কী খুশি হয়েছেন ওদের পেয়ে! তিনি মাছ ডিম এই সবের সন্ধানে ছুটে গেলেন। ওঁদের বলে গেলেন—তোমরা বস মা, আমি এখুনি আসছি।

ওদের আসাটা বাবা কি ভাবে নিয়েছেন সেটা জানার ইচ্ছা নিয়েই দুলাল পারুল-বৌদিকে প্রশ্ন করেছিল। পারুল-বৌদি এই বিচিত্র নাটকের দর্শক হিসেবে আপনার সত্তাকে যেরকম উন্মুখ করে সব দেখছিলেন সেই অনুভূতির বলেই বোধ হয় ওর প্রশ্নের অন্তরালের গূঢ় ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে জবাব দিলেন।

—তোমরা বিশ্রাম কর, আমি জামাটা খুলে আসি। সে এবার একান্ত সহজ হয়ে আপনার ঘরের দিকে পা বাড়ালে।

—আপনার হাতে ওটা কি কাগজ? আপনার গল্প আছে? আছে? তা হ'লে আমাকে দিয়ে যান।

দুলালের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে গোপা ওলটাতে লাগল। সোম-নাথকে দুলাল ডাকলে—সোমনাথ এস।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সোমনাথকে আপনার ছেলেবেলার ঘরে শুইয়ে, একবার বউদির ঘরে সে উঁকি মারলে। দেখলে পাটি পেতে মেঝের উপর বৌদি আর গোপা শুয়েছে। গোপা শুয়ে শুয়ে পর্যায়ক্রমে গল্প করছে, বৌদি, অশোক আর গণনাথের সঙ্গে। বাবা আপনার ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। সে দরজায় দাঁড়াতেই কথা বলতে বলতে গোপা একবার তার দিকে তাকালে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে গল্প করতে লাগল। দুলাল আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আজ আর ছেলেগুলো আসেনি। সে লেখার টেবিলে বসে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। দাওয়ার নীচে বেড়ে মরশুমি ফুল আজও ঝলমল করছে, আমগাছের পাতা আজও বরাবরের মত বাতাসে সর সর ঝর ঝর শব্দ তুলে কাঁপছে। কিন্তু আজ তার নিজের মধ্যেই কত অমিল।

দাওয়ার উপর পায়ের মৃদু আওয়াজ হল। পরক্ষণেই গোপা এসে ঢুকল ঘরে।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দুলালের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললে—আসব?

দুলাল চমকে উঠে আসন ছেড়ে দাঁড়াল। বললে—এস। না বলতেই তো এতদূর এসেছ। আবার না বলতেই এটুকুও এস। বস। সাদর আমন্ত্রণ আর সস্নেহ সম্ভাষণ নীরবে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত করে ফুটে উঠেছে।

তার মুখের দিক তাকিয়ে একটু হেসে সে বিছানাতেই বসল, বললে—আপনি বসুন!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুলাল বসল আপনার লেখার আসনেই।

তারপর দুজনেই নীরব। শুধু মধ্যে মধ্যে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর একটু হেসে গোপা বললে—ভাতের সঙ্গে মিষ্টি খেয়েছিলেন?

দুলাল কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে—মিষ্টি। হ্যাঁ মিষ্টি তো খেলাম বটে। গোপার প্রত্যেকটি কথা কি স্পষ্ট, কি কোমল, আর কি এক আশ্চর্য মাধুরী মেশানো। আগেও দুলাল তো ওর কথা শুনেছে। কিন্তু আজকের প্রতিটি কথায় যেন কেমন গোপন বেদনা মিশিয়ে তার কাছে একান্ত ভাবে নিবেদন করছে!

তার উত্তর শুনে গোপা হাসল, বললে—মনে পড়ছে না? অথচ আপনার জন্যে এত কষ্ট করে কলকাতা থেকে নিজে তৈরী করে এনেছিলাম!

একান্ত অপরাধীর মত দুলাল ওর মুখের দিকে তাকালে। তার মুখ দেখে গোপা চাপা নিম্ন কণ্ঠে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে—আর লজ্জা পেতে হবে না! আপনি তো বরাবরই অমনি। এতো আর নতুন কিছু নয়! আমি যত্ন করে তুলে ধরেছি, আপনি নিয়েছেন, কিন্তু কি দিলাম খেয়াল করেন নি। পরে মনে পড়িয়ে দিলে দুঃখ পেয়েছেন!

দুলাল জবাব দিলে না, কেবল গভীরভাবে গোপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ নীরবে এক দৃষ্টিতে গোপার মুখের দিকে চেয়ে দুলাল জিজ্ঞাসা করলে—কি মনে করে এলে এতদিন পরে?

ম্লান বিষণ্ণ হাসি হেসে গোপা তার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করে বললে—কেন এলাম? তারপর অকস্মাৎ কৌতুকে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত করে বললে—বলুন তো কেন এলাম?

বাইরে আতপ্ত মধ্যাহ্নের উন্মনা বাতাসে কাঁপা আমপাতার মতই দুলালের গলা কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপা গলায় সে বললে—তুমি বল!

আপনার চোখ দুটোকে চাপা হাসিতে সঙ্কুচিত করে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমি বলব? শোন তবে। তোমাকে দেখতে এলাম।

আপনার দুই চোখ বিস্ফারিত করে দুলাল তার হাসি-হাসি সকৌতুক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গোপা তাকে দেখে কৌতুকে একটু হাসল। সে বুঝতে পারলে চাপা আবেগে দুলাল দেহে মনে থম থম করছে, থর থর করে কাঁপছে যেন। সে সবটাকে লঘু করবার জন্যে বললে—ওকি? শুনে তুমি ভয় পেলে না কি?

এইবার দুলাল একটু শুকনো হাসি হাসল।

—যাক, হাসি এসেছে যেন। তুমি তো আর গেলে না, তাই আমিই দেখতে এলাম তোমাকে। দুটো কথা বলতে এলাম।

আবার দুলালের গলা কেঁপে গেল। বুক দুর দুর করে উঠল। সে বললে—কি কথা?

গোপা সহজ হাসি হেসে বললে—ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কথাই। তবু শোন। আমি চাকরী নিয়েছি শুনলে তো? কেন নিলাম জান?

—কেন? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে তার গলা আবার কেঁপে গেল।

গোপা হাসল। মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললে—বোকা কোথাকার। কিছুই বোঝে না! নিজে রোজগার করব, আর দূর থেকে দুই চোখ দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকব সারা জীবন ধরে। নাই বা হল ব্রাহ্মণ ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্ম অধ্যাপকের কন্যার বিয়ে।

দুলাল তার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল। অকস্মাৎ তার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

এতক্ষণ রহস্য করে লঘুভাবে কথা বলছিল গোপা। দুলালের চোখের জল দেখে তার কথা থমকে গেল। হঠাৎ কাপড়ে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অনেকক্ষণ পর আপনার মুখ মুছে মুখ তুলে সে দেখলে দুলাল তখনও পুতুলের মত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে; তার চোখ থেকে তখনও জল পড়ছে।

গোপার একবার একান্তভাবে ইচ্ছা হল সে উঠে দুলালের চোখের জলটা মুছিয়ে দেয়। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে কাঠের মত আপনার আসনে বসে থাকল।

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াল সে। তার দিকে চেয়ে একটু হাসলে সস্নেহে। বললে—চোখ মোছ। আমি চললাম।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। দুলাল উৎকর্ণ হয়ে শুনলে—আস্তে আস্তে গোপার পায়ের শব্দ মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল। বহুকাল থেকে যার এক কণা পাবার জন্যে মনে মনে কত বাসনা করেছে আজ না চাইতে যে দেবার সে এসে তার অঞ্জলি ভরে দিয়ে গেল সব। যা দিয়ে গেল তা সমস্ত মনে, দুই হাতের অঞ্জলিতে ধরল না। দেখতে দেখতে তা-ই ছড়িয়ে পড়েছে ঐ মরশুমি ফুলের স্তবকে স্তবকে, আনমনা বাতাসের পরতে পরতে, আলো আর ছায়ার মাধুরীতে। সে আপনারই মনের অজস্র আনন্দ বাইরে প্রকাশিত দেখতে পেলে।

এই সময়ে খগেন এসে তাকে ডাকলে—কই এস। আজ জেগেই আছ দেখছি।

দুলাল হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—আজ আমার ছুটি পিসেমশায়। আজ আমার বন্ধু এসেছে।

খগেন বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও তো বটে! আচ্ছা আমি লাগি। তুমি যাও। খগেন খুরপি হাতে গাছের গোড়ায় বসে পড়ল।

যেতে গিয়ে দুলাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর খগেনকে বললে—আচ্ছা পিসেমশায়, আমাদের সেই বকুল গাছের সঙ্গে নবমালতীর বিয়েটা দিলে হোত না!

খগেন খুরপিটা মাটিতে রেখে উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে—কেন হবে না? খুব হবে। এটা তো বিয়ের মাসও বটে।

—তবে আর কি! কালই হয়ে যাক। কিন্তু—

উৎসাহী খগেন বললে—কিন্তু কিসের? বল কি কি লাগবে?

দুলাল বললে—লাগবে আর কি! কেবল একগাছা মালা লাগবে। ব্যাপারটা কিন্তু আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।

—সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। গাছের বিয়ে দিচ্ছি বলি, আর লোকে পাগল ভাবুক। আর মালা আমি গেঁথে রাখব। তবে কাল কেন? আজই হয়ে যাক না—এই রাত্রিতেই। কেমন চাঁদনী রাত্রি আছে। তা হলে যাই, গাছদুটোর গোড়াটা বেশ পরিষ্কার করে রাখি। আর বকুলের মালা গেঁথে রাখব। আমি ব্যবস্থা করে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

দুলাল যাচ্ছিল সোমনাথের ঘরের দিকে। দেখলে বারান্দায় অশোকের হাত ধরে গোপা একা দাঁড়িয়ে আছে!

দুলাল জিজ্ঞাসা করলে—বৌদি কোথায়?

—ঘুমুচ্ছেন।

—ওঃ আচ্ছা। আমাদের দেশ দেখবে? বেড়াতে যাবে বিকেলে?

গোপা একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে, তারপর বললে—আমি তো তোমার দেশ দেখতে আসিনি। তোমাকে দেখতে এসেছি। তোমাকেই দেখছি কেবল।

দুলাল বললে—আমার চারিপাশের মাঠে, গাছে, আকাশে যে আমি ছড়িয়ে গিয়েছি। আমাকে দেখতে হলে সেগুলোও দেখতে হবে যে।

গোপা হেসে বললে—না কি! আমার দরকার নেই। আমি এমনিই

তোমাকে বুঝতে পারছি। আর তুমি কি পাগল না কি! তোমার সঙ্গে একা একা আমি বেড়াতে যাব তোমার গাঁয়ে এসে! খুব বুদ্ধি তোমার।

দুলাল হাসল, বললে—তুমি যে অন্তত বুদ্ধিমতী তা স্বীকার করছি।

গোপা বললে—যাক, শোন। আমরা কাল সকালেই যাব। আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিও। গরুর গাড়ী চাই।

এর জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না দুলাল, একটু ব্যথিত হয়ে বললে—কালই যাবে?

গোপা হাসল, বললে—চিরদিন যেখানে থাকব ভেবেছিলাম সেখানে একদিন থেকে যেতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আর থাকতে বলো না।

—বুঝলাম।

—বৌদি উঠেছেন বোধ হয়। আমি যাই। বলে গোপা চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত গল্প চলছিল। দুলাল বললে—আমি একটু আসি। খগেন পিসেমশায় এলে বলবেন আমি তাঁর ওখানেই গিয়েছি। বলে সে উঠে চলে গেল।

রাত্রে গোপা, সোমনাথ আর দুলালকে একসঙ্গে খাওয়ালেন পারুল-বৌদি। দুলাল এক সঙ্গে বসতে চায়নি। পারুল-বৌদিই একসঙ্গে বসিয়েছিলেন তাকে জোর করে। পারুল-বৌদি সকৌতুকে অনুভব করলেন দুলালের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে গোপার কেমন অস্বস্তি লাগছে। সেই অস্বস্তিতেই যেন গোপা আপনার খোঁপার উপর সামান্য একটু ঘোমটা তুলে দিয়েছে।

সকলে নিঃশব্দে খেয়ে চলেছিল। অকস্মাৎ সোমনাথ বললে—কোথা থেকে বকুল ফুলের গন্ধ আসছে দিদি দেখেছ? তুমি পাওনি?

দুলাল বললে—কই হে, তোমার পাশে বসে আমি তো পাচ্ছি না। স্পোর্টসম্যান থেকে কবি হয়ে উঠলে নাকি?

গোপা বললে—কই আমিও পাচ্ছি না তো! বলতে বলতে সে বাঁ হাতে খোঁপার উপরের কাপড়টা মাথার উপর আরও বিস্তৃত করে টেনে দিলে।

পারুল-বৌদি সবটা দেখে একটু হাসলেন।

ভোর বেলাতেই মণির জুড়ি এসে দাঁড়াল সুধাকান্তের বাড়ীর দরজায়। সকলকে প্রণাম করে, আবার আসবার সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মতি দিয়ে

গোপা আর সোমনাথ গাড়ীতে গিয়ে উঠল। দুলালও ওদের সঙ্গে গেল ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে।

সারা রাস্তা গাড়ীর ভেতর কথায় কথায় হেসে ভেঙে পড়ল গোপা। কখনও সোমনাথের কথায়, কখনও দুলালের কথায়। দুলালও মাঝে মাঝে যোগ দিলে হাসিতে। তবে হাসির চেয়ে সারা রাস্তা সে দেখতে দেখতে গেল গোপাকে। তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে ওর, অথচ হাসছে সদ্য-কিশোরীর মত। নিটোল স্বাস্থ্য, সুগৌর দেহবর্ণ, মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত, বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস আর ধাবতায় উজ্জ্বল দুই চোখ, টানা ভ্রূ—সব যেন মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব আনন্দের স্পর্শে হেসে উঠছে। মাথায় মাথাভরা এলো চুলের খোঁপাটাও হাসির তাড়নায় খুলে খুলে পড়ছে বার বার। তারই মধ্যে অতি গোপন কথার মত বকুলের মালাটা আত্মপ্রকাশ করছে মাঝে মাঝে।

বাইরে আবার সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে বসন্ত এসেছে। গাছে গাছে কচি পাতার জয়ধ্বজা বসন্তের বাতাসে এলোমেলো কাঁপছে। সেই বসন্তেরই প্রকাশ গাড়ীর ভিতরে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করতে লাগল দুলাল।

ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে সেই গাড়ীতেই ফিরে এল দুলাল। খালি গাড়ীতে বাইরের বসন্ত-সমারোহের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সে চলেছিল। আগে আগে তার আক্ষেপ হত—সৃষ্টির আদিম-সন্তান এই গাছগুলি যেমন পুরানো পাতা ঝরিয়ে বছরে বছরে আবার নূতন পাতার জন্ম দেয় মানুষ তেমন পারে না কেন? আজ বাইরের বসন্ত শোভার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে অনুভব করলে তার মনেও পুরানো জীর্ণপাতা ঝরে গিয়ে আবার নূতন আনন্দের কচি পাতা বেরিয়েছে। তার মনেও নব-বসন্ত আবির্ভূত হয়ে তাকে যেন নব জন্ম দিয়েছে। বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে চোখ বন্ধ করলে।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামল। সহিস নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে দেখলে—দুলাল ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুদিন থেকেই দুলাল একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করছে। সন্ধ্যাবেলা তার দাওয়ায় যেমন ভিড় হবার তেমনি ভিড় হয়, তামাকও পোড়ে, গালগল্পও হয়। কিন্তু দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব যেন কেমন

মিইয়ে পড়ে। উচ্চ হাসি থেমে যায়, গল্পের স্রোত মন্দীভূত হতে হতে এক সময় থেমে যায়। তারপর অতিথিরা একে একে উঠতে সুরু করে।

দুলাল প্রথম দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি। সে নূতন একটা লেখা শেষ করতে ব্যস্ত ছিল। সেই লেখার ভাবনাতেই সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকত বলে বাইরের জীবনের নিত্য নিয়মিত কর্ম যথারীতি করে গেলেও সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ে নি। বইখানা শেষ হয়ে গিয়ে মনটা শূন্য আর লঘু হয়ে গেছে। বাইরের পৃথিবার ভিড়-করা ঘটনাপুঞ্জের জন্যে মনের রুদ্ধ দরজা খুলে গিয়েছে তখন। সেই সময় একদিন তার নজরে পড়ল তার দাওয়া থেকে উঠে একে একে সকলে চলে যাচ্ছে। বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে তাদের বাড়ীর বাইরের দাওয়ার উপর গিয়ে বসছে সুধাকান্তের কাছে।

ব্যাপারটা সে ক'দিনই লক্ষ্য করলে। ঠিক কিছু সে বুঝতে পারলে না। তবু এটা সে ঠিক অনুমান করলে—এই মানুষগুলি তার কাছে যেমন একান্তভাবেই গালগল্প করবার জন্যে আসে, তার বাবার কাছে ঠিক তেমনিভাবে গালগল্প করবার জন্যে গিয়ে জমে না। বাবার সঙ্গে নিত্য নিয়মিত যেন তাদের কী একটা গোপন পরামর্শ চলছে। এবং দীর্ঘদিন ধরে ক্রমান্বয়ে এই আলোচনা করার যে উদ্দেশ্য আছে তা নিশ্চয় যেমন গূঢ় তেমনি সুদূরপ্রসারী।

ব্যাপারটা কি সঠিক জানবার জন্যে সে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেদিন সন্ধ্যাতেও অমনি তার দাওয়ার আসর ভেঙে রাস্তার দিকে তার বাবার দাওয়ায় আসর জমে উঠেছে। আজ ক'জনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে বাবার আসরে গিয়ে উপস্থিত হল।

তাকে দেখেই সমস্ত আসরটা চমকে গেল যেন।

সকলের বিব্রত অবস্থা দেখে একবার তার ফিরে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ফিরে গেলে ব্যাপারটা কি জানা হবে না বলে সে নিজের মনের সব ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে আসরে বসল। মুখে বললে—আপনারা তো আমার ওখান থেকে উঠে এলেন। তাই আমিই এলাম আপনাদের কাছে।

কয়েকজন শশব্যস্ত হয়ে তাকে বসবার জায়গা করে দিলে।

সে বেশ জোর করে চেপে বসল।

সে বসতেই আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। তবু সে উঠল না, বসেই

থাকল। কেউ আর কোন কথা বলে না। একটা আধটা অন্য কথা হয়, আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে। অথচ উৎসাহের অভাবে নতুন কথাটা আর লতার মত পল্লবিত হয়ে বাড়তে পারে না। আসরে পড়েই ফুলঝুরির আগুনের টুকরোর মত নিবে যায়।

ইদানীং আপনার অন্তরে অন্তরে সহজ নম্র সহনশীল মন নিয়ে যে কোন সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তি লাভ করেছে দুলাল। নিজের শক্তির পূর্ণ পরিমাপ তার আছে। সেই বোধ থেকে তার হৃদয়ে অহমিকার পরিবর্তে একটি বিচিত্র সত্য আস্বাদনের অনুভূতি সে লাভ করে। সেই সহজ বোধ থেকেই সে আসরের সমস্ত লোকগুলিকে বিব্রত অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে। সে সহজ হাসি হেসে খগেনকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা কি আলোচনা করছিলেন, আমাকে দেখে সব থামিয়ে দিলেন মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি যে আপনাদের কথা শুনতে এলাম। না শুনে তো উঠব না। বলুন।

খগেন যেন তাকে কথাটা বলতে পেরে বেঁচে গেল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—কি শুনবে বাবা? এমন কিছু নয় যে শুনবে। আমাদের কথা হচ্ছিল মণির বাড়িতে এই আগামী রাসের ভোজে খাওয়া নিয়ে।

অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে দুলাল জিজ্ঞাসা করলে—মণির বাড়ী রাসের নিমন্ত্রণে খাওয়া নিয়ে কি কথা হচ্ছিল?

এইবার আলাপ-আলোচনাটা দুলালের সামনেও সহজ হয়ে উঠল। গলা ঝেড়ে নিয়ে সুধাকান্ত বললেন—কথাটা তোমাকে আমিই জানাতে নিষেধ করেছিলাম। তুমি গ্রামের মানুষ হলেও আসলে মনে-প্রাণে তুমি গ্রামের বাইরের মানুষ। তোমাকে তাই ইচ্ছা করেই গ্রামের সামাজিক গোলযোগের মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

দুলালের কাছ থেকে সুধাকান্ত হয়তো কোন উত্তর প্রত্যাশা করে থেমে গেলেন। কিন্তু দুলাল কোন উত্তর দিলে না। সে এই ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথাটা শুনবার জন্যে সুধাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাকান্ত বললেন—বছরের পর বছর ধরে যা ব্যাপার চলেছে তাতে একটা সামাজিক গোলযোগ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

দুলালের মুখে চোখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবু মুখে সে কোন প্রশ্ন করলে না।

সুধাকান্ত তা সত্ত্বেও দুলালের এই সন্দেহটা অনুমান করে বললেন—প্রথমেই সকলের সামনে এ কথা তোমাকে বলে রাখি যে অনেক দিন আগে এই নির্যাতনের প্রতিকার হিসেবে এই একমাত্র অস্ত্র সামাজিক বর্জনের পরামর্শ আমিই দিয়েছিলাম।

কথাটা বলে আরও জোর দিয়ে সুধাকান্ত বলতে লাগলেন—অবশ্য এ কথা ঠিক যে আনন্দ বা মণি আজও পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোন বিরোধ বা কোনও ধরনের ঝগড়া-বিবাদ করে নি। সেই কারণেই আরও জোর করে আমি এই পরামর্শ দিতে পেরেছি। আজ যদি নির্যাতনের মধ্যে আমিও থাকতাম, তখন এই পরামর্শ দিলে এ কথা বলা চলত যে আমি বিদ্বেষে এবং ঈর্ষায় এই পরামর্শ দিচ্ছি। আজ আমি যা বলছি তা ন্যায়সঙ্গত বলেই বলতে পারছি। দীর্ঘ দিন ধরে এ-গ্রামের এবং আশ-পাশের গ্রামের লোকের উপর প্রথমে আনন্দ, তারপর মণি যে অত্যাচার কারণে অথবা অকারণে চালিয়ে আসছে তা বন্ধ করার অস্ত্র এতদিনে আমরা পেয়েছি। আমরা সকলেই দরিদ্র। ওদের সঙ্গে টাকার লড়াইয়ে জেতার সাধ্য কারো নেই। তাই আমরা এই পথ নিয়েছি। এই অত্যাচারকে রোধ করারও একটা দায়িত্ব সমাজের আছে। যখন আনন্দ নরনাথবাবু আর আমাদের এই খগেনের উপর একটার পর একটা আঘাত করে ওদের প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে তখন সমাজ নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত শুধু অসহায় ভাবে দেখেছে; অর্থবান সম্পদশালীর ভয়ে, হ্যাঁ ভয়েই বলব বৈ কি, পঙ্গু হয়েছিল। আজ যখন অত্যাচারের পটভূমিতে সকলের মন একসঙ্গে মিলিত হয়েছে তখন তার প্রতিকার হবেই। আর তার প্রতিকার হওয়ার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনও আছে।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে সুধাকান্ত চুপ করলেন। এই যুক্তির কি ফল হল দুলালের উপর তা দেখবার জন্যে তিনি তার মুখের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন।

দুলাল এইবার মুখ খুললে, বললে—সত্যি কথা, এই দীর্ঘকাল ধরে যে ধারাবাহিক অন্যায় ঘটে আসছে তার প্রতিকার হওয়া অবশ্যই দরকার। এ অন্যায় আপনারা আগেই বন্ধ করেন নি কেন এ প্রশ্ন আমিও করছি আপনাদের কাছে। আপনারা অবশ্য বলেছেন। কিন্তু সমাজের পঙ্গুতা

দূর করার দায়িত্ব তো আপনাদের হাতে। তা এখন কোন্ রাস্তায় আপনারা সেটা করছেন তা এখনও জানতে পারিনি।

সুধাকান্ত বললেন—এর জবাব তো সর্বপ্রথমে তোমাকে খগেন দিয়েছে।

দুলাল বললে—তবু আর একবার বলুন না।

সুধাকান্ত কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরূপ কিছু খুঁজলেন বোধ হয়, তারপর বললেন—দেখ, আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যদি অকারণে বৈষয়িক মামলা-মোকদ্দমা করে কেউ অশান্তির সৃষ্টি করে তা হ'লে আমরা অনায়াসে বাঁচবার জন্যে সেই অশান্তিকে আরও কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের তরফ থেকে সামাজিক ঝগড়ায় টেনে নিয়ে যেতে পারি। আমরা তাই মনে করেছি—আগামী রাসপূর্ণিমায় ওদের বাড়ীতে যে মস্ত উৎসব হয়, যে পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণভোজন হয় তাতে আমরা কেউ অংশ গ্রহণ করব না; সে উৎসব, সে নিমন্ত্রণ আমরা বর্জন করব। পাঁচটা গ্রামের লোক আমরা সকলে এই মনে করেছি।

দুলাল হাসল। কথাটা সে এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অতি সহজ, সাধারণ ও তুচ্ছ বলে মনে হল। সে হেসে বললে—এইবার আমি কয়েকটা কথা বলি?

—বল।

—প্রথমতঃ এটা যে কিছু না করার চেয়ে, পঙ্গু হয়ে বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিচ্ছি। স্বীকার করে নিয়েও কয়েকটা কথা থাকে। অন্ততঃ আমার কাছে আছে। সেইগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা এতদিন এত আঘাত সহ্য করেও চুপ করে ছিলেন। মণি কেবল একতরফা আঘাত করছে। আপনারা প্রতিঘাত করলে অশান্তি কমবে না, বাড়বে। এই কলহের শেষ নেই। তারপর এ কথা ঠিক যে এই পঞ্চগ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে মণি মামলা-মোকদ্দমা বা ঝগড়া করেনি আপনারা এবার তাদেরও টেনে আনছেন। এই যেমন—বাবা, আপনার ব্যক্তিগতভাবে এই নিমন্ত্রণ-বর্জন করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না।

চিরকালের শান্ত সংযত সুধাকান্ত আজ অকস্মাৎ স্ফুরিত হয়ে উঠলেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন—তুমি বলছ আমার সঙ্গে মণি কোনদিন

কোন অন্যায় ব্যবহার করেনি বলে আমি যদি আজ সকলের সঙ্গে এই নিমন্ত্রণ বর্জন করি তা হলে তা অসঙ্গত হবে? কেন?

দুলালের কণ্ঠস্বর আরও বিনীত, আরও শান্ত হয়ে এল। সে বললে—বাবা, আমি তর্ক করছি না। আর আপনার সঙ্গে তর্ক করব কি ক'রে? তবে এ কথাটা কি ঠিক নয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটাই সব চেয়ে বড়! তার চেয়ে আর বড় কোন সম্পর্ক নেই। আপনি হয়ত অন্য রকম বিশ্বাস করেন। সেইজন্যেই এ ক্ষেত্রেও আপনার মণির সঙ্গে কোন বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও আপনি ওর সঙ্গে বিরোধ করতে পারছেন! এ কথা থাক। এ আপনারা যা হয় করবেন। আমার বলার কিছু নেই। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনাদের এই সিদ্ধান্তটা কি আগে মণিকে জানাবেন না?

সুধাকান্ত গম্ভীর ভাবে বললেন—না। সে যখন গ্রামের লোকের সঙ্গে একে একে বিরোধ করেছে তখন তো সে তা আমাদের জানিয়ে করেনি। এক একটা করে আদালতের নোটিশ এসেছে আমাদের কাছে বজ্রাঘাতের মত। কাজেই তাকে জানাবার কোন প্রয়োজন নেই।

দুলাল উঠল, বললে—আপনারা আলোচনা করুন, আমি উঠলাম। তবে বলে যাই একটি কথা। আমি একটি কাজ করব। আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে আমি আগে থেকে জানিয়ে দেব। কালই জানিয়ে দেব। কারণ আমি তার বন্ধু!

সমস্ত আসরটাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দুলাল উঠে চলে গেল।

নিজের ঘরে লেখার টেবিলে এসে বসল সে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে শুধু একটা জিনিসে বিচলিত হয়েছে সে। তা ছাড়া আর কিছুতেই সে বিচলিত হয়নি। সারা গ্রামের লোকের সঙ্গে সংঘবদ্ধ ভাবে মণির একটা বৃহৎ শক্তি পরীক্ষার কাল উপস্থিত হয়েছে; এটা তার কাছে কিছুই নয়। সে আপনার শান্ত বুদ্ধি দিয়ে এর সমাধান অনেক আগেই করে রেখেছে। এখন সেই মানসিক সমাধানকে কর্মে প্রয়োগ করতে হবে মাত্র! প্রয়োগের পন্থা সম্পর্কেও তার কল্পনা স্থির করা আছে। তার জন্যে সে বিচলিত হয় নি।

সে তার গ্রামের এবং তার পরিবারের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানে।

সে ভাল করেই জানে তাদের পরিবার কখনও কোন কলহে অংশ গ্রহণ করেনি। সমাজপতির বংশ তাদের। সমস্ত কোলাহল, সমস্ত কলহের ঊর্ধ্বে স্থির, অসংশয় চিন্তার ও সমাধানের নিষ্কম্প আলো তারা এতকাল ধরে কোন না কোন রকমে ধরে রেখেছে। আর সে নিজের বাবাকেও ভাল করে জানে। সুধাকান্ত শান্ত সংযত মানুষ। তাঁর চিত্তলোকেও সমস্ত ঈর্ষা দ্বেষ ভালবাসার ঊর্ধ্বে একটি স্থির শান্ত বিশ্বাসের আলো জ্বালা ছিল। আজ যেন সেই আলো নিবে এসেছে, না হয় নিবে যাবার পূর্ব মুহূর্তে বাইরের ঝড় ঝাপটার আঘাতে থর থর করে কাঁপছে। একটা ক্ষোভ যেন তাঁর মনের কোন পাতাল দেশ থেকে উঠে এসে তাঁর সমস্ত হৃদয়কে, হয়তো বিশ্বাসকেও আচ্ছন্ন করছে।

সুধাকান্তের এই পরিবর্তনে বিচলিত হয়েছে সে।

খাওয়া-দাওয়ার পরও তার ঘুম এল না। সে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। ফুলগুলো সব অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল স্থির অসংশয় চৈতন্যের অনির্বাণ আলোর মত অনন্ত-পরিব্যাপী অন্ধকারে এখানে ওখানে তারাগুলি নির্ভয়ে ঝলমল করছে। সে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, ভাবল, তারপর অকস্মাৎ দাওয়া থেকে নেমে পড়ল।

বাইরে যাবার দরজা খুলতেই সুধাকান্ত ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দিলেন—কে?

—আমি দুলাল। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। এখনই আসব। দরজাটা খোলা থাকুক।

ঘরের ভিতর থেকেই সুধাকান্ত সাড়া দিলেন—আচ্ছা।

সে বেরিয়ে চলে গেল দ্রুতপদে। মণির বাড়ীর গেটে দরওয়ানকে বললে—বাবুকে একবার ডাক তো। কিছুক্ষণ পরেই মণি নেমে এল। দুলালকে দেখে সে অবাক হয়ে বললে—কি ব্যাপার? এত রাত্রে?

দুলাল হেসে বললে—ঘরে চল, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

দুলাল যখন বেরিয়ে এল তখন মধ্য রাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। দুলাল বাড়ী ঢুকতেই দেখতে পেলে আলো জেলে সুধাকান্ত বারান্দায় বসে আছেন—বোধ হয় তারই অপেক্ষায়।

তাকে ঢুকতে দেখেই সুধাকান্ত আলোটি কমিয়ে আবার আপনার ঘরে ঢুকে খিল দিলেন। একটিও কথা বললেন না।

দুলাল হাত পা ধুয়ে আপনার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর নিদ্রা।

কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের লোক শুনে বিস্মিত হয়ে গেল যে যার নামে যেখানে যা কিছু মামলা মণীন্দ্রচন্দ্র করেছিল সব সে তুলে নিয়েছে। বহু ক্ষতি স্বীকার করেও তুলে নিয়েছে।

সেবার রাসের নিমন্ত্রণে যে সমারোহ যে আনন্দ হল তা বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর কোনদিন হয় নি। সকলে এসে অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ চিত্তে মণিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

দুলাল চুপ করে বসে হৃষ্টচিত্তে সব দেখলে।

মণি হাতে একখানা বই নিয়ে নিয়েই সারাদিন ঘুরছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর দুলালকে সে বললে—দুলাল খেয়েছ?

দুলাল হাসলে। বললে—তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মণি বললে—চল। তোমার বইখানা পড়লাম। এ তুমি আমাকে নিয়ে লিখেছ না কি? আমি কি এত সুন্দর?

দুলাল বললে—তুমি নিজেকে জান না। তাই তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্যেই লিখলাম। তোমার আবার নবজন্ম হল। একটা খোলস খসে গেল তোমার! তা হলে আমার 'নবজন্ম' নামটা ঠিক হয়েছে তো?

* * *

এর পর দীর্ঘকাল কাটল। প্রায় চার পাঁচটা বছর।

দুলাল যথানিয়মে আপনার ঘরে বসে লেখে, ভাইপোদের নিয়ে খেলা করে, পড়ায়, খগেনের সঙ্গে নানান ধরনের গাছের হেফাজত করে, ফুল ফোটায়, গ্রামের সমস্ত মানুষের নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবন যাত্রার দিকে তাকিয়ে দেখে। হৃদয়ে শান্তি, মুখে হাসি নিয়ে মানুষগুলি ছুটে আসে তার কাছে। দাঁত দিয়ে পায়ের কাঁটা তোলার মত সে পরম যত্নে তাদের সামান্য ক্লেশ নিবারণের ও দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তার নিজের কাজে নিজেরই পরম আনন্দ হয়। তার মনে হয়—রৌদ্রদগ্ধ বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে কিছুটা জায়গায় সে যেন নিজেকে খানিকটা ছায়ার মত বিস্তৃত

করে দিয়ে প্রান্তরের কচি কচি ঘাস পাতাগুলিকে বৈশাখের রৌদ্রদাহ থেকে খানিকটা আড়াল করে রেখেছে।

শুধু মাঝে মাঝে একটা কেমন অস্বস্তি আর সন্দেহ হয় তার সুধাকান্ত সম্বন্ধে। সেই ঘটনার পর সুধাকান্ত যেন কেমন চুপ করে গিয়েছেন। তিনি এখন কথা বলেন কম, এমন কি দুলালের সঙ্গেও কম কথা বলেন। তাঁর স্নেহশীলতায় কোন ত্রুটি অবশ্য কোন দিন দেখতে পায়নি দুলাল। তবু তার মনে হয় সুধাকান্ত কেমন যেন একটা ক্ষোভ, একটা জ্বালা হৃদয়ের কোন গোপনে পুষে রেখেছেন। দুলাল বুঝতে পারে—তার প্রকাশ নেই, তবে তার অস্তিত্ব আছে। তিনি যেন মণি সম্পর্কে একটা জ্বালা হৃদয়ে কোথায় লালন করছেন অত্যন্ত সংগোপনে। এর কোন প্রকাশ্য প্রমাণ অবশ্য দুলাল কোনদিন পায়নি। কিন্তু মণির সম্পর্কে আলোচনা, মণির প্রসঙ্গ তিনি যেন প্রাণপণে এড়িয়ে চলেন। তার মনে হয় সুধাকান্ত যে মণির চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় বড়, একদা তিনি এই মণিকে সন্তানের মত মানুষ করেছিলেন বলেই সে তার পরবর্তী জীবনে এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠায় অধিকার পেয়েছে এবং সেই হিসাবে সুধাকান্তের তার কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাওনা আছে—এই বোধটাই তাঁকে বোধহয় ইদানীং পীড়া দেয়। দুলাল যত ভাবে তত অবাক হয়। এই যদি সত্য হয় তবে এতকাল সুধাকান্তের জীবনে এ বহ্নি কোথায় লুকানো ছিল? বাল্য, তারুণ্য, যৌবন, প্রথম প্রৌঢ়ত্ব—এই এতগুলি কাল পার হয়ে গেল। এতদিন তো এ-আগুন তাঁকে পোড়ায়নি। তবে আজ? তা হলে আজ কি মণিকে এই প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও দুর্বল ও প্রতিষ্ঠাহীন মনে করেন? তাই মনে ভাবেন বলেই কি তিনি নিজেকে মণির উপরে এ গ্রামে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান?

তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এ নিয়ে সে সুধাকান্তের সঙ্গে একবার খোলাখুলি আলোচনা করে তার নিজের মনের সমস্ত সংশয় ও সুধাকান্তের মনের জ্বালায় শান্তি ও সান্ত্বনার জল নিক্ষেপ করে। কিন্তু তা সে পারে না। ঐ তো সামনে দাওয়ায় শান্ত সৌম্য মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে স্ফিংসের মত উত্তরহীন সুধাকান্ত বসে আছেন।

তাঁর মুখে কোন জ্বালার চিহ্নই তো নেই! তবু তার সন্দেহ থেকেই যায়। সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম অকারণ বেদনায় চিত্ত পীড়িত হয়। এ যেন

তার বড় যত্নে সাজানো দাবার ছকে রাজাটাই বারে বারে বাইরের বাতাসে উল্টে উল্টে পড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই যেন সেটা ঠিকমত বসছে না।

ধীরে ধীরে মানব জীবনের আর একটা সত্য সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে। কোন প্রেম, ভালবাসা স্থায়ী নয়। জীব-জীবনের জন্ম ও মৃত্যুর মত মানুষের প্রেমের জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। এ যেন কোন ক্ষণ-পরমায়ু ওষধির মত। দিনের আলোয় অপরূপ শোভা নিয়ে উত্তাপের স্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠল। আবার রাত্রির অন্ধকারে আর শীতলতায় সকলের অগোচরে তার মৃত্যু ঘটল। পরদিন আলোর মধ্যে আর তার কোন চিহ্নও থাকল না যেন। তখন কিন্তু বেদনায় বুক ভেঙে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আবার নূতন আশায় বুক বেঁধে নূতন চাষ করতে নামতে হবে। তবে নূতন ফসল ফলবে। মানুষের প্রেমকেও তাই প্রতি মুহূর্তে নূতন করে প্রেম দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে জয় করতে হবে।

ভাবতেই এক এক সময় নিদারুণ বেদনা-বোধ করে সে। এত উৎসাহ, এত আশা কার আছে যে প্রতি মুহূর্তের সযত্ন তপস্যায় এই রাশি রাশি প্রেমের সম্ভার সে জয় করে আপনার করায়ত্ত করে রাখবে ?

ভাবতে ভাবতেই আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। একখানি সুকুমার হাস্যমুকুলিত মুখ আপনার কল্পনাতে ক্রমে ক্রমে ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে যেতে দেখে সে। মনে হয় ম্লান মুখখানি অনেক দূর থেকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ক্রমে ক্লান্ত হয়ে তার দিক থেকে আপনার মুখ পুরোপুরি ফিরিয়ে নিলে। এখন কেবল দেখা যাচ্ছে ম্লান শুকনো বকুলের মালা-জড়ানো তার এলো চুলের খোঁপা। হঠাৎ যেন সে তার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে, যেন অকস্মাৎ সেই এলোচুলের খোঁপাটা আর এক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়ল ; খোলা চুলের রাশি থেকে শুকনো বকুলের মালাটা খসে ধুলোয় পড়ে গেল ; সে জানতেও পারলে না।

তবু। তবু কি এক এক প্রেম থাকে না অপরের মুখের দিকে অনন্ত কাল ধরে তাকিয়ে ? থাকে তো! শীতের দিনে একটির পর একটি করে যখন পদ্মের পাপড়ি ঝ'রে তার পুষ্পজীবনের সমাপ্তি ঘটে তখনও তো পদ্ম

তাকিয়ে থাকে দুরান্তবর্তী সূর্যের দিকে। গোপাও কি অমনি করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নেই? ভাবতেই সমস্ত মুখে ক্লেশের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে লেখা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ায় পারুল-বৌদির কাছে সান্ত্বনার প্রত্যাশায়।

পারুল-বৌদির সঙ্গে গোপা যাবার পর থেকে একটি বেশ হৃদ্য সম্পর্ক হয়েছে তার। মধ্যে মধ্যে পারুল-বৌদি ইঙ্গিতে গোপাকে নিয়ে তার সঙ্গে রসিকতা করে। ভালই লাগে তার।

আজ তার ক্লিষ্ট মুখ দেখে পারুল-বৌদি একটু রহস্যময় হাসি হাসল। তারপর সে যেমন ভাতের ফেন গড়াচ্ছিল তেমনিই ফেন গড়ানো নিয়ে ব্যস্ত হল।

দুলাল বললে—তোমার এখনও রান্না শেষ হল না? কি এমন রান্না করছ?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে পারুল-বৌদি বললে—কি খিদে পেয়েছে না কি? মুখ খানায় যে কত কষ্ট লেখা! কিসের এত কষ্ট?

একটু হেসে দুলাল বললে—তুমি তো আমার মুখে কষ্ট দেখতে পাচ্ছ দেখছি। তুমি অন্তর্যামী না কি? বেশ অন্তর্যামীই যদি হও তা হলে বল দেখি আমার কষ্টটা কিসের?

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল বৌদি। হাসি থামিয়ে বললে—কষ্ট দুটোর একটা। এক তোমার সত্যি খিদে পেয়েছে, না হয় গোপার জন্যে মন কেমন করছে।

দুলাল ছোট্ট একটু কপট ধমক দিয়ে চুপ করে গেল। সদ্য প্রেমে-ডুবু-ডুবু তরুণের মত তার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তবু সে অন্য দিনের মত চলে গেল না।

তার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে খানিকটা গম্ভীর হয়ে গিয়ে পারুল-বৌদি বললে—তা যা বল তাই! মন কেমন করবার মত মেয়ে বটে গোপা। তোমার মন-কেমন করাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারব না!

দুলাল রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা পিঁড়ির উপর বসে পড়ল। তার বসা দেখে একটু অবাক হল পারুল-বৌদি। বললে—সত্যি মন কেমন করছে ভাই, নয়? এক কাজ করব? গোপাকে একবার আসতে চিঠি

দেব? সে আসুক না একবার এখানে? আর না হয় তুমি এক কাজ কর না। তুমি একবার কলকাতা চলে যাও, তার সঙ্গে দেখা করে এস একবার।

দুলালের সমস্ত মন এক মুহূর্তে কলকাতা যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই নিজের ইচ্ছাকে দমন করে নিলে। মুখে বললে—নাঃ, কোথায় যাব এখন। আমার নতুন বই বেরুবে মাস কয়েক পরে: সেই সময় কলকাতা যাব।

তার মনটা যে এই মুহূর্তে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে উঠেছে সেটা বুঝতে পেরেছে পারুল-বৌদি। বললে—তা হ'লে এক কাজ কর না কেন? একখানা চিঠি দাও দিয়ে জান সে কেমন আছে?

—নাঃ, চিঠি পত্র আমি লিখি না।

পারুল-বৌদি এবার রাগ করলে, বললে—বেশ গো বেশ, তোমাকে লিখতে হবে না, আমিই লিখব কাল। আহা বেচারা। তোমার আচ্ছা ভাগ্য বটে ভাই। অমন অপ্সরীর মত সুন্দরী, কত লেখাপড়া জানা, আর কি লক্ষ্মী মেয়ে! কোন দূর দেশে শুধু তোমার মুখ ধ্যান করে বেঁচে রয়েছে। কি করে বাঁচবে ভাই যদি একটু খবর পর্যন্ত না দাও? ও মেয়ে তো প্রাণ থাকতে কোন দিন কারো দিকে চাইবে না, শুকিয়ে মরে যাবে কষ্টে। আহা ফুলের মত মেয়ে। আচ্ছা ভাই, বিয়ে করলে না কেন? হলেই বা ভিন্ন জাতের মেয়ে।

দুলালের মুখ চাপা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। সে তো এই আশ্বাসই পেতে এসেছিল। বৌদি সেই আশ্বাসে তার সারা মন ভরে দিয়েছে। আর তার চাই কি। সে উঠে আস্তে আস্তে এবার আপনার ঘরে গিয়ে লেখার জায়গায় বসে অর্ধ-সমাপ্ত লেখাটা টেনে নিলে। তার সারা মন ভরে লেখা সঞ্চরণ করছে গানের মত।

হঠাৎ জানালা দিয়ে নজর পড়ল বাবা বারান্দায় শ্রীমদ্ভাগবত হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। কি খুঁজছেন সুধাকান্ত আকাশের অন্তহীন নীলিমায়? কোন্ জ্বালার শান্তি খুঁজছেন তিনি? না কি জ্বালাকে চিন্তার বাতাস দিয়ে নূতন করে জ্বালিয়ে তুলছেন?

দুলাল নিজের সম্বন্ধে দুটো নূতন সংবাদ আবিষ্কার করেছে।

তার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। গত কিছুকাল থেকেই বুকে একটা ব্যথা সে মাঝে মাঝে অনুভব করত। প্রথম প্রথম সে ভ্রূক্ষেপ করে নি, কিম্বা কাউকে জানায়ও নি। এখন সেই ব্যথাটা মাঝে মাঝে হয়। হলেই সে চুপচাপ করে আপনার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। এটা ওটা খেয়ে ব্যথাটা আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে আসে। সুধাকান্ত কি পারুল বৌদি জিজ্ঞাসা করলে লেখার ক্লান্তির দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যায়।

নিজের কথা, বিশেষ করে নিজের অসুবিধা, অসুখের কথা সে কোন দিন কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না, বলেও নি সে কোন দিন। বলতে যেন তার অভিমানে লাগে। আর তা ছাড়া নিজের মন নিয়ে সে আজকাল অহরহ এমনই ব্যস্ত থাকে যে নিজের সামান্য শারীরিক অসুখের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো তার আর হয়ে ওঠে না।

নিজেকে আজকাল সে যত দেখছে ততই আনন্দিত বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। যে লেখাটায় সে হাত দিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। সে আজকাল প্রায়ই আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে গাছের পাতাগুলির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে! দেখতে দেখতে মনে হয়—এক একটি পাতা এক একটি পৃথক প্রাণ যেন। একটি অপরটি থেকে কত পৃথক, প্রত্যেকটি শাখার প্রত্যেকটি ডালের স্বতন্ত্র চেহারা তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সে যেন প্রত্যেকটি পাতাকে পৃথকভাবে জীবিত প্রাণীর মত চিনতে পারে। পরম আনন্দে ডালে ডালে এখন কাঠবেড়ালী নেচে নেচে বেড়ায়। সে একদৃষ্টে সকৌতুকে তাকিয়ে দেখে। একবার সে খরখর করে অনেকখানি চলে, হঠাৎ ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ডালের উপর, থমকে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো তুলে অতি বিবেক বুদ্ধিমানের মত সে দুলালের দিকে দুই চোখ তুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আবার হঠাৎ একডাল থেকে লাফিয়ে অন্য ডালের উপর ছুটে চলে।

খামার বাড়ীতে শালিখ চড়াই আর পায়রাতে কলরব করে করে ধান খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়ায়। শালিখগুলো খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কিচির কিচির করতে করতে হঠাৎ একটা আর একটার উপর লাফিয়ে পড়ে খুনোখুনি বাধিয়ে তোলে; চড়াইগুলো চঞ্চল হয়ে তুরুক তুরুক করে নেচে নেচে চলে;

পায়রাগুলো গম্ভীরভাবে ডাকতে ডাকতে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে একপা একপা করে এগিয়ে চলে, আর ধান খায়।

সে মূর্তিমান আনন্দের মত অবাক বিস্ময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবটা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। ক্লান্তি লাগে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এই বাতাসে-দোলা পাতার ভাষা, এই চঞ্চল, অবোধ্য-ভাষী পাখীগুলোর ভাষা সব যেন জলের মত সে বুঝতে পারছে। সবকিছুর অর্থ যেন অত্যন্ত সহজে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই সকালের নির্মল আকাশ থেকে, শান্তি আর আনন্দ যেন মধুর মত সমস্ত সংসারকে পরিব্যাপ্ত করে ঝরে ঝরে পড়ছে। শুধু পান করবার অপেক্ষা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়—আজ সকালে যেন এই আকাশ, এই গাছ, এই পাখীর সঙ্গে তার প্রাণ কোন্ এক অদৃশ্য সুতোয় এক সঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। এই আশ্চর্য প্রাণধারার বিনিসুতোর মালা যেন বিশ্ব সংসারের গলায় একখানি হারের মত দুলে উঠেছে।

নিজের উপলব্ধিতে আজকাল তার নিজের কাছেই বিস্ময় লাগে। নিজেরই বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর পরিচয় দিন দিন তার কাছে নব নব বিস্ময়ের মত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তার মনে হয় যেন এতদিন রাশি রাশি ছদ্মবেশ তার গায়ে চাপানো ছিল। সেই ছদ্মবেশের বর্ণাঢ্য অলঙ্কারের সজ্জাকেই আপনার অবয়ব বলে ভুল করেছিল যেন। আজ যত নিজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে ততই সে চাপানো মহার্ঘ্য ছদ্মবেশ অকারণ ভারের মত একের পর এক একান্ত অবহেলায় তার অঙ্গ থেকে খসে খসে পড়ছে। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারছে অর্থ মিথ্যা, প্রতিপত্তি মিথ্যা। যশ, খ্যাতি মূল্যহীন—জীবনের কাছে সব অকারণ ভারের মত। আনন্দের সমুদ্রে সব অকারণ মিথ্যা পাথরের টুকরোর মত হারিয়ে যাচ্ছে একে একে। শুধু একান্ত অর্থহীন প্রেম সেই আনন্দকে সাত-রঙা রামধনুর রঙে মাঝে মাঝে অনুরঞ্জিত করে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার গোপাকে। মনে মনে একান্ত সাধ হয়—সেও এমনি করে এই সকালবেলার আলোতে চুপ করে তার পাশে এসে এই গাছতলায় দাঁড়াক, এই নানান প্রাণের হারে সেও ফুলের মত গাঁথা পড়ে যাক।

এরই মধ্যে একদা তাকে আবার সচকিত হয়ে নিজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হল বাইরের দিকে। সুধাকান্তের মনে যে আগুন গোপনে গোপনে জ্বলছিল সেই গোপন আগুনের উত্তাপেই আর এক জনের মনে শুকনো কাঠ বারুদের মত জ্বলে উঠেছে। মণির সঙ্গে সুধাকান্তের বৈষয়িক বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে।

সংবাদটা সে যখন জানতে পারলে তখন আর তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। সে তখন শেষ শয্যা নিয়েছে। তিলে তিলে রোগের দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে চরম পরিণামের দিকে সে তখন এগিয়ে চলেছে।

সংবাদটা শুনে রোগের যন্ত্রণার মধ্যেই সে গূঢ় উপলব্ধির হাসি হাসলে। সে যা জেনেছে যা বুঝেছে সব ঠিক। মনের এ বিদ্বেষের আগুন কোন দিন নিববে না বাইরের শান্তি বারিসেচনে। প্রীতির জলধারায় মনের অঙ্গন সিক্ত হয়ে বন্যা বয়ে যাবে, আগুন নিভবে সাময়িক ভাবে। আবার মনের জটিল গহন অন্ধকার অরণ্যে ক্ষোভের ঝড় উঠবে। দাবানলে দাউ দাউ করে মনের বনস্পতি জ্বলে উঠে চারিদিকে অসহনীয় উত্তাপ, অসহ্য জ্বালা আর ভয়াল আলো ছড়াবে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। তবে যদি কোন দিন বহুবর্ষব্যাপী কর্ষণের তপস্যা চলে তাহ'লে হয়তো হৃদয়ের অন্ধকার দেশে অতল-বাহিনী ভোগবতীর সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। সেই নিবিয়ে দেবে ঐ আগুন, শান্ত করবে ঐ দাহ।

সে সংবাদটা শুনে অসহায়ের মত জানালা দিয়ে নির্মল আকাশের দিকে, আনন্দিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকল। সে ডেকে পাঠিয়েছে মণিকে। ডাকলে সুধাকান্তকে। অত্যন্ত সকাতর অনুরোধ করে বললে—আর ঝগড়া করবেন না। এ আমার অন্তিম অনুরোধ। আমি ভেবেছিলাম, ছোট ছেলের মত ভেবেছিলাম—এখানে আর ঝগড়া হবে না; একে অন্যের মুখের দিকে হাসিমুখে, প্রসন্ন মনে তাকাবে। কিন্তু কৈ? দুদিন তাকাতে তাকাতেই আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি ছোট ছেলের মতই আকাশ-কুসুম দেখেছি। বলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

তার পরেই একটু ক্লিষ্ট হাসি ফুটে উঠল তার পাংশু ঠোঁটে। একটু হেসে বললে—তবু এই চেয়েছি, এই ভেবেছি—এইটুকুই সান্ত্বনা।

বলে আবার নিশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে শুল। সুধাকান্ত মণির হাত

ধরে উঠে গেলেন। আধঘুমের ভেতরেও সে তা বুঝতে পারলে। একটু আপন মনে বললে—এই বা কতক্ষণ। চোখে তখন তার ঘুম নেমে এসেছে।

আলস্যের মধ্যেই ঘুমটা ভাঙল তার। কে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চুড়ির শব্দ উঠছে! তবে! সে আলস্য-জড়িত দৃষ্টি তুলে তাকালে। একখানি সুকুমার, অতি-বাঞ্ছিত মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

গোপা! গোপা এসেছে।

সে কোন কথা না বলে আপনার রোগক্লান্ত একখানি হাত পাকা ফলের মত সুপুষ্ট সেবারত হাতখানির উপর অলস ভাবে স্থাপন করলে। জানলা দিয়ে সে অলস শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে হতে অনন্ত-বর্ষ-বয়স্কা চিরতরুণী পৃথিবী আপনার আনন্দ-আসব অক্লান্ত ভাবে পান করে চিরদিনের প্রেয়সীর মতই তার দিকে মুগ্ধ জড়িত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন।

সে একটু হেসে গোপার হাতখানি শক্ত করে ধরে চোখ বন্ধ করলে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আস্তে আস্তে মৃত্যুর সাগরে সে ডুবে গেল যেন।

একরাশ বকুল আর কিছু মালতী এনে তার বিছানায় চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে সজল চোখে খগেন বললে—তোমার বিয়ে-দেওয়া সেই বকুল আর মালতী তোমাকে ভেট পাঠিয়েছে বাবা। তুমি নাও।

কলকাতা ফিরে যাবার আগে গোপা খগেনের সঙ্গে সেই বকুল আর মালতীর তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিষণ্ণ হেসে সে খগেনকে প্রশ্ন করেছিল —এই বুঝি আপনাদের সেই বকুল-মালতী?

শেষ পর্ব্ব

গত রাত্রিতে একসঙ্গে সকলকে স্বপ্ন দেখে সুধাকান্ত ছুটে গিয়েছিলেন সেই পুরোনো সঙ্কেত-স্থানে। স্বপ্ন দেখেছিলেন—আনন্দ, লোকনাথ, কিশোর, দুলাল—সকলে যেন একসঙ্গে এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই জীবনের রাশিকৃত পুঞ্জীভূত বিষাদ তারা সব এইখানেই ফেলে গিয়েছে। ভারমুক্ত হয়ে আজ একে একে সকলে সকলের হাত ধরাধরি করে যেন অন্ত লোক থেকে নেমে এসে তাঁকে ডেকেছিল। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই। মনটা অত্যন্ত আতুর হয়ে উঠেছিল।

বাড়ী ফিরে দাওয়ার উপর অশোক আর গণনাথকে দেখেই মনের সেই আবছা কুয়াশার মত আতুরতা কেটে গেল। ঐ তো দুলাল লোকনাথ কিশোর খেলা করে বেড়াচ্ছে অশোক আর গণনাথ হয়ে।

তিনি দাওয়ার উপর উঠে দুই নাতিকে টেনে নিলেন। দুলালের মৃত্যুর পর থেকে ওরা কেমন সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছে। এখন তিনি নিজেই ওদের সঙ্গে খেলা-ধুলো করে দুলালের অভাবটা আর বুঝতে দেন না। তবে ওরা এখন বড় হয়েছে, খেলাধুলোর সঙ্গে এখন ওরা নিজের ইচ্ছাতেই পড়াশুনো করতে বসে।

ওদের দুজনকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন—এইবার একবার পড়তে বস। খেলাপড়া না করলে কাকুর মত হবে কি করে?

কাকুর উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই মুখ তুলে তাকালে তাঁর মুখের দিকে। তারা মুখে তাঁকে কোন প্রশ্ন করলে না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অনেক প্রশ্ন ফুটে উঠল।

সে প্রশ্নের কি জবাব দেবেন সুধাকান্ত! তার উত্তর কি তিনি নিজেই জানেন? বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ আকুলি-বিকুলি করে উঠল। তিনি প্রাণভরে একবার ডাকলেন—গোবিন্দ হে! হরিবোল। হরিবোল।

গণনাথ বড় হয়েছে অনেকটা। সে বললে—তুমি সকাল থেকে কোথায় গিয়েছিলে দাদু? মা চারবার তোমার খোঁজ করে গিয়েছে। তুমি কি জল খাবে না? ঐ দেখ মা আবার ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা কিছু করবার পেয়ে সুধাকান্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাতে অশোক আর গণনাথের হাত ধরে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

দাওয়ার উপর আসন পেতে জল আর পাথর বাটিতে ক'রে খানিকটা ছানা আর চিনি দিয়েছে পারুল-বৌমা। দাওয়ার কিনারায় জলের ঘটি রাখা।

হাত ধুয়ে আসনে বসতে বসতে হঠাৎ তাঁর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে বললেন—খেতে দিয়েছ! খাবার জন্যে ডাকছ? আর কত খাব মা? আজীবন তো খেয়ে আসছি! আর খেতে ভাল লাগছে না মা!

পারুল মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকল। এই একের পর এক মৃত্যুর জন্যে এই মুহূর্তে তার নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল।

মস্ত বড় বাড়ী। এই পুরানো বাড়ী। তারপর রান্নাশালা, তার ওপাশে সুধাকান্ত একসারিতে পূর্ব-দুয়ারী দুখানা ঘর করিয়েছিলেন দুই ছেলের জন্যে। তারপর গোবিন্দের মন্দির। তারপর খানিকটা সরে গিয়ে দুলাল একখানা ঘর তৈরী করেছিল। ঘরখানায় তালা ঝুলছে। তার মৃত্যুর সময় ঘরখানা যেমন ছিল সমস্ত জিনিষ ঠিক তেমনি অবস্থাতেই রেখে ঘরখানায় তালা দিয়েছেন সুধাকান্ত। সমস্ত বাড়ীটা মৃতের মত শান্ত। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। খামার বাড়ীতে দুলালের ঘরের সামনের আমগাছটার কোন্ ডালে বন-কাক ডাকছে হুক-হুক করে। অকস্মাৎ একটা কাঠবেড়ালী বিচিত্র শব্দ করে উঠল—সব, সব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে কানে এসে বাজছে। সুধাকান্তের মনে হল—সমস্ত সংসারটা যেন শোকে নিথর, স্তব্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতে আপনার মনের নিদারুণ যন্ত্রণা অমনি কতগুলো অব্যক্ত ধ্বনির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

অকস্মাৎ সংসারের সমস্ত বেদনাটা তাঁর কাছে মানুষের বেদনার মত বেজে উঠল যেন। সংসার যেন সমস্ত বেদনা নিয়ে এই মুহূর্তে তাঁকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তিনি খাওয়া ছেড়ে তড়িতের মত উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে পারুল-বৌমা বললে—ওকি, ওকি বাবা, আপনি কিছুই খেলেন না যে !

আর নিজের যন্ত্রণার কথা কত বলবেন। তিনি মিথ্যা করে বললেন—আর খেতে পারছি না মা। কাল রাত্রে কেমন অম্বল হয়ে সমস্ত শরীরটা ভার হয়ে আছে। ওটা অশোক আর গণুকে দিয়ে দাও।

—ওদের জন্যে তো আমি সব আলাদা করে রেখেছি। এইটুকু না খেলে বাঁচবেন কি করে ?

কান্না আর হাসি এক সঙ্গে মিশিয়ে সুধাকান্ত বললেন—এখনও বাঁচতে বল মা ? এখনও আমার আর বেঁচে থাকা সাজে ? আমার দিকে আর তাকিয়ো না। আমাকে খরচের খাতায় কানাকড়ির নামে খরচ লিখে দাও। আর আমি মরব না মা। আমি অমর। আমি বেঁচে থাকব। এখন নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি দাও। নিজের স্বাস্থ্য, নিজের শরীরকে রক্ষা করো। এখন তোমাকেই এই দুটি অনাথ ছেলের বাপ মা রক্ষক সব হতে হবে। বাড়ীতে ঐ যে আজ সাতের পুরুষ ধরে গোবিন্দ রয়েছেন তাঁর ভার নিতে হবে। মনে বল ধর মা। তোমাকে জোর ক'রে বাঁচতে হবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি আমার বুক দিয়ে তোমাদের আগলে রাখব। কিন্তু আমার ভরসা আর করো না মা।

কমলা আর কিশোরের মৃত্যুর পরও সুধাকান্ত বুক বেঁধেছিলেন দুলালের মুখ চেয়ে। দুলালের সম্পর্কে অপরিমিত ভরসা ছিল তাঁর। আর সেই ভরসা ছিল বলেই মনে মনে নিদারুণ অহঙ্কার জমে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। তারপর কিশোর আর কমলার মৃত্যুর পর দুলাল এসে তাঁরই কোলের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে। শুধু এই সংসারেই নয়, এই গ্রামের মানুষের চিত্তলোকে অলোকসম্ভব এক মায়ার মত নিজের শান্ত সুন্দর আত্মত্বকে বিস্তৃত করে দিলে। তিনি নিজেও তার অস্তিত্বের সে মায়াজাল আপনার মনে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই আশ্চর্য স্নিগ্ধতা নিজের মনে তিনি যতই অনুভব করেছেন ততই তাঁর মনে অহঙ্কার আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে—এ মায়া সৃজন করেছে যে সে তাঁরই আত্মজ। সেই অহঙ্কার থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই গ্রামে প্রতিষ্ঠার মোহ।

দুলাল যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহ স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছেন তিনি। এ কথা কাউকে বলার নয়। কাউকে বলতেও তিনি পারেন নি। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করেন—দর্পহারী মধুসূদন কারো দর্প, মিথ্যা অহঙ্কার সহ্য করেন না। তাঁরও সহ্য করেন নি। ভালই হয়েছ, এ ভালই হয়েছে। আপন মনে তিনি একবার ঘাড় দুলিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—এ ভালই হয়েছে। ভালই হয়েছে।

তাঁর কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে পারুল তাঁর মুখের দিকে তাকালে। কথাগুলো বলে বুঝতে পারলেন সুধাকান্ত যে তিনি কয়েকটা অদ্ভুত কথা বলে বসেছেন। পুত্রবধূর অবাক মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—কেন বললাম এ কথা জান মা? তোমার শাশুড়ী গেলেন, কিশোর গেল, তাতেও সংসারের অনিত্যতা, তুচ্ছতা সম্পর্কে আমার চেতন হয়নি। দুলাল ফিরে এল। তাকে নিয়ে ঘর করতে করতে মনে হল—এমন ছেলে কার হয়? ভাবতে ভাবতে মনে আকাশ-ছোঁওয়া অহঙ্কার জমে উঠেছিল মা। কিন্তু গোবিন্দ এ অহঙ্কার সহ্য করবেন কেন বল? অভিমানী দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মত দর্পহারী ভগবান আমার দর্পে পদাঘাত করে সব চুরমার করে দিলেন। তাই বলছি—এ ভালই হয়েছে মা। তাঁর অভিপ্রায় কে বুঝবে বল মা। তবু মাঝে মাঝে ভাবি সান্ত্বনা পাবার জন্যে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। জানি না তিনি কি মঙ্গল করেছেন দুলালকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে। তবু ভাবি—মঙ্গলময় মঙ্গল করেছেন।

এই সময় গণনাথ বললে—দাদু, বাইরে কে ডাকছে।

কে ডাকবে আর? সুধাকান্ত কান পেতে শুনলেন, কে ডাকছে—দুলাল! দুলাল! দুলো!

সুধাকান্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কে দুলালকে ডাকতে পারে! তাঁর মনে পড়ছে, আবার পড়ছেও না। তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন দাওয়াতে দাঁড়িয়ে আছেন গোকুলবাবু! ঠিক তেমনটিই আছেন। রোগা শুকনো, আবলুস কাঠের মত কাল রঙ। কেবল মাথার চুলগুলো আর গোঁফগুলো আগে কালো কষকষে ছিল; এখন একেবারে বকের পালকের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। আর গিয়েছে মুখের

আরও ক'টা দাঁত। তোবড়ানো শুকনো মুখখানা আরও খানিকটা ডুবকে গিয়েছে। বাকী সব ঠিক তেমনি আছে। তেমনি মালকোঁচা মেরে পরা কাপড় পৌঁছেছে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি গিয়ে। গায়ে সেই আগেকার মত গলাবন্ধ সার্ট। পায়ে সাদা কেড্‌স্‌ জুতো, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। চোখের চশমাটা আরও পুরু হয়েছে।

দুজনে দুজনকে অনেকক্ষণ থমকে দেখলেন। গোকুলবাবু তির্যক দৃষ্টিতে চশমাটা তুলে অনেক্ষণ দেখলেন সুধাকান্তকে। তারপর চোখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন—আপনি তো সুধাকান্ত বাবু। নমস্কার!

—নমস্কার। সশ্রদ্ধভাবে প্রতি-নমস্কার জানালেন সুধাকান্ত!

—দুলাল কৈ, তাকে একবার ডেকে দিন। তার জন্যেই তো এই স্কুলে আবার ফিরে এলাম।

সুধাকান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—কি ব্যাপার? দুলাল কি বাড়ীতে নেই না কি?

এইবার সুধাকান্ত মুখ খুললেন। একটু হেসে বললেন—দুলাল তো নেই।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভ্রূ কুঞ্চিত করে গোকুল বাবু প্রশ্ন করলেন—দুলাল নেই? মানে?

রহস্য উপলব্ধির হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে সুধাকান্ত বললেন—বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমিই কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম? কিন্তু বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, দুলাল সত্যি সত্যিই নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সে।

সুধাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি আস্তে আস্তে সামনের চৌকিতে বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ স্থাণুর মত মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন, ঠিক আপনার পাশে-রাখা ক্যাম্বিসের ব্যাগটার মত। বসে থাকতে থাকতে আপন মনে বোকার মত আপনার আগের কথাটারই পুনরুক্তি করলেন গোকুলবাবু—সে এখানে আছে শুনেই তো এখানকার স্কুলে আবার হেড-মাষ্টারি নিয়ে এসেছিলাম! আমি এলাম, আর সে নেই!

গোকুলবাবু যেন অভিযোগ করলেন সুধাকান্তের কাছে। সুধাকান্তও যেন মাথা পেতে নিলেন সে অভিযোগ। একটু হেসে বললেন—অনেক চেষ্টা

করেছিলাম বাঁচাবার। কিন্তু মনে হল সে যেন নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুর সাগরে আস্তে আস্তে ডুবে গেল।

গোকুলবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন মাটির দিকে চেয়ে। তারপর অকস্মাৎ চঞ্চল উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন—আমি এখন যাই। আবার আসব।

এতক্ষণে সুধাকান্ত সামাজিকতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠলেন। তিনি শশব্যস্তে বললেন—এখনি যাবেন? কবে এসেছেন এখানে আপনি?

এইবার গোকুলবাবু হেসে বললেন—এই তো ট্রেন থেকে নেমেই পথে পথে এখানে আসছি। স্টেশনে নেমে দেখি মণির জুড়ি রয়েছে। জুড়িতে বাক্স বিছানা চাপিয়ে দিয়ে ব্যাগটা হাতে করে দুলালের সঙ্গে দেখা করে যাব বলে এসেছিলাম। আঃ—বলে আবার একটু হাসলেন গোকুলবাবু।

সুধাকান্ত বললেন—আপনি এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমে আসছেন? দেখুন দেখি আমারই ভুল! আপনার হাতে ব্যাগটা দেখেও বুঝতে পারি নি। আপনি একটু বসুন। হাত পা ধুয়ে একটু জল খেয়ে যান। সুধাকান্ত হাত জোড় করলেন।

কথা না বাড়িয়ে ব্যাগটা চৌকির উপর রেখে গোকুলবাবু বসে পড়লেন। সুধাকান্ত ডাকলেন—ওরে অশোক! অশোক! শুনে যা!

অশোক এসে দাঁড়াল সুধাকান্তের কাছে। সুধাকান্ত বললেন—একটি কাজ করতো ভাই! গাড়ুতে করে জল আর গামছা নিয়ে এসো তো! তোমার মাকে বল বাবা আর কাকুর মাস্টার মশায় এসেছেন, জল খেতে দিতে হবে। আর তিনি এই বেলা আমাদের এখানে আমার সঙ্গে খাবেন।

গোকুলবাবু স্থির দৃষ্টিতে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে আছেন—সুধাকান্ত লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখতে পেলেন অশোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোয়ালের হাড় দুটো ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গলাটা একবার কেঁপে গেল। তিনি অশোকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন—বাবা, এই দিকে একবার এসো তো!

আশোক আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে গোকুলবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাছে যাবা মাত্র গোকুলবাবু তাকে বুভুক্ষুর মত অকস্মাৎ সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে কেঁদে উঠলেন। সুধাকান্ত আর অশোক দুজনেই

অবাক হয়ে গেল। তাকে বুকে চেপে ধরে গোকুলবাবু কেঁদেই চললেন। অনেকক্ষণ পর নিজেই নিজের চোখ মুছলেন আপনার রুমালের খুঁট দিয়ে। তারপর তাকে আবার একবার দেখে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—এযে একেবারে দুলালের মুখ বসানো! এ যেন সেই ছোটবেলার দুলাল। একে কোথায় পেলেন?

—এই তো আমার একমাত্র নাতি। কিশোরের ছেলে।

—আচ্ছা! তুমি কোন ক্লাসে পড়ছ বাবা?

—এই ফিফ্থ্ ক্লাসে পড়ছি বড় ইস্কুলে।

—আচ্ছা। বেশ হয়েছে! আমার কাছেই আবার পড়তে হবে তোমাকে। আচ্ছা আবার লাগব তোমাকে তৈরী করার কাজে। তোমার বাবাকে, কাকুকে পড়িয়ে মানুষ করেছি, আবার তোমাকে পড়াব, মানুষ করব।

সুধাকান্ত একটু জোরে হেসে উঠলেন, বললেন—আপনার তো বাসনা আর সাহস কম নয় মশাই। আপনি একতরফা ছাত্র পড়িয়ে একটা কাল শেষ করে আবার নূতন ছাত্র পড়াবেন? তাকে মানুষ করবেন?

একান্ত জোর দিয়ে গোকুলবাবু বললেন—নিশ্চয়! যদি সেই ভরসাই না করতে পারব তবে এই বুড়ো বয়সে আবার আপনাদের গ্রামের স্কুলে আসব কেন? কি নাম বললে তোমার—অশোক না? তোমাকে তোমার কাকুর মত আমার হাতে তুলে নেব। আবার দুলালের মত মানুষ করে দেব তোমাকে, বুঝলে? কিন্তু এ কে?

সুধাকান্ত একটু হেসে বললেন—বলুন তো কে এটি?

অনেকক্ষণ দেখে গোকুলবাবু বললেন—কে? কিশোরের বড় ছেলে নাকি? কিন্তু কিশোরের সঙ্গে কি এর ভাইয়ের সঙ্গে তো কোন মিল দেখছি না।

সুধাকান্ত বললেন—হল না আপনার। ওটি লোকনাথের ছেলে।

সুধাকান্তের উত্তর শুনে গণনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোকুলবাবুর চোখ আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। একবার গলা ঝেড়ে গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—পাগলার ছেলে! পাগলা পাগলামির জন্যে কি কষ্টই না পেয়েছে!

হাত মুখ ধুয়ে জল-খাবার খেয়ে আবার কথা আরম্ভ হল দু'জনের।

কথায় কথায় গোকুলবাবু আবেগ-বিহ্বল হয়ে উঠছেন। তিনি বললেন—জানেন সুধাকান্ত বাবু, ভেবেছিলাম শেষ জীবনটা দুলালের সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়ে দেব। ওর কাছ থেকে দূরে থেকেছি। তবু ওর খবর রেখেছি বরাবর। ওর সব লেখা এক এক করে পড়েছি যত্ন করে। দেখেছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ও মনে মনে শান্তির একটা রাস্তা পেয়েছে। সে রাস্তায় মানুষ হাঁটবে কি না সেটা বড় কথা নয়, ও একটা চলবার রাস্তা পেয়েছে এইটাই বড় কথা। তার চেয়েও বড় কথা এই যে ও নিজে মনে মনে একটি স্থির শান্তি আর আনন্দের রাজ্যে বাস করছে। ওর 'নবজন্ম' পড়ে মনে হয়েছিল ওরই আধ্যাত্মিক নবজন্ম হয়েছে। তাই ভেবেছিলাম শেষ কালটা ওর কাছাকাছি বাস করব, ওর মনের স্থির শান্তির ছোঁওয়া পাব। প্রাণটা জুড়োবে। জীবনে তো অনেক পথ হাঁটলাম, কখনও জোরে চলেছি, কখনও ছুটেছি, যখন পারিনি তখন হেঁটেছি; থামিনি তো কোন দিন। কিন্তু চলাই সার হয়েছে, পথই পার হয়েছি খালি; কোনও আস্তানায় পোঁছুনো হল না। অথচ দেখলাম আমারই হাতে গড়া ছেলে কেমন করে অল্প একটু রাস্তা কোন্ পথে চলে যেন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় আবিষ্কার করে নিয়েছে। তাই জুড়োবার জন্যে, ওরই আশ্রয়ের আস্তানায় সামান্য একটু জায়গার জন্যে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখছি সে-আস্তানা ছেড়ে সে চলে গিয়েছে, বাসা ছেড়ে পাখী উড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় যাবার সহজ রাস্তাও হারিয়ে গিয়েছে।

বলে গোকুলবাবু থামলেন। গোকুলবাবুর কথা শুনতে শুনতে সুধাকান্তের চোখ দুটি স্তিমিত বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল আস্তে আস্তে। গোকুলবাবু বললেন—কিন্তু জানেন সুধাকান্তবাবু, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি ওর লেখার মধ্যে। ওর মনে কোথায় একটা কেমন বেদনার টনটনানি ছিল। কেমন জানেন! ছোট ছেলে খেলা করে বেড়াচ্ছে, অথচ কোথায় একটা ব্যথা আছে। খেলতে খেলতে হঠাৎ সেখানে যেই ছোঁওয়া লাগল অমনি সে মুখে হয়তো কিছু বললে না, কিন্তু যন্ত্রণায় মুখখানা নীল হয়ে গেল। অমনি ধরনের একটা ব্যথা যেন ছিল ওর মনের মধ্যে।

সুধাকান্তের মন হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠল। এক একদিন দুলাল যখন আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত তখন ওর শান্ত মুখখানি হঠাৎ মাঝে মাঝে

কেমন গম্ভীর, ক্লিষ্ট, ব্যথিত মনে হত। অনেকবার তিনি ভেবেছেন জিজ্ঞাসা করেন ওর বেদনার কথা। কিন্তু পারেন নি। বাপ হয়ে বন্ধুর মত ওর মনের কাছে নিজের মনকে নিয়ে যেতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুশয্যার পাশে শুশ্রূষারতা মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত সেই অপরূপ শান্ত সুকুমারী কন্যাটিকে মনে পড়ল। ওদের দুজনের সম্পর্কটা যেন কত স্পষ্ট অথচ কত গোপন! সেই কি দুলালের জীবনের সমস্ত দুঃখকে দুভাগ করে একভাগ নিজে নিয়ে আর একভাগ তাকে দিয়ে গিয়েছিল? হবেও বা! তিনি জানতে পারেন নি। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে হল গোকুলবাবুর কথার জবাব দেওয়া হয় নি। জবাব দেবার জন্যে মুখ তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই জুড়ি গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠল। জুড়ি এসে দাঁড়াল তাঁর বাড়ীর সামনে।

সমব্যথী দুজনের আলোচনায় যেন এক স্বপ্নজাল রচিত হয়েছিল। গাড়ীর ঘণ্টার শব্দে সে স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন। গাড়ীর ভিতর থেকে মণি মুখ বাড়িয়ে বললে—আপনার জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি মাস্টার মশায়। আপনি আসুন। আর দেরী করবেন না।

সুধাকান্ত বললেন—বাবা মণি, নেমে এস বাবা।

একান্ত লৌকিকতার খাতিরেই কথাগুলি বললেন সুধাকান্ত।

মণি নামল না। সেও ভদ্রভাবে বললে—না কাকামশায়, এখন আর নামব না। কাজ আছে। সে তাড়া দিলে গোকুলবাবুকে—আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন মাস্টারমশায়। আপনার সমস্ত ইস্কুল অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।

গোকুলবাবু উঠলেন, বলে গেলেন—আমি দুপুর বেলায় এসে খেয়ে যাব। এখন আসি। মণির তাড়া দেখছেন তো!

গাড়ীখানা চলে গেল। চলমান গাড়ীখানার দিকে সুধাকান্ত অসহায়-ভাবে তাকিয়ে থাকলেন।

রিক্ত অঙ্গন, শূন্য অসহায় মন। সভা ভেঙে গিয়েছে, সন্ধ্যায় আর জনসমাগম হয় না। যে দু-একজন আসে তাও একান্ত লৌকিকতার খাতিরে আসে। তাও যেন দিন দিন কমে আসছে। অন্দরে নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, মূর্তিমতী রিক্ততার মত পারুল-বৌমা জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত

হয়ে সংসারে কেবল কর্তব্য হিসেবে নিত্যকর্ম করে যাচ্ছে। সে যেন তাঁদের সকলের ভারটা একান্ত ক্লেশে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে আপনার সেবা দিয়ে। সুখ নেই, আনন্দের লেশ নেই সেখানে। মনোজগতে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন দুটি বালক আপনার খেয়ালে বাইরে খেলা করে বেড়ায়। নিজেদের প্রয়োজন হলে তবে এক আধবার এসে সুধাকান্তের কাছে পিঠে ঘুরঘুর করে। তারা নিজেদের জগৎ নিয়ে নিজেরা আছে। বাড়ীর ভিতরে সমস্ত বাড়ীটা যেন অস্বাভাবিক রকম নীরব, মৃতের মত শান্ত। আমগাছটা বোবার মত থমকে দাঁড়িয়ে আছে পঙ্গু মানুষের মত আপনার স্থাণু ডাল পালাগুলোকে মেলে, নড়ে চড়ে না। বাইরে থেকে বাতাসের দোলা লাগলে তবে দোলে। দুলালের ঘরে তালা লাগানো; তালাটিতেও প্রায় মরচে ধরে গেল বোধহয়। দাওয়ার নীচে মরশুমী ফুলের ক্ষেত্রটা শূন্য। সব গাছ মরে গিয়েছে। আর লাগানো হয় নি দুলালের মৃত্যুর পর। সব সমেত মিলে সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দে যেন এ বাড়ীর সমস্ত মানুষ ক'টাকে গিলে খেতে আসছে।

আশ্রয়ের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দের ঘর। সব দিক দিয়ে বাইরে থেকে এবং নিজের মনে মনে যখন একান্ত অসহায় ও সঙ্গিহীন মনে করেন নিজেকে তখন গিয়ে আশ্রয় নেন গোবিন্দের চরণতলে। উজ্জ্বল প্রদীপের সামনে দুই হাতে বাঁশী-ধরা বিগ্রহ সেই চিরকালের অস্পষ্ট অর্থহীন হাসি হাসছেন। সুধাকান্ত ক্লান্তিতে, বেদনায়, একান্ত অসহায়ের মত বিগ্রহের সামনে অশ্রুসিক্ত চোখে লুটিয়ে পড়েন। প্রার্থনা করেন এই ক্লান্তি আর বেদনা থেকে মুক্তি পাবার। এই নাবালকগুলিকে দেবতা যেন নিজে রক্ষা করেন—এই আকুল প্রার্থনা জানান। কখনও পুনরায় সুস্থ হবার শক্তি প্রার্থনায় দুই হাত জোড় করেন।

বিকেল বেলা এক একদিন গোকুলবাবুর সাহচর্যে আবার পুরানো আপনাকে যেন তিনি ধীরে ধীরে ফিরে পান।

গোকুলবাবু প্রায়ই গল্প করেন দুলালের। সেদিন তিনি দুলালের ঘরখানা দেখলেন। বিছানা সমেত দুলালের চৌকি পাতা, সেখান থেকে এই মাত্র সে যেন উঠে গিয়েছে। লেখার টেবিলে কাগজ পত্র গোছানো। সব কিছুর উপর ধুলো পড়েছে। গোকুলবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে সব কিছুর

উপরে ধুলো দেখে সুধাকান্তের মন কেমন করে উঠল। তিনি ধুলো ঝাড়তে আরম্ভ করলেন। ঠিক করলেন এইবার থেকে প্রতিদিন একবার করে ধুলো ঝেড়ে ঘরটা গুছিয়ে রেখে যাবেন তিনি নিজেই।

আবার দুজনে বাইরে এসে বসলেন।

জীবনের কথা থেকে দুজনে নানান তত্ত্বের কথায় পৌঁছে গেলেন। জীবনের অনিত্যতার কথা আলোচনা করতে করতে গোকুলবাবু বললেন—আচ্ছা সুধাকান্তবাবু, বলুন তো সংসারে ধ্রুব পরিণাম কি?

সুধাকান্ত হাসলেন। গোকুলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—সেই ধ্রুব পরিণামের জন্যেই তো মনে মনে অপেক্ষা করছি। মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষমান হয়ে আছি।

গোকুলবাবু বললেন—ঠিক বলেছেন। জীবন আমার কেমন মনে হয় জানেন? মৃত্যুর কল্লোলিত অপার সাগরে জীবনের তরঙ্গ উঠেছে। আস্তে আস্তে সেই মৃত্যুর থেকেই সে একবার জীবনের আকারে ঢেউ হয়ে উঠে আবার পরমুহূর্তে মৃত্যুর পায়েই আছড়ে পড়ছে।

সুধাকান্ত বললেন—এইবার আমার যে অমনি করেই আছড়ে পড়বার সময় এসেছে তা মনে মনে বুঝতে পারছি। আচ্ছা আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। শ্রেয় কি বলুন তো সংসারে?

গোকুলবাবু বললেন—কর্ম।

ঘাড় নেড়ে সুধাকান্ত বললেন—হল না গোকুলবাবু। শ্রেয় হল প্রেম।

গোকুলবাবু বললেন—শ্রেয় সবারই এক নয়। যার যেমনি স্বভাব তার তেমনি হবে।

সুধাকান্ত আলোচনা নিবৃত্ত করে বললেন—চলুন। একবার মণির কাছে আমার সংসারের শেষ কর্তব্য আছে। আমার শেষ বোঝাটা তার কাছেই নামাতে হবে।

রাস্তায় যেতে যেতে গোকুলবাবু বললেন—জানেন, মাঝে মাঝে একটা কথা ভাবি। নিজের কথা। সমস্ত জীবনটা ধরে ছেলেদের সঙ্গে কাটালাম। সকাল থেকে যতক্ষণ না ঘুমিয়েছি ততক্ষণ ওদের দিকে কড়া নজর রেখেছি, আজও রাখি। শুধু একটা কথা ভেবে আজীবন এই কাজ করে এলাম। আজ যারা ছোট, কাল তারা বড় হবে, সংসারে আপনার চিহ্ন রেখে

যাবে। মৃত্যুর গণ্ডী দিয়ে ঘেরা জীবন ঐ সমুদ্রের একটি ঢেউয়ের চূড়ার মত। একবার উঠে আবার ভেঙে পড়বে। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যেন সংসারে আপনার যে যে চিহ্ন সে রেখে যাবে তাতে কালির মালিন্য না লাগে মোটামুটি এইটুকু চেয়েছি। তেমনি করে চরিত্রটা গড়ে দেবার চেষ্টা করি ওদের। তাই পরস্পরকে সহ্য করতে শেখাই, অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝতে শিখিয়ে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে শেখাই। তারপর একদা আমার হাত পার হয়ে ওরা বৃহত্তর জীবনে গিয়ে ঢোকে। আমি দূর থেকে দেখি। ওরা সুখী হলে, কৃতী হলে, আমার মনে হয় এতে যেন আমারও সামান্য মাত্রায় কৃতিত্ব আছে। তবে দুলালের সম্পর্কে ভিন্ন কথা। তাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম।

মণিকে খবর পাঠাতেই মণি এল তাড়াতাড়ি। এসে বললে—কি ব্যাপার কাকামশায়, আপনি এলেন? এমন কি দরকার পড়ল যে আপনাকে আসতে হল? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত।

সুধাকান্ত বললেন—ডেকে পাঠালেই তুমি যেতে তা জানি বাবা! তবে তোমাকে ডেকে পাঠালে তো চলত না। আমারই আসার দরকার ছিল। তোমার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে এসেছি বাবা!

মণি অবাক হয়ে গেল, বললে—আপনার সঙ্গে তো আমার কোন দেনা-পাওনা আর নেই কাকামশায়!

সুধাকান্ত বললেন—আছে বাবা, আছে। যেদিন থেকে তোমার মায়ের কোলে তুমি এসেছ সেই দিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার সম্পর্ক। তোমাকে বুকে করে মানুষ করেছি, ভালবেসেছি আপনার ছেলের মত। তোমার যে অনেক ঋণ ছিল বাবা আমার কাছে। কিন্তু সে ঋণ পরিশোধের দাবী নিয়ে আজ আসি নি বাবা তোমার কাছে। তুমি আমার সে ভালবাসা নিয়ে, আমাকে ভালবেসে সে ঋণ পরিশোধ করেছ। শেষ বয়সে তোমার কাছে আমার কিছু ঋণ জমে উঠেছে। শেষ বয়সে তোমার কাছ থেকে এক অকারণ কৃতজ্ঞতার দাবীতে হঠাৎ মনে হয়েছিল তোমার কাছে আমার পাওনা বেড়ে উঠেছে, সে পাওনা আমাকে পেতে হবে! এর সঙ্গে আমি যে দুলালের মত ছেলের বাবা—

এ কথা মনে হয়েও আমার মহাজনত্বকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল বাবা! আজ তোমার কাছে এসেছি শুধু একটি কথা বলতে—তুমি কিছু মনে কর না। সব ভুলে যাও। আমার যাবার সময় হয়েছে। এ আমার যাবার সময়ের অনুরোধ। তা ছাড়া তুমি আমার দুলালকে ভালবাসতে আপনার ভাইয়ের মত। সেই ভালবাসার ঋণও আমি তার বাপ হয়ে তোমার কাছে শোধ চেয়ে যাচ্ছি।

মণি উঠে দাঁড়াল। তার চোখে জল এসেছে। সে বললে—এ কথা বলতে আসার কোন দরকার ছিল না কাকামশায়। আমার মনের কথা বলি আপনাকে। আপনার উপর কখনও হয়তো রাগ করতে চেয়েছি। কখনও হয়তো সত্যিই রাগের কারণ আপনি ঘটিয়েছেন। তবু রাগ করতে গিয়েও পুরোপুরি রাগ করতে পারিনি আপনার ওপরে। যে ভালবেসেছেন ছেলেবেলায় তার কথা মনে হলে আজও যে মন কেমন করে। ওসব কথা যাক। যেতে দিন। মানুষের ওপর যেমন রাগ করেছি, তেমনি ভালও তো বাসি অনেককে। যাক। আপনি ভাববেন না। পারুল-বৌদি আর ছেলেরা থাকল, আমিও থাকলাম। আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমি দেখব ওদের। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে সুধাকান্ত উঠলেন। মনে আর কোন গ্লানি কি চিন্তা থাকল না।

•

তিনি এবার মৃত্যুর জন্যে দেহে মনে প্রাণে প্রস্তুত হয়েছেন। এবার যেন যেতে পারলেই বাঁচেন। পারুল-বৌমা আর অশোক গগনাথের জন্যে চিন্তা করাও ছেড়ে দিয়েছেন। ভগবান ওদের ভার ওদেরই হাতে দিয়ে ওদের রক্ষা করবেন। যদি রক্ষা না পায় তারা তা হলে সেও হবে তাঁরই ইচ্ছা। আজ তাঁর লীলার অঙ্গন রিক্ত হয়েছে। সকলেই চলে গিয়েছে একে একে।

সেই দিনের জন্যে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই দিন এল। গরমের দিন, দাওয়ার উপর বিছানায় শুয়ে অর্ধ-আচ্ছন্নতার মধ্যে গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

মাথার কাছে পারুল-বৌমা, নাতিরা শুকনো মুখে বসে আছে। একবার

চেতনা হতেই তাদের দিকে চেয়ে বললেন—কেঁদো না মা! আমার জন্যে কেঁদো না। ভগবান আছেন।

মাথার কাছে আরও যেন কে এসে বসেছে। ডাকছে তাঁকে—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!

ঠিক চিনতে পারছেন না তিনি। ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন—কে?

—চিনতে পারছ না! আমি বিদ্যুত! তুমি চললে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমিও এইবার যাব। তুমি আগে যাচ্ছ, তাই যাবার আগে বলতে এলাম—শান্তিতে যাও। তোমার বন্ধু আছে, ছেলেরা আছে, কমলা আছে সেখানে। এখানে যারা থাকল তাদের আমি দেখব যতক্ষণ আছি।

তিনি তাকালেন চারি পাশে। কিছু বলবার নেই। যারা থাকল তাদের দেখতে খুসী হয় দেখো। ভগবান আছেন।

তিনি একবার মনে মনে বললেন—গোবিন্দ হে! তারপর চোখ বন্ধ করলেন। মনের মধ্যে আর্তের মত খুঁজতে লাগলেন গোবিন্দের মুখ।

উপসংহার

আমার সঙ্গে সুধাকান্তের পরিচয় ছিল। পরিচয় হয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে। তাঁর গ্রামে গেলেই তাঁর কাছে যেতাম। গেলেই বৃদ্ধ অতি মিষ্ট হাসি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করতেন। নানান গল্প করতেন। তাঁর ওখানেই আমার খগেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমরা তিনজন এক সঙ্গে হলেই অসমবয়সী হলেও সঙ্গে সঙ্গে নানান গল্প জমে উঠত। তাঁদের দুজনের কাছেই আমি এই কাহিনী টুকরো টুকরো করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুনেছিলাম।

আবার এই গ্রামে এসেছি অনেক দিন পর। আজ সুধাকান্তও নেই, খগেনবাবুও নেই। এ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে আবার আমাকে নূতন মানুষের কাছে ছুটতে হবে। তাতে কাজ কি!

আমি সেই বকুল-মালতী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বকুল ফুটবার সময় না হলেও দু চারটি বকুল ফোটে, ঝরেও পড়ে। এখন মালতী ফোটার সময়, বর্ষাকাল। মালতী গাছটা ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে। শুভ্র শোভায় তার সারা দেহটা সমাচ্ছন্ন। কতক ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে মাটিতে। ক'টা ছাগল ফুল খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দূর দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত অস্তসূর্যের রক্তিম আলোয় গাছপালা বিস্তীর্ণ, রক্ত-আলোক-রঞ্জিত তৃণভূমির উপর বিপুল বিস্তার ছায়া ফেলেছে। বকুল-মালতীর ছায়াও ছড়িয়ে পড়েছে আমার দৃষ্টির ওপার পর্যন্ত। কিন্তু আমি জানি এখনি ঐ ছায়া মিলিয়ে যাবে।

এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি সেই সব মানুষের কথা যারা দুর্দান্ত প্রতাপে এই গ্রামের উপর প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছিল। ভাবছি সেই মানুষটির কথা যে আপনার মমতার শান্ত ছায়ায় গ্রামখানিকে ছায়াস্তীর্ণ করে রাখতে চেয়েছিল। আজ তারা কেউ নেই। তাদের ছোট বড় প্রেম-বিদ্বেষ, হাসি-দুঃখ, বিশ্বাস-উপলব্ধি সব আজ অসীম অন্ধকারে আবৃত। ধ্রুব পরিণাম মৃত্যু—এই কথাই এখানে দাঁড়িয়ে অনুভব করছি।

আজ এখানকার কথা স্মরণ করে মনে হচ্ছে প্রেম আর অপ্রেমের, ভালবাসা আর বিদ্বেষের জটিল ধারাবাহিক ইতিহাস পর্বে পর্বে মৃত্যুর যতি-চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত। কেবল সেই ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডের স্মারক এই তরু-দম্পতি আজও ফুল ঝরিয়ে চলেছে ঋতুতে ঋতুতে, প্রতি মুহূর্তে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে একদিন কিছু মানুষ পরস্পরকে ভালবেসেছিল।

অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে আসছে। আমারও যাবার সময় হয়েছে।

সমাপ্ত